ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

লেখাপড়া
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১৯৬১

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণ
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দুপালিত লেন
কলিকাতা-৬

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এবং

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

১৯৬০ সালের গোড়ায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের উপরে লেখা আমার একখানি অকিঞ্চিৎকর কৃশকায় ভ্রমণ-পুস্তক প্রকাশিত হইলে আমি উহা ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের হাতে দিয়া তাঁহার অভিমত প্রার্থনা করি। কিছু দিন পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাস লইয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে বলেন। বুঝিলাম আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার মনঃপূত হয় নাই অথবা আমি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখি ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী প্রসঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের কথা আসিল কিরূপে?

১৯৫৭ সালে ডক্টর দাশগুপ্ত আমার উপর একটি গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁহার প্রসিদ্ধ "ত্রয়ী" বই খানির হিন্দী অনুবাদের কাজ দিয়া। হিন্দীজানা লোকের পক্ষে ব্যাপারটা কিছু গুরুতর নয়, কিন্তু আমার পক্ষে দুর্ভাবনার কারণ হইল। "অপটু হিন্দীতে অনুবাদ করাইয়া হিন্দী-ভাষী জগতে আপনার একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করাটা কি ঠিক হইবে"—আমার এই যুক্তিপূর্ণ আপত্তির কথা তিনি শুনিলেন না। অগত্যা সে দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করিতে হয়। পরে তাঁহার "ভারতীয় শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশও হিন্দীতে রূপান্তরের সুযোগ আমার হইয়াছিল। এই সমস্ত সূত্রেই হয়ত হিন্দী সাহিত্যের কথা আসে।

আমি তাঁহার কথামত লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম অধ্যায় "হিন্দী ভাষার কথা" প্রকাশিত হইল সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। কিন্তু গোল বাধিল হিন্দী ভক্তি-সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসিয়া। মনে কুবুদ্ধি জাগিল। ভাবিলাম এই উপলক্ষ্যে ভক্তি সাহিত্যের পূর্বকথাটা সারিয়া লইলে কেমন হয়। পূর্বকথা দাঁড়াইল প্রায় আশি পৃষ্ঠায়। ডক্টর দাশগুপ্ত দেখিয়া শুনিয়া

এই বিষয়টি লইয়াই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে বলিলেন। ফলে হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে আমি সরিয়া আসিলাম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। হিন্দী সাহিত্য পড়িয়া থাকিল। '৬০-'৬১-'৬২ এই তিন বৎসরের চেষ্টায় ভক্তি সাহিত্য সম্পূর্ণ হইল। সম্পূর্ণ হইল একথা বলিতে পারি না, আমার রচনা শেষ হইল।

এখানে একটা স্বীকারোক্তি প্রয়োজন। ভক্তিসাহিত্য আমার আলোচ্য বিষয় বলিয়া আমাকে ভক্ত বলিয়া ভুল হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্তই ভুল। আমি ভক্ত নই, ভক্তের কোনো লক্ষণ আমাতে নাই। নবকুমারের মতো আমি বলিতে পারি —ভক্তিতীর্থের মাহাত্ম্য অপেক্ষা আমাকে বেশী টানিয়াছে ভারতীয় চিত্তের ভাব-প্রবাহ। বিষয়টা অন্য কিছু হইতে পারিত, ঘটনা-ক্রমে ভক্তিসাহিত্য হইয়াছে।

ভক্ত না হইয়া ভক্তিসাহিত্য লইয়া আলোচনা করা অরসিকের রস-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করার মতো ধৃষ্টতার পরিচায়ক। কোনো যোগ্য ব্যক্তি এই কাজে হাত দিলে বিষয়ের প্রতি সুবিচার হইত। তবে ভরসার কথা, আমার আলোচনা ভক্তি সাহিত্যের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নয়। ইহা প্রধানত বিপুল ভক্তি সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

ধর্ম-সাহিত্য সম্পর্কে অনেকের মনে অশ্রদ্ধা আছে জানি। অন্যের কথা দূরে থাক, নিজের কথাই বলি। এ-যুগের দৃষ্টি লইয়া সে যুগের সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে গিয়া কখনো কখনো বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে। মনে হইয়াছে, ধর্ম লইয়া বড়োই বাড়াবাড়ি চলিতেছে। কিন্তু উপায় নাই, যে কালের যা 'ধর্ম'। এ-যুগের 'ধর্ম' রাজনীতি, সে-যুগের 'ধর্ম' ছিল ধর্ম। ভারতীয় চিত্ত এককালে ধর্মকেই জীবনের সারাৎসার বলিয়া মনে করিয়াছিল একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা যদি বা করি বিদেশীরা করিবে না। অনেক সময়ে অপরের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে নিজেকে

ভালো চেনা যায়। য়ুরোপীয়দের চোখে ভারতবর্ষের মানসিক চেহারাটা কিরূপ তাহা বুঝিবার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী দু'জন ইংরেজ ভদ্রলোকের কথা শোনা যাক। তাঁহাদের মতে ভারতের আশ্চর্য অতীত উহার ধর্ম-জীবনের সহিত গভীর ভাবে সম্পৃক্ত—the wonder of it is all bound up with its religion (Kingsbury & Phillips—Hymns of Tamil Saivite Saints, Introduction).

সেই আশ্চর্য অতীত আর নাই, তবে তাহার প্রভাব আছে। তাই এই যুক্তি-প্রযুক্তির যুগেও আমরা ধর্মের কথা ছাড়িতে পারি না, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারিলে খুশী হই। কিন্তু নদীতে চড়া পড়িয়া যাওয়ার মতো আমাদের এই ধর্মবোধের চারিদিকে এত কুসংস্কার ও পৌরাণিক গালগল্প জমিয়া গিয়াছে যে, উহাকে বর্তমান যুগে গ্রহণীয় করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের এই ধর্মবোধের বিবর্তনকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। স্বীকার করিতে হইবে যে, অবিশ্বাস্য ঘটনার দ্বারা বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা প্রশংসনীয় নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমি ভক্তিসাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভক্ত পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কিন্তু কেন প্রবৃত্ত হইলাম? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, যাহা মিথ্যা ও কল্পিত, অন্ধভাবে তাহাকে আঁকড়াইয়া না থাকিয়া যাহা সত্য ও ঐতিহাসিক তাহারই অনুসন্ধান প্রয়োজন। আমার আলোচনায় অনেক পূর্বকথার মহিমা হয়তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কৈফিয়ত-স্বরূপ বঙ্কিমের দোহাই পাড়িতেছি—'সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায় কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না।' (কৃষ্ণ চরিত্র ৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় সেই সেই অঞ্চলের ভক্তিসাহিত্যের উপর যে বিপুলসংখ্যক আলোচনাত্মক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আমি তাহার কিছু কিছু—পড়িয়াছি বলিতে পারি না, উল্টাইয়া-

পাল্‌টাইয়া দেখিয়াছি। অনেক পণ্ডিত ভক্তিসাহিত্য আলোচনার নামে কেবল সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব বিচার করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। উদার-বুদ্ধি নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষে এই জাতীয় বৃহদায়তন গ্রন্থ নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করা ধৈর্য-পরীক্ষার একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত—এ সমস্ত হইল আচার্যের ভাষা, দার্শনিকের ভাষা, জ্ঞানীর ভাষা। প্রেমের ভাষা নয়। ভক্ত কবিরা যে ভাষায় কথা বলিয়াছেন তাহা হইল প্রেমের ভাষা। জ্ঞানের ও প্রেমের ভাষা আলাদা। আমি জ্ঞান রহিত; নির্দিষ্ট মত, পথ, সম্প্রদায় বা সিদ্ধান্ত লইয়া কোনো কথা বলার অধিকার আমার নাই। মনে হয়, ভক্ত কবিরাও তাহা করেন নাই। পুরন্দরদাস কন্নড ভাষার বড় কবি ছিলেন। কিন্তু যেখানে তিনি কবি হিসাবে বড়ো সেখানে বিশেষ কোনো মত বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহার ভাব-প্রকাশের পরিচয় নাই। আর যেখানে আছে, সেখানে পুরন্দর দাসের নামাঙ্কিত হইয়াও তাহা অকাব্য ও অপাঠ্য হইয়া রহিয়াছে। পুরন্দর দাসের নামে একটি প্রচলিত পদ এইরূপ (হরিদাস কীর্তন তরঙ্গিণী ২য় ভাগ পৃঃ ৭৮)—ছাড়িও না, ছাড়িও না, মাধ্ব মত ছাড়িও না; ছাড়িয়া নিজের অহিত করিও না ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস ইহা পুরন্দর দাসের রচনা নয়; আর যদি তিনি লিখিয়াই থাকেন লিখিয়াছেন সম্প্রদায়ের চাপে। এইরূপ সাম্প্রদায়িক রচনা অন্য বড়ো কবিদের লেখাতেও অল্প স্বল্প দেখা যায়। সম্প্রদায়, ধর্ম, গোষ্ঠী বা রাজনীতির চাপে শিল্পীদের এই জাতীয় যোগভ্রংশ কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, মহৎ কবিরা যেখানে যথার্থ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন সেখানে সমাজ, সম্প্রদায়, দেশ, জাতি ও ধর্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধনের উপদ্রব নাই। ভক্তি সাহিত্যেও মানবতার সেই মহৎ বাণী—পরুষ-কলুষ ঝঞ্ঝার মাঝে চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী। ভক্তিসাহিত্য আলোচনার এই-টুকুই নির্যাস।

ভারতবর্ষের ব্যবহারিক জীবনে ভক্তিধর্ম ও ভক্তিসাহিত্য আলোচনার সার্থকতা ও উপযোগিতা কী ইহাও একটি সঙ্গত প্রশ্ন। ইহার উত্তর রহিয়াছে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতার মধ্যে। বিশাল ভারতবর্ষে বিভিন্নকালে এত সব বিভিন্ন জাতি আসিয়াছে যে ইহাদের লইয়া একটি অখণ্ড জাতীয় সত্তা গড়িয়া উঠা প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। তথাপি আমরা দেখিতে পাই বহুকাল হইতে এই দেশে একটি সমন্বয়ের সাধনা চলিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে এমন কথা বলা যায় না, কারণ সাধনা এখনও চলিতেছে। ভারতীয় সাধনার সেই বহুমুখী ধারার বহু-বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যেও একটি গভীর ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভৌগোলিক বিশালতা সত্ত্বেও এবং ভাষা ও আচার-আচরণের পার্থক্য থাকিলেও ভারতবর্ষ একটি দেশ, একটি জাতি। ভারতীয় চিত্তের সেই বিশেষ গুণটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার শিল্পে ও দর্শনে, ধর্মে ও সাহিত্যে। ভক্তিধর্ম ও ভক্তিসাহিত্যের আলোচনায় আমরা সেই ভাবগত ঐক্যের সন্ধানে ফিরিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বর্তমানে ভারতবাসী পরস্পরের ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। য়ুরোপীয় সাহিত্যের চুল-চেরা বিশ্লেষণে আমাদের যতটা আগ্রহ প্রতিবেশী সাহিত্যের খোঁজখবর লইতে ততোধিক শৈথিল্য। ১৯৪৭-এর পরে গত ষোলো বৎসরের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। আজ জাতীয় সংহতির দাবি ও প্রয়োজন যেরূপ জোরদার হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার—আমাদের এই মানসিক বিচ্ছিন্নতার—একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিবে না ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস, কেবল পরস্পরের ভাষাশিক্ষাই নয়, পরস্পরের সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ, অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রও দিনে দিনে প্রশস্ত হইবে।

ভারতবর্ষের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা

সংস্কৃত-জগৎ লইয়া প্রচুর আলোচনা-গবেষণা করিয়াছেন, যাহার ফলে ভারতীয় সাহিত্য বলিতে ওদেশে একসময়ে সংস্কৃত ও তাহার আনুষঙ্গিক সাহিত্যকেই বুঝাইত। আজ পশ্চিমের ঝোঁক পড়িয়াছে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর, এবং ইতিমধ্যেই ইংরেজী ভাষায় কয়েকখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপক এদেশে আসিয়া বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া বর্তমান ভারতবর্ষকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর আমরা? পারস্পরিক সংহারকার্যে অমানবীয় উল্লাস বোধ করিতেছি।

গ্রন্থের আয়তন সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। অগ্রসর পাঠক ইহার মধ্যে অনাবশ্যক স্ফীতি লক্ষ্য করিবেন সন্দেহ নাই। উদ্ধৃতির বাহুল্য গ্রন্থকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। আলোচনার মূল পদ্ধতিই ইহার জন্য দায়ী। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সাহিত্যবস্তুর উপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার পরিবর্তে কতকাংশে মূল রচনার সহিত পরিচিত হওয়াকে আমরা অধিকতর ফলপ্রসূ বলিয়া মনে করিয়াছি। আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত ও কবিকুলের সংখ্যা অজস্র বলিয়া স্বভাবতই উদ্ধৃতি-বাহুল্য ঘটিয়াছে। পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন ভাষার মূল কাব্যাংশের যে উদ্ধৃতি ছিল, গ্রন্থে তাহা দুটি কারণে কমানো হইয়াছে। প্রথম উদ্দেশ্য গ্রন্থের কলেবর-নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয়ত, অনেকের কাছে ইহা অনাবশ্যকরূপে বিরক্তিকর, পীড়াদায়ক ও পাণ্ডিত্যগন্ধী বলিয়া মনে হইতে পারে। তাই সামান্য কিছু রাখিয়া বাকি অংশের অনুবাদ ও মূল-উল্লেখ (reference) মাত্র দেওয়া হইল।

আলোচনা বহু-বিস্তৃত বলিয়া সত্যানুসন্ধানে হয়তো ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন এই জাতীয় আলোচনায় সত্যকে পুরাপুরি পাওয়া শক্ত। আমরা বড়ো জোর বলিতে পারি—'সত্যের কাছাকাছি আসিয়াছি।' সুতরাং সব কথা বলিতে পারিয়াছি এমন

স্পর্ধা নাই। সংক্ষেপে কিছুটা আভাস পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পরীক্ষা করিয়াছি বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ পাওয়া যায় কিনা। আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিয়াছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মনোলোক হইতে আমরা দূরে পড়িয়া আছি। আলোচ্য গ্রন্থে সেই ব্যবধান ও দূরত্বের মধ্যে সেতুবন্ধনের সামান্যতম চেষ্টাও যদি লক্ষিত হয়; তবে আর আমার শ্রম নিষ্ফল নয়।

লিপ্যন্তরীকরণ (Transliteration) সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বর্ণমালার মোটামুটি ঐক্য থাকিলেও উহাদের উচ্চারণ-ভেদের জন্য লিপ্যন্তরীকরণে অসুবিধা দেখা দেয়। ইংরেজীর ক্ষেত্রে আমরা চলি উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া। কিন্তু ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে বানান-সমেত শব্দের মূল রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এই নিয়ম সর্বত্র গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ নিছক লিপি-বদল করিতে গেলে কখনো কখনো পরিচিত শব্দগুলিও বিকৃত বেশে আসিয়া হাজির হইবে। যেমন, তামিলের পিরপু, চুরুতি, চূনিয়ম, চিন্‌তু ইত্যাদি শব্দগুলিকে বাংলায় প্রভু, শ্রুতি, শূন্যম্, সিন্ধু—এইরূপে লেখাই সঙ্গত। কন্নড তেলুগুর মঞ্জরি, কাশি, কবিত, শ্রীমতি ইত্যাদি বাংলায় লিপ্যন্তরিত হইলে তাহা বর্ণাশুদ্ধি বলিয়াই গণ্য হইবে। সুতরাং উহাদের স্বর-বৃদ্ধি করিয়া পরিচিত রূপ দিতে হইয়াছে। অন্য দিকে বাংলায় সুপ্রচলিত নাম্বুদ্রি, অন্ধ্র, তেলেগু, তামিলনাদ প্রভৃতি শব্দ গ্রহণ করিতে পারি নাই। পরিবর্তে নম্বূতিরি, আন্ধ্র, তেলুগু, তামিলনাড প্রভৃতি দিয়াছি। আলোয়ার ও আড়্‌বার দুই রকমই লিখিয়াছি। কিন্তু 'তামিল'-এর পরিবর্তে 'তমিড়্' লিখিবার সাহস পাই নাই। মোট কথা মতিস্থির করিয়া সর্বত্র একই নিয়ম অনুসরণ করিতে না পারার ফলে যে অসঙ্গতি দেখা দিয়াছে তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রূফ-দর্শনে গ্রন্থকার নিতান্ত আনাড়ি। যে দুই সজ্জনের উপর এই দায়িত্ব চাপানো হইয়াছিল তাঁহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি হইলেও বানান সম্পর্কে দুই ভিন্ন শিবিরের লোক। সুতরাং গ্রন্থমধ্যে কিছু

বানানবৈচিত্র্যের নমুনাও পাওয়া যাইবে। মুদ্রণকার্য শেষ হইবার পরে যে কয়টি ভুল চোখে পড়িল শুদ্ধিপত্রে তাহার সংশোধিত রূপ দেওয়া হইয়াছে। তাই বলিয়া বাকি অংশকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

ভক্তিসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক ভক্তিতীর্থে আমাকে মানস-ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। আমার ন্যায় দীন ব্যক্তির 'দূর তীর্থদরশনে' যাঁহারা পথপ্রদর্শক হইয়াছেন তাঁহাদের কথা স্মরণ করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রী কে. আর. রাধাকৃষ্ণনের কথা। বিদ্যাবয়োবৃদ্ধ এই দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ যে-ভাবে আমাকে প্রাচীন তামিল সাহিত্যের দুরূহ পথ পরিক্রমায় সাহায্য করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নাই। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়কে আমি দৈবানুগৃহীত বলিয়া মনে করি। আমি যখন তামিল গ্রন্থাদি সামনে লইয়া জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রখর আলোর নিচে বসিয়া গভীর অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছিলাম তখন হঠাৎ একদিন গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষেই এই মহানুভব পণ্ডিতকে আবিষ্কার করা গেল। তাহার পর হইতে সময়ে অসময়ে তাঁহাকে কতই না জ্বালাতন করিয়াছি। কোনো কোনো দিন এক নাগাড়ে আট-নয় ঘণ্টাও আমাদের অধ্যয়ন চলিয়াছে। ইহার জন্য কিন্তু একটি পয়সাও আমার খরচ হয় নাই, উপরন্তু তাঁহারই গৃহে প্রস্তুত ইড্‌লি-দোসৈ প্রভৃতি নানারূপ উপাদেয় আহার্য গ্রহণের সুযোগ জুটিয়াছে। একদিন আমিও থাকিব না, রাধাকৃষ্ণন্‌ও থাকিবেন না, কিন্তু এই চিত্রটি জাগিয়া থাক।

আর মনে পড়িতেছে অরুণস্বামীর কথা। 'বঙ্গসাহিত্য বিশারদ' এই তামিল তরুণ আমাকে তামিল শিখিতে সাহায্য করিয়াছেন বলিলে কম বলা হয়। অরুণ এবং তাঁহার মাতা-পিতার সাহচর্যে আমি যে কতদিন তাঁহাদের দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট্-এর গৃহে বসিয়া তিরুচি-তাঞ্জোর-তিরুনেল্‌বেলি-র পথ ঘাট মঠ মন্দির ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি তাহার হিসাব নাই। এই গ্রন্থ রচনার পরে

তাঁহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই, বরং ঘনিষ্ঠতর হইল। অন্য যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন নিম্নলিখিত তালিকায় তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল—**তামিল:** পি. এন্. বেঙ্কটচারী, কে. সুব্রহ্মণ্যম্, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, শঙ্কর শর্মা, আর্. লক্ষ্মীনারায়ণন, আর্. শঙ্করন্, এস্. কৃষ্ণন্, নটরাজন্, সিংগারম্, পি. এন্. ত্যাগরাজন্ এবং সুব্রহ্মণ্যদম্পতী। **তেলুগু:** সত্যনারায়ণ রাও, রঙ্গনাথ রাও, প্রভাকর রাও, এন্. নাগরাজন্ এবং দক্ষিণামূর্তি। **কন্নড:** এম্. এন. নাগরাজ। **মলয়ালম্:** এস্. বালসুব্রহ্মণ্যম্, সি. কে. রবি বর্মা এবং শ্রীমতী অম্মিণি মেনোন্। **মরাঠী:** চিন্তামণ দাতার এবং কুমারী মালিনী ওয়ারে। **গুজরাতী:** কে. ডি. জাসাণী এবং কুঞ্জবালা কাপডীয়া। **পঞ্জাবী:** গুরনেক সিং এবং জ্ঞানী নাথ সিং জগ্‌গি **হিন্দী:** কৃষ্ণাচার্য। **বাংলা:** চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং জ্ঞানপদ ভট্টাচার্য।

জাতীয় গ্রন্থাগারের নানা বিধি-নিষেধের মধ্যেও যাঁহাদের সহযোগিতায় গ্রন্থাদির অনুসন্ধান ও গ্রন্থ-প্রাপ্তির শ্রম অনেকটা লাঘব হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কে. বি. রায়চৌধুরী, তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, নকুল চট্টোপাধ্যায়, বাণী বসু, সুনীলবিহারী ঘোষ, কার্ত্তিক সাহা, অরুণ দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। কলিকাতাস্থিত ভারতী তামিল সঙ্গম্, তামিল এড়ুত্তালর সঙ্গম্, আন্ধ্র সাহিত্য পরিষদ্, মলয়ালী সমাজম্, পঞ্জাবী সাহিত সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে তুত্তুকোডি কলেজের অধ্যক্ষ এবং তামিল সাহিত্যে 'নাণল্' এই ছদ্মনামে সুপরিচিত শ্রীনিবাস রাঘবন্-এর কথা বলা প্রয়োজন। আর বলিতে হয় কুম্ভকোণম্-নিবাসী বৃদ্ধ তামিল ডাক্তার গোপালস্বামী অয়্যরের কথা—১৯৫৭ সালের এক শীতের সন্ধ্যায় মাদ্রসের এড়ুম্পুর (এগ্‌মোর) স্টেশন হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য যাঁহাকে 'বোট্ মেল্'-এর ভ্রমণসঙ্গীরূপে পাইয়াছিলাম এবং যাঁহার সহিত আলাপের মধ্য দিয়া তামিল ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমার

প্রথম অনুরাগ জন্মে। আরও অনেক কাল আগে যাঁহাদের কাছে মলয়ালম্ ও তেলুগু ভাষায় আমার হাতেখড়ি হয় আজ আর তাঁহাদের নাম মনে পড়িতেছে না। সেই বিস্মৃত-নামা বন্ধুদের উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম রহিল।

গ্রন্থরচনা কালে উৎসাহদানে অকুণ্ঠিত ছিলেন ছাত্রবৎসল অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী এবং অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। ৩৮৪-৩৮৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রবীন্দ্র-অনূদিত (তুকারামের) পদগুলি অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত। গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য নিরন্তর তাগিদ দিয়া যিনি আমাকে প্রায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য। এই অকৃত্রিম হিতৈষীর পরামর্শ না পাইলে গ্রন্থের দশম অধ্যায়টি হয়তো লেখা হইত না।

অনেক নামোল্লেখ হইল বটে, কিন্তু যাঁহাদের উপদেশ-নির্দেশ ব্যতীত গ্রন্থ-রচনা দূরে থাক, রচনার কল্পনাও আমার মনে জাগিত না, উৎসর্গপত্রে তাঁহাদের নাম-গ্রন্থনের সুযোগ পাইয়া আমি ধন্য বোধ করিতেছি।

গ্রন্থ প্রকাশের কাজে আনুকূল্য করিয়াছেন সর্বশ্রী অমিয়কুমার চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রাখাল সেন এবং তুলসী দাস। ইঁহারা বন্ধুজন, ভবিষ্যতে ইঁহাদের কাছে অধিকতর সাহায্যের প্রত্যাশী। সুতরাং ধন্যবাদের পালা চুকাইবার সময় এখনও আসে নাই।

গবেষণার ক্ষেত্রে ইহাই আমার প্রথম কাজ। শেষ কিনা জানি না। হৃষীকেশকে হৃদয়ে রাখিয়া কাজ করিলাম। ফলাফলও তাঁহারই হাতে। আমি শুধু যামুনাচার্যের ভাষায় বলিতে পারি 'তত্র শ্রমস্তু মম মন্দবুদ্ধেঃ'—আমি মন্দ বুদ্ধি, আমার পক্ষে শ্রম করাই সহজ।

বিষয়সূচী

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয়, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই, গো চাই, আয়ু চাই, শত্রুপরাভব চাই; যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন, তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়—সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তাবনা

ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা-সমূহের মধ্য দিয়া বিভিন্ন কালে ভক্তিধর্ম যে সাহিত্য-রূপ লাভ করিয়াছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সেই সমগ্র ভক্তিসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কিছুটা আভাস পাইবার জন্য প্রস্তুত গ্রন্থের পরিকল্পনা। ইহাতে যে পূর্ব ও উত্তর ভারতের অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া এবং হিন্দীর কোনো আলোচনা নাই তাহার কারণ এই নয় যে, উল্লিখিত ভাষাগুলির ভক্তিসাহিত্য উৎকর্ষে ও পরিমাণে কিছু কম; তাহার কারণ এই যে, বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া বাংলা ও তাহার প্রতিবেশী প্রদেশগুলির ভক্তিসাহিত্যের আলোচনা ইতিপূর্বে অল্পবিস্তর হইয়াছে। কিন্তু সুদূর দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষায় নিবদ্ধ ভক্তিসাহিত্য এখনও বাংলা ভাষার বহিরঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে।[১] দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলুগু, কন্নড ও মলয়ালম্ এবং পশ্চিম ভারতের মরাঠী, গুজরাতী ও পঞ্জাবী—এই সাতটি ভাষার ভক্তিসাহিত্য আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। ইহার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কোনো কোনো রচনাও যুক্ত হইয়াছে। বাংলাদেশের ভক্তিসাহিত্যে জয়দেব, রূপ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত রচনা যেমন অবশ্যই আলোচনার যোগ্য, তেমনি দক্ষিণ ভারতের ভক্তিসাহিত্যে আলোচনার দাবি করিতে পারে কুলশেখরের 'মুকুন্দমালা', লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতম্', মেল্‌পত্তুর ভট্টতিরি-রচিত 'নারায়ণীয়ম্', এবং নারায়ণতীর্থের

---

১ শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজদাস বাংলা ভাষায় তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃতির অনুরাগী ও জাতীয় সংহতিকামী দেশবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

'কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী'। শ্রীমদ্ভাগবত দক্ষিণ ভারতের রচনা বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের অভিমত সত্য হইলেও উক্ত গ্রন্থ আজ সমগ্র ভারতের অতি-পরিচিত বস্তু বলিয়া আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তথাপি রামায়ণ মহাভারতকে বাদ দিয়া ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে ঐ দুই মহাগ্রন্থের প্রসঙ্গ যেমন নানাস্থানে অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়ে, আমাদের এই ভক্তিসাহিত্যের আলোচনায় ভাগবত-প্রসঙ্গও সেইরূপ আসিয়া পড়িয়াছে। আর আসিয়াছে বাংলা ও হিন্দী ভক্তিসাহিত্যের প্রাসঙ্গিক কথা। এই দুটি ভাষার ভক্তিসাহিত্য বিশেষ গৌরবের অধিকারী এবং অন্যান্য ভক্তিসাহিত্যের সঙ্গে তাহাদের সংযোগও নিতান্ত দূরবর্তী নয়। তুলনা-ক্রমে কোথাও জয়দেব-বিদ্যাপতি কোথাও কবীর-সুর-তুলসীর প্রসঙ্গ তুলিয়াছি।

উত্তর ভারতবর্ষে ভক্তিসাহিত্য বলিতে সাধারণত বৈষ্ণব সাহিত্যকে বুঝাইলেও দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে সেকথা বলিবার উপায় নাই। তামিল, তেলুগু ও কন্নড ভাষায় বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ ও রামকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ ধর্ম-আন্দোলন ও ধর্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তদপেক্ষা প্রবল আন্দোলন ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে শিবকে কেন্দ্র করিয়া। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ভক্তি-সাহিত্য স্পষ্টভাবেই দুইভাগে বিভক্ত—শৈব ও বৈষ্ণব। ইহাদের মধ্যে শৈব সাহিত্যকে অগ্রবর্তী ও অধিকতর প্রভাবশালী বলিয়া ধরা যায়। তামিলনাডে শৈব ও বৈষ্ণব সাহিত্য অনেকটা সমান্তরাল-ভাবে চলিলেও আন্ধ্র ও কর্ণাটকে এই দুই সাহিত্যের ধারায় একটা বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি প্রদেশে শৈবমত যত শীঘ্র ও স্বাভাবিকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্মের পক্ষে সে সুযোগ ঘটে নাই। বীর শৈব মতের প্রবর্তক আচার্য বসবন্ ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আচার্য মধ্ব জন্মিয়াছিলেন এক শতাব্দী পরে। আরও উল্লেখযোগ্য

এই যে, দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই কন্নড ও তেলুগু ভাষায় যে বিপুল শৈব সাহিত্য গড়িয়া উঠে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণীয় রূপ দেখা যায় নাই। পঞ্চদশ শতকে শৈব সাহিত্যের ধারা ক্ষয়িষ্ণু হইতে থাকিলে বৈষ্ণব সাহিত্যে নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়। তামিলনাড, কর্ণাটক ও আন্ধ্র এই তিনটি প্রদেশেই শৈব-ধর্মের অগ্রগণ্যতার কথা বিবেচনা করিয়া আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে শৈব সাহিত্যের পরে বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা বলিয়াছি।

আলোচনার মূল বিভাগ হইয়াছে ভাষাক্রম ধরিয়া, শৈব-বৈষ্ণবের ক্রমানুসারে নহে। কারণ, আলোচ্য সাতটি ভাষার মধ্যে তামিল, তেলুগু ও কন্নড ছাড়া অন্য ভাষাগুলিতে শিব ভক্তির কোনো লক্ষণীয় প্রকাশ দেখা যায় নাই। সুতরাং দেবতার ক্রম-ধরিয়া মূল বিভাগ না করিয়া ভক্তিসাহিত্যের বিবর্তন অনুযায়ী বিষয়-বিভাগ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি।

শিবই হউন আর বিষ্ণুই হউন, ভক্তিসাহিত্যের আলোচনায় এই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই যে, এই ধারা ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশ তামিলনাড হইতে শুরু করিয়া ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখী হইয়াছে। প্রথমে তামিল, অতঃপর কন্নড, তেলুগু ও মলয়ালম্। তামিলনাডের উত্তরে কর্ণাটক, কর্ণাটকের উত্তরে মহারাষ্ট্র। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্ম কাবেরী-কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া উত্তর ভারতে আসিয়া প্রবেশ করে। গুজরাতে ও পঞ্জাবে ভক্তিসাহিত্যের উন্মেষ ঘটে মহারাষ্ট্রীয় ভক্তি-আন্দোলনের পরে। এই ঐতিহাসিক বিকাশের কথা স্মরণে রাখিয়া ভক্তি-সাহিত্যের আলোচনায় তামিলনাড-কর্ণাটক-আন্ধ্র-কেরল-মহারাষ্ট্র-গুজরাত-পঞ্জাব এই ভৌগোলিক ক্রম অনুসরণ করিয়াছি। ভক্তি-আন্দোলন ও ভক্তিসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সঙ্গতিটুকু আমাদের দৃষ্টি এড়াইবে না আশা করি।

স্বভাবতই আলোচনার ক্ষেত্র বহু-বিস্তৃত এবং আলোচনার কাল বহু-প্রসারিত। স্থান ও কালের এই ব্যাপকতার জন্য কোনো ভাষার ভক্তিসাহিত্য সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা করিবার অবসর আমাদের হয় নাই। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই সাতটি ভাষার মধ্য দিয়া ভক্তিধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমটি অনুসরণ করা এবং উহার বৈচিত্র্য, ঐক্য এবং সাহিত্যিক রূপটি চিনিয়া লওয়া। তাই প্রত্যেক ভাষার মুখ্য বা প্রতিনিধিস্থানীয় কবি-সাধকদের রচনা লইয়াই আমাদের তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছে। কখনও কখনও যে অপ্রধান কবিদের কথা বলিয়াছি বা তাঁহাদের রচনার পরিচয় লইয়াছি—তাহা কেবল প্রধান কবিদের ভূমিকা বা পরিশিষ্ট-রূপে। কিন্তু সব কিছুর উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—ভক্ত-কবি নয়, ভক্তি-সাহিত্যের ধারা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলা যায়, প্রত্যেক ভাষার ভক্তি আন্দোলনের এক-একটা বিশেষ যুগ দেখা দিয়াছিল। ইহার সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা সাধারণত সেই বিশেষ যুগ-সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। দু-একটি ক্ষেত্রে যে যুগ-বহির্ভূত কবি ও তাঁহার রচনার কথা বলিয়াছি তাহা কেবল কবির স্বকীয় মহত্ত্বের কথা বিবেচনা করিয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে তামিল সাহিত্যের আধুনিক কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী এবং তেলুগু সাহিত্যের অনাধুনিক কবি ত্যাগরাজের কথা। ইঁহারা যথাক্রমে বিংশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কবি হইলেও ইঁহাদের বাদ দিয়া তামিল ও তেলুগু ভক্তিসাহিত্যের কথা চিন্তা করা যায় না। ত্যাগরাজ তো পুরাপুরি ভক্ত ছিলেন, ভারতীও তামিল-ভাষীদের প্রাণের সামগ্রী। তিনি মুখ্যত দেশ-প্রেমের কবি হইলেও তাঁহার ভক্তরূপটিও উপেক্ষণীয় নয়। একদিকে যেমন তিনি রচনা করিয়াছেন দেশভক্তির উদ্দীপনাময়ী কবিতা, অন্যদিকে তেমনি লিখিয়াছেন কৃষ্ণগাথা (কণ্ণন্‌পাট্টু)। ত্যাগরাজ ও ভারতীর

স্থায় ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে আমাদের আলোচ্য ভক্তিসাহিত্যের কালসীমা এইরূপ :

ভাষা	শতাব্দী
তামিল	ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ
কন্নড	দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ
তেলুগু	দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ
মলয়ালম্	দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ[1]
মরাঠী	ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ
গুজরাতী	পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ
পঞ্জাবী	পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যায়, তামিলকে বাদ দিলে[2] ভক্তিধর্মের দৃষ্টিতে ষোড়শ শতাব্দী সমগ্র ভারতবর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য কাল। মনে হয় যেন হিন্দী বাঙালী-অসমীয়া-ওড়িয়া-মরাঠী-গুজরাতী-পঞ্জাবী-তেলুগু-মলায়লী-কন্নডিগ কবিরা একইযোগে একইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র দেশকে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। সূর-তুলসী-বল্লভাচার্য, চৈতন্য-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস, পঞ্চসখা, শঙ্করদেব, ব্যাসরায়-পুরন্দর-কনকদাস, পোতানা-ক্ষেত্রয়্য-নারায়ণতীর্থ, এড়ুত্তচ্ছন্-পুন্তানম্, একনাথ-তুকারাম, মীরাঁ-নরসিংহ, ফরীদ-নানক-হুসৈন এই সমস্ত আচার্য-কবি-সাধক-বৃন্দের বাণী-মধুরিত ষোড়শ শতাব্দী ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে চিরভাস্বর।

সমগ্র গ্রন্থখানি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আর্যাবর্তে ভক্তিধর্মের ক্রমবিকাশের ধারাটি

১ লীলাশুক বিল্বমঙ্গল রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতম্'কে মলয়ালম্ ভক্তি-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি।

২ ষোড়শ শতাব্দীর তামিল কবি অরুণগিরিনাথর্ 'তিরুপ্পুগড়্' (শ্রীকীর্তি) নামক ভক্তিকাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা পূর্ববর্তী তামিল ভক্তিসাহিত্যের সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে না।

দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বেদে যে ভক্তিধর্মের ঈষৎ সূচনা তাহা উপনিষদের যুগে বিকশিত হইয়া গীতায় আসিয়া কৃষ্ণ-ভক্তিতে সম্পূর্ণতা লাভ করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতে ভাগবতধর্ম বা বৈষ্ণবধর্মের যে প্রভাব দেখা যায়, গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কালে তাহা হ্রাস পাইতে থাকে।

এই সময়ে নানা ঐতিহাসিক কার্য-কারণ-সংযোগে দক্ষিণভারতে ভক্তিধর্মের যে অভ্যুদয় ঘটে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। আর্যাবর্ত তথা ভারতবর্ষের ভক্তিধর্ম যে মূলত দ্রাবিড় সংস্কৃতির ফল এবং পঞ্চম শতাব্দীতে সেই ভক্তিধর্ম যে উত্তরাপথ হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া রূপান্তর লাভ করিয়া মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব প্রাণ-প্রবাহ সৃষ্টির আয়োজন সম্পূর্ণ করিল তাহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়কে প্রাদেশিক ভক্তিসাহিত্য আলোচনার উপক্রমণিকা রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে তামিল ভক্তিসাহিত্যের অধ্যয়ন। দ্রাবিড় সংস্কৃতির ফল-স্বরূপ ভক্তিধর্মের আলোচনায় তামিল সাহিত্যের দাবি সর্বাগ্রগণ্য। কারণ দ্রাবিড় ভাষা ও সংস্কৃতির পূর্বতন বৈশিষ্ট্য তামিলে যতটা অক্ষুণ্ণ আছে, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্য ভাষাগুলিতে তাহা নাই। বস্তুত দাক্ষিণাত্যে ভক্তিধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে তামিল ভাষার মধ্য দিয়া। নানা কারণে আমরা তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যকেই ভাগবতের প্রস্তাবনা বলিয়া ধরিয়াছি। কোন্ সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে তামিলনাডে ভক্তিসাহিত্যের প্রবল বন্যা দেখা দিল, প্রায় একই সময়ে একই অঞ্চলে কিভাবে একই ভক্তিধর্ম শৈব ও বৈষ্ণব নামক দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত হইল, তাহার আলোচনা করিয়া আমরা স্বতন্ত্র আটটি পরিচ্ছেদে বিপুলায়তন তামিল ভক্তিসাহিত্যের পরিচয় লাভের চেষ্টা করিয়াছি। শৈব ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সাধারণ আলোচনা ছাড়া শৈব-সংগীত তেবারম্, শৈব-কবি

মাণিক্কবাচকর্, বৈষ্ণব কবি আণ্ডাল ও নম্মাড়্বার্, রামায়ণ-কার কম্বন্ এবং ভক্তকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ণাটকের শৈব ও বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা। কর্ণাটকে এই উভয় ধারার তরঙ্গ আসিয়াছে তামিলনাড হইতে। বীর শৈববাদের প্রবর্তক বসবন এবং দ্বৈতবাদের প্রচারক মধ্বাচার্য উভয়েই তামিল সাহিত্য ও সাধনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এই আচার্য-দ্বয়কে অনুসরণ করিয়া কন্নড ভাষায় যে ভক্তি সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তন্মধ্যে আমরা 'বচন সাহিত্য' (শৈব) ও 'হরিদাস সাহিত্য' (বৈষ্ণব) সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কন্নড ভক্তিসাহিত্যের এই দুইটিই প্রধান শাখা।

পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে তেলুগু সাহিত্যের কথা। পরস্পর প্রতিবেশী-রূপে, আবার কখনও কখনও একই রাজবংশের শাসনাধীন থাকিয়া, কর্ণাটক ও আন্ধ্র অনেকটা যে একই সংস্কৃতির অধিকারী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। শৈব ও বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্‌ভব ও ক্রমবিকাশেও সেই ঐক্যটুকু লক্ষণীয়। কর্ণাটকী সংগীতের পুষ্টি-সাধনেও এই দুই রাজ্যের সাধনা সমানভাবে স্মরণীয়—প্রথম দিকে কন্নডিগ এবং পরে তেলুগু কবিরা দক্ষিণের এই সাংগীতিক ঐতিহ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। তেলুগু সাহিত্যের যে অংশ "দক্ষিণ দেশীয় তেলুগু সাহিত্য" (অর্থাৎ তামিলনাডে রচিত তেলুগু সাহিত্য) নামে পরিচিত তাহার রাজনৈতিক ইতিহাসটুকু বুঝিয়া লইয়া আমরা একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে ভা[illegible] ত্যাগরাজ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যে বিষ্ণু-ভক্তির তুলনায় শৈব প্রভাব খুবই সামান্য। বস্তুত কেরলীয় ভক্তিসাহিত্য বলিতে তাহার বৈষ্ণব সাহিত্যকেই বুঝায়। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কেরলীয় সাহিত্যে শৈব মতের এই দীনতা বোধ করি নম্বুতিরি

ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর প্রভাবের ফল।. ইঁহাদের প্রভাবে কেরলে একদিকে যেমন আর্য-ভাষা সংস্কৃতের প্রবল চর্চা হইয়াছে, অন্যদিকে তাহার চেয়ে অধিকতর উল্লেখযোগ্য—'ভাষা'য় (অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা মলয়ালম্-এর উপর) সংস্কৃতের অস্বাভাবিক প্রভাব—যাহার ফলে কেরলে 'মণিপ্রবালম্' ভাষারীতির বিশেষ চর্চা হইয়াছিল। কেরলের ভক্তিসাহিত্য কিভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে ভিন্নকালে ভিন্নরূপ লইয়াছে তাহার মোটামুটি আভাস দেওয়া হইয়াছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

মহারাষ্ট্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোজক। এই রাজ্যের পাঁঢরপুর মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক উভয় অঞ্চলের বৈষ্ণব সাধকদের তীর্থ-ভূমি এবং পাঁঢরপুরের দেবতা বিঠল বা বিঠোবা উভয় সাহিত্যকে সমান প্রেরণা যোগাইয়াছে। পাঁঢরপুরের প্রথম ইতিহাসে কর্ণাটকী সাধু পুণ্ডলীকের স্মৃতি জড়িত থাকিলেও পরবর্তীকালের মরাঠী ভক্তবৃন্দও যে এই তীর্থ ও তীর্থ-দেবতার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন, মহারাষ্ট্রের বারকরী সম্প্রদায় তাহার প্রমাণ। এইভাবে, মধ্বাচার্য তামিল দেশে ভ্রমণ কালে শ্রীরঙ্গম্ হইতে যে ভক্তি-প্রদীপ জ্বালাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহার স্নিগ্ধ আলোক কর্ণাটকের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া মহারাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। মধ্বাচার্যের অব্যবহিত পরে মরাঠী সাধক জ্ঞানেশ্বর-নামদেবের সাধনা জনগণের মধ্যে যে ভক্তি-উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল তুকারামে আসিয়া তাহা সার্থক পরিণতি লাভ করে। সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বস্তু এই মরাঠী ভক্তিসাহিত্য যাহা কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যের ন্যায় বৈষ্ণব সাহিত্যের নামান্তর মাত্র। শৈব-ধর্ম দ্রাবিড় ভূমিতে জয়-ধ্বজা উড়াইতে সমর্থ হইলেও আর্য-প্রধান মহারাষ্ট্রে তাহার সমাদর হইল না।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাত প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কিন্তু গুজরাতের ভক্তি-সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে মরাঠী সাহিত্যের কাছে ততটা ঋণী নয়, যতটা

ঋণী হিন্দী সাহিত্যের কাছে। মরাঠী ভক্ত নামদেব চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া ভক্তিধর্মের বীজ বপন করিয়া যান। উত্তর কালে তাহা হইতে, এবং তৎসহ রামানন্দ প্রভৃতি আরও অনেক ভক্ত সাধকের সাধনায় ও প্রচারে ব্রজমণ্ডলে যে ভক্তির জোয়ার বহিল, জৈনধর্মের দেশ গুজরাতও তাহাতে অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হইল। মীরাঁ-নরসিংহের কাব্যধারা বণিক্-প্রধান গুজরাতী সমাজে বিশুদ্ধ ভক্তি-চেতনা অপেক্ষা কীভাবে একপ্রকার রস-মাধুর্য-ময় ধর্মবোধে পরিণত হয় অষ্টম অধ্যায়ে তাহার বিবরণ রহিয়াছে।

নবম অধ্যায়ে আলোচিত পঞ্জাবী ভক্তিসাহিত্য আমাদের মূলধারা হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। সুদূর দক্ষিণ হইতে ভক্তিধর্মের প্রভাব উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবে পৌঁছিবার পূর্বে পশ্চিমাগত সূফীধর্ম সেখানে অধিকার বিস্তার করিয়া বসিল। শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক পঞ্জাবী সূফী সাধক শেখ ফরীদের কাছে কম ঋণী ছিলেন না। অবশ্য নানকের প্রধান গুরু ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ রামানন্দ—দক্ষিণের ভক্তিধারা উত্তর ভারতে আনয়ন-প্রসঙ্গে যাঁহার নাম হিন্দী-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুতরাং নানকের মিশ্র সাধনাকে দক্ষিণের ভক্তিধর্ম হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া যায় না। তথাপি সমগ্রভাবে পঞ্জাবের ভক্তিসাহিত্যে যে সূফীপ্রভাব বলবৎ হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং এই কারণেই 'দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের ভক্তিসাহিত্য' প্রসঙ্গে পঞ্জাবের ভক্তিসাহিত্য পরিশিষ্ট-স্থানীয়।

দশম বা শেষ অধ্যায়ে বিপুল দেশ ও কালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এই সমগ্র ভক্তিসাহিত্যের উপর একটা সংক্ষিপ্ত 'সর্বেক্ষণ' (Survey) করিয়া গ্রন্থের উপসংহার টানা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

আর্যাবর্তে ভক্তিধর্মের ক্রমবিকাশ

১. ভক্তিধর্মের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আর্যসভ্যতার সুদূর অতীত লোকে গিয়া পৌঁছিতে হয়।[১] বহু শতাব্দীর পথ বাহিয়া ভক্তির ভাবানুভূতি যেভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার বিভিন্ন স্তরগুলি সর্বদা সুস্পষ্ট নহে।

আরাধ্য দেবতার প্রতি যে গভীর প্রীতিপূর্ণ বিশ্বাসের ফলে হৃদয়ে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়, সাধারণভাবে বৈদিক কবিদের রচনায় তাহার আপেক্ষিক অভাব দেখিয়া কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, ভক্তিধর্ম পরবর্তী পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি। ভগবদ্‌গীতায় যে বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনার কথা পাওয়া যায়, তাহাতে শ্রদ্ধার সহিত রহিয়াছে মানবহৃদয়ের একটা গভীর প্রেম-সম্পর্ক। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে শ্রদ্ধা বা ভক্তিশব্দের যে সমস্ত প্রয়োগ রহিয়াছে, তাহার কোনো ক্ষেত্রেই ভক্তির এই অর্থটি পরিস্ফুট হয় নাই।[২] বিশিষ্ট ধর্মীয় পারিভাষিক অর্থে বেদে ভক্তিশব্দের উল্লেখ নাই।[৩]

১ The origin of the way of devotion is hidden in the mists of long ago. S. Radhakrishnan—The Bhagavadgita p. 59

২ এই প্রসঙ্গে যজ্ঞপ্রধান বৈদিক যুগ সম্পর্কে একটি মন্তব্য : Though the sacrifices were generally made to some particular god or gods they were nothing of the kind of an attempt at establishing any sort of personal contact between the god or gods in question and the sacrificer. S. B. Das Gupta—Obscure religious cults p. 71.

৩ Indian Historical Quarterly—Vol. VI No. 2. p. 324.

পারিভাষিক অর্থে ভক্তিশব্দের উল্লেখ না থাকিলেও বিস্তৃত বৈদিক সাহিত্যের কোনো কোনো স্থলে ভক্তির ভাবটি নিঃসংশয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। বেদের মন্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার সমস্তটাই কেবল দানধ্যানের আবেদন-পত্র নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেবতার সহিত কবির বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্কের কথাও বলা হইয়াছে। এবং একটি ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক বিশেষিত হইয়াছে 'স্বাদু' (অর্থাৎ মধুর) শব্দের দ্বারা —যস্য তে স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতিরদ্রিবঃ (৮।৬৮।১১)—হে ইন্দ্র, তোমার সখ্য স্বাদু অর্থাৎ অতীব অনুভবযোগ্য এবং প্রণীতি[১] অর্থাৎ প্রণয় আনন্দদায়ক।

ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া অন্যত্র বলা হইয়াছে—আমার সুখান্বেষী মনের সমস্ত আকাজ্ক্ষা সমবেত হইয়াছে তোমার প্রশংসায়। স্ত্রী যেমন তাহার স্বামীকে আলিঙ্গন করে, তেমনি তাহারা (আমার স্তুতিসমূহ) নির্দোষ ও উদার ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করে। হে পুরুহূত ইন্দ্র, তোমার প্রতি উন্মুখ আমার মন যেন তোমা হইতে কখনও বিমুখ না হয়। তোমাতেই আমার আকাজ্ক্ষা স্থাপন করি।[২]

ইন্দ্র-স্তুতি অপেক্ষা বরুণ-স্তুতিতে ভক্তের হৃদয়ানুভূতি অধিকতর আন্তরিক হইয়াছে—হে বরুণ, আমি কি স্বীয় তনুর দ্বারা তোমার সহবদন করিতে পারিব ? কবে আমি তোমার চিত্তে সংলগ্ন হইব ? হে বরুণ, আমি এমন কি অধিক অপরাধ করিয়াছি যাহার জন্য তুমি এই স্তুতিকারী বন্ধুকে জিঘাংসা করিতেছ ? হে দুর্দম তেজস্বী

১ প্রণীতি কথাটির অর্থ সায়ন ভাষ্যে দেওয়া হইয়াছে এইরূপ—প্রণীতিঃ প্রণয়নং ধনাদীনাম্।

২ পরিষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন
শুন্ধ্যুং মঘবান মূতয়ে।
ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মে মন স্তে ইতকামং
পুরুহূত শিশ্রয়। ১০।৪৩।১-২

বরুণ, আমার সেই অপরাধের কথা বল যাহাতে আমি পাপশূন্য হইয়া শীঘ্রই নমস্কারের দ্বারা তোমাকে অর্চনা করিতে পারি।[১]

২. বৈদিক সংহিতায় ভক্তির যে আভাস পাওয়া যায় তাহা আরও একটু বিকশিত রূপ লইয়াছে উপনিষদের যুগে। বিভিন্ন উপনিষদের স্থানে স্থানে এমন প্রসঙ্গ কিছু কিছু আছে যাহা ভাবের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ভক্তিরসের ইঙ্গিত বহন করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—প্রিয় স্ত্রী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া মানুষ যেরূপ বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কিছুই জানে না, সেইরূপ এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কিছুই জানে না।[২] তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—তিনিই প্রেমময় এবং সেই প্রেমময়কে লাভ করিয়া সকলে আনন্দিত হয়।[৩]

ভগবানের অনুগ্রহই যে ভক্তের পরম আশ্রয় মুণ্ডক উপনিষদে সে সম্পর্কে বলা হইয়াছে—সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, যাহাকে তিনি বরণ করেন। তাহার কাছেই এই আত্মা স্বীয়তনু প্রকাশ করে।[৪] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই বোধ করি বর্তমান প্রচলিত অর্থে 'ভক্তি' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়—যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা

১ উত স্বয়া তন্বা সং বদে তৎ কদা ন্বন্তর্বরুণে ভুবানি।
কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎ স্তোতারং
জিঘাংসসি সখায়ম্।
প্রতন্মে বো চো দূলভ স্বধা বো হব
স্বানেনা নমসা তুর ইয়াম্॥ ৭।৮৬।২-৪

২ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমে-বমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদনান্তরম্ ইত্যাদি ...৪।৩।২১

৩ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। ২।৭

৪ যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্। ৩।২।৩

দেবে তথা গুরৌ ইত্যাদি (ষষ্ঠ অধ্যায় ২৩ সং মন্ত্র)। এইরূপে বিভিন্ন উপনিষদে ভক্তিমূলক উপাসনার কথা পাওয়া যায় বলিয়া ভক্তিধর্মকে সকলে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন।[১] রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়।"[২]

উপনিষদের যুগে ভক্তিতত্ত্ব যে একটা প্রধান ও স্পষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে নাই তাহার দুইটি কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমত, ভক্তিধর্মের কথাগুলি বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, সেগুলিকে একটি স্থলে সংকলিত আকারে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, উপনিষদের ভক্তি বিশেষ কোনো নামধারী দেবতা বা দেবোপম মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় নাই। তাহা ছিল নির্বিশেষ ঈশ্বর-প্রীতি, পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা, তাহা ভক্ত ও আরাধ্যদেবতার কোনো বিশেষ সম্পর্ক নহে। ঔপনিষদিক ভক্তিকে তাই বলা যাইতে পারে অদ্বৈতভক্তি বা নির্গুণবাদীর ভক্তি।

৩. বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পরে ব্রাহ্মণ্য সমাজের পক্ষ হইতে উপনিষদের ভক্তিমূলক উপাসনার কথাগুলিকে সংকলিত ও বিশিষ্ট রূপবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা দেখা দিল এবং তাহারই ফলে রচিত হয় ভগবদ্‌গীতা (দ্র° ৯)। বস্তুত ভগবদ্‌গীতার কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসনার মধ্যেই ভক্তিধর্ম সর্বপ্রথম একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।[৩]

৪. উপনিষদের যুগ হইতে গীতার যুগের ব্যবধান বড় কম নয়।[৪] মোটামুটিভাবে ইহাকে গৌতমবুদ্ধের যুগ হইতে যীশুখ্রীষ্টের

---

১ The Cultural Heritage of India (Vol. 1. p. 382)

২ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা।

৩ S. K. De—Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal—p. 2.

৪ প্রধান উপনিষদগুলি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হয়। গীতার রচনাকাল সম্পর্কে যদিও S. Radhakrishnan বলিয়াছেন : It

যুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কিভাবে যে কৃষ্ণ-বাসুদেব-ভক্তির বিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার স্পষ্টরূপ নির্ণয় করা সহজ নয়। মহাভারতে বাসুদেব-ভক্ত ভাগবত শব্দের উল্লেখ[১] থাকিলেও উহা হইতে বাসুদেব-ভক্তির উদ্ভব-কাল সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন। গোয়ালিয়রের দক্ষিণে ভিল্সার নিকটবর্তী বেসনগরে প্রাপ্ত একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, খ্রী° পূ° ১৮০ অব্দে হেলিওডোরাস (Heliodoros) নামক গ্রীক রাষ্ট্রদূত দেবদেব বাসুদেবের সম্মানার্থে যে স্তম্ভ নির্মাণ করেন তাহাতে তিনি আপনাকে বাসুদেব-ভক্ত ভাগবতরূপে অভিহিত করিয়াছেন।[২] বাসুদেব ভক্তির আরও প্রাচীনতর নিদর্শন পাওয়া যায় পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে। "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্"[৩] —৪।৩।৯৮সংখ্যক এই সূত্রে স্পষ্টই বাসুদেব-ভক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পাণিনির আবির্ভাবকাল খ্রী° পূ° পঞ্চম শতক। সুতরাং বাসুদেবের উপাসনা যে খ্রী° পূ° পঞ্চম শতকের বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই (বোধকরি বুদ্ধদেবের পূর্ব হইতেও) প্রচলিত ছিল তাহা স্বীকার করিয়া লইতে কোনো বাধা নাই।

গীতায় কৃষ্ণ-বাসুদেবকে অভিন্নরূপে পাওয়া গেলেও তাঁহাদের

is definitely a work of the Pre-Christian era, তথাপি নিশ্চিত-ভাবে নির্দিষ্ট কোনও তারিখ স্থির করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার অভিমতের বাকি অংশটুকু এই—Its date may be assigned to the fifth Century B. C. though the texts may have received many alterations in subsequent times. (The Bhagavadgita.) p. 14.

১ যদা ভাগবতোঽত্যর্থমাসীদ্রাজা মহান্ বসুঃ ইত্যাদি ১২।৩৩৭।১

২ J. E. Carpenter—Theism in Mediæval India p. 245

৩ পূর্ববর্তী ৮৯ ও ৯৫ সং সূত্র হইতে 'বাসুদেবো ভক্তি রস্য' এই অর্থে বুন প্রত্যয় যোগে 'বাসুদেবক' (অর্থাৎ বাসুদেবভক্ত) শব্দটি গঠিত করা যায়।

প্রচারিত ভাগবত-ধর্মের উদ্‌ভবকালে কৃষ্ণ ও বাসুদেবের ভিন্ন ব্যক্তিত্বের পক্ষে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১] ভাগবত-ধর্মে কৃষ্ণকে বলা হইয়াছে শ্রীভগবান এবং তাঁহার প্রচারিত গীতাকে বলা হয় ভগবদ্‌গীতা। আবার পাণিনির ৪।৩।৯৮ সংখ্যক সূত্রের টীকায় পতঞ্জলি (খ্রী° পূ° ২য় শতক) তাঁহার মহাভাষ্যে বাসুদেবকে বলিয়াছেন ভগবৎ।[২] কিন্তু ইহা তো অনেক পরবর্তীকালের কথা।

৫. কৃষ্ণের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঋগ্‌বেদ সংহিতায়। তিনি ছিলেন অন্যতম বৈদিক ঋষি। ৮ম মণ্ডলের ৮৫-৮৭ সূক্ত এবং ১০ম মণ্ডলের ৪২-৪৪ সূক্ত তাঁহারই রচনা। অষ্টম মণ্ডলের ৮৫ সং সূক্তের ৩য় ও ৪র্থ ঋকে রচয়িতা নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

দেবকীপুত্ররূপে কৃষ্ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদে[৪] যেখানে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির কাছে তিনি শিষ্যরূপে উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। বৈদিক মন্ত্রের রচয়িতা কৃষ্ণ এবং ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একই ব্যক্তি কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণই যে ভগবদ্‌গীতার মূল প্রবক্তা সে বিষয়ে অনেকে একমত। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশের সহিত গীতার কৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত

১ R. G. Bhandarkar—Vaishnavism, Saivism and minor religious systems p. 11.

২ "নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংজ্ঞৈষা তত্রভবতঃ।" এই সম্পর্কে কৈয়ট "প্রদীপ"-এ বলিয়াছেন—নিত্যঃ পরমাত্মা দেবতাবিশেষ ইহ বাসুদেবো গৃহ্যতে।

৩ অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা হবতে বাজিনী বসু ইত্যাদি এবং শৃণুতং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তবতো নরা ইত্যাদি। (৮।৮৫।৩-৪)

৪ অথৈতদ্‌ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় ইত্যাদি। (৩।১৭।৬)

বাণীর অনেকটা মিল রহিয়াছে।[১] গুরু-শিষ্যের চিন্তাধারায় এই সাদৃশ্য কিছু অপ্রত্যাশিত নয়।

৬. পাণিনির ৪।৩।৯৮ সং সূত্র এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৭।৬ সং মন্ত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব এবং দেবকীপুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি না হইলেও ইঁহারা উভয়েই বুদ্ধদেব অপেক্ষা প্রাচীনতর। এবং বুদ্ধ-জন্মের সমসাময়িক কালে কিংবা অনতিকাল পরেই ইঁহাদের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সুতরাং বলিতে পারি কৃষ্ণ-বাসুদেব প্রবর্তিত ভাগবত-ধর্ম খ্রী° পূ° ৪র্থ শতকের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।[২]

৭. ভাগবতধর্ম আধুনিক বৈষ্ণবধর্মের পূর্বরূপ হইলেও এবং বাসুদেব বৈষ্ণবধর্মের মূল অবলম্বনরূপে গৃহীত হইলেও[৩] বৈষ্ণব শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের শেষ ভাগে।[৪] বিষ্ণু বৈদিক সাহিত্যের অতি প্রাচীন দেবতা। তথাপি বৈষ্ণব শব্দটি যে এত অর্বাচীন তাহার কারণ বৈদিকমন্ত্রের বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন যুগে, এমন কি ভাগবতধর্মের উদ্‌ভবের অর্থাৎ কৃষ্ণ-বাসুদেবের

১ There is a great similarity between the teaching of Ghora Angirasa in the Upanishad and that of Krishna in the Gita. (S. Radhakrishnan—The Bhagavadgita p. 28.)

২ By the fourth century before Christ the cult of Vasudeva was will established.

(S. Radhakrishnan—The Bhagavadgita p. 29)

৩ Vasudeva is the fountain-head of Vaishnavsm. Raychaudhuri—Early History of the Vaishnava Sect p. 18.

৪ স্বর্গারোহণ পর্বে 'মহাভারত শ্রবণ মহিমা' নামক অধ্যায়ে—

অষ্টাদশ পুরাণানাং শ্রবণাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ।

তৎফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮।৬।৯৭

অশ্বমেধিক পর্বের ৫৫।৩ শ্লোকে উত্তঙ্ক কৃষ্ণকে বলিলেন—দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপং বৈষ্ণবং তন্নিদর্শয়॥

যুগেও, কোনও ভক্তিধর্ম অর্থাৎ "বৈষ্ণব" ধর্ম গড়িয়া উঠে নাই। বেদে ও ব্রাহ্মণে যে-বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্পর্কই বেশি, ভক্তি বা প্রসাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিষ্ণুর প্রাচীনতম স্তবগুলিতে নারায়ণ, কৃষ্ণ বা বাসুদেবের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়া অনুমান হয় যে, বিষ্ণুর সহিত নারায়ণ, কৃষ্ণ ও বাসুদেব যে অভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন তাহা পরবর্তী যুগের ক্রমিক সৃষ্টি।

৮. বিষ্ণু যে কী করিয়া নারায়ণের সহিত অভিন্ন হইলেন তাহার ঐতিহাসিক সূত্রটি খুব স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। নারায়ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে[১], কিন্তু এখানে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার কোনো যোগের কথা বলা হয় নাই। নারায়ণ ও বিষ্ণুর একসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে।[২]

৯. একদিকে নারায়ণ-বিষ্ণু, অন্যদিকে কৃষ্ণ-বাসুদেব, এই দ্বৈত-রূপের অভিন্নরূপ ধারণ ভক্তিধর্মের তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার নির্দিষ্ট কাল নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নাই।[৩] বিষ্ণু বৈদিক দেবতা, আর কৃষ্ণ বৈদিক ঋষি এবং ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। বৈদিক পরিবেশে বর্ধিত হইয়াও কৃষ্ণ কিন্তু বৈদিক ধর্মের আড়ম্বরপূর্ণ

১ পুরুষং হ নারায়ণং প্রজাপতিরুবাচ—যজস্ব যজস্বেতি। (১২শ কাণ্ড ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ)।

২ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ১০।১।৬। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্যত্র (১০-১১-১) নারায়ণকে পরম পুরুষের সমস্ত গুণে ভূষিত করা হইয়াছে।

৩ The exact period when Krishna-Vasudeva was first identified with Narayan-Vishnu cannot be ascertained. H. C. Raychaudhuri. Early Vaishnava Sect. p. 62.—তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যে অংশে (১০।১।৬) বিষ্ণু-বাসুদেবের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা পরবর্তী সংযোজন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

আনুষ্ঠানিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না।[১] ফলে রক্ষণশীল পুরোহিত-শাসিত বেদতন্ত্রের সহিত তাঁহার বিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। কিন্তু কৃষ্ণের প্রবল ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মতো শক্তি ও যুক্তি ক্ষয়িষ্ণু বৈদিক সমাজে ছিল বলিয়া মনে হয় না। ধীরে ধীরে কৃষ্ণ ও তাঁহার ভাগবতধর্ম শক্তিশালী হইয়া উঠিলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আপোসের উপায় খুঁজিতে লাগিল। এই আপোস অনুসন্ধানের মূলে আর একটি গুরুতর কারণ ছিল—তাহা বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব।

পূর্বেই বলা হইয়াছে (দ্র° ৬), খ্রী° পূ° ৪র্থ শতকের মধ্যে ভাগবতধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ঠিক একই কালে মৌর্যযুগে বেদ-বিরোধী নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও প্রবল হইয়া উঠে। এইভাবে আলোচ্য কালে ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মের সম্মুখে ভাগবত ও বৌদ্ধ এই দুইটি নতুন ধর্ম জাগিয়া উঠিলে বৈদিক সম্প্রদায় ভাগবত-ধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সম্বন্ধ স্থাপন ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অধিকতর আগ্রহশীল হয় এবং অনুমান করা যায় এই সময় হইতেই নারায়ণ-বিষ্ণুর সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের অভিন্নতা-স্থাপনের উদ্যোগ আরম্ভ হয়।

১০. কিন্তু সেই উদ্যোগ-পর্ব আলোচনার পূর্বে আর একটি প্রশ্ন আলোচিত হওয়া দরকার এবং তাহা এই যে, কৃষ্ণের সহিত সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য বহু-সংখ্যক বৈদিক দেবতার মধ্যে বিষ্ণুই নির্বাচিত হইলেন কেন। সমস্ত ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুর প্রায় একশতবার উল্লেখ থাকিলেও কেবল বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে মাত্র পাঁচটি সূক্ত।[২] ঋগ্‌বেদের যুগে বিষ্ণু

১ Krishna was opposed to sacerdotalism of the Vedic religion and preached the doctrines which he learnt from Ghora Angirasa. —S. Radhakrishnan (The Bhagavadgita p. 29)

২ পুরাপুরি পাঁচটিও বলা যায় না। প্রথম মণ্ডলের ২২ (১৭-২১), ১৫৪ ও ১৫৬ এবং ৭ম মণ্ডলের ৯৯ (১, ২, ৩, ৭) ও ১০০ সং সূক্ত।

একজন বড় দেবতা হইলেও তিনি দেব-সমাজের অগ্রণী নহেন। তবে জনত্রাতা বন্ধু-রূপে তাঁহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি যে অচিরেই মনুষ্যকুলে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিলেন সন্দেহ নাই। ৬।৪৯।১৩ সং মন্ত্রে বলা হইয়াছে—হে বিষ্ণু, সেই তুমি যে আমাদের গৃহদান করিয়াছ তাহাতে আমরা ধন, সুস্থ শরীর ও পুত্রাদি লইয়া আনন্দে বাস করিব।[১] পুনরায় ৭।১০০।২ সং মন্ত্রে বলা হইয়াছে—হে প্রাপ্তকাম বিষ্ণু, তুমি তোমার সর্বজনহিতকারী দোষ-বিরহিত অনুগ্রহ-বুদ্ধি আমাদিগকে দাও।[২]

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুর গুরুত্ব ও মহিমা অনেক বাড়িয়া যায়।[৩] অসুরদের কবল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়া তিনি যে দেবকুল ও মনুষ্যকুলের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ" সাহিত্যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে।[৪] বামন-রূপী বিষ্ণু কর্তৃক জগতের উদ্ধারসাধনই তাঁহাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতার

১ তস্য তে শর্মন্ন পপৃচ্যমানে রায়া মদেব তন্বা তনা চ।

২ ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যামপ্রযুতামেবয়াবো মতিং দাঃ।

বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে Keith সাহেবের মন্তব্য এই—his interest in human life as a protector of embryos is a sign of his importance in ordinary life which should not be overlooked. (The religion and philosophy of the Veda and Upanishads p. 110)

বিষ্ণুং নিষিক্তপাং অর্থাৎ নিষিক্তের বা গর্ভের রক্ষক বিষ্ণুকে (৭।৩৬।৯) এবং বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু (১০।১৮৪।১)—এই দুইটি ঋকই Keith সাহেবের লক্ষ্য স্থল।

৩ In the later Samhitas and the Brahmanas we find that Vishnu is assuming an importance in the minds of the priests which give him undoubtedly the leading place in the living faith of the Brahmanas. (The religion and philosophy of of the Veda and Upanishads p. 110)

৪ শতপথ ব্রাহ্মণ—প্রথমকাণ্ড ২য় অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ।

পর্যায়ে উন্নীত করিয়া দেয় এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডেই বিষ্ণুকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে —ওঁ অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণসর্বা অন্যা দেবতাঃ ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। ভারতীয় ভক্তিধর্ম কোনো একটি বিশেষ যুগের সৃষ্টি নয়, ইহা একটি ক্রমিক বিকাশের ফল। বৈদিক যুগের প্রায় সূচনা হইতেই দেখা যায়, ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে দুই বিভিন্ন চিন্তাধারা ক্রিয়াশীল ছিল। একপক্ষ যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল, অপর পক্ষ উচ্চতর ধর্মসাধনায় বিশ্বাসী। পরবর্তী কালে ইহার নাম হইয়াছে ব্রহ্মবিদ্যা। সমাজের মধ্যে এই যে আদর্শগত ভেদ তাহা লইয়া নিরন্তর লড়াই চলিয়াছে সন্দেহ নাই। এই সংগ্রামরত দুই পক্ষের প্রতিনিধিরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্য দলের দেবতা বিষ্ণু।[1] ব্রহ্মা-বিষ্ণুর আপেক্ষিক প্রাধান্য লইয়া যে বিরোধ চলিয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যজ্ঞকর্তা ঋষি ভৃগু ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বিরোধী পক্ষের দেবতা বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। শেষ পর্যন্ত ভৃগু-পক্ষকে নূতন দলের আদর্শ স্বীকার করিয়া লইতে হইল। এইভাবে প্রাচীন দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও নব্য দলের দেবতা বিষ্ণু মর্যাদার আসন অধিকার করিলেন। অতঃপর বৌদ্ধধর্মকে ঠেকাইবার জন্য যখন বৈদিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ভাগবত-সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য স্থাপনের-উদ্যোগ আরম্ভ হইল, তখন স্বভাবতই বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুর দাবিই হইল অগ্রগণ্য।

১১. বিষ্ণু-কৃষ্ণের সামঞ্জস্য বিধানে সাধারণভাবে উভয় পক্ষের

১ রবীন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

আগ্রহ থাকিলেও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষ্ণের উপর এই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা আরোপের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। মহাভারতের কতগুলি স্থান হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের এই অসামান্য অভ্যুদয়কে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এমন কি ভগবদ্গীতার মধ্যেও কৃষ্ণবিরোধী দলের উল্লেখ রহিয়াছে—"যাহারা আমার মতের নিন্দা করে এবং আমার মত অনুসারে কাজ করে না, তাহাদের বিবেক নাই, তাহাদের কোনো জ্ঞান নাই, তাহাদের কখনও ভালো হয় না।[১] আমি মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।[২] ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেন, মহাভারতের আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণ-বিষ্ণুতে কোন রূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই (কৃষ্ণ চরিত্র ৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)।

১২. মৌর্যদের যুগে বিষ্ণু-কৃষ্ণের অভিন্নতা-প্রতিপাদনের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়, গুপ্তযুগে আসিয়া তাহা সার্থক সমাপ্তি লাভ করে। বস্তুত কৃষ্ণ-বাসুদেবের অনুগামী "পরম-ভাগবত" গুপ্ত-সম্রাটদের আমলেই বৈষ্ণবধর্ম নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।[৩] সমুদ্রগুপ্ত (৩২৬—৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫—৪১৩) রাজ্যকালের মধ্যেই

---

১ ভগবদ্গীতা ৩।৩২

২ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্—ভগবদ্গীতা ৯।১১

সভাপর্বের ৪২।৬ শ্লোকে কৃষ্ণের দেবত্বের উপর প্রকাশ্যভাবেই আক্রমণ করা হইয়াছে। সঞ্জয়, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম প্রমুখ কৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও মহাভারতের বহু অংশে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বে সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩ ...a great formative movement took place in the history of Vaishnavism when India was potentially united under the Guptas. Sister Nivedita : Footfalls of India History p. 213

মহাভারতের কাহিনী শেষবারের মতো সংকলিত ও সম্পাদিত করা হয় বলিয়া অনুমিত হয়। শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম-পর্বভুক্ত নারায়ণীয় অধ্যায়গুলি[১] বোধ করি এই সময়েরই রচনা। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা চলে যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই কৃষ্ণ-বিষ্ণুর ঐক্য সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।[২]

১৩. এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় পক্ষকেই কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। রক্ষণশীল বৈদিক সম্প্রদায় কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়ায় ভাগবতধর্মের জয় হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণকে পরমপুরুষ বিষ্ণুর অবতার রূপে গ্রহণ করার ফলে কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভাগবত ধর্ম মূল বিষ্ণুর ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে। কৃষ্ণের ন্যায় রামও বিষ্ণুর অন্যতম অবতাররূপে কল্পিত হওয়ায়[৩] রামভক্তিও বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে

---

১ ৩৩৪ সং অধ্যায় হইতে ৩৫৮ সং অধ্যায় পর্যন্ত (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণে ৩২০ হইতে ৩৩২) মোট ১৫টি অধ্যায়ে নারায়ণীয় বা ভাগবতধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৩৪৬।১১ সং শ্লোকে আছে যে, এই মহান্ ধর্ম ইতিপূর্বেই ভগবান কৃষ্ণ গীতায় বর্ণনা করিয়াছেন—

এবমেষ মহান্ ধর্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরি-গীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥

এই প্রসঙ্গে ৩৪৮।৮ সং শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

২ ৩৪১ সং অধ্যায়ে নারায়ণ-বিষ্ণু-কৃষ্ণ-বাসুদেবের সমীকরণের জন্য নিম্নলিখিত অংশ উল্লেখযোগ্য :—

নরাণামযনং খ্যাতমহমেকঃ সনাতনঃ॥ ৩৯
আপোনারা ইতি প্রোক্তা অপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং মম তৎ-পূর্ব মতো নারায়ণো হ্যহম্॥ ৪০
ছাদয়ামি জগদ্‌বিশ্বং ভূত্বা সূর্য ইবাংশুভিঃ।
সর্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততো হ্যহম্॥ ৪১

৩ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতকের কবি কালিদাসও বলিয়াছেন রামরূপে অবতীর্ণ ভগবান বিষ্ণুর কথা। তুলনীয়—রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ (রঘুবংশম্—১৩।১)।

বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ফলে বিষ্ণুর কতকগুলি গুণ কৃষ্ণে আরোপিত হয়। গীতার পার্থসারথি কৃষ্ণের সহিত গোকুলের গোপালকৃষ্ণের সংযোগসাধনকে কেহ কেহ এই প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমান করেন।[১]

১ প্রথমদিকে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপবালকদের কোনো যোগ ছিল না। পরবর্তীকালে বিষ্ণু-কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে বিষ্ণুর গোপা বিশেষণটি (ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ ইত্যাদি ঋগ্‌বেদ ১।২২।১৮) কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে হয়ত আভীর (আহীর—গোয়ালা) জাতির কৃষ্ণ যুক্ত হওয়ার ফলে গোপালকৃষ্ণের জন্ম হয়। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে: This epoch (অর্থাৎ গুপ্তযুগ) saw the synthesis of the doctrinal Krishna, Partha-Sarathi, speaker of the Gita, and the popular Krishna, the Gopala of Gokool, and Hero of Mathura. (Footfalls of Indian History p. 213)

গোপালকৃষ্ণের (গোপী-রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গের) বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত-রচিত "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ" পৃ° ৯৫-১৩৫। তাঁহার মতে আভীর জাতির মধ্যে গোপালকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রচলিত ছিল (পৃ. ২৬৬) এবং রাধার উৎপত্তি যে বৃন্দাবনের প্রেমলীলায় ইহাতে কোন সংশয় নাই (পৃ. ১০৩)। এই প্রসঙ্গে মহাভারত হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটি স্মরণীয়—

আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ! দ্বারকাবাসিন্! কৃষ্ণ! গোপীজনপ্রিয়॥

সভাপর্বে দুঃশাসন কর্তৃক বস্ত্রহরণ কালে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে "গোপীজন প্রিয়" বলিয়া মনে মনে সম্বোধন করিয়া বলে—কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ইত্যাদি। বঙ্কিম শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রাচীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"সভাপর্বে শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারত-প্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণ-ঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা

১৪. *বিষ্ণুবাদী বৈদিক সম্প্রদায় কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া* স্বীকার করিয়া লইলেও, কৃষ্ণের অনুগামী ভাগবত-সম্প্রদায় হয়ত সহজে বিষ্ণুর পরমপুরুষত্বের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টিতে স্বয়ং কৃষ্ণই ভগবান এবং বিষ্ণু প্রাচীন বৈদিক ঋষি কল্পিত সূর্য দেবতার অতিরিক্ত কিছু নহেন। ভাগবত-সম্প্রদায় প্রথম দিকে বিষ্ণুকে বড় জোর আদিত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই গীতার দশম অধ্যায়ে দেখা যায় কৃষ্ণ আপনার অলৌকিক ঐশ্বর্য (বিভূতি) বর্ণনাপ্রসঙ্গে "বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, পশুদের মধ্যে সিংহ" ইত্যাদি তালিকার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—"আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু (একজন আদিত্য)"—আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ (১০।২১)।

কৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তি বিষ্ণুর পক্ষে নিশ্চয়ই সম্মানজনক হয় নাই। আবার কৃষ্ণ সম্পর্কেও মহাভারতে এমন সব উক্তি রহিয়াছে যাহা কোনো প্রকারেই মর্যাদাসূচক নয়। এইভাবে নিরন্তর সংঘর্ষের

হইলে শিশুপাল কখনই কৃষ্ণনিন্দা কালে তাহা পরিত্যাগ করিত না। অতএব নিশ্চিত যে আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না—তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।" হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত মহাভারতে দেখিলাম বঙ্কিম-উদ্ধৃত ঐ শ্লোক বর্জিত হইয়াছে। সেখানে "দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণ আরম্ভ করিল" (৬৫তম অধ্যায় ৪০ সং শ্লোক) এই কথার পরে আছে "যাজ্ঞসেনী সর্বদুঃখহারী নরমূর্তিধারী কৃষ্ণনামক বিষ্ণুকে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী ইত্যাদি (৬৫।৪০)।

সম্পাদক টীকায় বলিয়াছেন—"৪০ শ্লোকাৎ পরং কতিপয় পুস্তকে ইমে পঞ্চশ্লোকা দৃশ্যন্তে, অস্মৎপিতামহপুস্তকে বর্ধমানপুস্তকে চ ন দৃশ্যন্তে" এই বলিয়া পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন তাহার প্রথম শ্লোকটি বঙ্কিমের কৃষ্ণ-চরিত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মধ্য দিয়া অবশেষে উভয়ের যে সমীভবন প্রতিষ্ঠিত হইল, মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাহার বিচিত্র কাহিনী বহন করিতেছে।[১]

১৫. বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যে ভাগবতধর্ম (অথবা বৈষ্ণবধর্ম) মহাভারতের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাহার পূর্ণ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে অশোকের যে স্থান, বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে গুপ্তসম্রাটগণকে সেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইলে (স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ), উত্তর ভারতে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু ততদিনে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্মের তথা ভক্তিধর্মের নবপর্যায় শুরু হইয়া যায়।

---

১ মহাভারতে বিষ্ণুকৃষ্ণের অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই বিরোধের স্মৃতি যে সহজে মুছিয়া যায় নাই তাহার দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—

(ক) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকার বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে,—বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে। (বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণচরিত ২য় খণ্ড দশম পরিচ্ছেদ)। কৃষ্ণচরিত্রের ৪র্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদে লেখক প্রাচীন বৈষ্ণব (বিষ্ণুভক্ত) সম্প্রদায়কে বলিয়াছেন "কৃষ্ণদ্বেষী"।

(খ) মহারাষ্ট্রের দুইটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেছে 'মানভব' (মহানুভব) ও 'বারকরী' সম্প্রদায়। বারকরীদের মতে তাহাদের উপাস্য দেবতা বিঠোবা (কৃষ্ণ) হইলেন বিষ্ণুর অবতার। অন্যদিকে, 'মানভব' সম্প্রদায় বিষ্ণুর মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী। N. Kalelkar বলেন—Although the Manabhavas worship Sri Krishna and Sri Dattatreya they consider them as incarnations of Parabrahma and not of Vishnu who is, according to them, a minor deity not able to give salvation to his devotees (The cult of Vithoba p. 115) মানভব ও বারকরী সম্প্রদায়ের অসদ্ভাব অতীতের কৃষ্ণ-বিষ্ণুর দ্বন্দ্বেরই রেশ বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাক্ষিণাত্যে ভক্তিধর্মের পুনরুজ্জীবন

১৬. খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্ম তথা ভক্তিধর্মের যে নব-পর্যায় শুরু হইল তাহা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। সুদূর অতীত হইতেই দাক্ষিণাত্য ভক্তিধর্মের দেশ বলিয়া পরিচিত। খ্রী° পূ° পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর্যদের ভারত আগমনের পরে দ্রাবিড় জাতি উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া বসতি বিস্তার করে। ইতিহাসের কোন্ দূরবর্তী যুগে দ্রাবিড়গণ প্রথমে ভারতে প্রবেশ করে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। দ্রাবিড়দের ভারত আগমন সম্পর্কে এইটুকু জানা যায় যে, তাহারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 'ক্রীট্' (Crete) হইতে বাহির হইয়া এশিয়া মাইনর ও মেসোপোটেমিয়ার মধ্য দিয়া ইরানীয় মালভূমির দক্ষিণ দিক ধরিয়া ভারতের মাটিতে সিন্ধুদেশে আসিয়া উপনীত হয়। খ্রীষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বেই ইহা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।[১]

১৭. বর্তমানে উত্তর ভারতে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বলিতে সাধারণত আর্যসভ্যতার ইতিহাসকেই বুঝায়। মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পরেও এই মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।[২] কেহ কেহ এমন মতও প্রকাশ

১ Suniti Kumar Chatterji—Dravidian origins and the Beginnings of Indian civilization, The Modern Review, 1924 December.

২ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কিন্তু অনেক কাল আগেই ভারতীয় সভ্যতার সত্য রূপটি ধরা পড়ে। ১৯১২ সালে তিনি বলিয়া গিয়াছেন : প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দু সভ্যতা রূপে বিচিত্র ও রসে গভীর হইয়াছে।...আর্যদের বিশুদ্ধ

করিয়াছেন যে, মহেনজোদড়ো সভ্যতা আদৌ দ্রাবিড় সভ্যতা নহে এবং ঋগ্‌বেদীয় সভ্যতার তুলনায় উহা অর্বাচীন।[১]

অপরদিকে একদল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এবং বহু সংখ্যক দক্ষিণ-ভারতীয় পণ্ডিতের মতে, ভারতবর্ষে আর্য-দ্রাবিড়ের যৌথ-সাধনায় যে মিশ্র সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার আলোচনায় প্রায়ই দ্রাবিড়-জাতিকে উপেক্ষা করিয়া আর্যদের উপর অনুচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[২] তাঁহাদের কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে যাহা কিছু মহনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাহা প্রায় সমস্তই আর্যপূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতার দান ; এবং পরবর্তী-কালের আগন্তুক আর্যগণ সেই মহৎ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী মাত্র। এই অভিমত কতদূর গ্রহণযোগ্য জানি না, তবে ভক্তিধর্মের দিক হইতে আমরা ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

১৮. দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন রহিয়াছে তামিল ভাষায়। গোঁড়া তামিল পণ্ডিতগণ অবশ্য তামিল সাহিত্যের ইতিহাসকে যতটা প্রাচীন বলিয়া দাবি করেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টি-সম্পন্ন নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ তাহাকে

তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়দের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্‌ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু।....আর্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে হিন্দু-সভ্যতায় সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে—এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে। (ইতিহাস পৃ° ৪৪-৪৭)।

১ L. Sarup—The Rigveda and Mohenjo Daro, Indian culture, 1937 October.

২ The Indian Sanskritists as a class consciously or unconsciously have failed to do justice to the Dravidian element in the problem. K. N. Sivaraja Pillai—The chronology of the early Tamils p. 2.

তত প্রাচীন বলিয়া গণ্য করেন না। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে আধুনিক দ্রাবিড় ভাষাগুলির মূল উৎসরূপে যে একটি ভাষার প্রচলন ছিল তাহাকে খ্রী° পূ° দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।[১] তাহা হইলে এই মূল দ্রাবিড় ভাষা ঋগ্বেদের সমকালীন।

১৯. মূল দ্রাবিড় ভাষা ও বৈদিক ভাষার উর্ধ্বতম সীমারেখা অভিন্ন হইলেও ভারতবর্ষে দ্রাবিড় সভ্যতার ইতিহাস আর্য-সভ্যতার ইতিহাস অপেক্ষা প্রাচীনতর। বাহ্য সম্পদে আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে আর্যজাতি অধিকতর উন্নত ছিল।[২] মানস সম্পদের দিক হইতেও এই দুই জাতির মধ্যে কতকগুলি গুরুতর পার্থক্যের কথা জানিতে পারা যায়। মহেনজোদড়োর দ্রাবিড় জাতি ছিল প্রতিমার পূজারী, আর্যজাতি ছিল প্রকৃতির উপাসক। দ্রাবিড়দের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর-ভক্তিতে, আর্যদের বিশ্বাস ছিল অগ্নি উপাসনায় ও যাগযজ্ঞে।[৩]

ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে আর্য-দ্রাবিড়ের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য স্মরণে

১ 1500 B. C. may tentatively be put down in round numbers as a date for the hypothetical single speech which is the source of all the current Dravidian languages of India. Suniti Kumar Chatterji—Old Tamil, Anclent Tamil and Primitive Dravidian, Tamil culture 1956 April.

২ (ক) From the political and military stand-point it is hardly to be questioned that the Aryans wore superior to Dravidians. But were they as superior in other respects ? G. W. Brown—The Sources of Indian philosophical ideas (Studies in Honor of Maurice Bloomfield p. 77

(খ) The Aryans, though inferior in culture, were very powerful. A Chakravarti—Tirukkural—Introduction.

৩ বৈদিকধর্ম কর্মকাণ্ড-প্রধান, দ্রাবিড়ধর্ম ভক্তিপ্রধান। ক্ষিতি-মোহন সেন—ভারতে হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা পৃ° ১

রাখিলে ভক্তি-ধর্মকে দ্রাবিড়সভ্যতার সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।[১] কেবল ভক্তিধর্মই নয়, কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উপনিষদে যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহা বৈদিক আর্য-চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাচীন বৈদিকযুগে প্রচলিত ছিল না এমন কয়েকটি ঔপনিষদিক তত্ত্ব হইতেছে—আত্মোপলব্ধি, বৈরাগ্য সাধন এবং ঈশ্বরানুভূতি। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে দর্শন ও বৈরাগ্যের কিছুমাত্র পরিচয় নাই। ইহা পুরাপুরি ভোগবিলাসপ্রিয় বহির্মুখী মানব-সম্প্রদায়ের সাহিত্য।[২]

২০. একেবারে গোড়ার দিকে বৈদিক সাহিত্যের উপর দ্রাবিড়দের প্রভাব ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। কিন্তু আর্যগণ এদেশে কিছুকাল বাস করার পরে দ্রাবিড়দের সঙ্গে তাহাদের সংস্পর্শ ঘটে। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে আর্যগণ শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়া উত্তর ভারত হইতে যে গোটা দ্রাবিড় গোষ্ঠীই দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিয়াছিল এইরূপ মনে করা ভুল হইবে। আর্যাবর্তেও প্রচুর-সংখ্যক দ্রাবিড় থাকিয়া যায়—যাহার ফলে আর্য দ্রাবিড়ের মিশ্রণ ঘটিতে থাকে।[৩] এই সময়ে উত্তর ভারতে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়

১ (ক) A. P. Karmarkar—The Religion of India, Vol. I. p. 316

(খ) ভক্তি ও প্রেমের কথা বেদে থাকলেও অনেকে মনে করেন, দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবেই তা ভারতীয় সাধনায় প্রধান স্থান পেয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতের সংস্কৃতি পৃ° ১০

২ H. Heras—The origin of Indian philosophy and asceticism—An Historical Introduction (Mystic Teachings of the Haridasas of Karnataka).

৩ (ক) The religion of the Rigveda is the product of the Aryans who must have been affected considerably by their new environment and whose blood must have been becoming more and more inter-mingled by inter-marriage. A. B. Keith—The religion and philosophy of the Veda and upanishads p. 12

ঘটিতেছিল তাহা অনেকটা এইরূপ : আর্যদের বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা দ্রাবিড়দের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে ; অন্যদিকে নতুন ভারতীয় জাতির রক্ত গঠনে এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রাবিড়দের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঋগ্‌বেদ শেষবারের মতো সংকলিত হওয়ার পূর্বেই আর্য সমাজে ও আর্যসভ্যতায় দ্রাবিড় প্রভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে।[১] বৈদিক ঋষিরা বরুণের উদ্দেশ্যে যে ভক্তিগীতি রচনা করেন, দশম মণ্ডলে বহুদেবতার পরিবর্তে যে এক পুরুষোত্তমের কথা বলা হইয়াছে—এই সমস্ত দ্রাবিড়-চিন্তা-প্রভাবিত আর্যদের অথবা বৈদিক-ভাষী দ্রাবিড়দের সৃষ্টি বলিয়া অনুমিত হয়।

আর্য-সভ্যতায় দ্রাবিড় প্রভাবের পূর্ণতা ঘটে উপনিষদের যুগে।[২] উপনিষদের মধ্যে বৈদিক চিন্তাধারায় অনুবর্তন নাই, আছে দার্শনিক চিন্তা ও তত্ত্বালোচনা। আর্য-সংস্কৃতির এই গুরুতর রূপান্তর-সাধনে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব অধিক বলিয়া কেহ কেহ

(খ) ঋগ্‌বেদের যুগে আর্য-অনার্যের মিশ্রণের কথা বঙ্কিমচন্দ্রও উল্লেখ করিয়াছেন : ঋগ্‌বেদ সংহিতার দুই-এক স্থানে শূদ্র ঋষির উল্লেখ পাওয়া পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলে কবষ নামে একজন শূদ্র ঋষি আছে (কৃষ্ণচরিত্র ১ম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ)। ঋগ্‌বেদে আর্যেতর প্রভাবের আর একটি নিদর্শনরূপে দেবী-সূক্তের (১০।১২৫) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১ (ক) The Dravidian element preponderates over all other elements in the racial make-up of the people of India ····Even when the Rigveda took the form in which it has come down to us, a considerable part of the Sanscritic-speaking population was of Dravidian race. Gilbert Slater —The Dravidian element in Indian culture. pp. 17—18

(খ) While the Dravidians were *Aryanised* in language, the Aryans were Dravidised in culture. Ibid p. 63

২ (ক) G. W. Brown উপনিষদ্ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

The philosophic ideas were derived from some other

মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে যোদ্ধা-শাসক রাজাদের মধ্য হইতে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে হইতে নয়।[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্‌ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধীদলের সহিত দীর্ঘকাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।...এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে...ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে।...বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেই জন্যই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

---

source, such as the pre-Aryan civilization of the country, which was gradually assimilated by the invading Aryans. To the orthodox Aryans the doctrines of the upanishads were the New Thoughts of their time. These doctrines represent the highest phase of the ancient religion and philosophy of the Dravidians.—The Sources of Indian philosophical ideas (Studies in Honor of Maurice Bloomfield)

(খ) The philosophy of the Upanishads is essentially Dravidian rather than Aryan. Heras.

(গ) Brown, Heras প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আত্মন্, উপনিষদ্ প্রভৃতি শব্দকেও দ্রাবিড় হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করেন।

১ Garbe, Hertel, Heras, Winternitz প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। The fact that the warrior-caste was closely connected with the intellectual life and the literary activity of ancient times is proved by numerous passages in the Upanishads. M. Winternitz—A History of India Literature Vol. I. p 227

এই ক্ষত্রিয় সমাজ দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল অথবা আর্যজাতির, সে তর্কের মীমাংসা বোধ করি সহজে হইবার নয়। সে যাহাই হউক, উপনিষদের যুগে যে একটা বেদ-বিরোধী, যাজ্ঞযজ্ঞ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্ম-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং সেই মতাদর্শের প্রধান প্রবক্তা ছিল ক্ষত্রিয়-সমাজ। এই প্রসঙ্গে ক্ষত্রিয়-সন্তান কৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধের নামোল্লেখ যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর আদর্শ সংঘাতের মূলে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও গুরুত্বের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী যুগে কৃষ্ণের স্থানাপন্ন হইলেন ক্ষত্রিয়-সন্তান শাক্যসিংহ।[১]

কেবল শাক্যসিংহের যুগেই নয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই সংঘর্ষ, বলা উচিত দুই ভিন্ন আদর্শের দ্বন্দ্ব, ভারতবর্ষের একটি অতিপুরাতন প্রশ্ন। ইহারই মধ্যে আবার আপোস মীমাংসার পথ ধরিয়া পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া এবং দেওয়া-নেওয়ার ভাবও চলিয়াছে। দ্রাবিড়দের মধ্যে ঠাঁই পাইয়াছে যাগ-যজ্ঞ-হোম-হুতাশনপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সাধনা, আর্যদের মধ্যে তেমনি পাকা আসন পাতিয়াছে ভক্তিধর্ম পূজা-উপাসনা—যাহা দ্রাবিড় সংস্কৃতির ফল বলিয়া বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।[২]

২১. দ্রাবিড় ভারতে যে সমস্ত দেব-দেবীর প্রচলন রহিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হইতেছেন শিব এবং তৎসহ পার্বতী

---

১ A high philosophy, quite distinct from the vedic religion, was developed····and it led, in the course of time, to the rise of a great Kshatriya preacher. It was Gautam Buddha, the lion of the Sakya clan, who rose in open protest against the power and ritual of the Brahmanas and thus introduced a new force into Indian life and thought. Jadunath Sarkar—India through the ages p. 15.

২ Bhakti is another off-shoot of the Dravidian tree of ascecticism. H. Heras.

ও কার্তিক।[১] আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই, বোধ করি দ্রাবিড়দের ভারত আগমনের সময় হইতে, এই দেবত্রয়ের পূজা-উপাসনার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তখন অবশ্য ইহারা আণ, অম্মা এবং অনিল নামে পরিচিত।[২] মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার লিপি হইতে জানা যায় যে, সে-যুগে একদিকে যেমন শিবের শ্রেষ্ঠত্ব ও শিবভক্তির মহিমা প্রচলিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল হিমালয়ের সহিত শিবের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।[৩]

এইরূপে উত্তরাপথের দ্রাবিড় জীবনে শিবের যে অসামান্য অধিকার স্থাপিত হইল, দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপনের পরেও তাহার কিছু মাত্র লাঘব হয় নাই। শিব, এক কথায়, দ্রাবিড়দের জাতীয় দেবতা। তাহারা যখন দাক্ষিণাত্য হইতে লঙ্কায় গিয়া বসতি বিস্তার করে, তাহাদের প্রিয় দেবতাকে তাহারা সঙ্গে লইতে ভুলে নাই। কালক্রমে শিব লঙ্কাবাসীদেরও জাতীয় দেবতায় পরিণত হন। এই কারণেই বোধকরি রামায়ণের রাক্ষসকুল শিবের বরপ্রভাবে

১ In the pre-vedic period Siva formed a unique monotheistic deity of the Vratyas (i.e. Dravidians). A. P. Karmarkar—The Religions of India Vol. I. P. 47.

২ We get sufficient information regarding the united life of the Divine Triad An. Anil and Amma, who happen to be the proto types of the later Siva, Murugan (Kartikeya or Subramanya) and Parvati. Mystic Teachings of the Haridasas of Karnataka P. 1.

৩ (ক) The inscriptions found at Mohenjo Daro and Harappa clearly prove the existence of the traces of the idea of superiority of Siva along with that of devotion towards Him. Ibid p. 4.

(খ) ...they show how ancient is the association of God (An, Siva) with the Himalayas. H. Heras—The velalas in Mohenjo Daro. I. H. Q. Winternitz Memorial Number 1938.

অত্যন্ত বলদর্পিত (উত্তরকাণ্ড ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সর্গ)। উৎপীড়িত দেবগণ ও মুনিগণ নিতান্ত ভয়ার্ত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে তিনি রাক্ষসবধে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া দেবগণ ও মুনিগণকে বিষ্ণুর শরণ লইতে বলিলেন (ঐ)। সুকেশ-পুত্র মালী-সুমালী-মাল্যবান্ শেষ পর্যন্ত পরাভূত হইলেও মাল্যবান্ একবার গরুড়কে তাড়া করিয়া গরুড়-বাহন বিষ্ণুকেও আহত করিয়াছিল (উত্তর কাণ্ড অষ্টম সর্গ)। রাবণ ইহাদের দৌহিত্র এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে লঙ্কার অধিপতি। পুলস্ত্য-বিশ্রবার বংশধর বলিয়া রাবণের ধমনীতে আর্যরক্ত থাকিলেও মাতামহের দিক হইতে রাবণ রাক্ষস-কুল-সম্ভূত। তাই তিনি ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবগণকে পরাভূত করিয়া আর্যদের যজ্ঞনাশ ঘটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। শিবের আশীর্বাদ-পুষ্ট রাবণের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন রামরূপী বিষ্ণু। রামায়ণকে তাই আর্য-দ্রাবিড় সংঘর্ষের কাহিনী বলিয়া মনে করিলে খুব ভুল হইবে না।

কেবল রামায়ণ কেন, দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া জাতি-সংঘর্ষের আভাস বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনীর মধ্যেও পাওয়া যায়। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। আবার শিবভক্ত বাণ-অসুরের কন্যা উষাকে হরণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। এইভাবে কখনও অনার্য দল, কখনো আর্য দল জয়ী হইতেছিল। ভৃগুবংশ বৈদিক আদর্শের সমর্থক ছিল বলিয়া (দ্র° ১০) শিব-বিরোধী দক্ষ-যজ্ঞে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল এবং অবশেষে শিবানুচরদের হাতে ভৃগুকে বিশেষ বিড়ম্বনাও ভোগ করিতে হয়। বামন পুরাণে আছে, তপঃক্লিষ্ট মুনিদের আশ্রমে নগ্নবেশে প্রবেশ করেন বনমালা-বিভূষিত সুন্দর যুবক শিব। মুনি পত্নীরা তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া সভ্যতার সকল সীমা লঙ্ঘন করিলে মুনিগণ নিজেদের আশ্রমে স্বীয় রমণীদের এই চাপল্য দেখিয়া আগন্তুক শিবকে বধ করিতে উদ্যত হন। বধ আর করা

হইল না, তবে তাঁহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুনিদেরই হার হইল। কারণ সহধর্মিণীদের একান্ত পীড়াপীড়িতে শিবলিঙ্গের পূজা প্রবর্তিত হয়। কূর্ম পুরাণে দেখা যায়, মুনিরা যষ্টি মুষ্টি দ্বারা শিবকে তাড়না করিয়াও পরিশেষে শিবপূজা গ্রহণে বাধ্য হইলেন।[১] এইরূপ সংঘর্ষের কাহিনী আরও আছে।

সংঘর্ষের পরে শান্তি, শত্রুতার পরে সদ্‌ভাব, বিরোধের পরে সামঞ্জস্য। আর্যগণ দ্রাবিড় দেবতা শিবকে স্বীকার করিয়া লইলেন। গল্প যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে মুনিপত্নীরাই শিবপূজা প্রবর্তনের মূল। আর্যেরা ভারতে আসিয়া অনেক দ্রাবিড় (এবং অন্য অনার্য) জাতির কন্যাদের বিবাহ করেন। মুনিপত্নী হইয়াও দ্রাবিড় নারীরা তাহাদের পৈত্রিক উপাস্য দেবতা শিবকে ভুলিতে পারিল না। মুনিরা এই সমস্ত কাজে প্রথম প্রথম বাধা দিয়াছেন, কিন্তু ক্রমশ গৃহিণীদের মধ্য দিয়া শিব মুনিদের সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করেন।[২] ধীরে ধীরে বৈদিক দেবতা রুদ্রের সহিত তাঁহার একাত্মসাধন হইয়া গেল।[৩]

১ ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতের সংস্কৃতি পৃ ২০-২২

২ ঐ

৩ (ক) The name Siva is unknown to the Vedas (A classical dictionary of Hindu Mythology etc. p. 296)

ঋগ্‌বেদের যে কয়টি ক্ষেত্রে শিবের উল্লেখ আছে তাহা 'দেবতা' অর্থে নয়—benign, benignant, auspicious, সুখকর প্রভৃতি অর্থে (Sri Aurobindo's Vedic glossary).

৭।১৮।৭ সূক্তে 'শিব' কথাটি জাতিবাচক (Vedic Index—Macdonell and Keith).

(খ) Siva was declared to be another name of the Vedic Rudra, though the functions and attributes of the latter were quite different from Siva's. Jadunath Sarkar—India through the ages p. 10.

শিব ও রুদ্রের প্রধান পার্থক্য এই যে, শিব-লিঙ্গ মূলত সৃষ্টির প্রতীক, পক্ষান্তরে বেদের দেবতা রুদ্র ধ্বংসের বাহন।

২২. অপর দিকে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-দুর্গে ধীরে ধীরে আর্যশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে। অগস্ত্য কোন্ ঐতিহাসিক যুগে উত্তর ভারত হইতে আর্য সংস্কৃতিকে দক্ষিণ ভারতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন জানা নাই। অগস্ত্যের যাত্রা অবশ্যই দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে আর্য-শক্তির জয়যাত্রা, কিন্তু তাহার কাল অনির্দিষ্ট। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে দাক্ষিণাত্যের আর্যীকরণ ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল এবং ইহা খ্রীষ্টজন্মের প্রায় একহাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়া মৌর্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছিল বলা যায়।[১] দলে দলে আর্যগণ গঙ্গা তীর হইতে আসিয়া কাবেরী নদীর তীরে বসতি স্থাপন করিতে থাকে এবং এই ভাবে সুদূর দাক্ষিণাত্যের কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জয়-ধ্বজা প্রোথিত হয়। অতঃপর আর্য-দ্রাবিড়ের সান্নিধ্য ও বৈবাহিক বন্ধনের ফলে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ সমাজে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির বিচিত্র সমাবেশ ঘটে। অনেক ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্যগণ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া শিবকে অগ্রাহ্য

(গ) এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন : অনার্য দেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্যদেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল (ইতিহাস পৃ ৪৬)।

১ The Aryanization of the South was doubtless a slow process spread over several centuries. Beginning probably 1000 B. C. it had reached its completion sometime before the establishment of the Mauryan empire, before the time of Katyayana, the Grammarian of the fourth century B. C. K. A. Nilakanta Sastri—A History of South India pp. 66-74.

করিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের পিতৃপিতামহের দেশ আর্যাবর্তের স্মৃতিও তাঁহাদের অন্তরে জাগরূক রহিল, এখনও রহিয়াছে। তাই পার্শ্ববর্তিনী কাবেরী অপেক্ষা দূরবর্তিনী গঙ্গা তাঁহাদের নিকট পবিত্র নদী।[১] বৈদিক যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য নিত্যকর্মেও তাঁহারা আর্যরীতির অনুগামী হইয়া চলিলেন। একদিকে যজ্ঞ, অন্যদিকে যজ্ঞ-ভঙ্গ-কারী শিব—একই সঙ্গে এই বিপরীতের সেবায় তাঁহারা নিয়োজিত রহিলেন। শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় ভাষা-রূপে সংস্কৃত ভাষার নিয়মিত চর্চা হইতে থাকে। ফলে ভিন্ন গোষ্ঠী-ভুক্ত হইয়াও ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলি ধীরে ধীরে আর্যভাষার প্রভাবে আসিয়া পড়ে।[২] কালক্রমে সমগ্র ভারতের উপর আর্যদের রাজনৈতিক ও তৎসহ সাংস্কৃতিক বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়

১ (ক) দক্ষিণ ভারতের একটি ব্রাহ্মণপ্রধান কেন্দ্র হইল কুম্ভকোণম্। এখানে বৈদিক বিষ্ণু এবং দ্রাবিড় শিব উভয় দেবতার সমান মর্যাদা। শার্ঙ্গপাণি স্বামী অর্থাৎ পেরুমাল মন্দিরে বিষ্ণু এবং কুম্ভেশ্বর মন্দিরে শিব পূজিত হন। এই কুম্ভকোণম্-এর একটি বিশিষ্ট উৎসব হইল 'মহামকক্কুলম্' অর্থাৎ মহামক নামক দীর্ঘিকায় পুণ্য স্নানোৎসব। বারো বৎসর পর পর অনুষ্ঠিত এই উৎসবের দিনে নির্দিষ্ট শুভ মুহূর্তে উক্ত দীর্ঘিকায় গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব ঘটে কল্পনা করিয়া আজও লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিয়া ধন্য হয়।

(খ) কয়েক বৎসর হইল অন্নামলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শৈব সিদ্ধান্ত'-এর উপর যে বার্ষিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার একটি শর্ত এইরূপ:

The lecturer shall bring on his return a pot of the holy waters of the Ganges for presentation at the Lord Sri Nataraja shrine at Chidambaram for Abhishekam...". G. Subramania Pillai—Introduction and History of Saiva Siddhanta, Appendix.

২ (ক) Tamil, a very ancient language, has also assimilated some rare thoughts from the Vedas even in the days

এবং তাঁহাদের আচমন-মন্ত্রে উত্তর-ভারতের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কাবেরী-গোদাবরীও একত্র গ্রথিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করে।

২৩. উত্তরে-দক্ষিণে আর্য-দ্রাবিড়ের এই ভাবগত আদান-প্রদানের ফলে উভয়ত একটা এক-জাতিত্বের মনোভাব গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়সমাজে যেমন বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রচলন হয়, উত্তরাপথের আর্যসমাজে তেমনি ভক্তিভাবের অনুশীলন হইতে থাকে। দাক্ষিণাত্যে যেমন ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতার সমাদর হয়, উত্তরাপথে তেমনি শিবের পূজা-অর্চনা চলিতে থাকে।[১] প্রকৃত পক্ষে পূজা কথাটি আর্য-সমাজে

of the Sangham Academy. Bharati Jayanti Souvenir (Calcutta) 1957 p. 20.

(খ) Vedic sacrifices were performed by kings and chieftains, and the individual Brahmins maintained and regularly worshipped 'the three fires' in their homes. Tamil Literature (Calcutta) 1960 p. 5.

(গ) Thoikappiyam, which is a treatise on Grammar, must have been written more than two thousand years ago. The author traces the romance of Sanskrit words which have crept into Tamil. Tamil Literature (Calcutta) 1958 p. 1.

(ঘ) কোথাও পড়িয়াছিলাম—এখন ঠিক স্মরণ হইতেছে না—সংঘম্ সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ "পত্তুপ্ পাট্টু"-তে শতকরা দুইভাগ আর্যভাষার (সংস্কৃত) শব্দ পাওয়া যায়।

১ Siva worship can be traced from the Yajurveda onwards. The great epic (Mahabharata) contains innumerable proofs of Siva worship. According to tradition confirmed by archaelogy Buddha was first a Saiva. K. R. Subramaniam—The origin of Saivism and its history in the Tamilnad p. 29.

মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণকে শিবোপাসক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলিকে প্রক্ষেপ মনে করেন (কৃষ্ণচরিত্র—৭ম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহা শিবের গুরুত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

প্রচলিত ছিল না, ভাষা তাত্ত্বিকদের মতে ইহা দ্রাবিড় হইতে গৃহীত। 'পূ' অর্থাৎ 'পুষ্প' এবং 'চৈ' অর্থাৎ 'করা'—এইরূপে 'পূচৈ' শব্দটির সৃষ্টি। তাহা হইতে পরিবর্তিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় (পূচৈ> পূজৈ<পূজা) 'পূজা' কথাটির উদ্‌ভব। দ্রাবিড়দের মধ্যেও প্রথম প্রথম আহুতি, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি শব্দ প্রবেশ করিলেও ধীরে ধীরে এইগুলির দ্রাবিড় প্রতিশব্দ গঠিত ও প্রচলিত হয়। যথা, যজ্ঞ—বেল্‌বি, ব্রাহ্মণ—অন্তনর্, ক্ষত্রিয়—অরসর্, বৈশ্য—বণিকর, শূদ্র—বেললর্ ইত্যাদি।

একথা সত্য যে, আর্য-সভ্যতার প্লাবনে উত্তর ভারত হইতে দ্রাবিড় সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও দক্ষিণ ভারতের আর্যীকরণ ঘটিতেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। বলা যাইতে পারে আর্য-সংস্কৃতির প্রবল তরঙ্গ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া ছোট ছোট ঢেউ-এ পরিণত হয়।[১] অর্থাৎ আর্যশক্তির তুলনায় তখনও দ্রাবিড় শক্তি বলীয়ান্, এবং মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যপন্থীকে বাদ দিলে জনসাধারণের হৃদয়ে বৈদিক ধর্ম তখনও ততটা শ্রদ্ধার আসন লাভে সমর্থ হয় নাই।[২]

১ K. N. Sivaraja—The chronology of the Early Tamils pp. 3-4.

২ A feeling of separateness between Aryans and Tamilians and between Sanskrit and Tamil was beginning to develop. though not to a degree of antagonism····Tamil Literature (Calcutta) 1960 p. 32.

বৈদিক ধর্ম জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন লাভে সমর্থ না হইলেও শিক্ষিত ও অগ্রসর দ্রাবিড়দের মনে আর্য-সংস্কৃতির প্রতি যে একরূপ অনুরাগ-মিশ্র প্রশংসার ভাব ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না (অনেকটা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইংরেজ-বিরোধী শিক্ষিত ভারতবাসীর শ্রদ্ধার তুল্য)। ইংরেজ কবিদের সহিত ভারতীয় কবিদের তুলনা করার ন্যায় (বঙ্কিম=স্কট, নবীন সেন=বায়রন, রবীন্দ্রনাথ=

২৪. দ্রাবিড়দের এই বেদ-বিরোধী মনোভাবের সুযোগ লইয়াই বৌদ্ধ ও জৈন মতের প্রচারকগণ দাক্ষিণাত্যে অতিক্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই দুইটি ধর্মমত উদ্‌ভবের অনতিকাল পরেই তামিলনাডে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, উল্লিখিত ধর্মমত দুইটিরও উদ্‌ভব হয় উত্তর ভারতের দ্রাবিড় সমাজের মধ্য হইতে, এবং তুলনাচ্ছলে বলা যায়—উপনিষদ্ অপেক্ষা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম অধিকতর দ্রাবিড়ীয়।[১] বোধকরি এই কারণেই, কয়েক শতাব্দীর চেষ্টার পরেও যেখানে বৈদিক ধর্ম দৃঢ়-মূল হইতে পারিল না বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সেখানে অতি সহজেই প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের ধর্মীয় পরিস্থিতি দাঁড়াইল এইরূপ: একদিকে আর্য ও ব্রাহ্মণ্যপন্থী দ্রাবিড়দের বৈদিক সাধনা—যাহা তখনও ব্যাপক হইতে পারে নাই; অন্যদিকে দ্রাবিড়দের শিব, মুরুগন্ (কার্তিক) প্রভৃতি দেবতার পূজা-অর্চনা—যাহা দ্রাবিড়দের জাতীয় ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত; তৃতীয়ত বৌদ্ধ-জৈনদের ত্যাগ, অহিংসা, কর্মবাদ প্রভৃতির প্রচার—যাহা একশ্রেণীর আর্যবিরোধী তথা বেদ-বিরোধী দ্রাবিড় সম্প্রদায়কে যথেষ্ট প্রভাবিত করিল।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্রম-বর্ধমান প্রচার ও প্রতিপত্তি লাভের ফলে আর্য ও দ্রাবিড় উভয় গোষ্ঠীকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্মমত সম্পর্কে নতুন করিয়া চিন্তা করিতে হইল, পুরাতন বস্তুর নতুন মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিল। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস

শেলী) প্রাচীন যুগে দ্রাবিড় (তামিল) ভাষায় রচিত গ্রন্থাদিকে ঋগ্‌বেদ যজুর্বেদ, সামবেদ প্রভৃতির সহিত তুলনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল।

১ Buddhism and Jainism remained more purely national, that is Dravidian; they would not accept the Vedas or the vedic Gods. The Sources of Indian philosophical ideas (Studies in Honor of Maurice Bloomfield).

বিসর্জন দিয়া বৈদিক-বৈষ্ণব-শৈব-জৈন-বৌদ্ধ-নির্বিশেষে সর্ব-সাধারণের গ্রহণযোগ্য কিছু সহজ ধর্মমতের প্রচার করা যায় কিনা এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

এখানে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগিতে পারে। বৌদ্ধ-জৈন-বিরোধী আন্দোলনে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের আগ্রহ বোঝা যায়, কিন্তু শৈবধর্ম-বাদী খাঁটি দ্রাবিড় সম্প্রদায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়া পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণ্য শক্তির সহায়তা করিল কেন। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পরে অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যশক্তি হতবল হইয়া ছিল। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল, যে-তুইটি বেদ-বিরোধী ধর্ম ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কার-জাল হইতে মুক্ত করিবার বার্তা লইয়া আসিয়াছিল, শেষপর্যন্ত তাহারাই ভারতবর্ষকে সংস্কারজালে এরূপ বদ্ধ করিয়া দিয়াছে যাহা আর কোনো কালে দেখা যায় নাই।[১] এইরূপে মুক্তির বাহকই শেষপর্যন্ত মুক্তির ঘাতক হইল। জৈনদের সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। তা ছাড়া, বৌদ্ধ-জৈনদের দাপটে শৈব-ধর্মের ক্রম-ক্ষীয়মান অবস্থায় দ্রাবিড়দের মধ্যেও নিশ্চয়ই একটা আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছিল। এই জন্য দ্রাবিড়-পক্ষ হইতেও একটা সংঘাত ও সামঞ্জস্য অনিবার্য হইয়া উঠিল।

এই ঐতিহাসিক সংঘাত ও সামঞ্জস্যের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে প্রাচীন তামিল সাহিত্যে। খ্রীষ্টীয় প্রথম কি দ্বিতীয় শতকে "তিরুবল্লুবর্" এই ছদ্মনামের আড়ালে থাকিয়া যিনি 'কুরল্' (অর্থাৎ বাণী) নামক একখানি ১৩৩০ শ্লোক-সমন্বিত উপদেশাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার সাধনা এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সাধনা। জৈন-বৌদ্ধদের সঙ্ঘবদ্ধ উৎপীড়নে যাহারা বিচলিত, অথচ

১ রবীন্দ্রনাথ—ইতিহাস পৃ. ৩৫

বেদের আনুগত্য স্বীকার করিতেও যাহারা অনিচ্ছুক এমন দ্রাবিড়দের মধ্যে নতুন ধর্ম-সাধনা ও নীতিবোধ জাগাইবার জন্য শুভবুদ্ধিপরায়ণ নিরপেক্ষ দ্রাবিড় সমাজ হইতে যে চেষ্টা চলিতেছিল 'তিরুক্ কুরল্' (শ্রীবাণী) গ্রন্থখানি তাহারই ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অচিরকালে এই "সাম্প্রদায়িক ধর্ম"-নিরপেক্ষ গ্রন্থখানি 'তামিল বেদ' 'উত্তর বেদ' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে—যদিও বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে ইহার ভাবগত সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই।

২৫. এইভাবে বিভিন্ন মত ও পথের সমন্বয়ে যখন দাক্ষিণাত্য একটা ধর্মগত ঐক্যের সন্ধানে রত ছিল তখন উত্তরাপথ হইতে আসিল ভক্তিধর্মের তরঙ্গ (দ্র° ১৫)। উত্তরাপথের ভক্তিধর্ম মূলত বৈষ্ণবধর্ম হইলেও দাক্ষিণাত্যে তাহা শিব ও বিষ্ণু ভেদে দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। 'সৃষ্টি করিল' বলাটা ঠিক নয়, কারণ পূর্ব হইতেই ইহাদের নিজ নিজ সাধনা চলিয়া আসিতেছিল। পঞ্চম শতকে আসিয়া নানা কার্য-কারণ-সংযোগ তাহা আবেগদীপ্ত হইয়া উঠিল মাত্র। গোঁড়া আর্যগণ এবং আর্যপন্থী দ্রাবিড়গণ গ্রহণ করিল কৃষ্ণ ও রাম-অবতার সহ বিষ্ণুকে—কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই যাঁহার নাম ও মাহাত্ম্যের কথা দাক্ষিণাত্যের জনসমাজে প্রচারিত ছিল (দ্র° ৩৩)। আর অধিক সংখ্যক দ্রাবিড় ও দ্রাবিড়পন্থী আর্যগণের ভক্তিসাধনার অবলম্বন রহিল দ্রাবিড়দের জাতীয় দেবতা শিব। এই ভাবে ভক্তিসাধনার মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যের দুই জাতি—আর্য ও দ্রাবিড় জাতি—পরস্পরের কাছে আসিবার সুযোগ পায়; এবং জাতি-বৈষম্য বর্ণ-বৈষম্য দূর করার পথ যতটা সম্ভব প্রস্তুত হয়। ইহাই দাক্ষিণাত্যের নব্য হিন্দুধর্ম।[১] ইহাতে আর্য ও

১ ধর্ম সম্বন্ধে ভারতের ইতিহাস একটু বিচিত্র। যাহা বৈদিক ধর্ম তাহাই যে হিন্দুধর্ম ঠিক একথা সত্য নহে। এদেশে অবৈদিক বহু প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল। সেই সব লইয়াই হিন্দুধর্ম। ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা পৃ ১।

দ্রাবিড় উভয়েরই বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তবে আর্যদের বিশেষ লাভ এইটুকু যে, নতুন ক্ষেত্রে আসিয়া তাহারা প্রথমে যতটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিল এখন আর তাহা রহিল না। কিছুটা বর্জন করিয়া, কিছুটা গ্রহণ করিয়া, নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করিয়া সংখ্যা-লঘু আর্যগণ দাক্ষিণাত্যে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ পাইল।

আর্যগণ টিকিয়া থাকিল বটে, কিন্তু, বলা বাহুল্য, তাহাদের পূর্বতন বিশুদ্ধ রূপে নয়। দ্রাবিড়দের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধন অবশ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাছাড়া 'গুণকর্মবিভাগশঃ' ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ-কল্প শ্রেণীর মধ্যে নানারূপ উপদলের সৃষ্টি হইল। দ্রাবিড় রাজা বা ভূস্বামীগণ দাক্ষিণাত্যে নবাগত ব্রাহ্মণদের চরিত্রবল ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া শিবের মন্দিরসমূহে অর্চকরূপে তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। স্বধর্মনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহাতে সম্মত না হওয়াই স্বভাবিক। ধন-রত্নের প্রলোভনে বা অন্য কোনো চাপে পড়িয়া যাহারা শিবের মন্দিরে পূজারী নিযুক্ত হয়, মর্যাদা-ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহারা 'পতিত' হইল। ইহারা শিবাচার্য, শিবদ্বিজ, আগমদ্বিজ অথবা 'গুরুক্কল্ ব্রাহ্মণ'-রূপে পরিচিত। সর্বশ্রেষ্ঠ শৈবতীর্থ চিদম্বরম্-এ যাহারা নটরাজের সেবা-অর্চনার সুযোগ লাভ করে তাহারা উল্লিখিত 'গুরুক্কল্ ব্রাহ্মণ' হইতে পৃথক। ইহারা 'দীক্ষিতর্ ব্রাহ্মণ'; সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া সামনের দিকে শিখা বা কেশগুচ্ছ রাখাই ইহাদের রীতি। সাধারণত ইহারা "তিল্লৈ মূবায়িরর্" নামে পরিচিত। ব্যাপারটা এই: পূর্বে নটরাজ-অধিষ্ঠিত চিদম্বরম্ জনপদ তিল্লৈ অর্থাৎ জ্যোতিবৃক্ষে (রাত্রিকালে যে বৃক্ষ হইতে জ্যোতি নির্গত হয়) পূর্ণ ছিল বলিয়া ঐ জনপদেরই নাম ছিল 'তিল্লৈ'। এই তিল্লৈ অঞ্চলে যে তিন সহস্র শিব-ভক্ত ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ-পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল, আজও তাহারা "তিল্লৈ তিন হাজার" (তিল্লৈ মূবায়িরম্)-

নামে অভিহিত হয়—যদিও বর্তমানে তাহারা সংখ্যায় হ্রাস পাইয়া কয়েক শতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা নিশ্চয়ই ধর্মান্তরের বিনিময়ে (অর্থাৎ বৈদিক ধর্মের সহিত শৈবধর্ম গ্রহণের ফলে) প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়। কেহ কেহ এই ব্রাহ্মণ-সমাজকেই তামিলনাডের প্রথম ব্রাহ্মণ সমাজ বলিয়া অনুমান করেন।[১] যাহারা শৈবধর্মে গ্রহণে সম্মত হইল না তাহারা অগত্যা বিষ্ণু-কৃষ্ণ-রাম-ভক্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তামিলনাডের এই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সমাজ বর্তমানে 'ঐয়ঙ্গার' নামে পরিচিত।

ভক্তিধর্ম বেদ-বিহিত ধর্ম না হইলেও আর্যগণ এই যুগধর্ম স্বীকার করিয়া লইল; অন্যদিকে নিজেদের পূর্বতন কর্মকাণ্ডপ্রধান বৈদিক ধর্মকেও পরিহার করিতে হইল না। ভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হইল; আবার বেদোক্ত পরমপুরুষের মুখ-বাহু-উরু-পাদ-সঞ্জাত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের বিভাগও বজায় থাকিল। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন—"সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই ভারতীয় সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে" (ইতিহাস পৃ ৩২)—দাক্ষিণাত্যে সেই সত্য আর একবার প্রমাণিত হইল।

২৬. নব্য হিন্দুধর্মে আর্যগণের দৃঢ় রক্ষণশীলতা ও সম্প্রসারণ শক্তির আরও একটি নিদর্শন এই যে, বিষ্ণুভক্ত-মণ্ডলীতে শিবের কোনো প্রতিষ্ঠা হইল না; শিবের নাম শুনিলে তাহারা কর্ণরুদ্ধ করিত।[২] অথচ শৈব সাধনার মধ্যে বিষ্ণু তাঁহার আসনটি পাকা করিয়া লইলেন। তাই শিবভক্ত-মণ্ডলীতে শিবপূজার পূর্বে বিষ্ণু

১ The 3000 of Tillai are perhaps the oldest Brahman community in the Tamilnad. The origin of Saivism and its history in the Tamilnad p. 60.

২ বর্তমান তামিলনাডেও এরূপ দৃশ্য নিতান্ত বিরল নয় শুনিয়াছি।

পূজার ব্যবস্থা।[১] অবশ্য এক্ষেত্রে বিষ্ণুর সেই অখণ্ড মহিমা আর থাকিল না, শিবের কাছে তাঁহাকে মাথা হেঁট করিতে হইল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে ইহার একটি সুন্দর নিদর্শন রহিয়াছে। ভূমির পঞ্চ বিভাগ প্রাচীন তামিলনাডের একটি বিশিষ্ট কল্পনা। এই পঞ্চ বিভাগ হইতেছে—কুরিঞ্জি (পর্বত), পালৈ (মরুভূমি), মুল্লৈ (বন), নেইদল্ (সমুদ্র) ও মরুদম্ (কৃষিক্ষেত্র)। এই পাঁচটি বিভাগের পঞ্চ অধিদেবতা হইতেছেন যথাক্রমে সুব্রহ্মণ্য (কার্তিক) দুর্গা, (বা কালী, সূর্য ও অগ্নি) বিষ্ণু, বরুণ ও ইন্দ্র।[২] শিব এই তালিকায় অনুপস্থিত, কারণ তিনি সর্বাধিনায়ক। দ্রাবিড় কল্পনায় বিষ্ণু ও শিবের এই পার্থক্য। বিষ্ণু 'অবতার' গ্রহণ করিতে পারেন, এবং অবতার রূপে তাঁহার জন্ম মৃত্যু রহিয়াছে। কিন্তু শিবের কোনো অবতার নাই, কারণ তিনি 'পিরপ্পিলি' অর্থাৎ জন্মরহিত। পরবর্তীকালে ভক্তিধর্ম যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন স্বভাবতই ধর্মের গোঁড়ামিও বৃদ্ধি পায়। বিষ্ণু তখনও শিবের সঙ্গে যুক্ত রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাহন-রূপে। দশম শতাব্দীর শৈব কবি মাণিক্কবাচকর্ তাই শিবের বর্ণনায় অনায়াসে বলিতে পারিলেন—চিনমাল্-বিডৈয়ুডৈয়ান—'সেই যে শিব, বিষ্ণু যাঁহার বৃষ'। মহাভারতেও বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবেরা শিবমাহাত্ম্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা

১ One noticeable peculiarity of the ancient Siva temples is that they enshrine within them images of Vishnu as also of various other gods of the Hindu Pantheon, whereas Vishnu temples are exclusive in this respect. H. Krishna Sastri—South Indian images of gods and goddesses. p. 72.

২ উ. বে. স্বামিনাথৈয়ার—সঙ্গত. তমিলুম্ পিম্কালত. তমিলুম্ পৃ ৭১-৭২

বিষ্ণু বা কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য-সূচক সেইরূপ রচনা সকল গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন।[১]

২৭. দাক্ষিণাত্যে ভক্তিধর্ম-ভিত্তিক যে নব্য হিন্দুধর্মের পরিচয় পাওয়া গেল, তাহার মধ্যে অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া ওঠার অন্তরায়-স্বরূপ অনেক ফাঁক ছিল সন্দেহ নাই। কেবল এই নবজাত ধর্মবোধের দ্বারা বৌদ্ধ ও জৈন মতের প্রভাব খর্ব করা সম্ভব হইত কিনা বলা যায় না। কিন্তু এই সময়ে এই ধর্ম-সম্প্রদায় দুইটির মধ্যে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা গেল। তা ছাড়া ধর্ম-প্রচারের বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ তীব্রতর হইতে থাকে। অবশেষে নবজাগ্রত হিন্দুশক্তির সম্মুখে তাহারা নতিস্বীকারে বাধ্য হয়।[২] ধীরে ধীরে নব্য হিন্দুধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারে বৌদ্ধ জৈনধর্ম সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং উহাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়া লয়।[৩] এইভাবে ভক্তিধর্ম ভারতবর্ষের নানা জাতি নানা ভাষা নানা মত সমন্বিত "বিরোধের মাঝে মিলন মহান্" সৃষ্টি করিবার যে পবিত্র ব্রতযাপনে উদ্যোগী হইল, আগামী অধ্যায়গুলিতে তাহার পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

১ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র ৪র্থ খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

২ Jadunath Sarkar—India through the ages p. 27.

৩ (ক) When the new Hinduism asserted itself in the 7th and 8th centuries after Christ the monastic and contemplative elements of Mahayana Budhism were borrowed by the Shaivas and the devotional and humanitarian elements by the Vaishnavas. In consequence, Buddhism disappeared from India by being swallowed up and completely absorbed in the new Hinduism. Ibid p. 32.

(খ) The aspect of Siva as a Yogi and Guru was presumably emphasised by the example of Buddha. The origin of Saivism and its history in the Tamilnad p. 42.

তৃতীয় অধ্যায়

তামিল ভক্তিসাহিত্য

(এক) তামিল ভক্তিসাহিত্যের ভূমিকা

২৮. ভারতীয় ভক্তিধর্ম দ্রাবিড় সংস্কৃতির ফল বলিয়া বিবেচিত হইলেও কালক্রমে তাহা আর্যাবর্তের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন আর্যাবর্তে সেই ভক্তিধর্মের ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির মোটামুটি বিবরণ আমরা দিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ভক্তিধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইয়া দক্ষিণ ভারতে কি ভাবে তাহার পুনরুজ্জীবন ঘটে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়দের বসতি বিস্তার ঘটিলেও দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তথা মূল দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণতম প্রদেশ তামিলনাডে যতটা অক্ষুণ্ণ আছে, অন্য প্রদেশে ততটা নাই।[১] ভক্তিধর্মের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, ইহার

১ দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও মূর্তি শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত তামিল ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ এইরূপ :

Its (i. e. South India's) monuments belong exclusively to the Dravidian style, and its principal language is Tamil. Elsewhere there is a marked difference in the language, people and style of monuments. In those regions Malayalam, Canarese or Telugu are spoken, and the monuments belong to the Chalukya or Northern Hindu style....From the iconography of Southern India it is evident that the greater part of the classic Sanskrit works are of no avail, as they are in no way applicable to South India. It is Tamil literature that must be the subject of research. Iconography of Southern India pp. 3-6.

পুনরুজ্জীবন প্রথম ঘটে তামিলনাডে তামিল ভাষার মধ্য দিয়া। তারপর ধীরে ধীরে ইহা উত্তরাভিমুখী হইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ছড়াইয়া পড়ে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মের যে প্লাবন বহিয়াছিল তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলির গুরুত্ব অস্বীকার না করিয়াও বলিতে পারি, উহার মূলে ছিল তামিলনাডের পুনরুজ্জীবিত ভক্তিধর্ম।

২৯. ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভক্তপ্রবর চৈতন্যদেব দক্ষিণভারতে যে বিস্তৃত ভ্রমণ করেন সেই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিতেছেন যে, নীলাচলে সার্বভৌমকে উদ্ধার করিবার পরে "দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল" (চৈ. চ ২।৭)। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের উদ্দশ্যে সম্পর্কে প্রভু বলিয়াছেন যে বিশ্বরূপকে সন্ধান করাই তাঁহার মূল অভিপ্রায়—

বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব॥ (ঐ)

প্রভুর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কবি পুনরায় টীকা করিয়া বলিলেন যে, লোকান্তরিত বিশ্বরূপের সন্ধান প্রভুর ছলনা মাত্র। আসলে তিনি যাত্রা করিলেন দক্ষিণ দেশকে উদ্ধার করিতে—

বিশ্বরূপের সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥...
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥ (ঐ)

কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥ (চৈ. চ ২।৯)

মহাপ্রভুর মহিমাকে কিছুমাত্র খর্ব না করিয়াও আমরা বলিতে

পারি যে, ভক্ত কবির বর্ণনায় কিছুটা অতিরঞ্জনের স্পর্শ লাগিয়াছে। প্রভুর ভ্রমণ যে কেবল "দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে" তাহা মনে হয় না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বোধ করি, ভক্তি তীর্থ পরিক্রমা, ভক্তি সাহিত্যের অনুসন্ধান ও ভক্তজনের সঙ্গলাভ। এই প্রসঙ্গে গোদাবরী তীরে ভক্ত-পণ্ডিত রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের বিবরণটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।[১]

৩০. অনুপম ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচনাকাল ও রচনাস্থান সম্পর্কে নিঃসংশয় কিছু বলার উপায় নাই। একটি মত এই যে, শঙ্করাচার্যের নব-প্রচারিত অদ্বৈততত্ত্বের সহিত আবেগ-মূলক ভক্তি-তত্ত্বের সমন্বয় করিয়া খ্রীষ্টীয় দশম শতকে দাক্ষিণাত্যের কোনো অঞ্চলে ভাগবত রচিত হইয়া থাকিবে।[২] এই অভিমত সত্য হইলে বলা যায় যে, ভাগবতের ন্যায় একখানি মহাগ্রন্থের রচনাকে যাঁহারা একটা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁহারা তামিল ভাষী দ্রাবিড়দের চার শতাব্দীব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি-সাধনাকে ইহার পূর্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

পরবর্তী ভক্তি-আন্দোলন ও ভক্তি-সাহিত্যের প্রধান উৎস যে

১ দক্ষিণ ভারতে মহাপ্রভুর ভ্রমণ সম্পর্কে একটি মন্তব্য :
Sri Caitanya undertook a long tour exchanging views with the local Vaishnava saints, impressing them with his own views and being in turn impressed by their views on the nature of divine love and the means for its attainment. S. B. Das Gupta—Aspects of Indian religious thought p. 192.

২ Among the Puranas the Bhagavata was composed somewhere in South about the beginning of the tenth century····The Bhagavata combines a simple surging emotional Bhakti to Krishna with the Advaita philosophy of Sankara in a manner that has been considered possible only in the Tamil country. K. A. Nilakanta Sastri—A History of South India p. 329.

শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহাতে সন্দেহ নাই। আর সেই ভাগবত রচনার পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন দাক্ষিণাত্যের তামিল বৈষ্ণব কবিরা। ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবতের মধ্যে প্রায় সহস্র বৎসরের ব্যবধান। এই দুই গ্রন্থের ভক্তিধর্মে স্বভাবতই পার্থক্য আসিয়া গিয়াছে। ভগবদ্‌গীতার যুগে প্রাচীনতর ভাগবত-সম্প্রদায়ে যে ধীর, প্রশান্ত ও মহামান্বিত ভক্তিসাধনার প্রচলন ছিল, ভাগবতের যুগে আসিয়া তাহা নৃত্যগীত-বহুল ভাবোন্মাদ-মত্ততায় পরিণত হইয়াছে।[১]

এই দুই মহাগ্রন্থের মধ্যবর্তী স্তরে রহিয়াছে তামিলনাডের বৈষ্ণব সাধনা ও সাহিত্য। ভাগবতে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক তামিল বৈষ্ণব সাধকদের ভক্তিতত্ত্বের অনুরূপ—সেই কৃষ্ণচিন্তা, কৃষ্ণগুণকীর্তন, কৃষ্ণরূপদর্শনে বিহ্বলতা। কবিরা ভগবানের সহিত মিলন-দশায় কখনও হাসিতেন, কখনও নৃত্য করিতেন, কখনও গান করিতেন। আবার বিরহদশায় কখনও কাঁদিতেন, কখনও বা প্রেমরোষে আক্রোশভরে অভিশাপ দিতেন। তাঁহাদের এই অবস্থার সহিত সর্বত্র কৃষ্ণদর্শী শ্রীচৈতন্যের তুলনা করা যায়।[২] ভগবদ্‌বিষয়ক যে-কোনও প্রসঙ্গে তাঁহাদের উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ এত গভীর ও বিশদ যে স্বয়ং রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য-প্রণয়নে তাঁহাদের রচনার সাহায্যে কোনো কোনো জটিল সূত্রের

১ With the youthful Krishna at the centre, the Bhagavata weaves its peculiar theory and practice of intensely personal and passionate Bhakti, which is somewhat different from the speculative Bhakti of the Bhagavadgita. S. K. De—Early History of the Vaishnava faith and movement in Bengal p. 5.

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত : বৈষ্ণবধর্মের একদিকে ভগবদ্‌গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর একদিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোক-প্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল। (ইতিহাস পৃ ৪৬)

২ শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজদাস—আড়বার পৃ ২০

অর্থ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।[১] এই সকল কারণে আমরা বলিতে পারি যে, ভাগবতের রচয়িতা যিনি বা যাঁহারাই হউন না কেন তিনি বা তাঁহারা বোধ করি তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য ও সাধনার মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলেন।

৩১. ভাগবতের মধ্যেও ইহার কিছু সাক্ষ্য মিলিবে। এই গ্রন্থের একাদশ স্কন্দের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের মনুষ্যগণ পুনরায় কলিতে জন্মলাভ গ্রহণে অভিলাষী, কারণ কলিযুগে অনেক বিষ্ণু-ভক্তের আবির্ভাব ঘটিবে। অন্যত্র ইহাদের সংখ্যা বেশি হইবে না, কিন্তু দ্রাবিড় দেশ তাঁহাদের জন্মলাভে ধন্য হইবে। তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী ও পশ্চিম মহানদী—এই নদী সমূহের জল পান করিয়া সেখানকার অধিবাসিবৃন্দ ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইবেন।[২]

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণ করিলে ভাগবতের উল্লিখিত অংশের তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। দ্রাবিড় দেশে, অথবা ঠিক ঠিক বলিতে গেলে, দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণতম অংশ তামিলনাড়ে, ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে একটি প্রবল ভক্তি-আন্দোলন গড়িয়া উঠে। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় শ্রেণীর ভক্তই সমভাবে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলে এবং ইহাদের যৌথ সাধনায় তামিল সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। বৈষ্ণব ভক্ত কবিদের মধ্যে যে

১ শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজদাস—আড়বার পৃ ৪৭

২ কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ ॥৩৮
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রাবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥ ৩৯
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥৪০

বারোজন তামিল সাহিত্যে দ্বাদশ আড়্বার (আলোয়ার)[১] নামে পরিচিত, তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে ভাগবতে বর্ণিত নদীগুলির তীরবর্তী অঞ্চলে। তাম্রপর্ণীর দেশে জন্মিয়াছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি নম্মাড়বার এবং তাঁহার শিষ্য মধুর কবি আড়বার। কৃতমালা অর্থাৎ বর্তমান ওয়াইখাই (বৈকৈ) নদীর তীরে আবির্ভূত হন পেরিয়াড়্বার এবং তাঁহার পলিতা কন্যা আণ্ডাল্। পয়স্বিনী অর্থাৎ বর্তমান পালার্[২] নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন পোয়কৈ আড়্বার, ভূদত্তাড়্বার, পেয়াড়্বার এবং তিরুমড়িসৈ আড়্বার্; কাবেরী নদীর তীরে তোণ্ডর্-অডিপ্-পোডি আড়্বার, তিরুপ্পান্ আড়্বার এবং তিরুমঙ্গৈ আড়্বার; মহানদী অর্থাৎ বর্তমান পেরিয়ার[৩] নদীর তীরে কুলশেখর আড়্বার।[৪]

৩২. পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উল্লিখিত তথ্যের সমর্থন আছে। উক্ত গ্রন্থের ভাগবত-মাহাত্ম্য-বর্ণনায় "ভক্তিনারদ-সমাগম" নামক অধ্যায়ে দেখা যায় কিভাবে ভক্তিধর্ম প্রথমে দ্রাবিড় অর্থাৎ তামিলনাড হইতে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাত প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া

১ আড়্বা আল্ (অর্থাৎ মগ্ন)+আর্ (সম্মানসূচক অথবা বহুবচনাত্মক প্রত্যয়)=আড়বার বা আল্বার (আলোয়ার) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়াছেন যাঁহারা।

২ পাল্ (দুগ্ধ)+আরু (নদী)=পালারু বা পালার পয়স্বিনীর সমার্থক।

৩ পেরিয় (মহা)+আরু (নদী)=পেরিয়ারু বা পেরিয়ার অর্থাৎ মহানদী।

৪ এই বারোজন আড়বার কবিদের সকলেই ভাগবত রচনার অর্থাৎ দশম শতকের পূর্ববর্তী। তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত ইঁহাদের কাল নির্দিষ্ট। আড়বারদের কালানুক্রমিক বিবরণে কিছুটা মতভেদ থাকিলেও সাধারণভাবে তাঁহাদের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনো মতভেদ নাই।

অবশেষে স্বয়ং কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হইল।[১]

সুতরাং যাঁহারা মনে করেন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ধর্ম গুপ্ত সাম্রাজ্যের বৈষ্ণব ধর্ম ব্যতীত আর কিছু নয়[২] তাঁহাদের অভিমত কিছুটা সংশোধিত আকারে গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে হয়। গুপ্তযুগে সংকলিত এবং বিক্রমাদিত্যের কালে (৪র্থ শতাব্দী) প্রচারিত মহাভারতের কাহিনী দাক্ষিণাত্যের ভক্তি ধর্মে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করিয়া থাকিবে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমানে প্রচলিত ভক্তিধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ হইল নৃত্যগীত বাদ্য। অথচ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ-গান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নৃত্যগীত করা নিষিদ্ধ ছিল।[৩] তাই মনে হয় তামিল ভক্তমণ্ডলীর অভ্যুত্থানের পরে এই নব্য-ভক্তির প্রচলন হইয়া থাকিবে। এই

১ নারদ একদা বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যমুনাতীরে এক বিষণ্নবদনা তরুণীকে। কৌতূহলবশে নিকটে আসিয়া উক্ত রমণীর পরিচয় জানিতে চাহিলে সে বলিল—আমার নাম ভক্তি। আমি জন্মিয়াছি দ্রাবিড় দেশে, বৃদ্ধিলাভ করি কর্ণাটকে, তারপরে কিছুকাল মহারাষ্ট্রে অবস্থান করিয়া গুর্জরে আসিয়া জীর্ণ হইয়া পড়ি। সম্প্রতি পুনরায় বৃন্দাবনে আসিয়া আমি সুরূপিণী নবীনার ন্যায় পূর্ণযৌবন ও প্রিয়রূপ প্রাপ্ত হইলাম—

উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
স্থিতা কিঞ্চিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাংগতা॥
বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনের সুরূপিণী।
জাতাহং যুবতী সম্যক্ প্রেষ্ঠরূপা তু সাম্প্রতম্॥

২ Southern Vaishnavism is the Vaishnavism of the Gupta Empire—Sister Nivedita—Footfalls of Indian History p. 208.

৩ [illegible]মোহন সেন—ভারতের সংস্কৃতি পৃ ১০-১১।

সমস্ত কারণে ভক্তিধর্মের বিকাশে দ্রাবিড় (তামিল) প্রভাব অনস্বীকার্য হইয়া পড়ে।[১]

৩৩. প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি আর্যাবর্তে যে ভক্তি ধর্মের ক্রমবিকাশ ঘটিতেছিল তাহার মুখ্য অবলম্বন বাসুদেব-কৃষ্ণ-বিষ্ণু। ইঁহারা সকলেই বৈদিক সাহিত্য অথবা আর্যাবর্তের সহিত যুক্ত। দ্রাবিড় ঐতিহ্যের সহিত ইঁহাদের কোনো সংযোগ ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে যখন দাক্ষিণাত্যের আর্যীকরণ হইতেছিল (খ্রী°পূ° ১০০০ অব্দের কাছাকাছি এই কাজ শুরু হয়) তখন খুবই স্বাভাবিক যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আর্যাবর্তের ভাগবত-ধর্মও প্রচারিত হইতে থাকে। আমাদের দেখা প্রয়োজন বৈষ্ণব ভক্তিসাহিত্য উদ্‌ভবের পূর্বে প্রাচীন তামিলনাড ও তামিল সাহিত্যের সহিত কৃষ্ণ-বিষ্ণু কিভাবে কতটা সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে যে সমস্ত প্রাচীনতম মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার একটি হইল মাতুরার নিকটবর্তী কৃষ্ণমন্দির।[২] খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চোল সম্রাটদের রাজধানী কাবেরীপ্-পূম্-পট্টিনম্-এ যে সকল মন্দির ছিল বলিয়া জানা যায় তাহার কয়েকটি নির্মিত হইয়াছিল কৃষ্ণ-বলদেবের উপাসনার জন্য।[৩] ভক্তিযুগের পূর্বে প্রাচীন তামিল সাহিত্যের মধ্যে কৃষ্ণের যে সমস্ত উল্লেখ পাওয়া যায় সংক্ষেপে আমরা তাহার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব।

১ Bhakti may be regarded as an important contribubution of South India to Indian culture in regard to the important feature of its further development. Krishnaswamy Ayyangar—Some contributions of South India to Indian Culture.

২ One of the oldest of South Indian shrines (near Madura) for which we have a reference is devoted to the worship of Krishna. Krishnaswamy Ayyangar—Some contributions of South India to Indian culture P. 117.

৩ Ibid pp. 117—118.

প্রাচীনতম তামিল সাহিত্য সাধারণত 'সঙ্ঘম্ সাহিত্য' নামে পরিচিত। চঙ্কম্ বা সঙ্ঘম কথাটির তাৎপর্য হইল পরিষদ্ অথবা বিদ্বৎ পরিষদ্। মনে হয়, প্রাচীন তামিলনাডের সুধীবৃন্দ দীর্ঘকাল পর পর সাহিত্য অধিবেশনে মিলিত হইয়া পূর্বগামী যুগে রচিত সাহিত্যের সমীক্ষা, সমালোচনা ও শ্রেণীবিভাগ করিতেন। এবং এইভাবেই হয়ত 'সঙ্ঘম্ সাহিত্য' কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে। তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে মাদুরায় অনুষ্ঠিত এইরূপ তিনটি সঙ্ঘের কথা জানা যায়। প্রথম সঙ্ঘীয় সাহিত্যের নিদর্শন আজ আর কিছু পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় সঙ্ঘের নিদর্শনের মধ্যে রহিয়াছে একখানি ব্যাকরণ জাতীয় গ্রন্থ—যাহা অগস্ত্য মুনির শিষ্য 'তোল্‌কাপ্পিয়' কর্তৃক রচিত বলিয়া 'তোল্‌কাপ্পিয়ম্' নামে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যাবর্তে বসিয়া পাণিনি যখন অষ্টাধ্যায়ী-প্রণয়নে ব্রতী ছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যের সুদূরতম প্রান্তে বসিয়া অগস্ত্য-মুনির শিষ্য রচনা করেন তোল্‌কাপ্পিয়ম্। সঙ্ঘ সাহিত্যের বিশদ ও যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায় তৃতীয় সঙ্ঘের রচনায়। এই যুগের মুখ্য গ্রন্থগুলি ব্যক্তিবিশেষের নামে পরিচিত নয়, ইহার অধিকাংশ সঞ্চয়ন। তৃতীয় সঙ্ঘের রচনাবলীকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা হইয়াছে—(১) এট্টুত্ তোকৈ অর্থাৎ অষ্ট (গীতি) সংগ্রহ (২) পত্তুপ্ পাট্টু অর্থাৎ দশ (গাথা) সংগ্রহ (৩) পদিনেন্ কিল্‌কনক্কু অর্থাৎ অষ্টাদশ (শ্লোক) সংগ্রহ। বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক হইতে রস-সমৃদ্ধ এই রচনাগুলি খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে (কিছু আগে ও পরে) রচিত হইয়া থাকিবে।

সঙ্ঘ সাহিত্য ও ভক্তিসাহিত্যের মধ্যবর্তী যুগে এমন কয়েকখানি আখ্যান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে যেগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই শ্রেণীর দশখানি কাব্যের মধ্যে পাঁচখানি পঞ্চ-বৃহৎ-কাব্য (ঐন্-পেরুম্-কাব্যম্) এবং অপর পাঁচখানি পঞ্চ-ক্ষুদ্র-কাব্য (ঐন-চিরু-কাব্যম্) নামে

পরিচিত। ইহাদের মধ্যে প্রথম তালিকাভুক্ত চিলপ্পধিকারম্, মণিমেখলৈ ও জীবকচিন্তামণি এই তিনখানি বৃহৎ কাব্য জৈন বৌদ্ধ কবিদের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও শৈব-বৈষ্ণব-প্রধান বর্তমান তামিলনাডে উচ্চ সমাদর লাভ করিতেছে।

আড়বার ও নায়ন্মার কবিদের আবির্ভাবকালের পূর্ব পর্যন্ত (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) তামিল সাহিত্যের যে কাঠামোর কথা উপরে উল্লেখ করা হইল, ভক্তিধর্ম বিশেষত বিষ্ণু-ভক্তির দিক হইতে সে সম্পর্কে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীনতম গ্রন্থ 'তোল্‌কাপ্পিয়ম্'-এ বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে 'কৃষ্ণবর্ণ বন দেবতা' (অথবা 'বনদেবতা কৃষ্ণ') রূপে—মায়োন্ মেয় কাডুরৈ য়ুলগমুম্ (৩।১।৫)। পত্তুপ্ পাট্টুর অন্তর্গত "পেরুম্-পাণ্ আট্রুপ্ পডৈ" অংশের একস্থলে বিষ্ণুকে বলা হইয়াছে "সর্প-শয়ন" রূপে—পাম্বনৈপ্ পল্লি অমরন্দোন্ আঙ্গন্ (৩৭০ সং পংক্তি)। পত্তুপ্ পাট্টুর অপর একটি "মুল্লৈপ্-পাট্টু" অর্থাৎ বন-গীতি প্রধানত বিষ্ণুস্তুতির জন্যই রচিত। ইহার প্রথম অংশের বর্ণনায় আছে—শঙ্খচক্রধারী লক্ষ্মীপতির কথা—ননন্ তলৈ উলগম্ বলৈ নেমিয়োপু বলম্ ভুরি পোরিত্ত মা তাঙ্গু ইত্যাদি। তিরুক্-কুরল্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও (খ্রীষ্টীয় ২য় শতক) 'তামরৈক্ কণ্নন্' (পদ্মলোচন), 'অডিঅলন্দান্' (ত্রিবিক্রম) প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা তিরুমাল্ বা বিষ্ণুকে বোঝানো হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত সুপ্রসিদ্ধ আখ্যানকাব্য 'চিলপ্পধিকারম্'-এর মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে নায়ক-নায়িকার ত্রিভুজ-সমস্যা লইয়া। কণ্ণগি-কোবলন্-মাধবী—ভালোবাসিয়া ইহারা কেহই সুখী হইতে পারিল না। এই বেদনা-মধুর প্রেম-কাব্যখানির একটি সর্গে প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণ-কাহিনীর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ব্যাপারটা এইরূপ: কণ্ণগি-কোবলন্ মাদুরায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে একটি গোপপল্লীতে। দম্পতীর জীবনে

সেটি ছিল ভয়ঙ্কর দিন। কোবলন্ স্ত্রীকে কুটিরে রাখিয়া অর্থের সন্ধানে শহরে বাহির হইল। আর ফিরিয়া আসিল না। আসিল তাহার মৃত্যু-সংবাদ। অতি প্রভাতেই গোপ-পল্লীতে এই আসন্ন নিদারুণ ঘটনার অশুভ ছায়াপাত হয়। দুগ্ধ হইতে দৈ উৎপন্ন না হওয়া, ধেনুগুলির অশ্রুপাত প্রভৃতি নানা অপশকুন দূর করিবার জন্য প্রধানা গোপী সকলকে ডাকিয়া বলিল সেই 'কুরবৈ কূত্তু' অর্থাৎ কুরবৈ নামক নৃত্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে, যাহা এককালে 'মায়বন্' কৃষ্ণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন গোপকন্যা নপ্পিন্নৈ-কে লইয়া। গোপীদের এই 'কুরবৈ' নৃত্যের দ্বারাই সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস, এবং এই কারণে সর্গটির নাম রাখা হইয়াছে "আয়্চ্চিয়র্ কুরবৈ" অর্থাৎ গোপী-নৃত্য। এই সর্গের গোড়াতেই আছে গোপ-সমাজে প্রচলিত একটি বিশিষ্ট প্রথার উল্লেখ—কিভাবে গোপীরা বৃষ-পালন করিয়া বিবাহের পূর্বে ছাড়িয়া দিলে সেই বৃষ-দমনকারী যুবক যোগ্য পতি বলিয়া বিবেচিত হইত।[১] গোপীদের নৃত্যগীতের মধ্যে কৃষ্ণের যে স্তুতি করা হইয়াছে তাহার কয়েকটি পঙ্ক্তি এইরূপ: কৃষ্ণের কীর্তিকথা যে কান শোনে নাই সেই কান কি কান? যে চোখ তাঁহাকে দেখে নাই সেই চোখ কি চোখ? যে রসনা নারায়ণের নামোচ্চারণ করে নাই সেই জিহ্বা কি জিহ্বা?—

১ ভাগবতের দশম স্কন্দের ৫৮তম অধ্যায়ে আছে—অযোধ্যাপতি নগ্নজিত তাঁহার কন্যা নাগ্নজিতী সত্যার বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলে এই সংকল্প প্রকাশ করেন যে, যে পুরুষ তাঁহার সাতটি বৃষকে দমন করিতে পারিবে, সে-ই সত্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিবে। সেই সাতটি বৃষকে জয় করিতে না পারিয়া সকল রাজা বিফলমনোরথ হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সপ্ত অংশে বিভক্ত করিয়া অবলীলাক্রমে সেই গো-বৃষকে ধারণ করিয়া এবং তাহাদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহাদের বলদর্প চর্ব করিলেন। (শ্লোক ৩২,৩৩, ৪৫)।

তিরুমাল্চীর্ কেলাদ চেবিয়েন্ন চেবিয়ে ?
করিয়বনৈক্ কানাদ কণ্নেন্ন কণ্নে ?
নারায়ণাবেন্না নাবেন্ন নাবে ?[১]

কৃষ্ণ বা বিষ্ণু শিবের ন্যায় তামিল দেবতা ছিলেন না। তৎসত্ত্বেও তামিলের প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেই কৃষ্ণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া, শিবের সমকক্ষ না হউন, অনেকটা প্রীতি-শ্রদ্ধার অধিকারী হন।[২]

৩৪. এতক্ষণ আমরা বিশেষভাবে বৈষ্ণবধর্মের কথাই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তামিলনাড তথা দাক্ষিণাত্যের ভক্তিসাহিত্যে বিষ্ণুভক্তির তুলনায় শিবভক্তির গুরুত্ব কম নয়। বরং ভক্তি-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও পরিমাণ এবং মঠ-মন্দির দেবালয় ইত্যাদির সংখ্যা বিবেচনা করিলে তামিলনাডে তথা দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব সাধনা অপেক্ষা শৈব সাধনাকেই প্রবলতর বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের আর্যীকরণ হইলেও তাহার নিজস্ব দ্রাবিড় রূপ অতিশয় বলশালী। বস্তুত শৈবধর্মই দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত ধর্ম এবং শৈব সিদ্ধান্তই দক্ষিণভারতের দার্শনিক চিন্তাধারাকে সবচেয়ে বেশি

১ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় (ক) চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ যেখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদোক্ত "শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (খ) পঞ্জাবী স্থফী কবি শেখ ইব্রাহীম ফরীদের অনুরূপ ভাব (দ্র ২৫১)।

২ Krishna is a loving and a lovable God of the ancient Tamilians.···Early in the centuries of the Christian era Krishna had attained the status of a deity in Tamil India, and he was worshipped by the people as a very ancient God. Indian culture vol. IV pp. 267—271. এতৎসহ দ্রষ্টব্য : S. K. Ayyangar—Some contributions of South India to Indian culture pp. 261-262 এবং H. C. Raychandhuri E. H. V. p. 180

প্রভাবিত কারিয়াছে।[১] সুতরাং প্রাচীন তামিল সাহিত্যে যে শিব ও শৈব মতের প্রচুর উল্লেখ থাকিবে তাহা কিছু বিস্ময়কর নয়।

প্রাচীন 'সংঘম্' সাহিত্যের 'এট্টুত্তোগৈ'-শীর্ষক সংগ্রহগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ঐয়ঙ্কুরু নূরু, কলিত্তোগৈ, অকনানূরু, পুরনানূরু প্রভৃতি গ্রন্থের প্রথমেই আছে পরম শিবের স্তুতি। গ্রন্থসমূহের অন্যত্র নানা স্থানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহয়সী কবি ঔবেয়ার রচিত একটি পদে আছে—'হে মহান্ রাজা তুমি অদ্বিতীয় নীলকণ্ঠের ন্যায় দীর্ঘজীবী হও'—

নীলমণি মিডট্রোরুবন্ পোল
মন্নুগ পেরুম নীয়ে। (পুরনানূরু-৯১)

মণিমেখলৈ গ্রন্থে আছে—'ললাট-নেত্র ঈশ্বর অর্থাৎ শিব হইতে আরম্ভ করিয়া কাবেরীপ্-পূম্-পট্টনম্-এর 'চতুক্ক' দেবতা (চৌরাস্তার দেবতা অর্থাৎ সামান্য দেবতা) পর্যন্ত'—

মুদল্ বিড়ি নট্টত্তিরৈয়োন্ মুদলাপ
পদিবাড় চতুক্কত্তুদ্ দেয়্ব মীরা।

চিলপ্পধিকারম্ গ্রন্থে বলা হইয়াছে জন্মরহিত (অযোনি-সম্ভূত) শরীর-বিশিষ্ট মহত্তমের (মহাদেবের) মন্দিরের কথা—

পিরবা য়াক্কৈপ্ পেরিয়োন্ কোয়িল্।[২]

৩৫. পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত তামিলনাডের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের

১ (ক) Saivism is the real religion of the South of India....and the Saiva Siddhanta philosophy has far more influence than any other. Rev. G. U. pope—Tiruvacagam.

(খ) Siva is the third member of the Hindu Triad and in Southern India is more widely worshipped than Vishnu. H. Krishna Sastri—South Indian images of gods and goddesses. p. 72.

২ উ. বে. স্বামিনাথৈয়ার্-রচিত "চঙ্কত্ তমিলুম্ পিন্‌কালত্-তমিলুম্" পৃ ৮৩—৮৪।

মধ্যে পারস্পরিক সদ্‌ভাব ও সহিষ্ণুতা একপ্রকার বজায় ছিল। একদিকে যেমন প্রচলিত ছিল আর্যদেবতা ইন্দ্র-কৃষ্ণ ও দ্রাবিড় দেবতা শিব মুরুগনের পূজা-উপাসনা, অন্যদিকে তাহার পাশাপাশি প্রচলিত ছিল বৌদ্ধও জৈনধর্মের প্রচার। কিন্তু শেষোক্ত ধর্ম দুইটির ক্রম-বর্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তি উচ্চতর তামিল সমাজে ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এবং এই অবৈদিক নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায় দুইটিকে প্রতিহত করিবার জন্য শিব ও বিষ্ণুর উপাসক সম্প্রদায় তাহাদের ভক্তি সাধনাকে শক্তিশালী করিয়া তোলার আবশ্যকতা অনুভব করে। এইরূপে বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম-সংগঠন রূপে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রচারধর্মে ব্রতী হইল।

এই সাধনায় জয়লাভ করিতে হইলে সমাজের উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর সহযোগিতা অত্যাবশ্যক মনে করিয়া শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জাতিভেদবর্জনের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। যে ভক্তিসাধনা ছিল কেবল মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ তাহাকে ছড়াইয়া দেওয়া হইল জনসাধারণের মধ্যে। যাহা ছিল কেবল উচ্চবর্ণের অধিগত, তাহার উপর স্বীকৃত হইল সর্বসাধারণের অধিকার। শাস্ত্রের অনুশাসনের সহিত যুক্ত হইল হৃদয়ের আবেগ। এইরূপে ভক্তিসাধনার মধ্য দিয়া শুরু হইল হিন্দু ধর্মের আত্মরক্ষার প্রবল প্রচেষ্টা।

৩৬. অপর পক্ষে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ও নিষ্ক্রিয় থাকিল না। নানা উপায়ে তাহারাও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইয়া উঠিল। এই ধর্ম-সংঘর্ষের যুগে উভয় পক্ষে তুমুল বাদানুবাদ হইল, রাজশক্তিকে স্বপক্ষে আনয়নের চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং আলৌকিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা অজ্ঞ জনসাধারণকে দলভুক্ত করার প্রয়াসও কম হইল না। কিন্তু শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় উল্লিখিত উপায়গুলি হইতে যে একটি বিশেষ স্বতন্ত্র পন্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন তাহা হইল

সংগীত। জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের আবেগমূলক ভক্তিধর্ম প্রচারের প্রধান বাহন রূপে তাঁহারা সংগীত সাধনাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোনো বিশিষ্ট সিদ্ধ পুরুষকে পুরোভাগে রাখিয়া দলে দলে ভক্ত সাধারণ নৃত্যগীত সহযোগে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া দেশপরিক্রমা আরম্ভ করিল। পল্লীর পথে, মন্দিরের চত্বরে, দেবতার সম্মুখে তাঁহারা মনের কথাকে গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে লাগিল। প্রবল [illegible] ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল নতুন নতুন মঠ ও মন্দির। অবশেষে সেই মন্দিরে মন্দিরে চলিল তাহাদের তীর্থযাত্রা, পথে পথেই রচিত হইল সংগীত।

৩৭. এই ভক্তি-আন্দোলন সমগ্র তামিলনাডে এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইহাকে একটি জন-আন্দোলন বলাই সমীচীন।[১] শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় এই আন্দোলনে সমান অংশ গ্রহণ করে এবং তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় তামিলনাডের বহু বিভক্ত জনসমাজ ভক্তিধর্মের মধ্য দিয়া হিন্দু সংহতির দিকে

১ আধুনিককালে কৃষক, মজদুর প্রভৃতিদের লইয়া যে রাজনৈতিক জন-আন্দোলন গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে যেমন প্রকৃত কৃষক, মজদুর প্রভৃতি থাকে, তেমনি আবার সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্য হইতে একদল প্রগতিশীল চিন্তানায়কও এই সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হইয়া এইগুলির নেতৃত্বভার গ্রহণ করে। তামিলনাডের ধর্ম-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ইহার সামাজিক দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভক্তসাধকদের জীবনচরিত হইতে জানা যায়, সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। তিরুপ্পান্ আড়্বার, নম্মাড়্বার, নন্দনর্ নায়নার্ প্রভৃতি পূজ্য ভক্তবৃন্দ জন্মিয়াছিলেন নিম্নতম কুলে। সম্বন্দর, সুন্দরর্ পেরিয়াড়্বার প্রভৃতি ছিলেন ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিন্তু ভক্ত জনমণ্ডলীতে ইঁহাদের মর্যাদার কোনো তারতম্য ছিল না, এখনও নাই। এই কারণেই আমরা তামিলনাডের ভক্তি-আন্দোলনকে একটি জন-আন্দোলন বলিয়াছি।

অগ্রসর হয়। এই ধর্ম-আন্দোলনের যুগে তামিল ভাষায় যে ভক্তি-সাহিত্যে গড়িয়া উঠে, জনসাধারণের উপর ব্যাপক প্রভাবের দিক হইতে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত এই ভক্তিসাহিত্য প্রাচীন তামিল তথা ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ।

৩৮. তামিলনাডে তামিল ভাষার মধ্য দিয়া যে শুভ আন্দোলনের সূচনা, উত্তরকালে তাহা ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। আমরা বলিয়াছি যে, ভাগবত রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তামিল বৈষ্ণবসাহিত্য (দ্র° ৩০)। এইভাবে ভাগবতের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে, কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে, তামিল ভক্তি সাহিত্য অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। দাক্ষিণাত্যে ইহার প্রভাব সংশয়াতীত। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইব, কিভাবে বিষ্ণুভক্ত আড়্‌বারগণের (কতকাংশে শিবভক্ত নায়ন্‌মারগণের) ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও বৈরাগ্যের বাণী দক্ষিণভারতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে, এবং সেই প্রভাব উত্তরোত্তর বিস্তৃতি লাভ করিয়া মধ্যযুগে সমগ্র ভারতবর্ষে বিরাট আকার ধারণ করে। শ্রীবৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত, ভজন-সাধন, অনুভব এবং আচার-অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তি দুইটি—রামানুজ রচিত শ্রীভাষ্য এবং আড়্‌বারগণের রচিত দিব্য গীতাবলী। শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারা মূলত আড়্‌বারগণের ভাবধারা হইতে গৃহীত। এই কারণে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় 'আড়্‌বার সম্প্রদায়' নামেও পরিচিত। কোনো কোনো রসবেত্তা তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণবধর্মের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ করিয়াছেন।[১] স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

১ শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজদাস—আড়্‌বার পৃ ২৩৮-২৪৩

তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের নিকট বহু বিষয়ে ঋণী।[1] গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে রাধাভাব অপেক্ষা সখীভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও স্বয়ং শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণসঙ্গলিপ্সু হইয়া নায়িকাভাবে (রাধাভাবে) আবিষ্ট থাকিতেন। তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা নাই বটে, কিন্তু তামিল কবিদের রচনায় "নায়ক-নায়কী" ভাবটি যে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, পরবর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে আমরা তাহার কিছু পরিচয় পাইব।

(দুই) তামিল শৈব সাহিত্য

৩৯. তামিল ভক্তি সাহিত্যের প্রধান দুইটি ধারা—শৈব ও বৈষ্ণব। এই ধারা দুইটি কতকটা সমকালীন হইলেও আয়তনে ও বিস্তারে বৈষ্ণব সাহিত্য অপেক্ষা শৈব সাহিত্য মহত্তর। মোটামুটি ভাবে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীকেই উভয়ধারার সূচনাকাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তন্মধ্যে শৈব সাহিত্যকে কিছুটা অগ্রবর্তী বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রায় ছয় শত বৎসর ধরিয়া তামিলনাডে শৈব ও বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার ধারা একরূপ অব্যাহত ছিল। ইহার প্রথমার্ধ গীতি-সাহিত্যের যুগ, দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায় প্রবন্ধ কাব্যের প্রাধান্য।

প্রসিদ্ধ দ্বাদশ বৈষ্ণব কবি যেমন আলোয়ার বা আড়্বার নামে পরিচিত, সেইরূপ অগ্রণী শৈব কবি এবং ভক্তগণকে বলা হয় নায়ন্‌মার্ বা নায়নার্।[2] সংখ্যায় ইঁহারা ৬৩ জন হইলেও ইঁহাদের সকলেই যে কবি ছিলেন, তাহা নয়। আবার শৈব-কবিদের সকলেই যে নায়ন্‌মার-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন, তাহাও নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

১ নলিনীমোহন সান্যাল অনূদিত 'কুরল্' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২ তামিলে 'ভক্ত' অর্থে উভয় শব্দেরই ব্যবহার আছে।

সর্বশ্রেষ্ঠ শৈব-কবি মাণিক্কবাচকর্-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাণিক্কবাচকর্ প্রভৃতি যে সমস্ত কবিকে নায়ন্‌মার-তালিকায় পাওয়া যায় না, তাঁহারা হয় আবির্ভূত হন নায়ন্‌মার-গোষ্ঠী সংগঠনের পরবর্তীকালে, অথবা তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল শৈব-ধর্মের মূল কেন্দ্র চোল রাজ্যের বাহিরে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে নায়ন্‌মার-গোষ্ঠী সংগঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই গোষ্ঠীর প্রায় সকল কবি বা ভক্ত পুরুষই চোল-রাজ্যের অধিবাসী। কুলচ্চিরৈ প্রভৃতি যে দু'তিনজন পাণ্ড্যনাডুর ভক্ত-পুরুষ নায়ন্‌মার-তালিকায় স্থান পাইয়াছেন, প্রথম যুগের জৈন-বিরোধী সংগ্রামে তাঁহারা ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত ছিলেন বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইয়াছিল।

৪০. দশম শতাব্দীতে নাথমুনি যেমন বৈষ্ণব পদাবলী নির্বাচিত করিয়া সংকলন করেন "নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্" তেমনি প্রথম রাজরাজ চোলের রাজ্যকালে (৯৮৫-১৯৩০ খ্রী°) শৈব-সাহিত্যের সংকলন করেন প্রসিদ্ধ শৈব-কবি নম্বিয়াণ্ডার-নম্বি। তামিল সাহিত্যে সেই সংকলন গ্রন্থ "তেবারম্" নামে পরিচিত।[১] বৈষ্ণব সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যায় ১২ জন আলোয়ার কবির রচনা, কিন্তু শৈবসংকলন গ্রন্থ "তেবারম্"-এ সংকলিত হইয়াছে মাত্র তিনজন নায়ন্‌মার কবির পদাবলী। সম্বন্ধর্, অপ্পর্ এবং সুন্দরর্—এই তিনজন কবির গীতাগুলিই আরাধ্য দেবতার কণ্ঠমাল্য রচনার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

এখানেও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শৈবভক্তির শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা দশম শতাব্দীর মাণিক্কবাচকর-এর কোনো পদ 'তেবারম্'-এ সংগৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ বোধ করি এই যে, বৌদ্ধ-জৈন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিয়া সপ্তম শতাব্দীর সম্বন্ধর্ ও অপ্পর্

---

১ তেবারম্—দেবতার কণ্ঠহার। দেবহারম্>দেবআরম্>দেবারম্>তেবারম্।

এবং অষ্টম শতাব্দীর সুন্দরর্ পরবর্তীকালের শৈব জনসাধারণের চিত্তে যে অলৌকিক ভক্তিশ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি মাণিক্কবাচকর-এর পক্ষে স্বভাবতই তাহা সম্ভব হয় নাই। মাণিক্কবাচকর্ ব্যতীত ছোট বড় আরও অনেক কবি শৈবসঙ্গীতের দ্বারা তামিল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র শৈব-সাহিত্যকে অন্য একভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার আবশ্যকতা অনুভূত হইল। এই শ্রেণীবিন্যাসই তামিল সাহিত্যে 'তিরুমুরৈ' (অর্থাৎ পবিত্র বিভাগ) নামে পরিচিত। এইরূপ বারোটি 'তিরুমুরৈ' লইয়া সমগ্র শৈব সাহিত্য গঠিত।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিরুমুরৈ হইতেছে 'তেবারম্'-এ সংকলিত সম্বন্ধর্-এর পদাবলী। অপ্পর্-এর পদাবলী লইয়া চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ তিরুমুরৈ। সপ্তম তিরুমুরৈ বলিতে সুন্দরর্-এর পদাবলীকে বোঝায়। অষ্টম তিরুমুরৈ-তে স্থান পাইয়াছে মাণিক্ক-বাচকর্ প্রণীত 'তিরুবাচকম্' এবং 'তিরুক্কোবৈ' গ্রন্থ দুইখানি। নয়জন অল্প পরিচিত কবির ২১টি 'পদিকম্'[১] লইয়া গঠিত হইয়াছে নবম তিরুমুরৈ। দশম তিরুমুরৈতে আছে কবি তিরুমূলর্ প্রণীত দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ 'তিরুমন্দিরম্' (অর্থাৎ শ্রীমন্ত্র)। এইরূপ তিরুমুরৈ বা পবিত্র শ্রেণীবিন্যাসের কর্তা হইলেন 'তেবারম্'-সংকলয়িতা কবি নম্বি-য়াণ্ডার-নম্বি। তিনি নিজের রচনাবলী বাদ দিয়া কারৈক্কাল অম্মৈয়ার, চেরমান পেরুমাল্, পট্টিনত্তুপ্ পিল্লৈ প্রভৃতি এগারোজন কবির রচনা লইয়া করিলেন একাদশ তিরুমুরৈ। পরে তাঁহার সমসাময়িক চোলরাজার নির্দেশে তাঁহার নিজের রচনাও একাদশ তিরুমুরৈ-র সর্বশেষে স্থান লাভ করে।

তিরুমুরৈ-র সংখ্যা বারোটি হইলেও আমরা এ পর্যন্ত এগারোটির পরিচয় পাইলাম। বস্তুতঃ নাম্বি-য়াণ্ডার-নম্বি শৈবসাহিত্যের

১ পত্তু অর্থাৎ দশটি স্তবক-বিশিষ্ট পদের নাম পদিকম্। কখনো কখনো ইহাতে ১১টি বা তাহার অধিক পদও পাওয়া যায়।

এগারোটি বিভাগই করিয়াছেন। দ্বাদশ তিরুমুরৈ-রূপে পরিচিত কবি চেক্কিড়ার্ প্রণীত 'পেরিয় পুরাণম' রচিত হইয়াছে এক শ' বছরেরও অধিক কাল পরে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, চোল বংশীয় সম্রাট ২য় কুলোতুঙ্গ চোলন্-এর রাজ্যকালে (১১৩৩-১১৫০ খ্রী°)। উক্ত চোল সম্রাটই 'পেরিয় পুরাণম' গ্রন্থকে দ্বাদশ তিরুমুরৈ-রূপে সম্মানিত করেন। ইহাই হইতেছে তামিল শৈবসাহিত্যের বারোটি তিরুমুরৈ-র মোটামুটি বিবরণ।

৪১. বিস্তৃত শৈবসাহিত্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন কবি এবং তিনখানি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্বন্ধর্-অপ্পর্-সুন্দরর্ প্রথম যুগের এই তিনজন, দশম শতাব্দীর মাণিক্ক-বাচকর্ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর চেক্কিড়ার্—শৈবসাহিত্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ কবি। প্রথম কবিত্রয়ের পদ সংকলন 'তেবারম', মাণিক্কবাচকর্এর 'তিরু-বাচকম' এবং চেক্কিড়ার্-এর 'পেরিয় পুরাণম'—এই গ্রন্থ তিনখানি কেবল শৈবসাহিত্যের নয়, সমগ্র তামিল সাহিত্যের স্মরণীয় গ্রন্থ।

৪২. শৈবসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা প্রথম কবিরূপে যাঁহার নাম পাই, তিনি হইতেছেন নেগা-পট্টনম্-এর নিকটবর্তী কারৈক্কাল্-নিবাসিনী মহিলা কবি পুনীতবতী (আবির্ভাবকাল ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। তামিল সাহিত্যে ইনি কারৈক্কাল-অম্মৈয়ার (অর্থাৎ কারৈকালের জননী) নামেই পরিচিত। পতি-পরিত্যক্তা এই ভক্ত নারীর পারিবারিক জীবন বিশেষ বেদনাদায়ক। তাঁহার রচিত পদের সংখ্যা এইরূপ: ২২টি স্তবক বিশিষ্ট 'মূত্ত তিরুপ্পদিকম্' (অর্থাৎ প্রথম শ্রীপদিক), ২০টি স্তবকের 'তিরু ইরট্টৈ মণিমালৈ'[১] এবং ১০১টি স্তবকে সম্পূর্ণ 'অর্বুদ তিরুবন্দাদি'।[২]

---

১ ইরট্টৈ অর্থাৎ দুই। আলোচ্য গ্রন্থের ছন্দোব্যবহারে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদি অযুগ্মসংখ্যক স্তবকে এক-প্রকার ছন্দ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ইত্যাদি যুগ্মসংখ্যক স্তবকে অন্য প্রকার ছন্দ। তাই ইহার নাম হইয়াছে 'ইরট্টৈ মণিমালৈ' অর্থাৎ দুই ছন্দের মণিমালা।

২ অর্বুদ তিরুবন্দাদি = অদ্ভুত শ্রী অন্তাদি। পূর্ববর্তী স্তবকের অন্ত-

অতি শৈশব হইতেই শিবের প্রতি ভক্তিমতী কবি পরিণত বয়সে দুঃখ যন্ত্রণায় পরিবৃত হইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে এই বলিয়া কাতর আবেদন জানাইলেন—"জন্মলাভের পরে যখন প্রথম আধো-আধো কথা বলিতে শিখিলাম, সেই হইতেই তোমার প্রতি আমার সমস্ত ভালোবাসা। আজ আমি তোমার পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি। হে উজ্জ্বল নীলকণ্ঠ দেবাদিদেব, সেদিন কবে আসিবে, যেদিন তুমি আমায় যন্ত্রণা হইতে মুক্তিদান করিবে।"[১]

ভক্তির পথে কত অন্তরায় এবং কত বাধা-বিঘ্ন ভয়-ডর অতিক্রম করিয়া যে দেবতার কাছে পৌঁছিতে হয়, তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—"আমরা তাঁহার কাছে কিরূপে অগ্রসর হইব? তাঁহার দেহের উপর একটি বৃহৎ সর্প নাচিতেছে এবং তাঁহার কাছে সে কাহাকেও যাইতে দেয় না। কেবল তাহাই নয়, তাঁহার গলায় আছে নরমুণ্ডের মালা এবং সেই বৃষবাহন দেবতা মহানন্দে ধারণ করিয়াছেন শুভ্র হাড়ের অলংকার।"[২]

কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে দেবতাকে যতই ভয়ংকর বলিয়া মনে হউক না কেন, তাঁহাকে ছাড়া কবি স্বর্গবাসও কামনা করেন না—"হে চন্দ্রচূড়, হে সপ্তলোক-নয়ন, আমি মনের কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, তোমাকে দেখিয়া, তোমার চরণে প্রণত থাকিয়া যদি তোমার সামান্য সেবা না করিতে পারি, তবে স্বর্গ পাইলেও আমি তাহা চাই না।"[৩] কারণ কবির দৃঢ় বিশ্বাস, "যদি আমরা আমাদের প্রভুর স্বর্ণ-চরণ-যুগলকে পুষ্পমাল্য দিয়া ভূষিত করিয়া সানুরাগ একাগ্রচিত্তে শব্দ-মালার সাহায্যে বন্দনা করি, যদি আমরা সেই

শব্দ বা শব্দাংশটি পরবর্তী স্তবকের আদিতে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এইরূপ নামকরণ।

১ অর্বুদতিরুবন্দাদি সং ১

২ তিরু ইরট্টৈ মণিমালৈ সং ১৭

৩ অর্বুদ তিরুবন্দাদি সং ৭২

অদ্বিতীয় জ্ঞানময় ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া থাকি, তবে কর্মজনিত অজ্ঞান-অন্ধকার আমাদের কিরূপে দুঃখ দিবে ?"[১]

কিন্তু কোথায় সেই ভগবান ? "কেহ বলে, তিনি আছেন স্বর্গে। বলুক না তারা। কেহ বলে, তিনি বাস করেন দেবরাজ ইন্দ্রপুরীতে। বলুক না তারা। কিন্তু আমি বলিব—সেই যে দেবতা, পুরাকালে বিষপানের ফলে কণ্ঠ যাঁহার কালো হইয়াও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তিনি আছেন আমার হৃদয়ের মধ্যে।"[২]

কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে থাকিলেও কবি যে তাঁহাকে ঠিক ঠিক চিনিতে পারিয়াছেন, তাহা নয়। হৃদয়ের ধন হইলেও তিনি দুর্জ্ঞেয়। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক কিরূপ, সে বিষয়ে কবির নিজের কথাই শোনা যাক ঃ

"যেদিন আমি তোমার ভক্ত হইলাম, সেদিন তোমার শ্রীমূর্তি না দেখিয়াই ভক্ত হই। আজিও তোমার শ্রীমূর্তি আমি দেখিতে পাইতেছি না। তাই তাহারা যখন জিজ্ঞাসা করে—"তোমার প্রভুর আকৃতি কিরূপ, তাহাদের কাছে আমি কি উত্তর দিব ? হে প্রভু, বল না তোমার আকৃতি কিরূপ।"[৩]

৪৩. তামিল শৈবসাহিত্যের সম্বন্ধর-অপ্পর্-সুন্দরর্-মাণিক্ক-বাচকর্—এই প্রধান কবি-চতুষ্টয় ছাড়া আর যাঁহারা ভক্ত কবিরূপে অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চেরমান্ পেরুমাল্ (অষ্টম শতাব্দী), তিরুমূলর্ (নবম শতাব্দী), পট্টিনত্তু-প্-

১ অর্বুদ তিরুবন্দাদি সং ৮৭

২ ঐ সং ৬

৩ অর্বুদ তিরুবন্দাদি, সং ৬১

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ

তখন কী কই নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি 'কী জানি কী জানি'।
—রবীন্দ্রনাথ (উৎসর্গ ৬সং কবিতা)

পিল্লৈয়ার্ (দশম শতাব্দী), নম্বি-য়াণ্ডার-নম্বি (একাদশ শতাব্দী) এবং চেক্কিড়ার্ (দ্বাদশ শতাব্দী)—ইহাদের নাম উল্লেখ করা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রথম রাজরাজ চোলের সম-সাময়িক কবি নম্বি-য়াণ্ডার-নম্বির বিষয়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে। পট্টিনত্তুপ্ পিল্লৈও কয়েকটি ভক্তিমূলক সুন্দর পদরচনা করিয়া গিয়াছেন। নবম শতাব্দীর কবি তিরুমূলর্-রচিত তিন সহস্রাধিক স্তবকে সম্পূর্ণ তিরু-মন্দিরম্ (অর্থাৎ শ্রীমন্ত্র) গ্রন্থখানি শৈবসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই গ্রন্থের প্রধান গৌরব কাব্যরস নয়, শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনা।[১] তামিল ভাষায় একটি কথা খুবই প্রচারিত, যাহার অর্থ হইতেছে—গীতের (স্তোত্রের) মধ্যে যেমন 'তিরুবাচকম্' শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের মধ্যে তেমনি 'তিরুমন্দিরম্।'[২] এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা দুই-ই অতিশয় নিগূঢ়। অপেক্ষাকৃত সরল দু'একটি পদের সাহায্যে আমরা 'তিরুমন্দিরম্'-এর রসাস্বাদনের চেষ্টা করিব।

প্রেম ও ভগবান যে একই বস্তু, সে সম্পর্কে কবি বলিতেছেন—

> অন্বুম্ চিবমুম্ ইরণ্ডেন্বররিবিলার্,
> অন্বে চিবমাবতারুম্ অরিকিলার্,
> অন্বে চিবম্ আবতারুম্ অরিন্দপিন্
> অন্বে চিবমায়্ অমরন্দিরুন্পারে। —২৭০ সং

—মূর্খলোকেরা বলে, প্রেম ও ভগবান দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু। প্রেম ও ভগবান্ যে একই বস্তু, একথা সকলে জানেনা। যখন তাহারা জানিতে পারে যে, প্রেম ও ভগবান একই, তখন তাহারা সার সত্য জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

১ Tirumantiram occupies a unique place in Tamil Philosophy. J. M. Nallaswami Pillai—Periya Puranam p. 70.

২ তোত্তিরত্ তিরুকুত্ তিরুবাচকম্,
শাস্ত্রত্তিরুকুত্ তিরুমন্দিরম্।

কবি ভগবৎ উপলব্ধির যে আনন্দলাভ করিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই আনন্দের অংশীদার হউক, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা—

নান্ পেট্র ইন্‌বম্ পেরুক ইবৈয়কম্,
'বান্ পট্রিনিগুরু মরৈপ্ পোরুল্ চোল্লিডিন্,
উন্ পট্রিনিগু উণাবুরু মন্দিরম্
তান্ পট্রপ্ পট্রত্ তলৈপড়ুম্ তানে। —৮৫ সং

৪৪. শৈবসাহিত্যের একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দ্বাদশ শতকের কবি চেক্কিড়ার্-রচিত 'পেরিয়পুরাণম।'[১] 'তেবারম' ও 'তিরুবাচকম্-এর পরেই ইহার স্থান। চোলবংশীয় রাজা ২য় কুলোতুঙ্গ (১১৩৩-১১৫০ খ্রী) তাঁহার সাহস ও বীরত্বের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনভয় চোলন্ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। চেক্কিড়ার্ ছিলেন এই চোল সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী। শৈববংশের সন্তান হইয়াও অনভয় চোলন্ শৈবসাহিত্য অপেক্ষা 'জীবক চিন্তামণি' প্রভৃতি জৈনগ্রন্থের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শৈব ভক্ত সাধকদের জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। রাজার এইরূপ বিপরীত মতিবুদ্ধি দেখিয়া চেক্কিড়ার্ অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং রাজাকে এই মর্মে উপদেশ দান করেন যে, শৈব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম গ্রহণ শস্য পরিত্যাগ করিয়া তুষ গ্রহণের মতোই নিরর্থক। দুগ্ধবতী ধেনুর পরিবর্তে বন্ধ্যা ধেনু, শীতল উদ্যান ছাড়িয়া পঙ্কভূমি, সরস ইক্ষুদণ্ডের পরিবর্তে লৌহখণ্ড এবং প্রদীপের পরিবর্তে খদ্যোত কেহ কি পছন্দ করে?[২]

মন্ত্রীর উপদেশে রাজা শৈব সাধকদের প্রচলিত জীবনীগ্রন্থপাঠে

১ ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী 'পেরিয়পুরাণম্' কে বলিয়াছেন—a landmark in the history of Tamil Saivism (A History of South India p. 362)

২ পদ সং ২০

মনোনিবেশ করেন, কিন্তু সেইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণে তৃপ্ত হইতে না পারিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে একখানি বৃহৎকাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। এইভাবে 'পেরিয়পুরাণম' রচনার সূত্রপাত ঘটিল। বিদ্বান্ তথা ধার্মিক প্রধানমন্ত্রী চেক্কিড়ার্ রাজকার্য হইতে দীর্ঘ অবসর লইয়া গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তৎপূর্বে ভক্ত-জীবনীসমূহের মধ্যে যে দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া, তাহার একখানি অষ্টম শতাব্দীর কবি সুন্দরর্-লিখিত 'তিরুত্-তোণ্ডর্-তোগৈ' (অর্থাৎ শ্রীভক্ত সমুচ্চয়) এবং দ্বিতীয়খানি একাদশ শতকের কবি নম্বি-য়াণ্ডার-নম্বি লিখিত 'তিরুত্-তোণ্ডর্-অন্দাদি (অর্থাৎ শ্রীভক্ত-স্তবক)। চেক্কিড়ার্ এই গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শৈব-আচার্য ও শৈব-কবিদের সম্পর্কে যে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া বৃহৎ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যে রাজধানী (তিরুচির নিকটবর্তী) 'গঙ্গৈকোণ্ড চোলপুরম্' পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ শৈবতীর্থ চিদম্বরম্-এ আসিয়া উপনীত হইলেন।

কথিত আছে, চিদম্বরম-এর নটরাজ হইতে তিনি তাঁহার গ্রন্থরচনার প্রথম শব্দটির ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। পেরিয় পুরাণম্-এর প্রথম শব্দট হইল—উলগেলাম্ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব। পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ—

উলগেলাম্ উণরন্দু ওদর্করিয়বন্,
নিলবুউলাবিয় নীর্মলি বেণিয়ন্,
অলকিল্ জোতিয়ন্ অম্বলত্তু আডুবান্ ,
মলর্ চিলম্বু অডি বাড়্ত্তি বণঙ্গুবাম্।[১]

গ্রন্থ শেষও হইয়াছে নটরাজ-প্রদত্ত ঐ 'উলগেলাম্' শব্দটি দিয়া।

১ বিশ্ববাসী যাঁহাকে জানিতে এবং প্রকাশ করিতে পারে না, জটায় যাঁহার গঙ্গা এবং অর্ধচন্দ্রের অধিষ্ঠান, চিদাকাশে নৃত্য করেন যে অপরিমেয় জ্যোতির্ময়, আমরা তাঁহার পুষ্পতুল্য নূপুর-পরা চরণযুগল বন্দনা করি।

এক বৎসর পরে গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হইলে চোল-সম্রাট একটি বিশেষ সমারোহপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করেন। তামিলনাডের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সমাগত জনসমাবেশের মধ্যে চেক্কিড়ার্ এবং তাঁহার গ্রন্থ যে রাজসম্বর্ধনা লাভ করেন, তাহা সত্যই দুর্লভ। 'পেরিয়-পুরাণম্' শৈবসাহিত্যের 'দ্বাদশ তিরুমুরৈ' রূপে স্বীকৃতিলাভ করিল।

রচনাগৌরবে অনেক উন্নত হইলেও বিষয়বস্তুর দিক হইতে চেক্কিড়ারের গ্রন্থ কিয়ৎপরিমাণে হিন্দী ও বাঙ্লা 'ভক্তমাল' জাতীয় গ্রন্থের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ২টি কাণ্ডম্ ও ১৩টি সরুক্কম্ (সর্গ)-এ বিভক্ত এবং সর্বশুদ্ধ ৪২৮৬টি স্তবকে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থখানির প্রকৃত নাম 'তিরুত্-তোণ্ডর্-পুরাণম্' (অর্থাৎ শ্রীভক্তপুরাণ) হইলেও উৎকর্ষে ও পরিমাণে পূর্বতন গ্রন্থগুলির তুলনায় মহত্তর ও বৃহত্তর বলিয়া সাধারণত ইহা পেরিয়-পুরাণম্ (অর্থাৎ মহাপুরাণ) নামেই পরিচিত।

বিষরবস্তুর দিক হইতে পেরিয়পুরাণম্ জীবনীকাব্য, এবং স্বভাবতই গীতিকাব্যের ন্যায় ইহার আবেদন দেশকালাতিশায়ী হইতে পারে না। তথাপি তামিলনাডের অধিবাসীদের চিত্তে যে প্রাচীন সাহিত্যসংগ্রহ বর্তমান যুগ পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে, পেরিয়পুরাণম্ অবশ্যই তাহার অন্তর্ভুক্ত। তামিলভাষী, বিশেষতঃ ভক্ত তামিলভাষীর দৃষ্টিতে ইহা একখানি অসামান্য গ্রন্থ। ইহাতে যে সমস্ত ভক্ত নরনারীর জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য সাধারণ তামিলীর মানসলোকে একটা চিরন্তন শ্রদ্ধার আসন পাতা রহিয়াছে। তামিলনাডের বাহিরে সেই ভক্ত নায়ন্মার-গোষ্ঠী কেবল কতগুলি অপরিচিত দুরুচ্চার্য নামের সমষ্টি বলিয়া, তামিল যাঁহাদের মাতৃভাষা নয়, পেরিয়পুরাণম্ সম্পর্কে তাঁহাদের যথোচিত আগ্রহ না-ও হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, পেরিয়পুরাণম্ কেবল ভক্তিরসের গ্রন্থ নয়, ইহাতে ভক্তিরস ও কাব্যরস মিশ্রিত হইয়া আছে। কবি চেক্কিড়ার্

প্রকৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার রচনায় সেই নিসর্গ-প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সেই সমস্ত বর্ণনার মধ্যেও হিন্দী কবি তুলসীদাসের ন্যায় আমরা তাঁহার ভক্ত হৃদয়টির সুমধুর আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাই।[১]

(তিন) তামিল শৈবসঙ্গীত 'তেবারম্'

৪৫. বিস্তৃত তামিল শৈব-সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম 'তেবারম্'।[২] প্রায় আট হাজার পদ বা স্তবকের সমাহারে গঠিত এই সংকলন-গ্রন্থখানি কেবল যে আকারেই সুবৃহৎ তাহা নয়, ভক্তি-রসেও ইহা শীর্ষস্থানীয়। প্রসিদ্ধ শৈবকবি মাণিক্কবাচকর্-প্রণীত 'তিরুবাচকম্'-এর কথা ছাড়িয়া দিলে শৈব-সাহিত্যে 'তেবারম্' অদ্বিতীয়। আর যদি নিছক কাব্যরসের দিক হইতে বিচার না করিয়া আমরা তামিল ভক্তজনের ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টি লইয়া দেখিতে চাই, তবে শৈব-সাহিত্যে 'তেবারম্'-এর তুলনা নাই। কারণ তামিলনাডের শৈব তথা হিন্দু জনসাধারণের মনে তেবারম্-এর সহিত একটা দ্বন্দ্ব-মুখর সুদীর্ঘ ইতিহাসের স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। বৌদ্ধ-জৈনদের কবল হইতে তামিলনাডকে মুক্ত করিবার যে দৃঢ় সংকল্প ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর শৈব তামিলীদের মধ্যে দেখা

১ আমরা এখানে কেবল একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মাঠে মাঠে প্রচুর ধান জন্মিয়াছে। ফসল সংগ্রহের কাল আসন্ন। সেই পাকা ধানের গুচ্ছ লইয়া সারি সারি গাছগুলি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাশাপাশি দুই সারি পরস্পরের দিকে নুইয়া পড়াতে মনে হইতেছে যেন পবিত্র দেবালয়ে দুই সারি ভক্ত তাঁহাদের সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ও বিনয়বশতঃ পরস্পরের সম্মুখে নত হইয়া পড়িয়াছেন।—তিরুনাট্টুচ্ চিরপ্পু, পদ সং ২১ ও ২২।

২ তেবারম্ <তেবআরম্ <দেবআরম্ <দেবহারম্। দেবহার অর্থাৎ দেবতার কণ্ঠে পরাইবার জন্য গীতিমাল্য।

গিয়াছিল, 'তেবারম্' তাহারই উদ্দীপনাময়ী স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে। ইহা ভক্তি-রসের কাব্য হইলেও এই ভক্তি অবিমিশ্র শান্ত বিশুদ্ধ ভক্তি নয়, ইহার সহিত অত্যন্ত অল্প পরিমাণে হইলেও মিশ্রিত হইয়া আছে একটি পরধর্ম-বিরুদ্ধতা। অবশ্য এই মনোভাব সর্বত্র উগ্র হইয়া উঠিলে তেবারম্ ভক্তিকাব্য না হইয়া ইতিহাসের উপাদান হইয়া থাকিত।

একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চোল সম্রাট্ প্রথম রাজরাজ চোলের নির্দেশক্রমে শৈব কবি নম্বিয়াণ্ডার-নম্বি যে তিন জন ভক্ত-কবির পদাবলী লইয়া 'তেবারম্' সংকলন করেন, তাঁহারা হইতেছেন—সম্বন্ধর, অপ্পর্ এবং সুন্দরর্। ইঁহাদের প্রথম দুইজন সপ্তম শতাব্দীর সমসাময়িক কবি। সুন্দরর্ আবির্ভূত হন এক শতাব্দীরও পরে। ততদিনে শৈবধর্মের জয়লাভের ফলে তামিলনাডের ধর্ম-সংঘর্ষের উত্তেজনা অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ফলে তৎকালীন শৈব কবিদের রচনা বিরুদ্ধ ধর্মের নিন্দাবাদ হইতে মুক্ত। অপ্পর্-সম্বন্ধর্-এর রচনাবলী সম্পর্কে ঠিক এই কথা বলা যায় না। এই দুইজন শৈবসাধক যেভাবে ধর্মযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের রচনার মধ্যে কিছু পরিমাণ উষ্ণতা থাকা স্বাভাবিক। তাঁহাদের ভক্তিসঙ্গীত কেবল নিষ্ক্রিয় হৃদয়োচ্ছ্বাস নয়, তাহা ধর্ম-যুদ্ধের একটি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার। এই জাতীয় দু-একটি রূঢ় পদে আসিয়া বিশুদ্ধ-দৃষ্টি নিরপেক্ষ ভক্ত হয়তো বেদনা বোধ করিবেন।

৪৬. ৬৩ জন নায়ন্মার্ ভক্তের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শৈব কবি চেক্কিড়ার্ 'পেরিয়পুরাণম্' (মহাপুরাণ) নামে যে উৎকৃষ্ট জীবনী-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাই বর্তমানে শৈব কবিদের জীবন-বৃত্তান্তের মুখ্য অবলম্বন। এইরূপ জীবনচরিত-গ্রন্থে সাধারণতঃ অলৌকিকতার স্পর্শ থাকে। 'পেরিয়পুরাণম্'-এও রহিয়াছে। ফলে, সম্বন্ধর্-অপ্পর্-সুন্দরর্—আমাদের আলোচ্য

এই তিন কবির জীবনেও নানারূপ অলৌকিক ঘটনার সমবেশ দেখা যায়। কাব্য জীবনবৃত্তান্ত নয় এবং কাব্যের আলোচনায় কবির জীবনচরিত হয়তো অনাবশ্যক। কিন্তু আলোচ্য শৈব কবিদের জীবনকাহিনী তামিল-সাধারণের মনে-প্রাণে এমনিভাবেই জড়াইয়া আছে যে, তাঁহাদের জীবনের দু-একটি মুখ্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া তাঁহাদের রচনার কথা বলিলে বোধ করি অন্যায় করা হইবে।

সম্বন্ধর্ অপেক্ষা অপ্পর্ যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ হইলেও তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে সম্বন্ধর্-ই যে সাধারণতঃ অগ্রাধিকার লাভ করেন, তাহার কারণ বোধ করি—বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের উচ্ছেদ করিয়া তামিলনাডে শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠাকার্যে অপ্পর্ অপেক্ষা সম্বন্ধর্ অধিক কৃতিত্বশালী। মাত্র ১৬ বছর বয়সে যাহার তিরোভাব ঘটে, সেই বালক কি ভাবে যে এই অসাধ্য সাধন করিল, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কবির শৈশব হইতেই এইরূপ নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তাঞ্জোর জেলার ব্রহ্মাপুরম্ (বর্তমান নাম শিয়ালি) নামক গ্রামের এক শৈব ব্রাহ্মণ-পরিবারে জাত এই শিশু বাহ্যত মানব সন্তান হইলেও বস্তুত ছিল উমা-মহেশ্বরের সন্তান। তিন বৎসর বয়সেই সেই দিব্য পিতা-মাতার জন্য তাহার আকুলতা দেখা যায়। একদিন মানব-পিতার পশ্চাতে শিশু শিবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলে পূজারী ব্রাহ্মণ তাহাকে ঘাটের উপরে রাখিয়া জলে নামিলেন। এদিকে শিশু উমা-মহেশ্বরের দিকে চাহিয়া 'মা, বাবা' বলিয়া কাঁদিতে থাকে। শিবের আদেশে উমা তাহাকে স্তন্যপান করাইলে সেই তিন বৎসরের শিশু দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হয় এবং তাহার নাম হয় 'তিরু-ঞান-সম্বন্ধর্' (অর্থাৎ দিব্য-জ্ঞানসম্বন্ধ) সংক্ষেপে 'সম্বন্ধর্'।

এই ঘটনার পরে ভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার শিশু-পুত্রকে কোলে করিয়া শৈবতীর্থ পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সম্বন্ধর্

সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলে দলে দলে ভক্ত-গায়ক তাঁহার অনুগামী হইতে থাকে। এই সময়েই সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ শৈব কবি অপ্পর্-এর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। কীর্তিমান্ কবি অপ্পর্ এই প্রতিভাশালী বালকের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

সম্বন্ধর্-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল জৈনদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া পাণ্ড্য-রাজ সুন্দর পাণ্ড্যন্-কে শৈবধর্মে দীক্ষিত করা। এই ঘটনার সহিত সম্বন্ধর্-কৃত নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈনদের সহিত তর্কযুদ্ধ, রাজার আরোগ্য-বিধান, জল-স্রোতের বিপরীত মুখে শৈবশাস্ত্রগ্রন্থের পৃষ্ঠা ভাসাইয়া দেওয়া, অগ্নি-বেষ্টিত হইয়াও অক্ষত থাকা ইত্যাদি নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া সম্বন্ধর্ বিজয়গৌরবের অধিকারী হইলেন। বিপুল-সংখ্যক জৈন নানাভাবে এই তরুণ শৈবাচার্যকে নির্যাতিত, এমন কি প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিলেও সম্বন্ধর্ পরবর্তীকালে (পাণ্ড্যরাজের শৈবমতে দীক্ষা-গ্রহণের পরে) যে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভয়াবহ। সম্বন্ধর্-এর সম্মতিক্রমে পাণ্ড্যরাজধানী মাদুরায় আট সহস্র জৈনের যে নিধন-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, ভক্তজীবনের সহিত আমরা কোন মতেই তাহার সঙ্গতি খুঁজিয়া পাই না।

সে যাহাই হউক, সম্বন্ধর্-এর রচনার পরিচয় দেওরার আগে আমরা তাঁহার তিরোভাবের দিনটির উল্লেখ করিতে চাই। সেইটি ছিল তাঁহার বিবাহের দিন। বর-বধূ সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্য শেষ করিয়া শিব-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন প্রভুকে প্রণাম জানাইতে। কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল সঙ্গীত। কিন্তু সেই সঙ্গীতের সুরধ্বনি মিলাইয়া যাওয়ার পূর্বেই বর-বধূর মর-দেহ মনুষ্যদৃষ্টির অগোচরে চলিয়া গেল।

৪৭. শিবের বন্দনা-গানে কবির প্রথম শ্লোকটি এইরূপ: কর্ণে যাঁহার কুণ্ডল, বৃষের উপরে আরূঢ় যিনি, যাঁহার শিরোদেশে শুভ্র চন্দ্র, শ্মশানের বিভূতি-মণ্ডিত যাঁহার দেহখানি, বহুদিন পূর্বে

যিনি অনুগৃহীত করিয়াছিলেন পদ্মাসন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মাপুর[১]-নিবাসী সেই প্রভুই আমার মন-চোর।[২]

ব্রাহ্মণকবি যে তাঁহার প্রভুকে ব্রাহ্মণের বেশে সাজাইয়াছেন নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাহার নিদর্শন—

কণ্ঠে যাঁহার বেদমন্ত্র, গলায় যাঁহার যজ্ঞোপবীত, শুভ্র বৃষবাহন ভূতগণবেষ্টিত ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত সেই দেবতা ঐ আসিতেছেন সমারোহের সঙ্গে। 'হে নগ্ন ভিখারী, তুমিই আমাদের প্রভু'— এই কথা বলিয়া যাহারা তাঁহার চরণাগত হয়, তিনিই তাহাদের পাপ দূরীভূত করেন।[৩]

প্রভু কি শুধুই শিব, শুধুই মঙ্গল? তবে জগদ্ব্যাপী এই অমঙ্গল আসে কোথা হইতে? কবি একটি পদে প্রভুর বিচিত্র রূপের কথা বলিয়াছেন এইভাবেঃ তুমিই গুণ, আবার তুমিই দোষ। তুমি বন্ধু, তুমি ভগবান। অনন্ত জ্যোতির অধিকারী তুমি। শাস্ত্রের তাৎপর্য তুমি, তুমি সম্পদ্, তুমি আনন্দ। তুমি আমার সব। তোমার প্রশংসা আর কত করি বল?[৪]

এমন প্রিয় প্রভুকে যখন বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায় নিন্দা করে, তখন স্বভাবতই কবি ক্ষুব্ধ হন। সেই ক্ষোভের মুহূর্তে তিনি একই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার মহিমা কীর্তন করিয়াছেনঃ বুদ্ধি-বিহীন বৌদ্ধ ও জৈনেরা আমার প্রভুর নিন্দা করে। কিন্তু আমার মন-চোর প্রভুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি পৃথিবীতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। আবার প্রভুর এ কী মায়া—যে মত্তহস্তী (গজাসুর) আসিল তাহাকে আক্রমণ করিতে, তিনি তাহার চর্ম দ্বারা দেহ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। লোকে

১ ব্রহ্মাপুর কবির জন্মভূমি।

২ তোড়ুডৈয় চেবিয়ন্ বিডৈয়েরিয়োর্ তূবেণ্মতিচূড়িক্

৩ বেদম্ ওদি বেণ্নূল্পূণ্ডু বেল্লৈ এরুদেরিপ্....

৪ কুট্রনী গুণঙ্গনী কুডলালবায়িলায়্....

তাঁহাকে পাগল বলে, কিন্তু আমি জানি, তিনি আমাদের মহান্ প্রভু।[1]

দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের বিভূতি-মণ্ডিত ললাট একটি অতিপরিচিত দৃশ্য এবং বাঙালীর পক্ষে কিছুটা কৌতুককরও বটে। এই বিভুতিকে সাধারণতঃ বলা হয় তির্নীর্ (তিরু নীরু) অর্থাৎ শ্রীভস্ম। শৈব ব্রাহ্মণ ললাটে 'তির্ নীর্' মাখিবার কালে নিশ্চয়ই স্মরণ করে উহার অতীত মহিমার কথা। সম্বন্ধর্‌কে অপদস্থ করিবার জন্য জৈনেরা একবার পাণ্ড্যরাজের দেহে সুকৌশলে ব্যাধিসঞ্চার করিয়া শৈবসাধুকে আহ্বান করে রাজার আরোগ্য বিধানের জন্য। রাজার রোগ-শয্যার একদিকে প্রবীণ জৈনাচার্য, অপরদিকে কিশোর সম্বন্ধর্। উভয়দিকেই সমানে মন্ত্রপাঠ চলিতে থাকে। কিন্তু যে দিকে জৈনাচার্য বসিয়াছিলেন, রাজার শরীরের সেই দিক্‌কার অর্ধাংশে যন্ত্রণা ক্রমশই উৎকট হইয়া পড়ে। আর সম্বন্ধর্-এর দিকে বাকি অর্ধাংশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। তখন যে স্বরচিত মন্ত্র-সহযোগে সম্বন্ধর্ রাজদেহে বিভূতি মাখাইয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

মন্ত্রম্ আবদু নীরু, বানবর্ মেল্ অদু নীরু,
সুন্দরম্ আবদু নীরু, তুতিক্কপ্ পডুবদু নীরু,
তন্ত্রম্ আবদু নীরু, সময়ত্তিল্ উল্লদু নীরু,
চেম্-তুবর্ বায় উমৈভঙ্গন্ তিরু আলবায়ান্ তিরুনীরে।[2]

শৈবদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র পঞ্চাক্ষর 'নমঃ শিবায়'। এই মন্ত্র কণ্ঠে লইয়া সম্বন্ধর্ মাদুরা যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি-

১ বুদ্ধরোডু পোরিয়িল্ চমণুম্ পুরক্কূরন্ এন্নিনিল্লা...

২ মন্ত্রের মহাশক্তি পবিত্র ভস্মে। স্বর্গবাসী দেবগণও ইহা ব্যবহার করেন। সৌন্দর্য-বিধায়ক মহাস্তত্য এই বিভূতি। তন্ত্রের মহিমা ধর্মের গরিমা এই বিভূতির মধ্যে—যে বিভূতি পরিধান করেন রক্তাধর-উমাদেহধারী (অর্ধারীশ্বর) আমার প্রভু নীলকণ্ঠ।

অর্জনে। আবার এই মন্ত্র কণ্ঠে লইয়াই তিনি মর-দেহ পরিত্যাগ করেন শিবের মন্দিরে সেই বিবাহ-রাত্রিতে—

বেদচতুষ্টয়ের প্রকৃত সার—আমার প্রভুর নাম 'নমঃ শিবায়'। তাহারাই প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, যাহারা প্রেমাশ্রু-বিগলিত নয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে উচ্চারণ করে 'নমঃ শিবায়'।[১]

৪৮. 'তেবারম্'-এর দ্বিতীয় কবি—অপ্পর্, যিনি বয়সে প্রবীণ এবং কীর্তিতে অগ্রণী হইয়াও সম্বন্ধর্-কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অপ্পর্-এর এই শ্রদ্ধার মূলে দুইটি কারণ থাকিতে পারে—(১) সম্বন্ধর্-এর অসামান্য প্রতিভা, (৩) অব্রাহ্মণ বেল্লাল-কুল-জাত অপ্পরের স্বাভাবিক দৈন্যবোধ। প্রথমোক্ত কারণটিই আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সম্বন্ধর্-ও যে অপ্পরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহা বোঝা যায় প্রবীণ কবিকে নবীন কবির পিতৃ-সম্বোধন হইতে। তাঁহার এই 'অপ্পা' (পিতা) সম্বোধনই কালক্রমে প্রবীণ কবির পূর্বনামকে[২] পিছনে ফেলিয়া 'অপ্পর্' নামটিকেই কালজয়ী করিয়া তুলিয়াছে।

এই দীর্ঘায়ু শৈবকবি কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন একজন প্রধান জৈনাচার্য। পিতৃমাতৃহীন অপ্পর্ যখন তাঁহার কুলধর্ম (শৈবধর্ম) পরিত্যাগ করিয়া যৌবনে জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন সব চেয়ে বেশি আঘাত পাইয়াছিলেন তাঁহার দিদি তিলকবতী। আবার যেদিন কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জৈনাচার্য ধর্মসেন (জৈনাশ্রমে ইহাই ছিল অপ্পরের নাম) সংসারে তাঁহার একমাত্র আশ্রয় দিদির কাছে চলিয়া আসেন, সেদিন এই একাকিনী কুমারীর আনন্দের সীমা ছিল না। জৈনগণ ধর্মসেনের ধর্মপরিবর্তনে

---

১ কাদলাকিক্ কচিন্দু কণ্ণীর্ মল্‌কি…

২ কবির পূর্বনাম ছিল তিরুনাবুক্করসু অর্থাৎ রসনাধিপতি (=বাক্‌পতি)—ইহাও প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয় কবি-কীর্তির জন্যই হয়তো তাঁহাকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মার কাছে অভিযোগ করিলে ধর্মসেন কারারুদ্ধ হন। কিন্তু শিবের ঐকান্তিক অনুগ্রহে ধর্মসেন (অপ্পর্) কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া রাজা মহেন্দ্রবর্মাকে শৈবধর্মে দীক্ষিত করেন। তামিলনাডের চোল রাজবংশ বরাবরই শৈব ছিল। পাণ্ড্যরাজ ও পল্লবরাজ-বংশকে জৈনধর্ম হইতে শৈবধর্মে আনয়ন করেন যথাক্রমে সম্বন্ধর্ এবং অপ্পর্। এইভাবে সপ্তম শতাব্দী শেষ না হইতেই সমগ্র তামিলনাডে শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

৪৯. 'তেবারম্'-এ সংকলিত অপ্পর্-এর পদসংখ্যা সম্বন্ধর্-এর পদসংখ্যার তুলনায় কিছু কম[১] হইলেও ভক্তিরসে ও কাব্যরসে অপ্পর্‌কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা হয়। ভক্তকবি তাঁহার আরাধ্য দেবতার রূপ বর্ণনা করিতেছেন এইভাবে ঃ

ঐ দেখ, সবুজ-কানন-বেষ্টিত 'পূবণম্'-এর পবিত্র দেবতার বিভূতি-মণ্ডিত দেহ, ঐ যে তাঁহার উজ্জ্বল ত্রিশূল, ঐ যে তাঁহার প্রবৃদ্ধ জটায় শিশুচন্দ্র, ঐ যে গলায় তাঁহার 'কোণ্ড্রৈ' পুষ্পের সুগন্ধ মাল্যখানি, তাঁহার এক কানে 'কুলৈ' (পুরুষের কর্ণভূষণ), অন্য কানে 'তোডু' (রমণীর কর্ণভূষণ), ঐ যে তাঁহার হস্তিচর্মে ঢাকা দেহ, ঐ যে তাঁহার সমুজ্জ্বল কিরীট।[২]

সাধকের জীবনে সিদ্ধি খুব সহজলভ্য নয়। অনেক পিছল পথের উপর দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয়। স্খলন-পতন স্বাভাবিক। সংসারের বিষয়-বাসনা অহর্নিশি তাঁহাকে ভুলাইতে চাহে। বৃথাই তাঁহার দিনগুলি কাটিয়া যায় 'স্তুতমিতরমণীসমাজে'। আবার দৈবানুগ্রহ পাইয়াও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। অতীত জীবনের

---

১ 'তেবারম্'-এর মোট ৭৯৫০টি পদ বা স্তবকের মধ্যে সম্বন্ধর্, অপ্পর্ এবং সুন্দরর্—ইঁহাদের পদসংখ্যা যথাক্রমে ৩৮৪০, ৩১১০ এবং ১০০০।

২ বডিবেক্ক ত্রিশূলন্ তোণ্ড্রুম তোণ্ড ম ··

পঙ্কিল মুহূর্তের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণেই তাঁহার চিত্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, হৃদয় অভিভূত হয় দৈন্য-নির্বেদ-গ্লানিতে। অপ্পরের রচনায় ভক্ত-জীবনের এই করুণ মর্মকথা অতি চমৎকার-রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অনুতাপ-দগ্ধ কবি এই বলিয়া খেদ করিতেছেন ঃ

ন্যায়ত আমি বাঁচিতে পারি না। দিনের পর দিন আমি নিজেকে কলঙ্কিত করিয়াছি। শাস্ত্র অধ্যয়ন করি বটে, কিন্তু উহার তাৎপর্য কিছুই বুঝি না। তুমি আমার প্রভু, তোমাকেও হৃদয়ে স্থান দিই না···আমি প্রচণ্ড কামরোগ দূর করিতে পারি নাই ; বাসনার পাশ হইতে মুক্তি লাভ করি নাই। আমি এত দিন চর্মচক্ষু দিয়াই দেখিয়াছি, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াও খুলে নাই। অজ্ঞানজনিত যে পাপকর্ম সঞ্চিত হইয়াছে, এখনও তাহার ভোগ শেষ হয় নাই। হে প্রভু, আমি বড় ক্লান্ত।[১]

কবির মনে হইতেছে, তাঁহার মতো হতভাগ্য বুঝি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। জন্ম বংশ কর্ম—সবই তাঁহার পাপ-দুষ্ট ঃ

কুবংশে আমার জন্ম। কোনো সদ্‌গুণ আমার নাই। নাই কোনো সৎ অভিপ্রায়। কেবল পাপ-কর্মেই আমি বড়। আমি নিজে সৎ নই, সজ্জনের সংসর্গও পাই নাই। আমি পশু নই, অথচ আমার আচরণে আমি পশু ছাড়া অন্য কিছু নই। যাহা কিছু ঘৃণ্য, সেই সমস্ত বিষয়ে আমি অনেক কথা বলিতে পারি। আমি দরিদ্র নই, তথাপি আমি কেবল যাচ্ঞা করিতেই জানি, কাহাকেও কিছু দিতে জানি না। মূর্খ আমি, কেনই বা জন্ম লইলাম।[২]

অবশেষে একদিন হৃদয়-দেবতা প্রসন্নমুখে আসিয়া কবির সম্মুখে দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরেন এবং অমানিশার গভীর অন্ধকারেও কবি

২ নীতিয়াল্‌ বালমাট্রেন্‌ নিত্তলুম্‌ তুয়েন্‌ অল্লেন্‌···

২ কুলম্‌ পোল্লেন্‌ গুণম্‌ পোল্লেন্‌ কুরিয়ুম্‌ পোল্লেন্‌···

দেখিতে পান তাঁহার পরম সুন্দর মূর্তিখানি। অপ্পর্ সেই শুভ দিনের উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবে ঃ

আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, সচল জলরাশিকে যিনি তাঁহার জটাবন্ধনে অচল করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, যিনি চিন্তাবিহীন আমাকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন। আমি যাহা পড়ি নাই, সেই সমস্তই যিনি আমাকে পড়াইয়াছেন ; যাহা দেখি নাই, সেই সমস্ত যিনি দেখাইয়াছেন ; যাহা কেহ আমাকে বলে নাই, তাহা যিনি বলিয়াছেন ; আমার পিছনে পিছনে আসিয়া যিনি দয়া করিয়া আমাকে কুৎসিত ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া ভক্তে পরিণত করিয়াছেন, সেই 'পূন্তুরুণ্ডি'র পবিত্র দেবতাকে আমি দেখিয়াছি।[১]

প্রভুর চরণে আশ্রয় লওয়া যে কত মধুর, কবি একটি শ্লোকে পর পর কয়েকটি চিত্রকল্পের সাহায্যে সেইটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ঃ

মধুর-ধ্বনি বীণার ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, মৃদুবহ দক্ষিণ সমীরের ন্যায়, নবাগত বসন্তের ন্যায়, মৌমাছি-গুঞ্জিত জলাশয়ের ন্যায় মধুর আমার প্রভুর পদচ্ছায়া।[২]

প্রভুর কৃপাধন্য কবি নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করেন। ভক্তজনের স্বাভাবিক দৈন্যবোধের পরিবর্তে তিনি যেন অনেকটা সদম্ভেই ঘোষণা করেন ঃ

আমরা কাহারও অনুগত নই, যমরাজকেও ভয় করি না। আমরা রহিব সদাপ্রসন্ন, রোগ থাকিবে অনেক দূরে। কাহারও নিকট নতি-স্বীকার আমরা করিব না। দুঃখ আমাদের কিছু নাই, আমরা যে সদানন্দ।[৩]

১ নিল্লাদ নীর্ চডৈমেল্ নীর্পিত্তানৈ....

২ মাচিল্ বীণৈয়ুম্ মালৈ মদিয়মুম্....

৩ নাম্ আর্ক্কুম্ কুডিয়ল্লোম্ নমনৈ অঞ্জোম্

শৈব কবি যে শিবভক্ত মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইবেন—ইহা স্বাভাবিক, যদিও ইহার মধ্যে সম্প্রদায়গত মনোভাবটি একটু উগ্ররূপেই প্রকাশমান। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও যে ভক্তিহীন দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও সুবিদিত। অপ্পরের একটি পদে শিবভক্তি-পরায়ণতা সম্পর্কেও অনুরূপ ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাই। কবি বলিয়াছেন:

মহাদেবের প্রতি যাহাদের ঐকান্তিক ভক্তি নহে, তাহারা যদি আমাকে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির সহিত স্বর্গ ও মর্ত্যের শাসন-কর্তৃত্বও দিতে চাহে, আমি তাহাদের সেই দানকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিব। আর যাহাদের সমস্ত অঙ্গ কুষ্ঠরোগে গলিত, অথবা যাহারা 'পুলৈয়া' প্রভৃতি নীচজাতিভুক্ত কিংবা যাহারা গোমাংসভোজী, তাহারাও যদি গঙ্গাজট শিবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, তবে নমস্য দেবতা বলিয়া আমি অবশ্যই তাহাদের বন্দনা করিব।[1]

চিদম্বর প্রভৃতি শৈবতীর্থ-পরিক্রমা ভক্ত জীবনের একটি পরম আকাঙ্ক্ষা। শৈবকবিদের রচনাতে এই সমস্ত তীর্থ, মন্দির ও দেবতার মাহাত্ম্য অতিশ্রদ্ধা-ভরে বর্ণিত হইয়াছে। অপ্পরের কতিপয় পদে এমন একটি ভিন্ন সুরের আভাস পাওয়া যায়, যাহা দেশ-কালাতিশায়ী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পূজা-অর্চনা-তীর্থপর্যটন প্রভৃতি বাহ্য আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপরে কবি ভগবদুপলব্ধির মহিমাকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। (ভগবান্ বুঝাইতে কবি 'ঈশন্' কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন; অবশ্য ইহা শিব্'-এর প্রতিশব্দরূপেও ব্যবহৃত।) কবির বক্তব্য সংক্ষেপে এইরূপ:

ঈশ্বর (বা প্রভু) যে সর্বকালে ও সর্বদেশে অবস্থান করিতেছেন, আবার তিনি যে আমাদের অন্তরেও বিরাজমান, এ কথা যাহারা বুঝিতে না পারে, তাহাদের গঙ্গাস্নানেই বা কি প্রয়োজন, কাবেরী-স্নানেই বা কি প্রয়োজন? তাহাদের বেদাধ্যয়ন নিষ্ফল, শাস্ত্র-শ্রবণও

১ শঙ্খনিধি পদ্মনিধি ইরণ্ডুম্ তন্দু…

অর্থহীন। কেনই বা তাহারা উপবাস ও ব্রতানুষ্ঠান করে? পর্বতে উঠিয়া তপশ্চর্যাতেই বা তাহাদের কি প্রয়োজন?[১]

৫০. 'তেবারম্'-এর তৃতীয় এবং শেষ কবি সুন্দরমূর্তি 'নায়নার্', সংক্ষেপে, সুন্দরর্। পূর্বজন্মে ইনি কৈলাসেই অবস্থান করিতেন শিবের অনুচর-রূপে। একদিন উমার মাল্য-রচনার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছিল তাঁহার দুই কুমারী পরিচারিকা। উভয়ের রূপ-দর্শনে মুগ্ধ সুন্দরর্ নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন শিবের চরণপ্রান্তে। ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শিব তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন মর্ত্যভূমিতে। অবশ্য সেই সঙ্গে কুমারী পরিচারিকা-দুটিকে পাঠাইতে ভুলিলেন না। স্পষ্টই বোঝা যায়, ব্রাহ্মণ-সন্তান সুন্দরর্ দুইটি অব্রাহ্মণ কন্যাকে যে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার কতকটা পরিশোধক-রূপেই এই কৈলাস-কাহিনীর উদ্‌ভাবন। পিতা কর্তৃক স্ব-সম্প্রদায়ের একটি সুলক্ষণা ব্রাহ্মণকন্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের আসরে কোথা হইতে এক শৈব সন্ন্যাসী আসিয়া দাবি করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত সুন্দরের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না, কারণ তাঁহার (সুন্দরের) পিতামহ নিজেকে এবং অধস্তন পুরুষকে সেই সন্ন্যাসীর কাছে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ সুন্দরর্ সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পিত্তা (ওহে পাগল), ব্রাহ্মণ কখনও ব্রাহ্মণের কিঙ্কর হইতে পারে?'

৫১. এই সন্ন্যাসী আর কেহই নন, স্বয়ং শিব। ঘটনাক্রমে সুন্দরর্ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইলে শিব তাঁহাকে গান রচনার জন্য আদেশ দিলেন। যে 'পিত্তা' (পাগল) শব্দের দ্বারা কবি প্রভুকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, প্রভুর আদেশে সেই শব্দ দিয়াই তাঁহার প্রথম পদ রচিত হইল। পদটি এইরূপ:

১ গঙ্গৈ-য়াডিলেন্ কাবিরি-য়াডিলেন্...

হে পিত্তা (পাগল), হে চন্দ্রচূড় মহাপ্রভু, হে করুণাময়, আমি বিস্মরণ-রহিত হইয়া নিরন্তর তোমাকে চিন্তা করিতেছি। তুমিই তো তোমাকে আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে। হে পিতা, হে পেণ্ণৈ নদীর দক্ষিণ তীরস্থ বেণ্ণৈয়্‌নল্লুর গ্রামের অধিবাসী, একবার আমি তোমার আনুগত্য স্বীকার করিয়া এখন আর এ-কথা বলিতে পারি না যে, আমি তোমার সেবক নই।

কৈলাসে শিবের সেবা-পরায়ণ নিত্য-অনুচর কবি যে মর্ত্যলোকে জন্ম লইয়া এমনভাবে শিবকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অনুতাপের সীমা নাই। কবি বলিতেছেন:—

এতদিন আমি তোমার কথা না ভাবিয়া কুকুরের মতো চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছিলাম। অবশেষে হতাশ আমি তোমার দুর্লভ করুণার অধিকারী হইলাম। বেণুবনমনোহরা পেণ্ণৈ নদীর দক্ষিণ তীরে বেণ্ণৈয়্‌নল্লুর্ গ্রামে আমি তোমার সেবক হইয়াছিলাম। এখন আর এ-কথা বলিতে পারি না যে, আমি তোমার সেবক নই।

কবির দু-একটি পদে বেশ একটু রহস্য-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বয়ং প্রভু মহাদেবকেই লইয়াই এই রহস্য। মহাদেবের দুই পত্নী। সুন্দরর্‌ও দ্বিপত্নীক। এক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবানে বেশ একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কবির আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুলের দুশ্চিন্তায় তাঁহার ঘরকন্নার জীবন যে অশান্তিময় ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একবার অনশনক্লিষ্ট কবি কৃপাভিক্ষাপ্রসঙ্গে গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন: সুন্দরী রমণী ঘরে থাকার যে কী দায়, তাহা তো তুমিও জান প্রভু—'মাদর্ নল্লার্ বরুত্তমতু নীয়ুমরিদিয়ণ্ড্রে'।

আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে, অভাবগ্রস্ত দ্বিপত্নীক কবির পারিবারিক জীবন অনেক সময়ে তাঁহার সাধনার পথে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করিত। এইরূপ সঙ্কটের কালে কবির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর প্রার্থনা ছিল এইরূপ: সংসারের কোলাহলে আমি

তোমাকে ভুলিয়া গেলেও হে প্রভু, আমার জিহ্বা যেন অবিরত বলিতে পারে 'নমঃ শিবায়'—'নট্রবা উনৈ নান্ মরক্কিনুম্ চোল্লুনা নমচ্‌চিবায়বে।'

প্রায় আট সহস্র পদবিশিষ্ট 'তেবারম্'-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানেই শেষ হইল। তের শত বৎসর পূর্বে তামিলনাডের তিন ভক্তগায়কের কণ্ঠে সুর-সংযোগে যাহার সৃষ্টি, আজও তামিলীদের সভায়-সজ্ঘমে, মন্দিরে-কোয়িলে যাহা পরম সমাদরে গীত হইয়া থাকে, আমরা সেই সুমহৎ সঙ্গীত-ধারাকে সুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রসহীন গদ্যে কিছুটা পরিবেশনের চেষ্টা করিলাম। বঙ্গদেশের কীর্তনের ন্যায় 'তেবারম্' কাব্য ও সঙ্গীতের এক সুন্দর সমন্বয়। বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি সুর-হারা কীর্তনের ন্যায় শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। কোনও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর জানা না থাকিলেও বাঙালী পাঠক যেমন মনের ভিতর হইতে একটা কল্পিত সুর সংযোগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া লয়, 'তেবারম্' সম্পর্কে তামিলভাষীও তাহাই করিয়া থাকে।

(চার) তামিল শৈবকবি মাণিক্কবাচকর্

৫২. তামিল শৈব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম কেহ জানিতে চাহিলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, সেই দুইটি নাম যথাক্রমে তিরুবাচকম্ ও মাণিক্কবাচকর্। পাণ্ড্যনাডুর রাজধানী মাদুরার নিকটবর্তী 'তিরুবাতবূর' নামক স্থানে দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত এই শৈবকবি কিছুকাল পাণ্ড্যরাজের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন হইতেই তাঁহার কবিজীবনের সূত্রপাত। সাধক-কবির রচনা-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া গুরু তাঁহার নামকরণ করেণ—মাণিক্কবাচকর্ (অর্থাৎ মাণিক্যের ন্যায় বচন যাঁহার)।

মাণিক্কবাচকর্‌-প্রণীত দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে 'তিরুবাচকম্' সমধিক প্রসিদ্ধ। শৈব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি অপ্পর্ এবং সম্বন্ধর্‌-এর পদসংখ্যার তুলনায় 'তিরুবাচকম্' নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও[১] ভক্তিরসে ও কাব্যরসে ইহা তামিল-সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয়। অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে কামনার নাগপাশে আবদ্ধ মূঢ় মানবাত্মার আলোকতীর্থে যাত্রা—ইহাই আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়-বস্তু। প্রেমময় ভগবানকে না পাওয়ার নৈরাশ্যময় বেদনা হইতে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হওয়ার সুগভীর আনন্দ পর্যন্ত ভক্তজীবনের সকল অবস্থা ও অনুভূতির কথাই বলা হইয়াছে এই কাব্যে। প্রকৃত ভক্ত যে এই গ্রন্থ-পাঠে কিংবা ইহার সঙ্গীত-শ্রবণে "অশ্রুসরস মহানন্দে" নিমগ্ন হইবেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তামিল ভাষায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে একটি সুপ্রচলিত উক্তি এই যে, তিরুবাচকম্ পাঠ করিয়া যাহার হৃদয় বিগলিত হয় না, অন্য কোনো কথায় সেই হৃদয় বিগলিত হইবার নয়।[২]

কেহ কেহ মনে করেন, সাধক-কবি মাণিক্কবাচকর্ তাঁহার ভক্তি-জীবনে যে নানা অবস্থান্তর অতিক্রম করিয়াছেন, সেই সকল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সরস অভিব্যক্তিই "তিরুবাচকম্"। কতগুলি কিংবদন্তী ছাড়া কবিজীবনের এমন কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ আমাদের জানা নাই যাহার সাহায্যে আমরা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের উত্থান-পতনের সহিত কাব্যকে মিলাইয়া লইতে পারি। গুটিকয়েক পদের মধ্য দিয়া কবির ভক্ত হৃদয়ের পরিচয় লইয়াই আমরা তৃপ্ত থাকিব।

৫৩. গ্রন্থের পঞ্চম অংশের নাম 'তিরুচ্ চতকম্' বা

১ অপ্পর্ রচিত পদের সংখ্যা ৩১১০ এবং সম্বন্ধর্ রচিত পদের সংখ্যা ৩৮৪০। ৫১টি অংশে বিভক্ত 'তিরুবাচকম্' গ্রন্থের মোট পদসংখ্যা
।

২ তিরুবাচকত্তুক্কুরুকাদান্ ওরুবাচকত্তুক্কুম্-উরুকান্।

'তিরুশতকম্'। একশত স্তবক লইয়া গঠিত এই 'শ্রীশতক' অধ্যায়ে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদ সংকলিত হইয়াছে। প্রভুর প্রসাদ-লিপ্সু ভক্ত-চিত্তের আকুলতা এবং পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি ঔদাসীন্য বর্ণিত হইয়াছে এইরূপে: আমি মনুষ্য বা মনুষ্যেতর কোনো জন্মকেই ভয় করি না, মৃত্যুর কাছেই বা আমার ঋণ কিসের? হাতে স্বর্গ পাইলেও আমি তাহা চাই না; মর্ত্যের শাসন-ক্ষমতা আমার কাছে অতি তুচ্ছ, উহাকে কোনোই মূল্য দিই না। হে মধুক্ষর কোণ্ড্রে-পুষ্প-ভূষিত শিব, হে প্রভু, হে আমার একমাত্র প্রভু, আমি আর্তকণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছি—তোমার প্রসাদলাভের দিন কবে আসিবে।[১]

কিন্তু প্রভুর কৃপালাভের যোগ্যতা কি তাহার আছে? উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর অপেক্ষা সে বড় কিসে? কত ভক্ত প্রভুর চরণতলে কত অর্ঘ্য বহিয়া আনিতেছে, আর সে শুধু আরামে আলস্যে দিন কাটাইয়া একই সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে চাহে? ইহা সম্ভব নয় জানিয়াও কবি কিন্তু তাহার আবেদন জানাইতে কুণ্ঠিত হয় না—

"আমি তোমার দাস, কুকুর-সদৃশ আমি, তোমার চরণপুষ্প ছু'খানি দেখিবার জন্য কতই না ব্যাকুল হইয়া আছি। কিন্তু উপযুক্ত পুষ্পে আমি তোমাকে সাজাইতেছি কৈ? তোমার নাম ডাকিতে ডাকিতে জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যাইবে—এমন ডাকা ডাকিতেছি কৈ। আমি তো কেবল বসিয়া আছি। হে প্রভু, তুমি জ্যা-যোজিত স্বর্ণধনু অবনত করিয়াছ, তোমার অমৃত কৃপা না দিলে আমি যে কাতর হইয়া পড়ি; আমি যে বড় একা, আমার আর কী পথ আছে?[২]

১ য়ানেহুম্ পিরপ্পঞ্জেন্, ইরপ্পদনুক্কু এন্ কডবেন—৫।১২

২ বরুন্দুবন্ নিন্ মলর্প্ পাদম্ অবৈ কাণ্বান্—৫।১৩

শিবের প্রতি, তাঁহার দিব্য করুণার প্রতি কবির এই যে ঐকান্তিক আকর্ষণ, তাহাও কিন্তু শিথিল হইয়া যায় সংসারের বিষয়-বাসনার টানে। তাই সকলেই যখন শিবতীর্থের যাত্রী, তখনও মূঢ় কবি সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সেই যাত্রীদলে যোগ দিতে পারে নাই। এই মর্মের একটি পদ এইরূপ—"আর সকলে তাহাদের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞ আমি আমার শিবের কাছে, শিবলোকের অধিপতির কাছে আজও পৌঁছিতে পারি নাই। যে শিব মধুময়, যিনি গব্যঘৃতের সমান, যিনি ইক্ষুর মধুর রসতুল্য, হরিণাক্ষী পার্বতীর অঙ্গধারী যিনি, আমি সেই শিবের কাছে আজও পৌঁছিতে পারি নাই। দীর্ঘকাল আমি বৃথাই এই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করিয়া আছি এবং এইরূপেই আমার জীবন বহিয়া চলিবে।[১]

আশ্চর্য, যাঁহার জন্য একদিন সমস্ত প্রাণমন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আজ আর তাঁহার অদর্শনেও কবিচিত্তে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নাই: "আমার প্রভু, আমার শাশ্বত অনুপম প্রভু, যিনি আমার মতো হীন কুকুরকেও তাঁহার উজ্জ্বল পুষ্পচরণ দান করিয়াছিলেন, যিনি আমার উত্তম পথপ্রদর্শক, যিনি আমাকে মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও মধুরতর প্রসাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি আর দেখিতে পাই না। তথাপি আমি আগুনে ঝাঁপ দিতেছি না, দুর্গম পর্বতে ভ্রমণ করিতেছি না এবং সমুদ্রেও আত্মবিসর্জন করিতেছি না"।[২]

ভক্তজনের কাছে ঐহিক জীবনের আর যে কোনো প্রলোভন থাকিতে পারে একথা কবি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ভক্তি-জনিত আকুলতায় সেদিন মনে করিয়াছিলেন কামিনীকাঞ্চন তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ বস্তু। অথচ আজ শিবকে ভুলিয়া কবি তাহাতেই

১ এনৈ য়াবরুম্ এয়তিডল্ উট্‌ট্রুম্, মট্রিয়দু এণ্ডু রিয়াদ তেনৈ—৫।৩৮

২ ওয়্ বিলাদন, উবমনিল্ ইরন্দন, ওণ্ মলয়্‌ত্ তাল্ তন্দু—৫।৩৯

আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। কবির কথায় শোনা যাক—
"বসন্তকালে যখন মন্মথের শর বিদ্ধ করে, তখন মতিভ্রংশ না হইয়া পারে না—এ কথায় আমি কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু আজ দণ্ড-মথিত দধির ন্যায় আমি হরিণাক্ষী রমণীদের ছলনায় মথিত হইতেছি। আমার শিবতীর্থে মধুর ন্যায় প্রভুর কৃপা বিতরিত হইতেছে; অথচ সেখানে না গিয়া এই দেহস্থিত প্রাণরক্ষার জন্য আমি আহার্য গ্রহণ করি, আজও আমি বস্ত্র পরিধান করি"।[১]

কিন্তু ভক্তকবির এই অবস্থা চিরকালের জন্য নয়। প্রভুর প্রসাদে তাঁহার পরিবর্তিত মতি আবার প্রভুর উদ্দেশেই ধাবিত হইল। তাহার পরে রহস্যময় মিলন। সেই মিলনের আনন্দ-বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—"তুমি আমার দিকে তাকাইয়া আমাকে আপন করিয়া লইলে। সেই মিলনের ক্ষণে তোমার আমার মাঝখানে আর কী রহিল? হে সুন্দর-নয়ন, আমার ভালবাসা তোমার চরণে চিরকালের জন্য যুক্ত হউক, ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ আনন্দ। এই আনন্দই আমি চাই, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের স্বর্গভোগের আনন্দ আমি চাই না। হে প্রভু, তোমার চরণযুগল ব্যতীত আমার অন্য কোনো কামনা নাই। এই দেখ, আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, সমস্ত দেহ কাঁপিতেছে। আমার হস্ত অঞ্জলি-বদ্ধ, নদীর ধারার ন্যায় আমার নয়ন-ধারা বহিতেছে।"[২]

আলোচ্য 'তিরুচ্ চতকম্'-এর শেষ কয়েকটি পদে প্রভুর আনন্দগানে কবিচিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। নটরাজের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া তাঁহার গৌরব-গীতের সুরে সুরে পাপমুক্ত কবি নাচিতে থাকিবেন ইহাই তাঁহার অন্তিম প্রার্থনা—

"হে রাজা, হে আমাদের প্রভু, তুমি এস এস। তোমার সম্মুখে

১ বেনিল্ বেল্কণৈ কিলিত্তিড মতি কেডুম্, অদ্ তনৈ নিনৈয়াদে —৫।৪০

২ পুণর্ম্পদোক্ক এনৃদৈ এন্নৈ আণ্ডু পূণ নোক্কিনায়্—৫।৭১-৭২

দাঁড়াইয়া ঐ ব্রহ্মা-বিষ্ণু সহ অন্যান্য দেবতারা; হে রাজা, হে আমাদের প্রভু, তুমি এস এস। বিশ্বের সব কিছুই যখন শেষ হইয়া যায়, তখনও তুমি বিরাজ কর; হে আমাদের প্রভু, তুমি এস এস। তোমার সুন্দর চরণে আমি রসনার প্রেমার্ঘ্য (গান) নিবেদন করিব; হে প্রভু, তুমি এস এস। হে পাপনাশক, আমি যেন চিরকালই তোমার গৌরব-গান গাহিতে পারি। আমি কেবল তোমারই গান গাহিতে চাই, হে প্রভু, জয় জয়! তোমার গান গাহিতে গাহিতে আমার হৃদয় গলিয়া গলিয়া পড়ুক; তোমার সভায় আমি নাচিতে চাই, হে প্রভু জয় জয়! আমি নাচিতে চাই তোমার নৃত্যপর চরণতলে। তোমার নাচে আমি যোগ দিতে চাই, হে প্রভু জয় জয়! আমাকে তুমি এই কৃমিদেহ হইতে সরাইয়া লও, হে প্রভু জয় জয়! সমস্ত মিথ্যা হইতে আমি মুক্তি চাই, হে প্রভু জয় জয়! হে সত্যের সত্য, তোমার লোকে (শিবলোকে) আমায় স্থান দাও, হে প্রভু জয় জয়"।[১]

'তিরুবাচকম্' গ্রন্থের সপ্তম ও বিংশ অধ্যায় দুইটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। এই দুইটি অংশ যথাক্রমে 'তিরুবেম্পাবৈ' এবং 'তিরুপ্ পল্লিয়েড়ুচ্চি' নামে অভিহিত। মূল গ্রন্থে অংশ দুইটি পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া থাকিলেও ইহাদের মধ্যে ভাবের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। এবং সেই কারণেই বোধকরি ২০টি পদবিশিষ্ট 'তিরুবেম্পাবৈ' এবং দশটি পদবিশিষ্ট 'তিরুপ্ পল্লিয়েড়ুচ্চি'র সংকলিত রূপ ক্ষুদ্র পুস্তকাকারেও প্রচলিত আছে।

'তিরুবেম্পাবৈ' কথাটির প্রকৃত অর্থ পবিত্র প্রতিমা বা ব্রত, কিন্তু ইহার বিষয়বস্তু হইতে ইহাকে বলা যায় 'কুমারীদের প্রভাত সঙ্গীত'। মার্গলি[২] মাসের অতি প্রত্যূষে ঘুম হইতে

১ মন্ন! এম্পিরান্! বরুক এন্নৈনে—৫।৯৯-১০০

২ 'মার্গলি' অর্থাৎ মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ। তামিলনাডের মার্গলি মাস আমাদের পৌষ মাসের সমকালীন।

উঠিয়া তামিলনাডের পল্লীবালিকারা গান গাহিতে গাহিতে সকল সহচরীকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের আরাধ্যদেবতার মন্দিরে উপস্থিত হইত। তাহার পরে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের গান। এই গানই হইল 'তিরুপ্ পল্লিয়েলুচ্চি' যাহার আক্ষরিক অর্থ 'শয্যা হইতে প্রভুর জাগরণ'। প্রভুর ঘুম ভাঙাইয়া ভক্ত মেয়েরা তাহাদের ব্রত ও প্রার্থনার কথা জ্ঞাপন করে (দ্র° ৬৭)।

আমরা গুটিকয়েক পদের সাহায্যে কবির বর্ণনীয় বিষয়ের আভাস পাইতে চেষ্টা করিব। বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া মেয়েরা ডাকিতেছে, সখীদের কেহ জাগিয়াছে, কেহ বা তখনও নিদ্রামগ্ন। সকলকে ঘুম হইতে জাগাইবে বলিয়া পূর্বদিন যে মেয়েটি সখী-সমাজে আড়ম্বর করিয়াছিল, এখনও সে ঘুমে অচেতন। তাহার দুয়ারে আসিয়া সখীরা গাহিতেছে—ওগো হরিণী, কাল তুমি বলিয়াছিলে, 'আমিই প্রভাতে সকলকে জাগাইব'। তোমার সেই সকল কথা, ওগো লজ্জাহীনা, আজ কোন্‌দিকে গিয়াছে, বল। এখনও কি প্রভাত হয় নাই ? যিনি আকাশ, যিনি পৃথিবী, সমস্ত কিছু যিনি, যাঁহাকে জানিয়াও জানা যায় না, তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদের সকলকে নিজগুণে (দয়ায়) আপন করিয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহার চরণ-বন্দনার গান গাহিতে গাহিতে তোমার দুয়ারে আসিয়াছি ; কিন্তু এখনও তুমি মুখ খোল নাই। আমাদের গানে তোমার হৃদয় বিগলিত হয় না ; ইহা ঠিক তোমারই উপযুক্ত আচরণ (বা তোমার পক্ষেই সম্ভব)। আমাদের জন্য, সকলের জন্য তোমার প্রভুর গান গাও"।[১]

ইহার পরে আর কোনো লজ্জাহীনার পক্ষেও শয্যায় পড়িয়া থাকা সম্ভব নয়। ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে আসিয়া দলে যোগদান করিতে হয়, সখীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইতে হয়। কিন্তু

১ মানে ! নী নেন্নলৈ "নালৈ বন্দুউঙ্গলৈ—৭।৬

সুখের কথা, তাহার মতো ঘুম-কাতুরে মেয়ে এ পল্লীতে আরও আছে। তাহাদের বাড়ির সদরে আসিয়া সমবেতকণ্ঠে সখীরা গাহিতে লাগিল—"মোরগ ডাকিতেছে, চারিদিকে ছোট ছোট পাখিরা শব্দ করিতেছে। ঐ নাদস্বর (বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে শোনা যাইতেছে শুভ্রশঙ্খের ধ্বনি। সেই অদ্বিতীয় পরম জ্যোতির অতুলনীয় করুণার কীর্তিগাথা আমরা গাহিতেছি, তাহা কি তুমি শুনিতে পাও নাই? ধন্য তুমি, ধন্য তোমার নিদ্রা। এখনও তুমি শব্দটি করিতেছ না। ইহাই কি সেই করুণাসাগরের প্রেমের প্রতিদান? প্রলয়কালে যিনি একা বিরাজ করেন, সেই অর্ধনারীশ্বরের গান করি এস"।[১]

এইরূপে একে একে সকলকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহারা আসিল শিবমন্দিরের সম্মুখে। এইবারে পবিত্র শয্যা হইতে প্রভুর জাগরণ। যিনি তাহাদের জীবনের সকল আনন্দের উৎস, সেই দেবতার জয়ধ্বনি করিয়া তাহারা আসিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। কণ্ঠে তাহাদের বিরাম নাই, গানের পর গান লাগিয়াই আছে। প্রভুকে সম্বোধন করিয়া তাহারা গাহিতেছে—

"ঐ দেখ, পূর্বদিকে অরুণোদয় ঘটিয়াছে; অন্ধকার অপসারিত হইয়াছে। ঐ যে সূর্য উদিত হইতেছে উহা তো তোমারই মুখের করুণা। ঐ যে সুগন্ধি পুষ্প বিকশিত হইয়াছে উহা তো তোমারই নয়নের জ্যোতিঃ। তোমার সুন্দর বাসস্থান ঘিরিয়া দলে দলে মৌমাছি আসিয়া গান করিতেছে। হে পেরুন্-তুরৈ (স্থানের নাম) মন্দিরের মহাপ্রভু শিব, হে কৃপানিধি, হে আনন্দগিরি, হে তরঙ্গিত মহাসিন্ধু, তুমি শয্যা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত কর"।[২] পরবর্তী গানখানি এইরূপ—"মোরগ ডাকিয়া উঠিয়াছে, ডাকিয়া উঠিয়াছে সুন্দর কোকিলেরা। ছোট ছোট পাখি

১ কোলি চিলম্বচ., চিলম্বুম্ কুরুকেঙ্গুম্—৭।৮

২ অরুণন্ ইন্দ্রন্‌দিশৈ অণুকিনন্: ইরুল্ পোয়্—২০।২

গাহিয়া উঠিয়াছে, শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। বিদায় লইয়াছে তারার দল, দেখা দিয়াছে উদয়াচলে ঐ দিনের আলো; হে দেব, তুমি ভালোবাসিয়া তোমার নূপুর-শোভিত চরণ দুখানি আমাদিগকে দেখাও। হে পেরুন্‌তুরৈ-বাসী মহাপ্রভু, অন্য সকলের কাছে তুমি দুর্জ্ঞেয়. কিন্তু আমাদের ন্যায় ভক্তদের কাছে তুমি অতি সহজ; হে প্রভু, তুমি শয্যা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত কর।[১]

একটি পদে কুমারী মেয়েদের মুখ দিয়া ভক্তচিত্তের আকাঙ্ক্ষাটি বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

আমরা তোমারই হাতের সন্তান, আমরা তোমার শরণ লইলাম—এই বহু পুরাতন কথাটি আমরা আবার নতুন করিয়া বলিতেছি। আমাদের এই দুর্দিনে তোমার কাছে একটি আবেদন জানাইব, হে প্রভু তুমি শোন। যাহারা তোমার ভক্ত নয়, তাহাদের বাহু যেন আমাদের স্তনস্পর্শ না করে। তোমার সেবা ব্যতীত আমাদের হাত যেন অন্য কোনো কাজ না করে। দিবানিশি আমাদের নয়ন যেন তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু না দেখে। তুমি যদি আমাদের এই বর দাও, তবে, সূর্যোদয় কোন্ দিকে (পূর্বে না পশ্চিমে) হইতেছে, তাহাতে আমাদের কী?[২]

১ কুবিন পূম্‌কুয়িল্‌; কুবিন কোলি—২০।৩

জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত 'প্রভুর জাগরণ' অংশটিতে কিছুটা ছেলেমানুষি অর্থাৎ childishnessএর সন্ধান পাইয়া কৌতুকবোধ করিয়াছেন। ভাবখানা এই যিনি স্বয়ং নিখিল বিশ্বের নিদ্রাপহারক, যিনি চিরজাগ্রত তাঁহার আবার নিদ্রাই বা কী, জাগরণই বা কী? তৎসত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতকে যাহা মুগ্ধ করিয়াছে তাহা হইল—the fresh morning feeling, and the sights and sounds of the sudden break of the Indian dawn.

—Hymns of Tamil Saivite Saints p 111

২ "উড্‌কৈয়িল্‌ পিল্লে উনক্কে অডৈক্কলম্‌" এণ্ড্রু—৭।১৯

কবি 'তিরুবাচকম্' কাব্যের বহু স্থলেই কোকিলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অষ্টাদশ অধ্যায়ের পদ-দশক বিশেষভাবে কোকিল-বিষয়ক বলিয়া উক্ত অধ্যায়টি 'কুয়িরপত্তু' অর্থাৎ 'কোকিল-পদিক' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই অংশে বিরহিণী প্রভুর কাছে কোকিলকে পাঠাইতেছে দূতরূপে, কিন্তু ইহার আসল উদ্দেশ্য প্রভুর গুণকীর্তন। বিরহের বেদনা ইহাতে কিছুমাত্র নাই, কেবল একটি কথা আছে—'প্রভুকে আসিতে বলিও'। বাকি সমস্তটাই তাঁহার মহিমাবর্ণন—"হে মধুকণ্ঠ কোকিল, তুমি যদি আমাদের প্রভুর পাদযুগলের কথা জানিতে চাও, তাহা আছে সপ্তপাতালের অভ্যন্তরে (অর্থাৎ তাহা তুমি দেখিতে পাইবে না)। যদি আমি তাঁহার মণিখচিত জ্যোতির্ময় কিরীটের কথা বলিতে চাই, তবে তাহা অনির্বচনীয় হইয়া উঠিবে। তাঁহার আদি নাই, কোন গুণ নাই, অন্ত-ও নাই। তুমি তাঁহাকে একবার আসিতে বলিও"।[১]

কিন্তু কোনো কোনো পদে প্রভুর অনির্বচনীয় মহিমার পরিবর্তে তাঁহার অপার ভালোবাসার কথাই বলা হইয়াছে। স্বর্গবাসী দেবতা কি আমাদের ভালোবাসিয়াই মর্ত্যে আসেন নাই? তাঁহার সেই অপার প্রেম-করুণার কথা আছে নিম্নলিখিত পদে—"হে মধুর ফলবনবিহারী কোকিল তুমি শোন, সেই যে প্রভু—যিনি স্বর্গ ছাড়িয়া এই মর্ত্যে পদার্পণ করিয়াছেন, মানুষকে তাঁহার নিজের করিয়া লইয়াছেন, দেহকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে অনুভবময় করিয়া তুলিয়াছেন, সেই হরিণাক্ষী উমার পতিকে একবার আসিতে বলিও"।[২]

অবশেষে উমাপতির চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া ভক্তহৃদয়ে যে আনন্দের জোয়ার বহিল, মাণিক্কবাচকর্ তাহার বর্ণনায় ক্লান্তি বোধ

গীতম্ ইনিয় কুয়িলে! কেট্টিএল্ এঙ্গল্ পেরুমান্—১৮।১
তেন্ ফলচ্ চোলৈ পয়িলুম্ চিরু কুয়িলে, · ইদু কেনী—১৮।৪

করেন নাই—"আমি খ্যাতি চাই না, অর্থ চাই না, স্বর্গ-মর্ত্য, কিছুই কামনা করি না। আমি জন্ম চাই না, মৃত্যু চাই না, শিবকে যাহারা কামনা করে না আমি তাহাদের স্পর্শ করি না। আমি যে 'পেরুন্-তুরৈ' (এখানেই কবি শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হন) নগরের প্রভুর চরণ-লাভে ধন্য হইয়াছি। আমি আর বাহিরে যাইব না, কোথাও যাওয়ার আমার প্রয়োজন নাই।[১] আমি বন্ধু চাই না, স্বজন চাই না, ঘর-বাড়ি, প্রতিষ্ঠা কিছুই চাই না। জ্ঞান আমার যথেষ্ট হইয়াছে, আমি আর কোনো জ্ঞানীর সঙ্গ চাই না। হে কুট্রালম্-এর নটরাজ (তাঞ্জোর জেলায় কুট্রালম্ অবস্থিত, ইংরেজী কায়দায় ইহার প্রচলিত নাম কোর্টালম্) আমি চাই কেবল তোরার ঝংকৃত চরণ দু'খানি। ধেনু যেমন বৎসকে কামনা করে, তেমনি তোমার চরণ চাহিয়া মহানন্দে আমার অন্তর গলিয়া গলিয়া পড়ুক"।[২]

(পাঁচ) তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য

৫৪. তামিল শৈব সাহিত্যের ন্যায় তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যেরও সূচনা হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। শৈব ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে একটি পার্থক্য এই দেখা যায় যে, শৈব-কবিদের রচনায়, বিশেষত সম্বন্ধর্, অপ্পর্ প্রভৃতি প্রথম যুগের কবিদের রচনায় অন্য ধর্মের প্রতি, বিশেষত বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের প্রতি যে বিরোধমূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহা নাই বলিলেই চলে। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমত বৈষ্ণব ধর্মের অনীহা এবং বৈষ্ণবভক্তদের নিঃস্পৃহ ঔদাসীন্য। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটিও উপেক্ষণীয় নয়।

১ বেণ্ডেন্ পুকল্, বেণ্ডেন্ চেল্‌বম্, বেণ্ডেন্ মন্নুম্ বিন্নুম্

২ উট্রারৈ য়ান বেণ্ডেন্ উম্ বেণ্ডেন্, পেস্ বেণ্ডেন্—৩৯।৩

তামিলনাড়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে হীনপ্রভ করিয়া ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠাসাধনে ভক্তমণ্ডলীকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। জৈনধর্মাবলম্বীরা রাজশক্তির সহায়তা লইয়া শৈবদের উপর কম নির্যাতন করে নাই। আবার শৈব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মোট কথা, এই ধর্মযুদ্ধে একপক্ষে জৈন ও অপর পক্ষে শৈব সম্প্রদায় যেরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের সম্পর্কে সেরূপ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শৈব-কবি সম্বন্ধর্ কেবল ভক্তি-সঙ্গীতই রচনা করেন নাই, অনেক সময়ে ধর্মযুদ্ধে তাঁহাকে ক্ষত্রজনোচিত নেতৃত্বও করিতে হইয়াছিল (দ্র° ৪৬)। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সংঘর্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ছিল বলিয়াই মনে হয়। অথবা এমনও হইতে পারে—চরম ধর্ম-সংঘর্ষের যুগে অর্থাৎ ভক্তি-আন্দোলনের একেবারে প্রথম দিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বস্তুত তামিলনাড়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় চিরদিনই সংখ্যায় ও শক্তিতে শৈব সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্‌বর্তী রহিয়াছে। রাজশক্তি ও জনশক্তি শৈবধর্মের যতটা অনুকূল ছিল, বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষে ততটা আনুকূল্য লাভ কোনোদিনই সম্ভব হয় নাই। চোল, পাণ্ড্য ও পল্লব—তামিলনাড়ের এই তিনটি অঞ্চলের রাজশক্তিই শৈবধর্মের বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করে। পল্লবনাড়ুর কাঞ্চীপুরম্ এবং চোলনাড়ুর শ্রীরঙ্গম্ বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইলেও চোলসম্রাটের কোপভাজন হইয়াই যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য রামানুজকে শ্রীরঙ্গম্ ত্যাগ করিয়া কর্ণাটকে চলিয়া আসিতে হয় ইহা সুবিদিত। মোট কথা, জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে বৈষ্ণবধর্ম অপেক্ষা শৈবধর্মই অধিকতর শক্তিশালী এবং আয়তনে ও বৈচিত্র্যে বৈষ্ণব সাহিত্য অপেক্ষা শৈব সাহিত্যই অগ্রগামী। এই

সকল কারণেই তামিলনাড তথা দক্ষিণ ভারতকে শৈবধর্মের দেশ বলিয়া অভিহিত করা হয় (দ্র° ৩৪)।

৫৫. বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম হইলেও এবং আয়তনে বৈষ্ণব সাহিত্য শৈব সাহিত্যের সহিত তুলনীয় না হইলেও, তাহার ভক্তিরসের গৌরব এবং কাব্যরসের উৎকর্ষ কিছুমাত্র কম বলিয়া বোধ হয় না। তামিল বৈষ্ণব কবিদের সমস্ত রচনা বর্তমান যুগ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেও সমস্ত কবিকে বা তাঁহাদের সমস্ত রচনাকে স্থায়ীরূপে ধরিয়া রাখিবার আগ্রহও হয়তো ছিল না। দশম শতাব্দীতে বৈষ্ণবাচার্য নাথমুনি বা রঙ্গনাথ মুনি কর্তৃক বৈষ্ণব পদাবলীর একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ইহাই তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে "নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্" নামে সুপরিচিত।[১] তামিল সাহিত্য রসিকদের পরম আদরের সামগ্রী এই "নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্" গ্রন্থে চারি সহস্র[২] পদ বা স্তবক সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে যে বারো জন বৈষ্ণব কবির পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা দ্বাদশ আড়্‌বার্ বা আলোয়ার[৩] নামে প্রসিদ্ধ। এই বারোজন আলোয়ার কবি এবং "নালায়ির দিব্য প্রবন্ধম্" ব্যতীত এই যুগের তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্য কোনো কবি এবং কবিতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণবকবিদের কালানুক্রমিক বিবরণে কিছুটা মতভেদ থাকিলেও আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে পারি।

১ নাল্‌ (চারি) আয়্যির (সহস্র) দিব্য প্রবন্ধম্ (দিব্য গীতের সংগ্রহ)।

২ দিব্যবন্ধম-এর কোনো কোনো সংস্করণে পদ-সংখ্যা ৩৭৭৬।

৩ আড়্‌ বা আল্ (নিমগ্ন)+আর্ (সম্ভ্রম সূচক বা বহুবচনাত্মক প্রত্যয়)=আড়্‌বার্ বা আল্‌বার (আলোয়ার) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম সাগরে নিমগ্ন যাঁহারা।

কবি	সংকলিত পদসংখ্যা
১. পোয়্‌কৈ আলোয়ার	১০০
২. ভূদত্তালোয়ার	১০০
৩. পেয়ালোয়ার্	১০০
৪. তিরুমলিসৈ আলোয়ার	২১৬
৫. নম্মালোয়ার	১২৯৬
৬. মধুর কবি আলোয়ার	১১
৭. কুলশেখর আলোয়ার	১০৫
৮. পেরিয়ালোয়ার	৪৭৩
৯. আণ্ডাল আলোয়ার	১৭৩
১০. তোণ্ডর্-অডিপ্-পোডি আলোয়ার	৫৫
১১. তিরুপ্পান্ আলোয়ার	১০
১২. তিরুমঙ্গৈ আলোয়ার	১৩৬১
মোট	৪০০০

৫৬. উল্লিখিত কবিদের মধ্যে পোয়্‌কৈ আলোয়ার, ভূদত্তা-লোয়ার এবং পেয়ালোয়ার এই তিনজন সমসাময়িক কবিদের প্রত্যেকেরই একশতটি করিয়া স্তবক সংকলিত হইয়াছে, যাহা "তিরুবন্দাদি" (অর্থাৎ শ্রীঅন্তাদি)[১] নামে পরিচিত। পোয়্‌কৈ আলোয়ারের রচনার নাম "মুদল্ (অর্থাৎ প্রথম) তিরুবন্দাদি।" ইহার প্রথম পদে কবি বিষ্ণুর পদ-বন্দনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"পৃথিবীকে দীপাধাররূপে, মহাসমুদ্রকে তৈলরূপে এবং প্রখর সূর্যকে দীপশিখারূপে (ব্যবহার করিয়া) আমি সেই রক্তোজ্জ্বল চক্রধারীর পাদ-বন্দনা করিতেছি শব্দের মালা দিয়া।"[২] অন্যত্র

১ প্রথম স্তবকের অন্তে প্রযুক্ত শব্দ বা শব্দাংশকে পরবর্তী স্তবকের আদিতে ব্যবহার করিয়া যে পদগুচ্ছ রচিত হয় তাহারই নাম তিরুবন্দাদি (অন্ত+আদি)।

২ বৈয়ম্ তকলিয়া, বার্কডলে নেয়্‌য়াক....

কবি আরাধ্য দেবতার প্রতি তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়াবেগের কথা বলিতে গিয়া প্রকৃতি-জগৎ হইতে তিনটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন—নদী যেমন ধাবিত হয় উত্তাল সমুদ্রের অভিমুখে, নবীন পুষ্প যেমন চাহিয়া থাকে উদীয়মান সূর্যের দিকে, জীবন যেমন চলিতে থাকে মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া, আমার হৃদয়ও তেমনি কামনা করে একমাত্র পদ্মবাসিনীর পতিকে।[১]

প্রথম কবি পোয়্কৈ আলোয়ারের ন্যায় দ্বিতীয় কবি ভূদত্তা-লোয়ারের প্রথম পদেও আমরা প্রায় অনুরূপ বিষ্ণু-বন্দনা দেখিতে পাই। পার্থক্য এইটুকু যে, কবি এখানে পৃথিবীর পরিবর্তে দীপাধার করিয়াছেন তাঁহার প্রেমকে, মহাসমুদ্রের পরিবর্তে পরম ভক্তিই তাঁহার ঘৃত (বা তৈল), আনন্দ-বিগলিত চিন্তা (বা মন) তাঁহার প্রদীপের সলিতা। এইরূপ আয়োজন করিয়া তিনি তামিল সঙ্গীতের সাহায্যে নারায়ণের জন্য তাঁহার দীপশিখা জ্বালাইয়াছেন।[২]

সেই যুগে শিব ও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় তৃতীয় কবি পেয়ালোয়ারের রচনায়। এই বিষ্ণুভক্ত কবি প্রথম পদেই তাঁহার আরাধ্য দেবতার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে শিবের রূপ ও রঙ্ কিছুটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন—"আজ আমার সমুদ্র-শ্যাম দেবতার মধ্যে আমি দেখিয়াছি শ্রীমতী লক্ষ্মীকে; দেখিয়াছি প্রভুর স্বর্ণকান্তি দেহকে, দেখিয়াছি তাঁহার সূর্য-সন্নিভ সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ; আরও দেখিয়াছি স্বর্ণচক্র—সমরে বিপুল শক্তিশালী, আর তাঁহার

১ পেয়রুম্ কয়ক্কডলে নোক্কুমারু—ওণ্ পূ...

২ অন্বে তকলিয়া, আমুবমে নেয়্য়াক...

ইরণ্ডাম্ (দ্বিতীয়) তিরুবন্দাদি সং ১

হাতে দেখিয়াছি শঙ্খ।[1] এই বর্ণনার মধ্যে 'স্বর্ণকান্তি দেহ' এবং 'সূর্যসন্নিভ সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ' এই দুইটি অংশে হরিহরের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে অপর একটি শ্লোকে—তিরুপতির গিরিশীর্ষে চারিদিকে প্রবহমান জলপ্রপাতের মধ্যে অধিষ্ঠিত আমার প্রভু। তাঁহার মধ্যে একই সঙ্গে চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়াছে দুই রূপের—একদিকে তাঁহার দীর্ঘ জটা, অপরদিকে উন্নত কিরীট; একদিকে তাঁহার উজ্জ্বল ত্রিশূল (পরশু), অপর দিকে চক্র; একদিকে তাঁহার সর্পবেষ্টনী, অপর-দিকে স্বর্ণাভ বরণ।[2] এইভাবে কবির দৃষ্টিতে শিব ও বিষ্ণু একাকার হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

মনে হয় ইনি শৈব বংশের সন্তান, পরে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, সাধারণ তামিল-ভাষীর ন্যায় এই দ্রাবিড় বৈষ্ণব কবির অন্তরেও শিবের প্রতি একটা মমত্ববোধ ছিল। আমরা আরও একটি কারণ অনুমান করিতেছি। ভক্তিধর্মের যুগে শৈব-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবাঞ্ছিত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিত (দ্র° ২৬) কোনো কোনো সাধকের পক্ষে তাহা বেদনার কারণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর নিরপেক্ষ ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্য হইতে পরবর্তীকালে বিষ্ণু ও শিবের সংযোগ ঘটাইয়া দাক্ষিণাত্যে হরি-হর-পুত্রন্ বা অয়প্পন্ বা অয়্যনর্ নামক এক বিশেষ দেবতার সৃষ্টি হইয়াছিল। (দ্র° পরিশিষ্ট—১)। পেয়াড়্বার্ বোধ করি এই সংহতি স্থাপনের অন্যতম অগ্রদূত।

৫৭. চতুর্থ কবি তিরুমলিসৈ আলোয়ারের ২১৬টি স্তবকের মধ্যে "নান্মুকন্ (চতুর্থ) তিরুবন্দাদি" অংশে ৯৬টি এবং

---

১ তিরুক্ কণ্ডেন, পোন্মেনি কণ্ডেন্, তিকলুম্...
—মুণ্ড্রাম্ (তৃতীয়) তিরুবন্দাদি সং ১

২ তাল্ জটৈয়ুম্ নীনমুডিয়ুম্ ওণ্মলবুম্ চক্রমুম্....
—ঐ সং ৬৩

"তিরুছন্দ-বৃত্তম্" অংশে ১২০টি স্তবক সংকলিত হইয়াছে। অতি শৈশবে মাতৃ-পরিত্যক্ত এই কবি জনৈক নিম্নশ্রেণীর ভক্ত কর্তৃক প্রতিপালিত হন। কবির রচনাতেও তাঁহার আত্মপরিচয়ের কিছু আভাস মিলিবে। কুলমর্যাদাহীন, জ্ঞানশূন্য এবং বেদবিদ্যায় অনধিকারী আলোয়ার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দেবতার চরণে যে কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা হৃদয়স্পর্শী—চতুর্বর্ণের কোনো বর্ণেই আমার জন্ম হয় নাই; মঙ্গল-দায়ী বিদ্যার কথা আমার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় নাই; জ্ঞানশূন্য আমি পঞ্চেন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ; হে পবিত্র দেবতা, হে আমার প্রভু, তোমার উজ্জ্বল চরণ ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় আশ্রয় নাই।[১]

ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে কবির বিশ্বাস একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে এইরূপে—"মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ জাগিয়া উঠে, আবার মহাসমুদ্রের বুকেই তাহারা বিলীন হইয়া যায়। সেইরূপ সমস্ত চরাচর (স্থাবর জঙ্গম) তোমার মধ্যে জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া তোমার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।"[২] ভগবানের এই স্বরূপ উপলব্ধির পরে কবি-চিত্তে আর কোনো সংশয় নাই। তাই তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলিতে পারিলেন—"হে লক্ষ্মীপতি, তুমিই আমার প্রেম, তুমিই আমার সুদুর্লভ পরিপূর্ণ অমৃত, তুমিই আমার আনন্দ, তুমিই আমার সর্বস্ব। হে উজ্জ্বল আলোকময় কেশব, আমি তোমার দাস। ন্যায় বিচারক তুমি এই দাসকে শাসন কর।"[৩]

১ কুলঙ্গল্ আয় ঊয়্ইয়গুিল্ ওগু্য়িলুম্ পিয়ন্দিলেন্,....
—তিরুছন্দ বৃত্তম্ সং ৯০

২ তন্ উলে তিরৈত্ত এলুম, তরঙ্গ বেণ্ তডম্ কডল্....
ঐ সং ১০

৩ অন্পাব্ায়্ আয় অমুদম্ আবায়্ অডিয়েহ্কু
—নান্মুকন্ তিরুবন্দাদি সং ৫৯

কবির নিশ্চিত বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি দেবতার করুণাবারি নিশ্চয়ই বর্ষিত হইবে। ভক্ত-ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলিতে গিয়া কবির কণ্ঠে যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত অংশে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—"আজ হউক অথবা আরও কিছুকাল বিলম্বিত হউক, আমার প্রতি অবশ্যই তোমার অনুগ্রহ জন্মিবে। কারণ হে নারায়ণ, আমি নিশ্চিত জানি, তোমাকে ছাড়া আমার যেমন কোনো অস্তিত্ব নাই, তেমনি তুমিও আমাকে ছাড়া থাকিতে পার না—নান্ উন্নৈ অণ্ড্রি ইলেন, নী এন্নৈ অণ্ড্রি ইলৈ।"[১]

৫৮. দ্বাদশ আলোয়ারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নম্মালোয়ার। দিব্য প্রবন্ধের চারি সহস্র পদের মধ্যে ১২৯৬টি পদ তাঁহারই রচনা। একমাত্র তিরুমঙ্গৈ আলোয়ার ব্যতীত অন্য কাহারও এত অধিক সংখ্যক পদ সংকলিত হয় নাই। কেবল সংখ্যাধিক্যেই নয়, সাহিত্যিক উৎকর্ষেও নম্মালোয়ার অগ্রণী কবি। নম্মালোয়ারের শিষ্য মধুর কবি আলোয়ার মাত্র ১১টি পদ রচনা করিয়াছেন। তিরুপ্পান্ আলোয়ার ব্যতীত আর কাহারও এত অল্পসংখ্যক পদ সংকলিত হয় নাই। আসলে মধুর কবি খুব বেশিসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার গুরু নম্মালোয়ারের গান গাহিয়া বেড়ানোই হইবে তাঁহার একমাত্র কাজ। মধুর কবি যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন সমস্তই তাঁহার গুরুদেব নম্মালোয়ার সম্পর্কে। বিষ্ণু বা কৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি একটি পদও রচনা করেন নাই, কেননা গুরুই ছিলেন

---

১ ইণ্ড্রাক নালৈয়েয়াক ইনিচ্চিরিহুম্
নিণ্ড্রাক নিন্ অরুল্ এন পালদে—নণ্ড্রাক
নান্ উন্নৈ অণ্ড্রি ইলেন্ কণ্ডায়্ নারণনে!
নী এন্নৈ অণ্ড্রি ইলৈ।
—নান্মুকন্ তিরুবন্দাদি, সং ৭

তাঁহার একমাত্র দেবতা। কবি বলিয়াছেন—"যিনি কুরুহুরের পুরুষোত্তম (অর্থাৎ নম্মালোয়ার), রসনায় তাঁহারই নামোচ্চারণ করিয়া আমি আনন্দ পাইলাম। সত্য সত্যই আমি উপনীত হইলাম তাঁহার স্বর্ণচরণতলে। তাঁহাকে ছাড়া আমি অন্য কোনো দেবতা জানি না। তাঁহারই গানের মধুর সুর কণ্ঠে লইয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াইব।"[১]

৫৯. আলোয়ারদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সপ্তম আলোয়ার কুলশেখর। ভক্তিসাধনার জন্য ত্রিবাঙ্কুরের এই নরপতি রাজ-সিংহাসনের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিলেন। রাজকার্য অপেক্ষা তীর্থ পরিক্রমাই তাঁহাকে অধিক আকৃষ্ট করিত। অবশেষে তিনি সত্যসত্যই একদিন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীরঙ্গম্-এ আসিয়া রঙ্গনাথের সেবক হইলেন এবং সেখান হইতে কাঞ্চীপুরম্, তিরুবেঙ্কটাচলম্ প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার রচনার নিদর্শন ১০৫টি স্তবকে সম্পূর্ণ "পেরুমাল্ (=বিষ্ণু) তিরুমোড়ি (=শ্রীবাক্য)।"

কুলশেখরের রচনায় তাঁহার নিজের জীবনের কথা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কামিনী-কাঞ্চন নয়, মর্তের রাজসুখ নয়, অপ্সরা-পরিবৃত স্বর্গরাজ্যও নয়, কবির কামনা কেবল রঙ্গনাথের প্রেম। তাঁহার নিজের কথাই শোনা যাক—"হে প্রভু, এই জগৎ (অর্থাৎ জগদ্বাসী), যে জীবন সত্য নয়, তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে করে। এইরূপ জগতের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। হে প্রভু রঙ্গনাথ, আমি ডাকিয়া বলিতেছি, তোমারই জন্য আমার ভালোবাসা। ক্ষীণকটি-বিশিষ্ট রমণীদের এই যে জগৎ, ইহার সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই। হে প্রভু রঙ্গনাথ, আমি ডাকিয়া বলিতেছি, আমার প্রেম কেবল তোমারই জন্য।"[২]

---

১ ন্যাবিনাল্ নবিট্রি ইন্‌ব্‌ম্‌ এয়্‌দিনেন্‌,....

২ মেয়্‌য়িল বাড়্‌কৈয়ৈ মেয়্‌ এণক্ কোল্‌লুম্‌—ইব্‌:

এই জীবন-সমুদ্রে ভগবানই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কবি এই কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ : সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মাস্তুলে একটি পাখি বসিয়া আছে। মাস্তুল ছাড়িয়া সে একবার অন্য আশ্রয়ের জন্য উড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার চারিদিকেই কূলহীন অনন্ত সমুদ্র। ক্লান্ত পাখি আবার ফিরিয়া আসে তাহার পুরাতন আশ্রয়ে, জাহাজের মাস্তুলে। পদটি এইরূপ :

বেঙ্গণ্ তিণ্ কলিরু অডর্ত্তায়্ !
　　বিত্তুবক্কোট্টু অম্মানে !
এঙ্গুপ্পোয় উয়্কেন্, নিন্
　　ইণৈ অডিয়ে অডৈয়ল্ অল্লাল্ ।
এঙ্গুম্পোয়্ক্ করৈ কাণাদু
　　এরিকডল্বায় মীণ্ডেয়ুম্
বঙ্গত্তিন্ কূম্বু এরুম্
　　মাপ্পরবৈ পোণ্ড্রেনে ।[১]

তিরুবেঙ্কটাচলম্-এ বসিয়া কুলশেখর যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিতেই দেখা যায় কবি রাজ্য চাহেন না, অর্থ চাহেন না, উর্বশীর ভালোবাসাও তাঁহার কাম্য নয়। অপ্সরা-পরিবৃত স্বর্গের প্রতিও তাঁহার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি শুধু চান তিরুপতির আশ্রয়ে যে কোনরূপে জীবনধারণ করিতে। তাহাতে যদি মনুষ্য জন্ম ছাড়িয়া কবিকে মৎস্যজন্মও

১ হে প্রভু, যদি তোমার চরণে শরণ না পাই তবে আমি কোথায় যাইব? কোথায় গিয়া নিরাপদ্ আশ্রয় লাভ করিব? যে পাখি তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের নানা দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কূলের সন্ধান না পাইয়া পুনরায় জাহাজের মাস্তুলে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে, আমিও তো সেই পাখির মত।

গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই। একটি পদ এইরূপ: স্বর্গলোকের রাজছত্রের নিচে থাকিয়া যদি স্বর্ণ-মেখলা-বেষ্টিত উর্বশীর অঙ্গস্পর্শও লাভ করি, তাহার প্রতি আমি উদাসীন থাকিব। বরং আমি আমার প্রভু রক্তপ্রবালধর বিষ্ণুর সেই তিরুবেঙ্কট নামক স্বর্ণপর্বতের উপরে যৎসামান্য জীবন ধারণ করিয়া থাকিব।[১]

তিরুবেঙ্কটে রচিত অনুরূপ ভাবের আর একটি পদ উদ্ধৃত করা হইল:

আনাদ চেল্‌বত্তু অরম্‌বৈয়র্‌কল্‌ তর্‌চূল
বান্‌ আলুম্‌ চেল্‌বমুম্‌ মণ্‌ অরচুম্‌ য়ান্‌ বেণ্ডেন্‌।
তেন্‌ আর্‌ পূঞ্চোলৈত্‌ তিরুবেঙ্কটচ্‌ চুনৈয়িল
মীনায়্‌প্‌ পিরক্কুম্‌ বিধিউডৈয়েন্‌ আবেনে।[২]

কৃষ্ণের বালক্রীড়া দর্শনে যশোদার বাৎসল্য-পূর্ণ হৃদয়ের আনন্দ বর্ণনায় কুলশেখর যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। মাকে লুকাইয়া শিশুর দধি-মাখন খাইবার চেষ্টা এবং আড়াল হইতে পুত্রের কীর্তি দেখিয়া মায়ের আনন্দ-কৌতুকবোধের নিদর্শন স্বরূপ আমরা কেবল একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

মুলুত্তমু বেণ্‌ণেয়্‌ অলৈন্‌ তুতোট্টু উণ্‌ণুম্‌
মুকিল্‌ ইলম্‌ চিরুত্‌ তামরৈক্‌ কৈয়ুম্‌,
এলিল্ল কোল্‌ তাম্বু কোণ্ডু অডিপ্‌পদর্‌কু এল্‌কুম্‌
নিলৈয়ুম্‌, বেণ্‌ তয়ির্‌ তোয়্‌ন্‌দ চেব্‌বায়ুম্‌,

১ উম্বর্‌ উলকু আণ্ডু ওরুকুডৈক্‌ কীড়্‌ উরুপ্পচিতন্‌ ..

২ এই মর্ত্যের রাজত্ব কিংবা চিরযৌবনা অপ্‌সরাদের দ্বারা বেষ্টিত যে স্বর্গের রাজ্য সম্পদ্‌ তাহা আমি চাই না। আমার অদৃষ্ট (বা কর্ম) এমন হউক্‌ যাহাতে আমি যেন মধুময় পুষ্পোদ্যানপূর্ণ তিরুবেঙ্কটাচলের নির্ঝরে মৎস্যরূপে জন্মলাভ করিতে পারি।

অলুকৈয়ুম্, অঙ্গিনোক্কুম্ অন্ নোক্কুম্,
অণিকোল্ চেম্ চিরুবায়্ নেলিপ্ পহুবুম্,
তোলুকৈয়ুম্ , ইবৈ কণ্ড অশোদৈ
তোল্লৈ ইন্বত্তু ইরুদি কণ্ডালে।[১]

৬০. পেরিয়ালোয়ার এবং তাঁহার পালিতা কন্যা আণ্ডাল্-এর জীবনকাহিনী তামিলনাডে সুপরিচিত। দিব্য প্রবন্ধম্-এ আণ্ডালের মাত্র ১৭৩টি স্তবক সংকলিত হইলেও তামিল-বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে নম্মালোয়ারের পরেই তাঁহার প্রসিদ্ধি সবচেয়ে বেশি। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রয়োজন মনে করিয়া (দ্র° ৬৬-৬৮) আমরা এখানে কেবল পেরিয়ালোয়ারের কথা বলিতেছি। বাৎসল্য রসের কবিরূপেই ইঁহার খ্যাতি। তামিল বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার ১২টি স্তবকে সম্পূর্ণ "তিরুপ্ পলাণ্ডু" সমধিক পরিচিত হইলেও আমরা তাঁহার "তিরুমোড়ি" (=শ্রীবাক্য) অংশ হইতে দুইটি পদের সাহায্যে কবির বাৎসল্যরসসৃষ্টির পরিচয় লইব—

"বালগোপাল ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে ; বারে বারে দুলিতেছে তাহার কপালের টিকলি। তাহার সোনার কটি ভূষণে রুনুঝুনু শব্দ শব্দ হইতেছে। হে চাঁদ, যদি তোমার চোখ থাকে, তবে আমার বালগোবিন্দের ক্রীড়া দেখিয়া যাও।

আমার ছোট্ট বাছা প্রাণ ; আমার কাছে সে অনুপম অমৃত ;

১ শিশু কৃষ্ণ হাত দিয়া মাখন স্পর্শ করিয়া তাহার আস্বাদ লইতেছে। পদ্মের মতো কোমল তাহার ছোট হাত দু'খানি ঈষৎ বোজা। সুন্দর একগাছি দড়ি লইয়া মা তাহাকে মারিতে আসিতেছে বলিয়া তাহার একটু ভয়-ভয় ভাব ; কৃষ্ণের লাল মুখখানি দই দিয়া একেবারে মাথা-জোখা হইয়া আছে। তাহার সন্ত্রস্ত চোখে সুন্দর দৃষ্টি, তাহার লাল মুখের সুন্দর কম্পন এবং তাহার প্রার্থনার ভঙ্গিতে জোড়-করা হাত— এই সমস্ত দেখিয়া মা যশোদা যে আনন্দলাভ করিল, তাহার আর সীমা-পরিসীমা নাই।

সে তাহার ছোট ছোট হাত তুলিয়া তোমাকে ডাকিতেছে। হে চাঁদ, যদি তুমি এই বালকৃষ্ণের সহিত খেলিতে ইচ্ছা কর, তবে মেঘের মধ্যে লুকাইও না, সানন্দে চলিয়া আইস।”[১]

৬১. আলোয়ারদের অধিকাংশ নামই তাঁহাদের উত্তরজীবনে গৃহীত বা আরোপিত হইয়াছে। ভক্তজীবনের নামের আড়ালে তাঁহাদের বাল্যকালের নাম প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। এইরূপ একজন কবি তোণ্ডর-অডিপ্‌পোডি। তাঁহার পূর্ব নাম বিপ্রনারায়ণ। দেবদেবী নামক জনৈক নর্তকীর প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহার মতিভ্রম ঘটে। কিন্তু অনতিকাল পরেই প্রভু রঙ্গনাথের কৃপায় মোহমুক্ত হইয়া তিনি নতুন নামে নতুন জীবন আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার নাম হইল তোণ্ডর-অডিপ্‌-পোডি অর্থাৎ ভক্ত-চরণ-রেণু।

তোণ্ডর-অডিপ্‌-পোডি আলোয়ারের সংকলিত পদসংখ্যা ৫৫। “তিরুমালৈ” (পবিত্র মালা) অংশে ৪৫টি এবং “তিরুপ্‌-পল্লি-এড়্‌চ্চি” (শ্রীনিদ্রাভঙ্গ বা প্রভুর জাগরণ) অংশে ১০টি। আমরা তাঁহার একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পদের মধ্য দিয়া কবির অনুতপ্ত চিত্তের কাতর আর্তনাদ আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে—“আমার ঘর নাই; নিজের বলিতে এক কানি জমিও নাই; তুমি ছাড়া আমার অন্য কোনো বান্ধব নাই; হে পরমমূর্তি ইহলোকে তোমার পাদপদ্মেও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলাম না। হে আমার কৃষ্ণ, হে আমার নব ঘনশ্যাম, হে আমার রঙ্গনাথ, আমি চিৎকার করিয়া বলিতেছি—আমার কে আছে প্রভু?”[২]

৬২. “অমলন্‌ আদি পিরান্‌” (নিষ্কলঙ্ক আদি প্রভু) শিরোনামায় যে দশটি স্তবক সংকলিত হইয়াছে তাহার রচয়িতা

১ তনুমুখত্তুচ্চুট্টি তূঙ্গত্‌ তূঙ্গত্‌ তবলন্দু পোয়্‌....

—পেরিয়ালোয়ার্‌ তিরুমোড়ি (১।৪।১-২)

২ উর্‌ ইলেন্‌ কাণি ইল্লৈ, উরবু মট্রু ওরুবর্‌ ইল্লৈ...

তিরুপ্পান্ আলোয়ার। এই কবিতায় ভক্ত কবি নারীরূপে তাঁহার প্রেমিক দেবতার অঙ্গ-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, মেঘশ্যাম কৃষ্ণের রূপ-দর্শনের পরে ইহলোকে তাঁহার আর দেখিবার কিছুই নাই। কবির বর্ণনার কিয়দংশ এইরূপ—"আমার প্রভু অলংকারশোভিত রঙ্গনাথ; হাতে তাঁহার বঙ্কিম শঙ্খ এবং উজ্জ্বল চক্র; উচ্চ পর্বতের ন্যায় তাঁহার শরীর; তুলসী গন্ধে আমোদিত, উন্নতশীর্ষ। আহা, তাঁহার রক্তিম অধর আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে। দেবতাদের অপ্রাপণীয় সেই আদি প্রভু রঙ্গনাথ; যিনি হয়বদন-রূপে অসুরের শরীর বিদীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার নির্মল মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল আয়ত রক্তিম নয়নযুগল আমাকে পাগল করিয়াছে।"[১]

কবি যেন কৃষ্ণ-প্রেম-মুগ্ধ গোপী। তাই তো তাঁহার পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছে—"আমার নয়ন দেখিয়াছে সেই ঘনশ্যামকে, গোপাল-রূপে জন্ম লইয়া যে ননি-মাখনের আস্বাদ লাভ করিল; যে হরণ করিয়া লইল আমার হৃদয়। দেবকুলের রাজা সেই শ্রীরঙ্গবাসীকে, আমার হৃদয়ামৃতকে দেখিবার পরে আমার নয়ন আর অন্য কিছুই দেখিতে চাহে না।"[২]

৬৩. দ্বাদশ আলোয়ারের সর্বশেষ কবি তিরুমঙ্গৈ আলোয়ারের রচনা হইতে সর্বাধিকসংখ্যক পদ-সংকলিত হইয়াছে।[৩] কবিত্ব-গুণে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নম্মালোয়ারের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার পরেই ইঁহার স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। আলোচ্য

১ কৈয়িনায় চুয়িশঙ্খনলালিয়য়্, নীল্ বরৈপোল্....

—অমলন্-আদি-পিরান্ (পদ সং ৭—৮).

২ কোণ্ডল্ বণ্ণনৈক্ কোবলনায়্ বেণ্ণৈয়্....

৩ নম্মালোয়ারের পদসংখ্যা ১২৯৬ এবং তিরুমঙ্গৈ আলোয়ারের পদসংখ্যা ১৩৬১।

ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁহার দেবতা পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দ সমস্ত গুণের আধার—

> পাববমুম্ অরমুম্ বীডুম্
> ইন্‌বমুম্ তুন্‌পম্ তান্মুম্
> কোবমুম্ অরুলুম্ অল্লাক্
> গুণঙ্গলুম্ আয় এন্‌দৈ
> মূবরিল্ এঙ্গল্ মূর্ত্তি
> ইবন্ এন মুনিবরোড়ু
> দেবর্ বন্দু ইরৈঞ্জুম্ নাঙ্গূর্‌ত্‌
> তিরু মণিক্ কূডত্তানে।[১]

কবি শ্রীরঙ্গের রঙ্গনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রভু যখন গুহকের মতো দীনহীন ব্যক্তিকেও কৃপা করিলেন তখন অবশ্য কবিও তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবেন না—

> এলৈ এদলন্ কীল্‌মকন্ এন্নাতু
> ইরঙ্গি মত্রবর্‌কু ইন্ অরুলু চুরন্দু,
> "মালৈ মান্‌মড নোক্কি উন্ তোলি,
> উন্‌বি এম্‌বি" এণ্ড্রু ওলিন্দিলৈ ; উকন্দু
> "তোলন্ নী এনক্কু ইঙ্গু ওলি" এণ্ড্রু
> চোর্‌কল্ বন্দু অডিয়েন্ মনত্তু ইরুন্দিড,

১ নাঙ্গুর্ তিরুমণির (স্থানের নাম) মন্দিরে বাস করেন এই যে আমার প্রভু, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রিমূর্তির মধ্যে আমাদের এই প্রভুকেই মুনি ও দেবতারা আসিয়া পূজা করিয়া যান। ইনি আমার পাপ ও ধর্ম, মোক্ষ ও আনন্দ; ইনিই আমার দুঃখ, ইনিই আমার নিগ্রহ, ইনিই আমার অনুগ্রহ, ইনিই সব কিছু।

আলিবন্ন ! নিন্ অডিয়িনৈ অডৈন্দেন,
অণিপোলিল্ তিরু অরঙ্গত্তু অম্মানে।[১]

নামের মহিমা কীর্তন উপলক্ষে নারায়ণ-ভক্ত কবি বলিয়াছেন ঃ যে শব্দটি আমাকে সদ্‌বংশে জন্মলাভের সৌভাগ্য দান করে, আমার সকল দারিদ্র্য দূর করিয়া সম্পদের অধিকারী করে, ভক্তজনের যত দুঃখকষ্ট দূর হইয়া যায় যাঁহার কৃপায়, যাঁহার প্রসাদে হয় দীর্ঘস্থায়ী স্বর্গবাস, যিনি দান করেন অক্ষয় বৈকুণ্ঠ, যিনি শক্তিদাতা, জন্মদায়িনী জননী অপেক্ষাও যাঁহার মাধুর্য অধিক, সেই সর্বশুভদায়ী নামটি আমি জানিয়াছি—তাহা হইল "নারায়ণ"।[২]

সেই নারায়ণের সহিত অনন্ত মিলনই কবির কাম্য। কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনা তাঁহার কিছুতেই দূর হইল না। এইখানে আমরা বৈষ্ণব কবির সেই চিরন্তন বেদনা-বিধুর বিরহী রূপটি দেখিতে পাই। কোথায় সেই তিরুক্কণ্ণপুরম্, যেখানে রহিয়াছে তাহার প্রিয়তম রক্তলোচন বিষ্ণু। কে সেখানে তাঁহার সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবে? ঐ যে তরুণ হংস—যাহার পা দুখানি রক্তের মতো লাল উহাকেই সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—"হে হংস আজই তুমি সেই নগরীতে যাইয়া তাহাকে বলিও আমার ভালোবাসার কথা। যদি সত্যই তুমি আমার এই অনুরোধ পালন কর, তবে তদপেক্ষা

১ হে সমুদ্র-বর্ণ প্রভু! মনোহর কুঞ্জ-বেষ্টিত শ্রীরঙ্গের রঙ্গনাথ! তোমার মধুর করুণা-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল দীনদরিদ্র নীচবংশীয় গুহকের প্রতি। তুমি তাহাকে বলিয়াছিল, "এই মৃগনয়নী সুন্দরী রমণী (সীতা) তোমার ভ্রাতৃবধূ, আমার ভাই তোমারও ভাই। তুমি আমার ভাই।" তোমার সেই কথাগুলি, ভক্ত আমি, আমার অন্তরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি তোমার চরণ-যুগলে উপনীত হইলাম।
—পেরিয় তিরুমোলি ৫.৮।১.

২ কুলম্ তরুম্, চেল্‌বম্ তন্দিডুম্, অডিয়ার্....
—পেরিয় তিরুমোলি ১।১।৯

অধিক আনন্দ আমার আর কিছুই হইতে পারে না।" হংস নিঃস্বার্থ হইয়া এই দৌত্য কার্য না-ও করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিরহিণী তাহাকে নানারূপ প্রলোভনের কথা শুনাইতেছে—"এই যে সবুজ কানন, ইহা চিরকাল তোমারই হইয়া থাকিবে। আর ঐ যে ধানখেত, উহার জলে আমি তোমাকে মাছ ধরিয়া খাইতে দিব। এখানে আসিয়া তুমি ও তোমার স্ত্রী মধুর দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়া মহা আনন্দ লাভ করিবে।"[১]

(ছয়) তামিল বৈষ্ণব কবি নম্‌মাড়্‌বার্

৬৪. তামিল শৈব-সাহিতের শ্রেষ্ঠ কবি যেমন মাণিক্কবাচকর্, তেমনি তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি নম্‌মাড়বার্ বা নম্‌মালোয়ার। তামিল বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ "নালায়ির দিব্য প্রবন্ধম্"-এর চার হাজার পদাবলীর মধ্যে নম্‌মালোয়ার-রচিত পদসংখ্যা ১২৯৬। একমাত্র তিরুমঙ্গৈ আলোয়ার ব্যতীত অন্য কোনো কবির এত অধিক সংখ্যক পদ সংকলিত হয় নাই।

নম্‌মালোয়ারের রচনা সম্পর্কে তামিল ভক্ত সমাজ যে কিরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন তাহা কতকটা বোঝা যাইবে তাঁহার পদাবলীর সুউচ্চ প্রশস্তির দ্বারা। কেহ তাঁহার রচনাকে বলিয়াছেন ভক্তামৃতম্, কেহ বা বলিয়াছেন সামবেদসার। দ্রাবিড়োপনিষদ্, দ্রাবিড়বেদসাগরম্ ইত্যাদি নামেও তাঁহার পদাবলী অভিহিত হইয়া থাকে। নম্‌মালোয়ারের শিষ্য অন্যতম আলোয়ার মধুরকবি তাঁহার গুরু-বন্দনায় বলিয়াছেন—প্রভুর নামোচ্চারণ করিয়া রসনা তৃপ্ত হইল। আমি অন্য কোনো দেবতা জানি না,

১ চেঙ্‌কাল মডনারায়্! ইণ্ড্রে চেণ্ড্রু,...
—তিরু-নেডুন্-তাণ্ডকম্ (দীর্ঘ বৃত্ত) পদ সং ২

কেবল তাঁহারই সুমধুর সংগীত কণ্ঠে লইয়া আমি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব।

৬৫. নম্মালোয়ারের সংকলিত পদাবলী যে চারিটি ভাগে বিভক্ত, তাহাদের নাম ও পদসংখ্যা এইরূপ—তিরুবায়্-মোড়ি—১১০২, তিরুবিরুত্তম্—১০০, পেরিয় তিরুবন্দাদি ৮৭ এবং তিরু আচিরিয়ম্—৭। ইহার মধ্যে "তিরুবায়্ মোড়ি" (অর্থাৎ শ্রীমুখবাণী) সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। সমগ্র দিব্য প্রবন্ধম্-এর মধ্যে এই অংশই সর্বাধিক পরিচিত।[১]

তিরুবায়্ মোড়ির প্রথম শ্লোকে কবি আত্ম-জাগরণের কথা বলিয়াছেন এইভাবে—যাঁহার উপরে আর কেহ নাই, যাহা কিছু-ভালো-র মালিক যিনি, তিনি কে? তিনিই তিনি। যাঁহার প্রসাদে উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তিনি কে? তিনিই তিনি। অমর দেবকুলের অধিপতি যিনি, তিনি কে? তিনিই তিনি। জন্ম-মরণ-দুঃখ-বিরহিত তাঁহার জ্যোতির্ময় চরণযুগল বন্দনা করিয়া হে আমার মন, জাগ্রত হও।[২]

মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্দনীয় বিষয় ঈশ্বরের কথা ভুলিয়া গিয়া কবিরা যে রাজা-মহারাজা কিংবা ধনী ব্যক্তিদের স্তুতি-বন্দনায় তাঁহাদের স্বর্গীয় কবিত্ব শক্তির অপচয় ঘটান ইহা নম্মালোয়ারের পক্ষে বিশেষ বেদনাদায়ক ছিল। সম-প্রাণ কবিদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বার বার এই আবেদন জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন গুটি-কয়েক স্বর্ণ মুদ্রার প্রলোভনে তাঁহাদের অমূল্য শক্তির অপব্যবহার না করেন। নশ্বর রাজশক্তির তোষামোদ করিয়া যে ধন পাওয়া যাইবে তাহা

১ 'তিরুবায়্‌মোড়ি' বিশিষ্ট অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ভিত্তিস্বরূপ। প্রধানত এই ভিত্তির অবলম্বনেই শ্রীরামানুজস্বামী বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন। দ্রঃ আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস—আড়বার পৃ ২৬।

২ উয়র্‌বর উয়র্‌নলম্ উডৈয়বন্ য়বন্, অবন্—(১।১।১)

ঐ রাজশক্তির মতোই নশ্বর।—"হে কবিবৃন্দ। তোমাদের স্তুতি-তোষামোদের বিনিময়ে ঐ ভঙ্গুর মানুষগুলির নিকট হইতে যাহা পাইবে, তাহা কিরূপ সম্পদ্? কতদিন তাহার স্থায়িত্ব?"[১]

প্রকৃত ধনীর নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলে কবির হয়তো আপত্তি হইত না। কিন্তু চারিদিকে যে সকল রাজা-মহারাজা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কি প্রকৃত ধনী? তবে তাহাদের এত অভাব কেন? দীন দরিদ্রের ন্যায় ধন-লিপ্সা কেন? কবি বলিয়াছেন—

"হে কবিবৃন্দ! আমি তো দেখিতেছি, এই পৃথিবীতে সম্পৎশালী কেহই নাই। সুতরাং কাহারও পদসেবা না করিয়া কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা নিজ নিজ জীবিকা অর্জনের চেষ্টা কর। আর, তোমাদের কাছে যে মধুর কবিত্ব সম্পদ্ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা যে-যাহার ইষ্টদেবের উপাসনা কর, স্তোত্র রচনা কর। আমি জানি, তোমরা যে দেবতারই উপাসনা কর না কেন, সমস্ত আসিয়া আমার জ্যোতির্ময় কিরীটধারী বিষ্ণুর চরণতলে পৌঁছিবে।"[২]

কবি নম্‌মালোয়ার স্বয়ং কী করিবেন সে কথা এই পর্যায়ের প্রথম পদে অতি স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—"আমি যাহা বলিব, তাহা বলিলে অপ্রীতিকর লাগিতে পারে, কিন্তু তথাপি আমি বলিতেছি, শোন। যখন মধুকর-গুঞ্জন-মুখরিত তিরুবেঙ্কট পর্বতে আমার প্রভু, আমার পিতা রহিয়াছেন, তখন আমার কণ্ঠের মধুর গীতি আমি মানুষের সেবায় উৎসর্গ করিব না।"[৩]

কবির কাছে প্রভু একটা নাম-মাত্র নহে। প্রভুর অস্তিত্ব কবি অনুভব করেন তাঁহার অভ্যন্তরে—সে কখনো মধু, কখনো দুগ্ধ, কখনো ঘৃত, কখনো ইক্ষু, কখনো বা অমৃত। এমন যে মধুময়

---

১ এন্ আবহু এত্তনৈ নালৈক্কুপ্ পোদ্দুম্? (৩।৯।৪)

২ বম্‌মিন্ পুলবীর! হুম্ মেয়বরুত্তিক্ কৈ চেয়হুয়ম্‌মিনো (৩।৯।৬)

৩ চোয়াল্ বিরোধমিহু, আকিলুম্ চোল্লুবন্, কেল্‌মিনো (৩।৯।১)

মধুসূদন, তাহার সহিত কবি এক হইয়া যান। তাই তো কবি নিজের দেহস্থ অন্তরাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—তুমি ধন্য ; আর তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য।[১]

প্রভুর মাধুর্য এমনই আস্বাদনীয় যে, কবি তাহাকে দেখিতে পাইলে একেবারে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কবির আক্ষেপ এই যে, সেই নিষ্ঠুর কালো মানিক তাহার আগেই ভালোবাসিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন।[২]

কবির কাছে ইহা এক পরম বিস্ময় যে, ভগবান তাহার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। এই পর্যায়ের কবিতা-গুলির মর্মকথাকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—"আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ।" একটি কবিতায় বলা হইয়াছে—"তিনিই যে জগৎ সংসারের আদি কারণ তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়াছেন। সুন্দর মধুর কবিতারূপে তিনি আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন আমার জিহ্বাগ্রে এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তদের জন্য নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন—এমন প্রভুকে আমি কিরূপে ভুলিতে পারি ?"[৩]

কবি নিজের অক্ষমতার কথা ভালো করিয়াই জানেন। ছন্দোবোধ বা সুন্দর মধুর কবিতা রচনার শক্তি যে তাঁহার নাই ইহা তো প্রভুর কাছেও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, "ঈশ্বর অযোগ্য আমাকে তাঁহার নিজের করিয়া লইয়া আমার দ্বারা তাঁহার মধুর গান গাহিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আরও তো কত পরম-কবি রহিয়াছেন, কত মধুর তাঁহাদের সুর ও ভাষা। কিন্তু কি আশ্চর্য, বৈকুণ্ঠপতি তাঁহাদের দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ না করাইয়া আজ

১ উনিল্‌বাল্‌ উন্নিরে নন্নে, পো উনৈপ্পেট্রু্‌ (২।৩।১)

২ বারিক্‌ কোণ্ডু উন্নৈ বিলুঙ্‌কুবুন কাণিল্‌ এগু্‌ন্ধ (৯।৬।১০)

৩ আম্মুদল এন্‌ ইবন্‌ এণ্ডু্‌ তন্‌ তেট্রি' এন্‌ (৭।৯।৩)

আমার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তারপর আমাকে তাঁহার করিয়া লইয়া আমার মধ্য দিয়াই তিনি অমর সংগীত গাহিবার ব্যবস্থা করিলেন।"[১]

কবি এই পর্যায়ে যে ঈশ্বরানুভূতির কথা বলিয়াছেন তাহার ভিতরে একটি বাক্যাংশ আমরা এইরূপ পাইয়াছি—"এন্নৈ তন্নাক্কি" অর্থাৎ আমাকে তাঁহার করিয়া লইয়া। কিন্তু অপর একটি পদে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত কথার আভাস পাই। সেখানে (৭।৯।৭ সং পদে) বলা হইয়াছে 'তন্ তন্নৈ এন্নাক্কি' অর্থাৎ "ঈশ্বর তাঁহাকে (নিজেকে) আমার করিয়া লইয়া" ইত্যাদি। ভক্ত কবির এই জাতীয় রহস্যানুভূতিও আলোচ্য পর্যায়েরর গানগুলির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বরের সহিত এইরূপ গভীর সংযোগের কথা বলিবার পরেও কবির চিত্ত কিন্তু কেবল ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকিতেছে না—"যে বৈকুণ্ঠপতি আমাকে তাঁহার করিয়া লইয়া এবং তাঁহাকে আমার করিয়া লইয়া আমার মধ্য দিয়া মধুর গান গাহিতেছেন, কবে আমি কেবল তাঁহারই চিন্তায় পূর্ণ হইব—তন্ তন্নৈ এন্নাল্ চিন্দিত্তু আর্বনো—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে অবশ্যই কবির অস্থির-চিত্ততার কথা অনুভব করা যায়, বোঝা যায় যে ক্ষণে ক্ষণে অন্যরূপ চিন্তাও তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করে।

তৎসত্ত্বেও কবিচিত্তে নৈরাশ্যজনিত বেদনা অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তাই বেশি। স্বর্গের আনন্দ কিংবা নরকের দুঃখের কথা ভাবিয়া দুর্বল মানুষ উল্লসিত কিংবা বিচলিত বোধ করে। কিন্তু ভক্ত কবি বলিতেছেন—"আমি যখন তুমিই তখন আর আমার ভয় কি? অসহনীয় নরক জ্বালার মধ্যে পড়িয়াও তো তোমাকেই পাইব। সুতরাং, তোমার আমার সম্পর্ক সত্য হইলে স্বর্গের আনন্দ এবং নরকের জ্বালা দুই-ই আমার পক্ষে সমান।"[২]

১ চীর্ কণ্ড় কোণ্ডু তিরুন্দু নল্ ইন্ কবি (৭।৯।৫-৬)

২ য়ানু নী তানে আবদো মেয়্য়ে অরুনরকু অবৈয়ুম্ নী—(৮।১।৯)

নম্মালোয়ার নায়ক-নায়িকাভাবে ভক্ত জীবনের বিরহ বেদনা প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে 'তিরুবিরুত্তম্' রচনা করিলেও, আলোচ্য 'তিরুবায়্ মোড়ি' অংশেও আমরা অনুরূপ ভাবের কিছু রচনা দেখিতে পাই। এক স্থলে নায়িকা বিরহ রজনীতে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—"যাহারা নারীজন্ম ধারণ করিয়াছে তাহাদের নিরতিশয় বিরহ ক্লেশ দেখিতে পারেন না বলিয়া সূর্যদেব উদিত না হইয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন (অর্থাৎ দীর্ঘ রাত্রির অবসান হইতেছে না)। এদিকে আয়ত-লোচন রক্তিম-বদন আমার কৃষ্ণর্ষভও আসে নাই। আমাকে এই চিন্তা ব্যাধি হইতে কে মুক্ত করিবে? দয়া করিবার ছলনায় কৃষ্ণ আসিয়া আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার দেহ-প্রাণ দুই-ই গ্রাস করিয়াছে—ইহাই হইল আমার কালো মানিকের ডাকাতি।"[১]

ভক্ত নায়িকা পাখিকে দূত করিয়া তাঁহার প্রিয় দেবতার উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছেন—"হে তরুণ জলচর কুরুকু (আণ্ড্রিল) পাখি, তিরু মুলিক্কলম্ নামক স্থানে আমার প্রিয় রহিয়াছেন। মাথায় তাঁহার সুন্দর তুলসী মাল্য। হাতে তাঁহার স্বর্ণ চক্র, তুমি তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে। তুমি তাঁহাকে গিয়া বলিও —আমার বক্ষোহার সমুন্নত, বিরহ বেদনায় কুচযুগল বিবর্ণ, আমার পুষ্পতুল্য নয়ন অশ্রুতে পরিপূর্ণ। আমাকে ভালোবাসিয়া পুনরায় পরিত্যাগ করা কি তাঁহার উচিত হইয়াছে?"[২]

দূত মুখে সংবাদ প্রেরণ ব্যর্থ হওয়ায় নায়িকা উন্মত্ত প্রায়। দিন-রাত্রি একই প্রসঙ্গ, মুখে তাহার অন্য কথা নাই। কখনো সে বলিতেছে—শঙ্খ, কখনো সে বলিতেছে—চক্র, আবার কখনো বলিতেছে—তুলসী। নায়িকার মাতা কন্যার এই অবস্থায় বিষম

১ পেন্‌পিরন্দয়ে এয়্‌হুম্ পেরুম্ তুয়র্ কান্‌কিলেন, এণ্ড্র

—রায় চো, আড়্‌বায়্ অমুহু, ৩৩১-৩৩২

২ পূম্ তুলায় [illegible]প্ পোন্ আলিক্ কৈয়ারকু—ঐ ৩৩৫

বিপদে পড়িয়াছে। সে পল্লীর সকল মেয়ের মায়েদের ডাকিয়া বলিল—ওগো তোমরাও তো মেয়ের মা হইয়াছ। আমার মেয়ের পাগলামির কথা তোমাদের কাছে আর কি বলিব? সে কখনো বলে শঙ্খ, কখনো চক্র, কখনো তুলসী। দিবা-রাত্রি তাহার মুখে আর কোনো কথা নাই। তোমরা বল আমি এখন কি উপায় করিব?"[১]

ভক্তের দৃষ্টিতে জগত কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে। কবি নম্‌মালোয়ার তাঁহার "পেরিয় তিরুবন্দাদি" অংশের কয়েকটি স্তবকে এই প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছেন তাহা একান্তই হৃদয়স্পর্শী। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার বর্ণ-সাদৃশ্যে ভক্তের বিভ্রম হইতেছে—মেঘই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ঐ বিশাল পর্বত, নীল সমুদ্রই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ঐ গভীর অন্ধকার, ভ্রমরপূর্ণ 'পূবৈ' পুষ্পই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ঐ যত কিছু কালো। ইহাদের কালো রূপ যখনই দেখি, তখনই আমার হৃদয়—"এই তো কৃষ্ণের মূর্তি" এই বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই কালোরূপের দিকে ছুটিয়া যায়।"[২]

অপর একটি স্তবকে বলা হইয়াছে—"যখনই দেখি পূবৈ, কায়া, নীলম্ ও কাবি ফুল ফুটিতেছে, তখনই আমার হৃদয় মনে করে—ইহারা সকলেই তো আমার প্রভুর অঙ্গ। এই ভাবিয়া ধন্য আমার কোমল অন্তর আমার দেহের অভ্যন্তরে স্ফীত হইতে থাকে।"[৩]

নম্‌মালোয়ারের একশত স্তবক-বিশিষ্ট "তিরুবিরুত্তম্" অংশটি মুখ্যত নায়ক-নায়িকা-ভাবকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছে। ইহাতে কোনো কাহিনী নাই, বিশেষ কোনো ঘটনারও বিবরণ নাই। তবে ভাবাত্মক শ্লোকগুলির ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু ব্যাপার ঘটিয়া

১ নঙ্কৈমীর্ নীরুম্‌ত্তম্ পেন্ পেট্র নল্‌কিনীর্....

২ কোণ্ডল্ তান্, মাল্‌বরৈ তান্, মাকডল্ তান্, কূর ইরুল্ তান্
—পদ সং ৪৯

৩ পূবৈয়ুম্ কায়াবুম্ নীলমুম্ পূক্কিণ্ড্—পদ সং ৭৩

থাকিবে এইরূপ কল্পনা করিয়া লওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। কোনো পদ নায়িকার উক্তি, কোনো পদ বা নায়িকার সখীদের, কোনো পদ বা তাহার মাতার। কোনো পদ বা কবিরই বর্ণনা। এইরূপ পদে গোপীপ্রেমের আকর্ষণে স্বর্গবাসী কৃষ্ণের মর্ত্যাবতরণের কথা বলা হইয়াছে এইভাবে—"স্বর্গবাসী দেবতারা তোমার পূজার জন্য গ্রহণ করেন সুন্দর মালা, তোমাকে স্নান করান নির্মল জলে, তোমার সম্মুখে করেন ধূপের আরতি। কিন্তু তুমি অনুপম মায়াবলে নামিয়া আস ননী-মাখন চুরি করিয়া খাইতে, বৃষকুলে নৃত্য করিতে, এবং এই সমস্তই তুমি কর গোপকুলসম্ভূতা সেই লতা-সন্নিভা বালিকাটির জন্য।"[১]

গোপকুলসম্ভূতা সেই বালিকা অর্থাৎ 'তিরুবিরুত্তম্'-এর নায়িকা আকাশের বিপুল মেঘ-সম্ভারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ব্যথিতচিত্তে স্মরণ করে মেঘ-শ্যাম কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ কি মেঘের ন্যায় শ্যাম? না না, মেঘই কৃষ্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নায়িকা তাই আকাশে সঞ্চরমাণ মেঘরাশিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে মেঘ, তোমরা আমাকে বল, কৃষ্ণের দেহকান্তি-সদৃশ রূপ লাভ করিবার মতো সৌভাগ্য তোমরা কিরূপে অর্জন করিলে?[২] জীবকুলের প্রাণরক্ষার জন্য তোমরা উত্তম জলভারবহন করিয়া সমস্ত আকাশ বিচরণ কর। এই কাজে (জলভার হেতু) তোমাদের শরীর কত কষ্ট পায়। ইহাই তো তোমাদের তপস্যা, আর এই তপস্যার বলেই তোমরা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করিয়াছ।[৩]

১ চুট্টু নন্মালৈকল্ তুয়ন্ বেন্দি বিন্নোর্‌কল্ নন্নীর্—পদ সং ২১

২ আণ্ডালের পদেও আমরা অনুরূপ ভাবের সন্ধান পাই। সেখানে নায়িকা মেঘের পরিবর্তে শুভ্র শঙ্খকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে যে, সে শঙ্খ এমন কি মহৎ তপস্যা করিয়াছে যাহার জন্য কৃষ্ণের অধর-স্পর্শের সৌভাগ্যলাভ তাহার ঘটিল।

৩ মেঘঙ্গলে! উরৈয়িয়ির্, তিরুমাল্ তিরুমেনি ওক্কুম্—পদ সং ৩২

অবশ্যই ইহা নায়িকার বিরহ-দশার উক্তি। বিরহিণী হংসকে দূত করিয়া পাঠাইতেছে তাহার প্রিয়দেবতার উদ্দেশ্যে—হে হংস, হে সারস, তোমরা যাহারা উড়িয়া যাইতেছ, আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি। তোমাদের মধ্যে যাহারা আগে পৌঁছিবে, তাহারা ভুলিও না—যদি আমার হৃদয়বাসী কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয় তো তাহাকে আমার কথা বলিও। আর জিজ্ঞাসা করিও —'তুমি এখনও তাহার (তোমার প্রিয়ার) কাছে যাও নাই? ইহা কি তোমার উচিত হইয়াছে?'[১]

আমরা কল্পনা করিতে পারি নায়িকার এইরূপ বিরহাবস্থায় তাহার সখীরা কৃষ্ণের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বিরহিণী তাহার প্রিয়ের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সখীদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—"আমি কি প্রতিমুহূর্তেই তাঁহার কৃপা পাইতেছি না? তাঁহার সানুরাগ রক্তিম লোচন—যাহা শীতল ও কোমল পদ্ম-তড়াগের ন্যায় প্রকাশিত —সেই মধুর নয়ন আমার মনে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের সেই শ্রীমুখের প্রতি ভালবাসা জাগাইয়া তোলে এবং এখন তাহা আমার অন্তরেই বিরাজ করিতেছে।"[২]

সখীদের কাছে এইরূপ বলিলেও ভক্ত-নায়িকা জানে যে সেই প্রেমিক-প্রবরকে কেবল জানিলেই শান্তি নাই, তাহাকে একান্ত করিয়া পাওয়া আবশ্যক। ঐ ত সূর্য অস্তমিত হইল, রাত্রির অন্ধকার এখনই ঘনাইয়া আসিবে। দেবতা তো ভক্তের সঙ্গে অনেক প্রতারণার খেলা খেলিয়াছে, এখনও কি তাহার কৃপাবিতরণের সময় হয় নাই?[৩]

১ অন্নন্ চেল্‌বীরুম্ বণ্ডানম্ চেল্‌বীরুম্ তোলুদিরন্দেন্—পদ সং ৩০

২ বণ্ণম্ চিবন্দুন বানাডমরুম্ কুলিয়্‌বিলিয়্—পদ সং ৬৩

৩ পদ সং ৮০

দেবতার প্রসাদ-লাভের জন্য ভক্তের আকুলতা প্রকাশের মধ্যে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, একান্ত নিভৃতে দেবতার সাক্ষাৎলাভের সুযোগ যদি না-ও ঘটে, তবে অন্তত রাজপথের ভিড়ের মধ্যেও যেন একবার তাহার দর্শন-লাভের সৌভাগ্য হয়। 'যেমন করিয়া হউক একবার তুমি দেখা দাও'—এই সুরের আবেদন। ৮৪ সং পদে বলা হইয়াছে—"সুন্দরী রমণী মহলেই হউক, অথবা ধনী ব্যক্তিদের উৎসব-আড়ম্বরেই হউক অথবা অনুরূপ অন্য কোনো স্থানেই হউক, হে শঙ্খচক্রধারী, হে অঞ্জনবর্ণ, হে আমার মণি-মুক্তা-মাণিক্য, আমি তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি।"[১]

ভক্তের কাতর আবেদনে দেবতা আর কতকাল উদাসীন থাকিতে পারেন? অবশেষে তাঁহাকে আসিতেই হইল। সেই প্রিয়-মিলনের মধুর আনন্দের স্মৃতি নায়িকা এইভাবে তাহার সখীদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে—"সখী আর ভয় নাই। একটি শীতল দক্ষিণ বায়ু আসিয়া আমার কাছে পৌঁছিল—কেহ সে আগমনের কথা জানিতে পারে নাই। তারপরে তুলসীমঞ্জরীর গন্ধ এবং মেঘের শীতলতা লইয়া সে আমার সমস্ত দেহে মনে স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিল।"[২]

কবি নম্মালোয়ারের প্রধান রচনা 'তিরুবায়্মোড়ি' দিয়া আমরা তাঁহার আলোচনা শুরু করিয়াছিলাম। সেই 'তিরুবায়্মোড়ি' দিয়াই এই আলোচনার উপসংহার করিতেছি। ভাগবতপুরাণে যে যুগ সম্পর্ক বলা হইয়াছে—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥

নম্মালোয়ার সেই ভক্তজন্ম-ধন্য কলিযুগে আবির্ভূত হন। কবি দুঃখ-তাপ ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের জন্য একটা নতুন দিনের আভাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—ভক্তের দল যখন প্রচুর

---

১ তৈয়নল্লায়্কল্ কুলাঙ্গল্ কুলিয় কুলুবিষ্টুম্—পদ সং ৮৪

২ পদ সং ৫৬

সংখ্যায় মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন আর ভয় কিসের? 'যুগের পরিবর্তন ঘটিবে, কলিযুগের অবসান হইবে'—এই সুরে নম্মালোয়ারে কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায়। কবি গাহিয়াছেন—

"জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক। মনুষ্যজীবনেয় নিষ্ঠুর অভিশাপ চলিয়া গেল। নরকের দুঃখকষ্টও বিনষ্ট হইল। এই পৃথিবীতে যমরাজের আর কিছু করিবার নাই। কলিযুগও শেষ হইতে চলিল। কারণ, সেই সমুদ্র-শ্যাম কৃষ্ণের সহচরগণ দলে দলে আসিয়া এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভুর কীর্তি-গাথা গাহিয়া গাহিয়া ইতস্তত নাচিয়া বেড়াইতেছেন—ইহা আমরা দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, দেখিয়াছি। সেই দৃষ্টি-মধুর ব্যাপার দেখিয়াছি। হে ভক্তবৃন্দ! আসুন, আমরা সকলে উচ্চকণ্ঠে তাঁহার পূজার্চনা করিয়া আনন্দোৎসব করি। সেই শীতল-সুন্দর অলিবেষ্টিত-তুলসী-ভূষণ মাধব, তাঁহার সহচরবৃন্দ মধুর রাগে গাহিতে গাহিতে এই মাটির বুকে ব্যাপক ভ্রমণ করিতেছেন—আমরা তাহা দেখিয়াছি। জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক!"[১]

(সাত) তামিল বৈষ্ণব কবি আণ্ডাল্

৬৬. তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে আণ্ডাল্ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। দ্বাদশ আলোয়ারদের অন্যতম পেরিয়ালোয়ারের পালিতা কন্যা এই ভক্ত কবির কাব্য ও জীবন দুই-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য (দ্র° ১৩৮)। বৈষ্ণবপদসংকলন 'দিব্য-প্রবন্ধম্' গ্রন্থে তাঁহার যে ১৭৩টি পদ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৩০টি পদ "তিরুপ্পাবৈ" নামে পরিচিত। বাকি ১৪৩টি পদ লইয়া গঠিত হইয়াছে "নাচ্চিয়ার্

১ পোলিক পোলিক পোলিক! পোয়িট্রু বল্লুয়িরূচ্চাপম্,
—৫।২।১-২

তিরুমোড়ি"। কবির এই দুইটি অংশ স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেও প্রচলিত এবং ইহার মধ্যে "তিরুপ্‌পাবৈ" অংশে বলা হইয়াছে কৃষ্ণপ্রেম-প্রার্থিনী গোপরমণীদের ব্রতকথা আর "নাচ্চিয়ার্‌ তিরুমোড়ি"তে কবিই স্বয়ং নায়িকা। নায়ক তাঁহার কৃষ্ণ।

৬৭. তামিল সাহিত্যের একটি অতিপ্রসিদ্ধ রচনা "তিরুপ্‌পাবৈ"।[১] মাত্র ত্রিশটি স্তবকে সম্পূর্ণ এই কাব্যখানির বিষয়বস্তু এইরূপ: মার্গলি[২] মাসের পূর্ণিমার দিনে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গোপপল্লীর কুমারী মেয়েরা চলিয়াছে কৃষ্ণের ঘুম ভাঙাইতে। কৃষ্ণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদের প্রার্থনা পুরণ করিবে। তখনও ভালো করিয়া অন্ধকার কাটে নাই, টুপ্‌টুপ্‌ করিয়া শিশির বিন্দু ঝরিতেছে। অগ্রহায়ণ (বাংলাদেশের পৌষ) মাসের প্রবল শীতে তখনও সকলে শয্যা ত্যাগ করিতে পারে নাই। আগের দিন যাহারা কথা দিয়াছিল বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলকে ডাকিয়া তুলিবে, তখনও তাহাদের ঘুম ভাঙে নাই। কিন্তু সখীদের ডাকাডাকিতে আর শুইয়া থাকা সম্ভব হইল না। 'তিরুপ্‌পাবৈ'র এই অংশকে বলা যাইতে পারে 'ঘুমভাঙানিয়া' গান। অতঃপর কুমারী মেয়েরা সম্মিলিত হইয়া চলিল নন্দগোপের গৃহাভিমুখে। সেখানে কৃষ্ণকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিয়া গোপীরা তাহার বন্দনা গান করিয়া তাহাদের প্রার্থিত বস্তু সমেত ফিরিয়া আসিল। ইহাই কাব্যখানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কাব্যখানির ২৯ সং স্তবকে কৃষ্ণের নিকট গোপীদের উক্তি হইতে

১ 'পাবৈ' কথাটি পুতুল, প্রতিমা, রমণী, ব্রত প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং "তিরুপ্‌পাবৈ" বলিতে আমরা পবিত্র প্রতিমা (বা মূর্তি), পবিত্র নারী বা পবিত্র ব্রত যে কোনো একটি অর্থ বুঝিয়া লইতে পারি। শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজ দাস লিখিয়াছেন "শ্রীব্রত"।

২ 'মার্গলি' মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণকে বুঝাইলেও ইহা বাংলাদেশের পৌষমাসের সমকালীন।

তাহাদের ব্রত ও প্রার্থিত বস্তুর স্বরূপটি বোঝা যায়। গোপীরা বলিতেছে—"হে গোবিন্দ! প্রতি জন্মেই আমরা তোমার বন্ধু হইব। কেবল তোমারই সেবা করিব। তুমি আমাদের অন্য সমস্ত কামনা নিবৃত্ত কর। ইহাই আমাদের ব্রত।"

ঠিক সদৃশ না হইলেও তিরুপ্পাবৈ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভাগবতের দশম স্কন্দের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ব্রজকুমারীদের কথা যাহারা "হেমন্তে প্রথমে মাসি" অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণার্পিতচিত্ত হইয়া একমাস যাবৎ ব্রতাচরণ করে এবং নিজ নিজ নামে আহূত হইয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পরের বাহুধারণপূর্বক কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে যমুনার জলে স্নান করিতে যায়।

তিরুপ্পাবৈ কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে এইরূপে: আজ মার্গলি মাসের শুভ পূর্ণিমা তিথি। হে অলঙ্কার-ভূষিত গোকুলবাসিনী কুমারীবৃন্দ! তোমরা সকলে স্নান করিতে যাইবে কি? সেই যে কৃষ্ণ, তীক্ষ্ণবর্শাধারী কঠোর পরিশ্রমী নন্দগোপের পুত্র কৃষ্ণ, সুচারু-নয়নী যশোদার সিংহশিশু, চাঁদের মতো যাহার মুখখানি, সেই যে রক্তিমনয়ন মেঘশ্যাম নারায়ণ—সে যে আজ আমাদের প্রার্থিত বস্তু দান করিবে।[১]

অতঃপর দ্বিতীয় স্তবকে বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া তাহারা নিজেদের কর্তব্যের কথা বলিতেছে—হে জগদ্বাসী, আমরা আমাদের ব্রতপালনের জন্য যে সকল কাজ করিব, তাহার বিবরণ শুনিবে কি? ক্ষীর সমুদ্রে মৃদু নিদ্রায় মগ্ন সেই যে পরমপুরুষ, আমরা তাঁহার চরণ বন্দনা করিব। প্রত্যূষে স্নান করিয়া আমরা আজ আর দুগ্ধ-ঘৃত খাইব না, চোখে কাজল পরিব না, ফুল দিয়া আজ আর কেশ-সজ্জা করিব না, অনুচিত কোনো কাজ করিব না, কাহারও কাছে গিয়া কটু কথা বলিব না। আজ গৃহস্থকে ও সন্ন্যাসীকে

১ মার্গলিত্ তিঙ্গল্ মদিনিরৈন্দ নন্নালাল্—পদ সং ১

দু'হাত ভরিয়া যথাসাধ্য ভিক্ষা দিব এবং ব্রতউদ্‌যাপনের এই পথের কথা ভাবিয়া আনন্দ লাভ করিব।[১]

এইরূপে প্রথম পাঁচটি পদে ব্রতচারিণীদের কর্তব্য এবং সেই কর্তব্যপালনের সুফলের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। ষষ্ঠপদ হইতে শুরু হইল—আমরা যাহাকে বলিয়াছি 'ঘুমভাঙানিয়া গান'। কাব্যাংশে এই অংশকেই আমরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। পঞ্চদশস্তবক পর্যন্ত এইরূপ বর্ণনা চলিয়াছে। আমরা কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।—ঐ শোন, পাখিরাও জাগিয়া উঠিয়া গান গাহিতেছে। গরুড়-বাহন দেবতার মন্দিরে যে শুভ্র শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মহান্ শব্দ তোমার কর্ণগোচর হয় নাই কি? ওগো মেয়ে, ঘুম হইতে ওঠ।[২]

পরবর্তী পদটিতে গোপপল্লীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোপকুমারীরা এক বাড়ি হইতে আর এক বাড়িতে গিয়া সখীকে ডাকিয়া বলিতেছে—"ওগো ভূতো মেয়ে, চারিদিকে যে আনৈচ্চাত্তন্ পাখি (ভরদ্বাজ পাখি) একসঙ্গে মিলিয়া কিচির্ কিচির্ শব্দে মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহা তুমি শোন নাই কি? গোপবধূরা তাহাদের চুলের গন্ধ ছড়াইয়া মন্থন-দণ্ডের সাহায্যে দধি-মন্থন করিতেছে, তুমি তাহার শব্দ শোন নাই কি? মন্থনকালে হাত নাড়িবার ফলে অলঙ্কারের যে 'কল-কলপ্‌প্' শব্দ হইতেছে তুমি তাহাও শোন নাই কি? ওগো গিন্নি মেয়ে, আমরা যে নারায়ণের বন্দনা-গীতি গাহিতেছি, তাহা শুনিয়াও তুমি ঘুমাইয়া আছ? লক্ষ্মী মেয়ে, দুয়ার খোল।[৩]

এইরূপে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া গোপ-

১ বৈয়ত্তু বাল্‌বীর্‌কাল্! নামুম্ নম্ পাবৈক্কু—পদ সং ২

২ পুল্লুম্ চিলম্বিন কাণ্। পুল্অরৈয়ন্ কোয়িলিল্—পদ সং ৬

৩ "কীচু কীচু" এণ্ড্রু এঙ্গুম্ আনৈচ্চাত্তন্ কলন্দু—পদ সং ৭

কুমারীদের পল্লীপরিক্রমার চিত্রটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া পল্লীবালার ব্রতনিষ্ঠা ও তাহাদের পারস্পরিক হৃদ্যতার যে পরিচয়টুকু পাওয়া যায় তাহার আবেদন কিছু উপেক্ষণীয় নয়। ইহা বৃন্দাবনের ব্রজরমণীদের আলেখ্য হইলেও, ইহার পটভূমি যে তামিলনাডের পল্লীপ্রকৃতি তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বাঙালীর খাঁটি কবি চণ্ডীদাস সম্পর্কে জনৈক সমালোচক[১] যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি—তামিল কবি আণ্ডাল্ এখানে তামিল দেশ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান নাই; বৃন্দাবনভূমি দূর হইতে আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তামিল কবির মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারাও তামিলনাডেরই কন্যা। মনে হয় আণ্ডাল্ এমন একটি ব্রতানুষ্ঠানের কাব্যরূপ দিয়াছেন, যাহা তাঁহার জন্মভূমিতে পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং যাহার সঙ্গে আশৈশব কবির পরিচয় ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। শৈব কবি মাণিক্কবাচকর্-প্রণীত 'তিরুবাচকম' কাব্যেও এইরূপ ব্রতানুষ্ঠানের পরিচয় আমরা পাইয়াছি (দ্র° ৫৩)। আজও যেমন মার্গলি মাসের প্রত্যূষে তামিল-কুমারীরা আণ্ডালের সংগীত কণ্ঠে লইয়া সখীদের ডাকিয়া তোলে, স্বয়ং কবিও একদিন এইরূপ কোনো লোক-সংগীত গাহিয়া গাহিয়া রামনাদ জেলার শ্রীবিল্লিপুত্তুর্ গ্রামে তাঁহার সখীদের ঘুম ভাঙাইতেন এইরূপ অনুমান মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না।[২] এগারো সংখ্যক পদে বলা হইয়াছে—"তোমার প্রতিবেশিনী বন্ধুরা যখন চারিদিক হইতে আসিয়া তোমার আঙিনায় প্রবেশ করিয়া মেঘবর্ণ কৃষ্ণের নাম কীর্তন করিতেছে, তখনও তুমি

---

১ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃ ৩২২

২ প্রাচীন তামিলনাডের সমাজ-জীবনে ভাগবতে বর্ণিত (১০।২২) 'কাত্যায়নীব্রত'-এর ন্যায় যে একটি কুমারী-ব্রতের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা বোঝা যায় প্রাচীন তামিল সাহিত্যে ইহার একাধিক উল্লেখ

কোনো সাড়া দিতেছ না। ওগো বড় মানুষের মেয়ে, তোমার এই ঘুমের অর্থ কি ?"[১]

সখীদের ডাকাডাকিতে অগত্যা এই বড় মানুষের মেয়েকে আসিয়া দল ভারি করিতে হইল। কিন্তু পাশের বাড়িতে গিয়াও দেখা গেল অনুরূপ অবস্থা! আঙিনায় প্রবেশের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। শীতের প্রত্যূষে কতক্ষণ আর বাহিরে বৃথা অপেক্ষা করা যায়? তাই সখীরা ডাকিয়া বলিতেছে—"দেখ, আমাদের মাথায় গাছের পাতা হইতে শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। আমরা তোমার বাড়ির সদর দুয়ারে আসিয়া রাবণ-সূদন আমাদের প্রিয় দেবতার গান গাহিতেছি, কিন্তু এখনও তুমি মুখ খোল নাই। আচ্ছা, এখন অন্তত শয্যা ত্যাগ কর। সকল গৃহস্থ যখন আমাদের গান শুনিয়া জাগিয়া উঠিল, তখন ইহা তোমার কিরূপ মহানিদ্রা ?"[২]

ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। অন্ধকার দূর হইয়া পুবের আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তখনও সকলের সমাবেশ হয় নাই, আরও কয়েক বাড়ি যাইতে হইবে। যে মেয়েটি সকলের আগে ঘুম হইতে উঠিবে বলিয়া গর্ব করিয়াছিল, এখনও তাহার ঘুম ভাঙে নাই। সখীরা ডাকিয়া বলিতেছে—"ঐ দেখ, তোমাদের খিড়কির পুকুরে রক্ত-কুবলয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কুমুদ ফুলগুলি ধীরে ধীরে বুজিয়া যাইতেছে। শুভ্রদন্ত গৈরিকবস্ত্রধারী সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের পবিত্র মন্দিরে শঙ্খধ্বনি করিতে

হইতে। শৈব কবি মাণিক্কবাচকরও তাহার 'তিরুবাচকম্' কাব্যের সপ্তম (তিরুবেম্পাবৈ) এবং বিংশ (তিরুপ্পল্লিএড়ুচ্চি) অধ্যায়ে এই অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়াছেন (দ্র° ৫৩)। সুতরাং বোঝা যায়, শৈব-বৈষ্ণব-নির্বিশেষে ইহা ছিল একটি জনপ্রিয় ব্রত।

১ চুট্রত্তুত্ তোলিমায় এল্লারুম্ বন্দু, নিন্—পদ সং ১১

২ পানিত্ তলৈ বীল্, নিন্ বাচল্ কডৈ পট্রি—পদ সং ১২

গিয়াছেন। ওগো মেয়ে, তুমি বড় উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলে, আমাদের আগেই ঘুম হইতে উঠিয়া তুমি আমাদের ঘুম ভাঙাইবে। এখন দেখিতেছি তোমার যত জোর কেবল জিহ্বায়, লজ্জা তোমার কিছুই নাই! ওগো কন্যে শয্যা পরিত্যাগ কর।"[১]

আরেক বাড়িতে গিয়া তো রীতিমত তর্কযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। সমাগত তরুণীরা যতই সখীকে বাহিরে আসিতে আহ্বান করে, সে ততই বিছানায় শুইয়া শুইয়া তাহাদের সহিত কথা কাটাকাটি করিতে থাকে। আলোচ্য পদের চরণগুলিতে এইরূপ সকৌতুক উক্তিপ্রত্যুক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছে। বাহিরে মেয়েরা শয্যাগত সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—"ওগো সখী, ওলো মোদের ছোট্ট টিয়ে পাখি, এখনও তোমার ঘুম ভাঙে নাই? এখনও শুইয়া আছ?" অমনি ভিতর হইতে রুক্ষ জবাব আসিল—"চুপ, তোমরা অত ডাকাডাকি করিয়া আমাকে বিরক্ত করিও না, আমি আসিতেছি।" সখীরা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিল না, বলিল—"অয়ি চতুরে, তোমার সত্য কথা (প্রতিশ্রুতি) এবং তোমার ধারালো জিহ্বাখানির কথা আমরা পূর্ব হইতেই জানি।" "কি বলিলে? চতুর জিহ্বা আমার না তোমাদের?" এই বলিয়াই উত্তরকারিণীর বোধ করি কিছুটা লজ্জাবোধ হইল এই ভাবিয়া যে বাহিরে অপেক্ষারত কৃষ্ণভক্ত কুমারীদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা সমীচীন হয় নাই। তাই সে নিজেকে সংশোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা আমিই না হয় চতুর-রসনা।" "তবে, এখন শীঘ্র বাহিরে এস। সকলে আসিতে পারিল, আর তুমি পারিলে না? কেন, তোমার কি অন্য কোনো বিশেষত্ব আছে?" "বল কি, সকলেই আসিয়া গিয়াছে?" "হ্যাঁ, আসিয়াছে; নিজে আসিয়া গুনিয়া দেখ।[২]

১ উন্গল্ পুলক্কডৈত্ তোট্টত্তু বাবিয়ুল্—পদ সং ১৪

২ এল্লে! ইলম্ কিলিয়ে! ইন্নম্ উরঙ্গুদিয়ো?—পদ সং ১৫

এইভাবে সকল গোপকুমারী মিলিত হইয়া চলিল কৃষ্ণের গৃহাভিমুখে। কৃষ্ণ-বধূ নপ্পিন্নৈ-কেও ডাকিতে ভুলিল না। ২৮ সংখ্যক পদে নপ্পিন্নৈ-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে এইভাবে—"হে নন্দগোপের পুত্রবধূ নপ্পিন্নৈ,[১] হে সুগন্ধ-কেশিনী, দুয়ার খোল। বাহিরে আসিয়া দেখ চারিদিকে মোরগ ডাকিতেছে। মাধবীকুঞ্জে কোকিলের দল মধুর সুরে ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে। হে কন্দুক-হস্তা (কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার জন্য নপ্পিন্নৈ বোধ করি হাতে 'বল' রাখিতেন), আমরা তোমার পতির নাম কীর্তন করিতেছি, তুমি তোমার কমল হস্তের কাঁকন বাজাইতে বাজাইতে সানন্দে আসিয়া দরজা খুলিয়া দাও।[২]

অতঃপর কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রতি গোপকুমারীদের নিবেদন। এই প্রসঙ্গে আমরা কেবল একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—"আমরা জাতিতে গোপ, ধেনু-কুলের পশ্চাতে বনে গিয়া সেখানেই আমরা আহার করি। আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। এইরূপ জ্ঞানহীন গোপকুলে যে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ইহা আমাদের বহু পুণ্যের ফল। হে সর্বদোষবিরহিত গোবিন্দ, তোমার সহিত আমাদের যে সম্পর্ক, ইহলোকে তাহা কখনও ছিন্ন হইবার নয়। অবোধ শিশুর মতো আমরা যদি ভালোবাসিয়া তোমাকে ক্ষুদ্র নামে ডাকিয়া থাকি, তুমি দয়া করিয়া রাগ করিও না। হে প্রভু, তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।"[৩]

৬৮. 'তিরুপ্পাবৈ' কাব্যে আণ্ডাল গোপকুমারীদের কথাই বলিয়াছেন, আত্মকথা কিছু বলেন নাই। অবশ্য কোনো কোনো

১ 'নপ্পিন্নৈ' কথাটির বিশ্লেষণ করা যায় এইভাবে: নল্ (অর্থাৎ উত্তম)+পিন্নৈ (অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভগিনী)।

২ নন্দগোপালন্ মরুমকলে! নপ্পিন্নায়্।—পদ সং ১৮

৩ কন্নৈকল্ পিন্ চেণ্ড্রু কানম্ চের্ন্দু উনবোম্—পদ সং ২৮

ব্যাখ্যাকার কবিকে গোপরমণীদের অন্ততম কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তৎসত্ত্বেও 'তিরুপ্পাবৈ'কে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কাব্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আণ্ডালের নিজস্ব কথা বলা হইয়াছে তাঁহার "নাচ্চিয়ার্ তিরুমোড়ি" (অর্থাৎ নয়িকার কথা) নামক কাব্যে। 'নায়িকার কথায় কবিই স্বয়ং নায়িকা। এই নায়িকা-কবির জীবন-কথা তেলুগু ভাষায় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন ষোড়শ শতাব্দীর সম্রাট্-কবি কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার 'আমুক্তমাল্যদা' নামক গ্রন্থে (দ্র° ১৩৮)। 'নাচ্চিয়ার্ তিরুমোড়ি' কাহিনী-কাব্য না হইলেও ইহার মধ্যে কৃষ্ণ-প্রণয়িনী আণ্ডালের প্রেমাকাঙ্ক্ষা চমৎকার রসরূপ লাভ করিয়াছে। মোট ১৪৩টি পদের মধ্যে আমরা মাত্র ৭।৮টি পদ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টির একটু আভাস লইবার চেষ্টা করিব।

কবি যৌবন পদার্পণ করিলে তাঁহার পালক-পিতা পেরিয়ালোয়ার্ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী আণ্ডালের পক্ষে কোনো মর্ত্যবাসীকে বিবাহ করা যে সম্ভব হইবে না একথা পিতাকে জানাইয়া দিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠাবোধ হইল না। প্রভু কৃষ্ণই যাঁহার পতি, রক্ত মাংসের মানুষে তাঁহার প্রয়োজন কী? এই প্রসঙ্গে মন্মথের উদ্দেশ্যে বলা কবির একটি প্রসিদ্ধ পদ দেওয়া হইল—স্বর্গবাসী দেবতাদের উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের যে হবি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বনে-জঙ্গলে বিচরণকারী শৃগাল আসিয়া শুঁকিয়া গেলে যেরূপ হয়, সেইরূপ শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুর জন্য আমার যে স্তনযুগল বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহা যদি মানুষেরই ভোগে লাগিয়া যায়, তবে হে মন্মথ, আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।[১]

১ বানিড়ৈ বালুম্ অব্ বানবর্ক্কু
মরৈয়বর্ বেল্‌বিয়িল্ বকুত্ত অবি—১।৫

প্রিয়-দেবতার সংস্পর্শ কিরূপ মধুর লাগিবে সেই চিন্তায় কবি বিভোর। কিন্তু কাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, কাহারই বা সে অভিজ্ঞতা হইয়াছে? শঙ্খধারী দেবতার কথা শঙ্খই বলিতে পারে ভাবিয়া আণ্ডাল তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিলেন। একটি পদ এইরূপ ঃ হে সমুদ্রজাত শুভ্র শঙ্খ, আমি গভীর তৃষ্ণা লইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি উত্তর দাও। আমার মাধবের অধরের স্বাদ কিরূপ? তাহা কি কর্পূরের মতো সুগন্ধি অথবা পদ্ম ফুলের মতো? সেই প্রবাল-সদৃশ অধরের মাধুর্যই বা কিরূপ?"[১]

প্রিয়-বিরহের বেদনায় অধীর হইয়া কবি কখনো দূতরূপে পাঠাইতেছেন কোকিলকে, কখনো বা প্রসিদ্ধ বিরহ-বার্তাবাহী মেঘকে। কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে কোকিল, নবগন্ধযুক্ত পুষ্পিত উদ্যানে প্রেমিকার সঙ্গে তোমার দিন কাটে ভ্রমরের মধুর রাগিণী শুনিয়া। তুমি আমার কালোমানিককে (কৃষ্ণকে) একবার আসিতে বলিও। আমার অস্থি গলিয়া যাইতেছে। আমার দুই চোখের পাতা বহুদিন যাবৎ এক হয় নাই। দুঃখ-সাগরে ডুবিয়া আমি বিষ্ণুরূপী তরণী না পাইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছি। প্রেমিকের কাছ হইতে দূরে থাকার যে বেদনা, হে কোকিল, তাহা তুমিও তো জানো। সেই স্বর্ণকান্তি গরুড়-ধ্বজকে একবার আমার কাছে আসিতে বলিও।"[২]

বর্তমানে আন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত বেঙ্কটাচলকে এক সময়ে তামিলনাডের সীমা বলিয়া ধরা হইত। বস্তুত তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে বেঙ্কটাচল এবং তাহার দেবতা তিরুপতির বিবরণ যথেষ্টই পাওয়া যায়। বৈষ্ণব জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ এই বেঙ্কটগিরির মেঘসমূহকে সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থই

১ কর্পূরম্ নারুমো? কমলপ্ পূনারুমো?—৭।১

২ পোদলয়্ কাবিল্ পুতুমনয়্ নারপ্ পোরিবিণ্ডিন্ কামরম্ কেট্টু —৫।৩৪

হৃদয়স্পর্শী—"হে মত্তহস্তী সদৃশ মেঘ, তুমি তো বেঙ্কটপর্বতকেই তোমার বাসস্থানরূপে বাছিয়া লইয়াছ। আমার প্রভুর খবর কী? তিনি কী উত্তর দিয়াছেন? দেখ মেঘ, যিনি সমস্ত জগতের আশ্রয়, তিনি কোনো বিচার বিবেচনা না করিয়াই একটি নারী-লতিকার মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, একথা শুনিলে জগদ্‌বাসী তাঁহার গুণকীর্তন করিবে না।"[১]

যাহার সহিত বাস্তব মিলন ঘটে না, অগত্যা স্বপ্নের মধ্যে দিয়াই তাহার সংসর্গলাভের আনন্দ ভোগ করিতে হয়। আণ্ডালের এইরূপ কয়েকটি পদ আছে যাহা স্বপ্ন-সম্মিলন পর্যায়ে স্থান পাইতে পারে। স্বপ্নদর্শনের পরবর্তী দিন প্রাতে কবি-নায়িকা তাঁহার পূর্বরাত্রির অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে সখীর কাছে বলিতেছেন—"হে সখি, ইন্দ্র সমেত সমস্ত দেবতারা আসিয়া মন্ত্র পাঠের দ্বারা আমার সম্বন্ধের কথা পাড়িলেন, আমাকে নববস্ত্র পরানো হইল, পার্বতীদেবী আমাকে বিবাহ-মাল্যে ভূষিত করিলেন—এইরূপ আমি স্বপ্ন দেখিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিলাম, মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিয়াছে, মধুর শঙ্খধ্বনি শোনা যাইতেছে, এবং মুক্তা-ঝালর শোভিত চন্দ্রাতপের নীচে আমার স্বামী মধুসূদন আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। আমি স্বপ্ন দেখিলাম, সুকণ্ঠে বেদপাঠ হইতেছে, বৃত্ত আঁকিয়া তাহাতে সবুজ দূর্বা স্থাপিত হইল, এবং তারপরে গজেন্দ্র-সদৃশ বিষ্ণুও আসিয়া আমার হাত দু'খানি ধরিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন।"[২]

তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্য কবির অন্যবিধ গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু প্রিয় ও দেবতার ব্যবধান ঘুচাইয়া উভয়কে একই আসনে অধিষ্ঠিত করার গৌরব মহিলা কবি আণ্ডালেরই প্রাপ্য। ভক্তির দেবতাকে প্রেমের নায়ক করিয়া তিনি যে তাঁহার কণ্ঠে

১ ময়দানৈ পোল্ এলুন্দ মা মুকিল্ কাল! বেঙ্কটত্তৈপ্—৮।৯

২ ইন্দ্রন্ উল্লিট্ট দেবর্ কুলমে এল্লাম্—৬।৩, ৬, ৭

বরমাল্য অর্পণ করিয়াছেন, তাহা কেবল তামিল সাহিত্যের সামগ্রী নয়, আমরা তাহাকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া মনে করি।

(আট) রাম ভক্তির আলোকে তামিল কবি কম্বন্

৬৯. ভক্তিরস গীতিকাব্য বা ঐ জাতীয় আবেগমূলক ক্ষুদ্র গদ্য-রচনার পক্ষে (যেমন কন্নড ভাষার বচন কবিতা) বিশেষ উপযোগী হইলেও মহাকাব্য বা সুবৃহৎ আখ্যানকাব্য সম্পর্কে তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ, ভক্তিরসের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া তাহার গল্পরস পদে পদে খণ্ডিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া একটা বিশেষ ছাঁচে গড়িয়া উঠে। এই প্রবণতার ফলে ভক্তিরসাত্মক আখ্যান-কাব্য বস্তু-লোকের স্বাভাবিকতাকে লঙ্ঘন করিয়া অলৌকিক জগতেব বস্তু হইয়া পড়ে এবং ভক্তিরস ও কাব্যরস পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবার ব্যতিক্রমও আছে। একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম হইল দ্বাদশ শতাব্দীর তামিল কবি কম্বন্-বিরচিত 'রামাবতার কাব্যম্', যাহা সাধারণত কম্ব-রামায়ণ নামে পরিচিত।

৭০. বাল্মীকি-রামায়ণ যে মূলত ভক্তিরসের কাব্য নয় ইহা একটি সুবিদিত তথ্য। এই কাব্যের সূচনায় রামচন্দ্র অবতার ছিলেন না, কবি তাঁহাকে মনুষ্যরূপেই কল্পনা করিয়াছিলেন। রামায়ণের যে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রামাবতারের কথা আভাসিত অথবা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণের মতে তাহা পরবর্তী কালের সংযোজন। এইরূপ প্রক্ষিপ্ত অংশের পরিমাণ খুব বেশি নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে বালকণ্ডের পঞ্চদশ সর্গে বর্ণিত দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ (১।১৫।২০-২১), অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে রামচন্দ্রের

যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য দশরথের সংকল্প (২।১।৭), সুন্দরকাণ্ডের ৫১তম সর্গে রাবণের প্রশ্নের উত্তরে হনুমানের আত্ম-পরিচয়দান (৫।৫১।২৯-৪০), যুদ্ধ কাণ্ডের ৭২ তম সর্গে রাবণের দৃষ্টিতে রঘুনন্দনে নারায়ণ-প্রতীতি (৬।৭২।১১), যুদ্ধকাণ্ডের ২১৪ তম সর্গে মন্দোদরী বিলাপে রামকে পরমপুরুষ বিষ্ণু বলিয়া উল্লেখ (৬।১১৪।১৪-১৭), যুদ্ধকাণ্ডের ১১৯তম সর্গে সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রসঙ্গে ব্রহ্মাদি কর্তৃক রামের স্বরূপকথন (৬।১১৯।৬, ১৩-১৪) ইত্যাদি।[১]

৭১. রামায়ণের যে দুইটি প্রধান চরিত্রকে বৈষ্ণবদের ভক্ত-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহাদের মধ্যে হনুমান বিশেষভাবে উত্তরভারতে জনপ্রিয় এবং বিভীষণের অনুরূপ জনপ্রিয়তা দক্ষিণভারতে। পরবর্তী যুগের রামায়ণ-কাব্যে এই দু'টিচরিত্র অবলম্বনে যে-ভাবে ভক্তিরসের স্ফুরণ হইয়াছে, বাল্মীকি রামায়ণে তাহার সামান্যই পরিচয় পাওয়া যায়। তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

বাল্মীকি রামায়ণের ৫।৫১তম সর্গে দেখিতে পাই হনুমান রাবণের কাছে নিজেকে রামের দূত বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছে—মহাযশা রাম সংসারের সর্বজাতীয় প্রাণিপুঞ্জের সংহার করিয়া পুনরায় সেইরূপ সৃষ্টি করিতে পারেন।[২] হনুমানের উল্লিখিত বাক্যাংশে রামের ভগবত্তা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই রামকে বিষ্ণু না বলিয়া বলা হইয়াছে বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী।[৩] তুলসীদাসের রামায়ণে দেখা যায়, হনুমান এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছে—'হে রাবণ শোন, যাঁহার

১। বর্তমান প্রবন্ধে বাল্মীকি রামায়ণের সংকেত সূত্রগুলি মদ্রাস হইতে প্রকাশিত রামরত্নম্ সংস্করণ (১৯৫৮) অনুযায়ী।

২। সর্বাল্লোঁকান্ সুসংহৃত্য সভূতান্ সচরাচরান্॥
পুনরেব তথা স্রষ্টুং শক্তো রামো মহাযশঃ। ৩৯-৪০

৩। যো রামং প্রতিযুধ্যেত বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্॥৪২

বলে মায়া সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে, যাঁহার বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে, দেবগণের রক্ষার জন্য যিনি নানা প্রকার দেহধারণ করেন, যাঁহার সামান্য বলে বলীয়ান্ হইয়া তুমি সমস্ত চরাচর জয় করিয়াছ, আমি তাঁহারই দূত।'—

সুনু রাবণ ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া। পাই জাসু বল বিরচতি মায়া॥
জাকেঁ বল বিরিঞ্চি হরিঈসা। পালত সৃজত হরত দসসীসা॥
ধরই জো বিবিধ দেহ সুরত্রাতা।......
জাকে বল লবলেস তেঁ জিভেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ......

হনুমান কেবল আত্মপরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই অযাচিতভাবে রাবণকে উপদেশও দিয়াছে—'হে রাবণ আমি হাত জোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তুমি স্বীয় পবিত্র কুলের কথা চিন্তা করিয়া এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তভয়হারী ভগবানকে ভজনা কর।'—

বিনতী করউঁ জোরি কর রাবণ।
সুনহু মান তজি মোর সিখাবন॥
দেখহু তুম্হ নিজ কুলহি বিচারী।
ভ্রম তজি ভজহু ভগত ভয় হারী॥

বাল্মীকি রামায়ণের যে অংশটি বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে মহাভারতের গীতা অংশের সহিত তুলনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে তাহা হইল রামের চরণে বিভীষণের শরণ গ্রহণ (৬।১৮)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়াছিলেন পরম আশ্বাসবাণী—মামেকং শরণং ব্রজ। বাল্মীকি রামায়ণে রামও বলিয়াছেন—'যখন বিভীষণ মিত্রতা করিবার নিমিত্ত আমার শরণাগত হইয়াছে তখন তাহার অশেষ দোষ থাকিলেও আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।... একবার মাত্র 'আমি আপনার শরণাগত হইলাম' এই কথা বলিয়া

আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে সে যে হউক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভয় প্রদান করিব।'[১]

উল্লিখিত অংশে শরণাগতির প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহা মানুষের সাধারণ ধর্মবাচক। ইহার মধ্যে ভক্ত-ভগবানের কল্পনা অনাবশ্যক। তুলসীদাসের রাম বলিয়াছেন—'যে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপে মগ্ন, শরণাগত হইলে আমি তাহাকে ত্যাগ করি না। জীব যেইমাত্র আমার সম্মুখে আসে তখনই তাহার জন্মজন্মান্তরের পাপ নষ্ট হইয়া যায়।'[২] ইহা হইল ভগবান রামের উক্তি।

বাল্মীকি রামায়ণে অবশ্য রামের একটি কথা পাওয়া যায় এইরূপ —'আমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাই নিহত করিতে পারি।'[৩] ইহা মানুষ রামের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ইহা অবশ্যই ভগবান রামের উক্তি। কিন্তু অগ্র-পশ্চাতের সহিত মিলাইয়া লইলে রামের এই উক্তিটি অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইবে! একটু পরেই দেখা যায়, সুগ্রীব বিভীষণকে রামের সম্মুখে উপস্থিত করিলে রাম প্রথম আলাপেই জিজ্ঞাসা করিলেন—বিভীষণ তুমি রাক্ষসগণের বলাবল সমস্ত আমার নিকট প্রকৃতরূপে বর্ণনা কর—

আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্ ॥ ৬।১৯।৭

১ মিত্র ভাবেন সংপ্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথংচন।
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ .....
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি যাচতে ॥
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতংমম। ৬।১৮।৩, ৩৩-৩৪

২ কোটি বিপ্রবধ লাগহিঁ জাহূ। আএঁ সরন তজউঁ নহিঁ তাহূ ॥
সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ ॥

৩ পিশাচান্ দানবান্ যক্ষান্ পৃথিব্যাং চৈব রাক্ষসান্ ॥
অঙ্গুল্যগ্রেণ তান্ হন্যামিচ্ছন্ হরিগণেশ্বর। ৬।১৮।২৩-২৪

বিভীষণের কাছ হইতে এইভাবে রাক্ষস-বাহিনীর বলাবল সম্পর্কে গুপ্ত সংবাদ আদায় করার চেষ্টা ভগবান রামের পক্ষে আদৌ মর্যাদা-সূচক নয়। তুলসীদাসের রাম এক্ষেত্রে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অশোভন কিছু নাই—'হে বিভীষণ, তোমার পারিবারিক কুশল বল'—

কহু লঙ্কেস সহিত পরিবারা। কুসল......

আসলে বাল্মীকির রাম মানুষ হিসাবেই রাক্ষস বাহিনীর বলাবল জানিতে চাহিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। সুতরাং সেই রামের মুখে—'আমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাই নিহত করিতে পারি।'—এইরূপ ভাগবত উক্তি নিতান্তই অসঙ্গত।

বিভীষণ যে ভক্ত পুরুষ, বাল্মীকি রামায়ণ হইতে তাহা বোঝা যায় না। মূল রামায়ণে বিভীষণ যতবার রাবণকে উপদেশ দিয়াছে তাহার মূল কথা হইতেছে ন্যায়ধর্ম আচরণ। 'সীতাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়, রামের সহিত শত্রুতা করিয়া লাভ কী? আপনি সীতাকে ফিরাইয়া দিন'—

আহৃতা সা পরিত্যাজ্যা কলহার্থে কৃতেন কিম্॥
বৈরং নিরর্থকং কর্তুং দীয়তামস্য মৈথিলী॥ ৬।৯।১৬-১৭

'যে অবধি সীতা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন সেই হইতেই নানাবিধ অশুভ সূচক দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে।'—

যদা প্রভৃতি বৈদেহী সংপ্রাপ্তেমাং পুরীং তব।
তদা প্রভৃতি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যশুভানি নঃ॥ ৬।১০।১৪

'আমি এই লঙ্কাপুরী, রাক্ষসরাজ, তাহার সুহৃদগণ, যাবতীয় রাক্ষসগণের হিতের নিমিত্ত বলিতেছি—সীতাকে ফিরাইয়া দিন।'—

ইদং পুরস্যাস্য সরাক্ষস্য রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সসুহৃজ্জনস্য।
সম্যগ্ হি বাক্যং সততং ব্রবীমি নরেন্দ্রপুত্রায় দদাম পত্নীম্॥
—৬।১৪।২০

এই সমস্ত উক্তি ন্যায়-নীতি-নিষ্ঠ সৎমানুষের কথা, ইহার মধ্যে ভক্ত বা ভক্তির কোনো আভাস নাই।

তুলসীদাসের রামায়ণে বিভীষণ অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছে—'সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রঘুবীরকে ভজনা করুন, যাঁহাকে সমস্ত সাধু ধর্মাত্মা ভজনা করেন। রাম কেবল মনুষ্যকুলেরই রাজা নহেন, তিনি সমস্ত লোকেরও প্রভু, কালেরও কাল। তিনি নিরাময় (বিকার-রহিত), অজন্মা (জন্ম-রহিত), ব্যাপক, অজেয়, অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম।'—

তাত রাম নহিঁ নরভূপালা। ভুবনেস্বর কালহু কর কালা॥
ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্তা। ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্তা॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখা যায়, বিভীষণ উপদেশ-প্রসঙ্গে রাবণকে বলিতেছে ঃ

প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞ জন।
অন্ধ যে চিনিতে নারে পেয়েও রতন॥

বাল্মীকি রামায়ণের ৬।৫০ সর্গে দেখা যায়, ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ রাম-লক্ষ্মণকে ভূপতিত দেখিয়া বিভীষণ এই বলিয়া রোদন করিতেছে—'হায়, যাহাদের বীর্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, সেই পুরুষপুঙ্গব রাজনন্দন-যুগল দেহ নাশ করিবার নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছেন। ইহাদের এইরূপ অবস্থায় আমি জীবিত থাকিয়াও বিপন্ন হইলাম এবং আমার রাজ্যলাভের আশাও নষ্ট হইল।'—

যয়োর্বীর্য্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া।
তাবুভৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুষর্ষভৌ॥
জীবন্নস্য বিপন্নোঽস্মি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ। ৬।৫০।১৮-১৯

বলা বাহুল্য, ইহা ভক্তজনের উক্তি নহে। ইহার পশ্চাতে রাজ্যলাভের যে আকাঙ্ক্ষা উঁকি মারিয়াছে, তাহারই জন্য বিভীষণ উত্তরকালে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে দেশদ্রোহীরূপে চিহ্নিত হইয়াছে।

বাল্মীকি রামায়ণের যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাম ভগবানরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন, তর্কের খাতিরে সেইগুলিকে মূল রচনার অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও পরবর্তীকালের ভক্তিকাব্য হইতে বাল্মীকি-রামায়ণের এই একটা বড়ো পার্থক্য দেখা যায় যে, তুলসীদাস প্রভৃতির রচনায় রাম যেমন নিজের ভগবৎ-সত্তা সম্পর্কে সচেতন, মূল রামায়ণে তাহা নাই। ৬।১২০তম সর্গে সীতার অগ্নিপরীক্ষা-প্রসঙ্গে রামচন্দ্র বলিতেছেন—'আত্মানাং মানুষং মন্যে। আমি নিজেকে দশরথ-নন্দন রাম-নামক মানুষ বলিয়া জানি' (৬।১২০।১১)। রামচন্দ্রের প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা বলিলেন—'আপনি চক্রধারী নারায়ণ। আপনি পুরুষোত্তম' ইত্যাদি (৬।১২০।১৩, ১৫)। ব্রহ্মা রামের স্তব করিলেও রাম যে নিজের মহিমা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। তুলসীদাসের রাম একাধিক স্থলে কখনও ইঙ্গিতে কখনও প্রকাশ্যে তাঁহার ভগবৎ-সত্তার কথা বলিয়াছেন। রাজা জনক বিশ্বামিত্রের কাছে রামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মুনি বলিলেন—'জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেরই ইনি প্রিয়।' মুনির এই রহস্যময়ী বাণী শুনিয়া রাম মনে মনে হাসিলেন। তাঁহার এই হাসির তাৎপর্য এই যে, তিনি মুনিকে রহস্যভেদ করিতে নিষেধ করিতেছেন। তখন মুনি বিশ্বামিত্র ইঙ্গিতের মর্ম বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—'ইনি রঘুকুলমণি মহারাজ দশরথের পুত্র' ইত্যাদি।—

> য়ে প্রিয় সবহি জহাঁ লাগি প্রাণী।
> মন মুস্থকাহি রামু স্থনি বাণী।
> রঘুকুলমনি দশরথ কে জাএ।
> মম হিত লাগি নরেস পাঠাএ॥

মারীচ বধের পূর্বে রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন—'হে প্রিয়ে, এখন আমি কিছু মনোহর মনুষ্যলীলা দেখাইব।' বাল্মীকি-রামায়ণে ব্রহ্মাদি কর্তৃক বন্দিত হইয়া রাম বলিলেন—'আত্মানাং মানুষং মন্যে।'

তুলসী রামায়ণে রাম অযাচিতভাবেই সীতাকে বলিলেন—'মৈঁ কছু করবি ললিত নরলীলা।'

বাল্মীকি রামায়ণে রামকে বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার বলা হইলেও আবার বহু স্থলে তাঁহাকে বিষ্ণুর সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—'বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে' (১।১।১৮) ইত্যাদি। ১।১।৯৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়া রাম ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন—

দশ বর্ষ সহস্রাণি দশ বর্ষ শতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি ॥

রাম মনুষ্য না হইয়া বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার হইলে তাঁহার সম্পর্কে এই জাতীয় উক্তি প্রযুক্ত হইত না। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে বাল্মীকি রামায়ণে সমগ্র বালকাণ্ডের নায়ক বিশ্বামিত্র রামের অবতার সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। সুতরাং একথা নিসেন্দেহে বলা যায় যে, "বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন। কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত, সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রাম মহিমান্বিত।...রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে।" (প্রাচীন সাহিত্য)

৭২. রামচন্দ্রের নর হইতে নারায়ণে পরিণতি লাভের ধারাটি উপযুক্ত ইতিহাসের অভাবে অস্পষ্ট হইয়া আছে। বাল্মীকি ও তুলসীদাসের মধ্যে দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধান। অবশ্য তুলসীদাস রামভক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হইলেও তাঁহার অনেক কাল পূর্ব হইতেই রামভক্তি ও রামোপাসনা চলিয়া আসিয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের অবতারবিষয়ক অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু তাহা অর্বাচীন নহে।

৭৩. রামচন্দ্র অযোধ্যার আর্য সন্তান হইলেও তাঁহার

লীলা-সাধনার অমর নিকেতন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল। ইহা মনে করা কিছু অযৌক্তিক হইবে না যে, রামভক্তির প্রথম সূচনা ও উদ্‌ভব ঘটিয়াছিল দক্ষিণ ভারতে। "রামকথা"র রচয়িতা কামিল বুল্‌কে সাহেবের অনুমান আমাদের বিশ্বাসের অনুকূল।[১] ভারতীয় ধর্ম সাহিত্যের অভিজ্ঞ লেখক ফার্কুহর সাহেবও মনে করেন রাম ভক্তির উৎপত্তি হয় দাক্ষিণাত্যে—তামিলনাড়ে।[২] বর্তমান তামিলনাড়ে পৃথক কোনো রামসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও এমন অনেক ভক্ত সাধকের কথা জানা যায় যাঁহারা রামনামের মধ্যেই মুক্তি অন্বেষণ করেন। এইরূপ সাধক মণ্ডলীর মধ্য হইতে আবির্ভূত অর্বাচীন কালের শ্রেষ্ঠ মহাজন হইতেছেন তাঞ্জোরের তেলুগু কবি ত্যাগরাজ—অষ্টাদশ শতকে যাঁহার রচনা ও গীতনৈপুণ্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করিয়াছে। এই সমস্ত হইতে যদি অনুমান করা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে প্রাচীন যুগেই একটি রামাইত সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব ঘটে তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। প্রাচীন যুগের আলোচনার পূর্বে আমরা মধ্য যুগের কথাটা সারিয়া লইতে চাই।

৭৪. মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধনা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাঁহার কথা মনে জাগে, তিনি দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সন্তান পঞ্চদশ শতকের সাধক স্বামী রামানন্দ। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে রামানন্দ একটি শ্রেষ্ঠ নাম হইলেও তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ রামানন্দের জন্মস্থান প্রয়াগ বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি যে দ্রাবিড় সন্তান ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।[৩]

১ রাম কথা—কামিল বুল্‌কে, প্রথম সংস্করণ পৃ ১৫০

২ J. N. Farquhar—An outline of the religious literature of India p. 25.

৩ J.N. Farquhar -An outline of the religious literature of India p. 324

রামানুজের শিষ্য পরম্পরায় রামানন্দ পঞ্চম স্থানীয়।[১] স্বীয় গুরু রাঘবানন্দের সহিত কোনও কারণে মতভেদ ঘটিলে রামানন্দ ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ উত্তর ভারতে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার ধর্ম সাধনার নূতন কেন্দ্র হইল কাশী। গুরু শিষ্যের কলহ নীতির দিক হইতে নিন্দনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তর ভারতের ভক্তি সাধনার দিক হইতে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। রামানন্দকে প্রকৃতপক্ষে হিন্দী ভক্তি সাহিত্যের প্রধান গুরুরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।[২] কেবল হিন্দী সাহিত্যই নয়, সাধারণভাবে সমগ্র মধ্যযুগের সাধনাতেই তিনি নব প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব রচনার পরিমাণ খুবই সামান্য।[৩] এবং এই সকল রচনার উপর তাঁহার কীর্তি নির্ভরশীল নয়। রামানন্দের প্রধান কীর্তি ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে কতগুলি পরিবর্তন সাধন। প্রথমত, সংস্কৃতের পরিবর্তে তাঁহার উপদেশ দানের মাধ্যম হইল তৎকাল প্রচলিত মুখের ভাষা। এতদিন যে সাধনা ছিল প্রধানত সংস্কৃত চর্চাকারীদের মধ্যে আবদ্ধ, তাহাকে তিনি সর্বজনের সাধনা করিয়া তুলিলেন। দ্বিতীয়ত, উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

১ ভাণ্ডারকরের মতে রামানুজ ও রামানন্দের মধ্যে তিন পুরুষের ব্যবধান এবং রামানন্দের জীবৎকাল চতুর্দশ শতাব্দী (১৩০০-১৪১১খ্রীষ্টাব্দ)।

২ হিন্দীতে একটি কথা প্রচলিত আছে যাহার তাৎপর্য এইরূপ: ভক্তির উৎপত্তি দ্রাবিড় দেশে, তাহা উত্তর ভারতে লইয়া আসেন রামানন্দ এবং প্রকট করেন কবীরদাস।

৩ রামানন্দ-রচিত তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়—বেদান্ত সূত্রের আনন্দভাষ্য, রামার্চন পদ্ধতি এবং বৈষ্ণবমতাব্জ ভাস্কর। ইহা ছাড়া রামানন্দ হিন্দীতেও কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থসাহেবে এইরূপ একটি পদ রামানন্দের ভণিতায় পাওয়া যায়—'কত জাঈ ঐ রে ঘর লাগো রঙ্গু'—কোথায় যাইতেছ, ঘরে উৎসব লাগিয়াই আছে।

তাঁহার মতে গুরুকে হইতে হইবে আকাশধর্মী—যে আকাশ নিরন্তর আলোক বিতরণ করিয়া বৃক্ষশিশুকে বড়ো হইবার অবকাশ দেয়।[১] তৃতীয়ত, তাঁহার ঔদার্য। আচারনিষ্ঠ রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত বৈষ্ণবদের পঙ্‌ক্তিভোজন অনুমোদন করেন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সমাজের নিচু তলার লোক। তন্মধ্যে পীপা, ধন্না, সেনা, রৈদাস, কবীর প্রভৃতি কয়েকজন সাধকজীবনে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। মোট কথা, আচারের ধর্ম ছাড়িয়া ভক্তি ধর্মের প্রচারে রামানন্দ দেশকে মাতাইয়া তুলিলেন।[২] চতুর্থত, তিনি রামানুজপন্থী হইয়াও কৃষ্ণের পরিবর্তে বিষ্ণুর অন্যতর অবতার রামের উপাসনা প্রচার করিয়া যান।

৭৫. এই শেষোক্ত সংস্কারই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। এই সম্পর্কে একটা অনুমানের অবকাশ রহিয়াছে। রামানুজের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে রামভক্ত সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোনো প্রখর ব্যক্তিত্বশালী গুরুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কিনা জানা যায় না। এই পৃথক রামাইত বৈষ্ণব সম্প্রদায় একাদশ শতকে কৃষ্ণোপাসক রামানুজের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু তাহারা যে রামানুজ-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়াছিল এরূপ মনে হয় না। বরং তাহার বিপরীত সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাষায় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি যে

---

১ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা পৃ ৪৮

৩ ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতের সংস্কৃতি পৃ ৬০। রামানন্দের মানবমন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে যে কত গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল তাহা বোঝা যায় 'পুনশ্চ' গ্রন্থের শুচি, প্রেমের সোনা ও স্নান সমাপন কবিতা হইতে। পত্রপুটেও তাহার প্রভাব রহিয়াছে।

কয়খানি সাম্প্রদায়িক রামায়ণ রচিত হয় অর্থাৎ বিশেষভাবে রাম ভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই যে গ্রন্থগুলির রচনা, তাহাদের আদি গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (রচনাকাল ১১০০—১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যাত্ম রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্য বেদান্ত দর্শনের আধারে রামভক্তির প্রতিপাদন। বস্তুত রামভক্তির বিকাশ সাধনে এই গ্রন্থখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের আনন্দ রামায়ণ, একনাথকৃত মরাঠী রামায়ণ, তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস প্রভৃতির উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ কাহার রচনা বলা কঠিন। রামানন্দী সম্প্রদায়ে এই গ্রন্থখানির বিশেষ সমাদর ও প্রতিপত্তি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, রামানন্দই এই গ্রন্থের রচয়িতা।[১] কিন্তু ফাকু্হরের মতে অধ্যাত্ম রামায়ণের রচনাকাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী।[২] সে যাহাই হউক, তামিলনাড়ে যে রামভক্ত সম্প্রদায় রামানুজ-সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া যায়, তাহাদের মধ্য হইতেই রামানন্দের আবির্ভাব এবং তাহার দুই শতাব্দী পূর্বে অধ্যাত্ম রামায়ণের সৃষ্টি।

৭৬. অধ্যাত্ম রামায়ণের অন্তত এক শতাব্দী পূর্বে এবং যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণেরও কিছুকাল আগে সুপ্রসিদ্ধ তামিল ভক্তকবি কম্বন্ তাঁহার রামায়ণ "রামাবতারকাব্যম্" রচনা করেন। কেহ কেহ কম্বনের আবির্ভাব কাল নবম শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিলেও তামিল সাহিত্যের পূর্বাপর ইতিহাস বিবেচনা করিয়া আমরা তাঁহাকে দ্বাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া স্বীকার করাই অধিকতর সঙ্গত মনে করি। কম্ব-রামায়ণে যে ভক্ত কবির পরিচয় রহিয়াছে তাহাতে এ কথা মনে করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না যে, কম্বনের বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই তামিলনাড়ের চিত্তভূমিতে রামভক্তির বীজ

---

১ কামিল বুল্কে—রামকথা পৃ ১৬৪

২ J. N. Farquhar—An outline of the religious literature of India p. 250

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখানে একটি সদৃশ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে চাই। তুলসীদাসের অগ্রবর্তী কবি মলিক মুহম্মদ জায়সী রচিত 'পদমাবত্' কাব্যে রামায়ণের পুনঃপুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করিতে বাধা নাই যে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' রচনার অনেককাল পূর্ব হইতেই রামচন্দ্রের পবিত্র জীবন-কথা উত্তর ভারতের জন-জীবনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। 'রামচরিত-মানস' সেই বিশিষ্ট জন-চেতনার ভক্তি-ঘন রূপ। কম্ব-রামায়ণ এবং তামিলনাডে রামভক্তিপ্রচার—এই উভয় সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা চলে। কম্বন্ যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা জনমানসের ভক্তিচেতনার উৎকৃষ্ট কাব্যরূপ মাত্র। কম্বনের অনেককাল পূর্ব হইতে তামিলনাডে রামায়ণের কাহিনী কতটা পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল এবং কিভাবে তাহা ধীরে ধীরে ভক্তিধর্মের অবলম্বন হইয়া উঠে, প্রাচীন তামিল সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা তাহার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব।[১]

৭৭. তোল্কাপ্পিয়ম্-এ বিষ্ণুর রামাবতারের কোনও উল্লেখ নাই। রামায়ণ-কাহিনীর প্রথম উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় তৃতীয় সঙ্ঘম্-এর কোনও কোনও রচনায়। "এট্টুত্-তোকৈ"র অন্তর্গত "অক-না-নূরু" (প্রেম চতুঃশতক) ও "পুর-না-নূরু" (যুদ্ধ-চতুঃশতক) দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'পুর-না-নূরু'তে আছে (দ্রষ্টব্য ৩৭৮ সং কবিতা—১৮-২১ পংক্তি) রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সীতা কর্তৃক অলঙ্কার-নিক্ষেপ, সুগ্রীব প্রভৃতির সেই অলঙ্কার প্রাপ্তি ও অলঙ্কার পরিধানের পদ্ধতি জানা না থাকায় বিস্ময়-মূঢ় বানরদের দেহের যত্র-তত্র অলঙ্কার পরিধানের চেষ্টা। "অক-না-নূরু"তে আছে (দ্রষ্টব্য ৭০ সং কবিতা—১৫-১৭ পংক্তি), সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এক বিরাট বটবৃক্ষের নিচে রামচন্দ্র তাঁহার যুদ্ধ পরিষদের সভা আহ্বান করেন।

১ প্রাচীন তামিল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত কাঠামোর জন্য দ্র° ৩৩

তখন সেই বৃক্ষস্থিত পক্ষিকুলের কোলাহলে মন্ত্রণা সভার কিছু ব্যাঘাত ঘটে।

৭৮. এই সমস্ত গ্রন্থে রামকথার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকিলেও তাহার মধ্যে রামের প্রতি বিশেষ কোন শ্রদ্ধা বা ভক্তিপূর্ণ মনোভাবের ইঙ্গিত নাই। সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় সঙ্ঘোত্তর সাহিত্যে—চিলপ্পধিকারম্, মণিমেখলৈ প্রভৃতি গ্রন্থে। আমরা এখানে বিশেষভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত 'চিলপ্পধিকারম্' (নূপুর কাব্য) গ্রন্থে বর্ণিত রাম কথার উল্লেখ করিতে চাই। গ্রন্থের নায়ক কোবলন্ সর্বস্বান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে কউন্তি অডিকল্ (কৌন্তী দেবী) তাহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করেন। অতীতযুগে কিভাবে মহৎ ব্যক্তিরা জীবনে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের কথা আসিয়া পড়ে। বর্ষীয়সী রমণী রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে রাম স্বয়ং মহাবিষ্ণু এবং তাঁহার মধ্য হইতেই বেদকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, রামায়ণের এই কাহিনী অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থের অন্যত্র কবি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোবলন্-এর মৃত্যুর পর মাদুরা নগরী রামচন্দ্রের নির্বাসনের পরে অযোধ্যা নগরীর ন্যায় শ্রীহীন হইয়া পড়িল। অপর একটি স্থলে বলা হইয়াছে যে, রামায়ণের কাহিনী যে শ্রবণ করে নাই সে সত্যই হতভাগ্য।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত কিছু অযৌক্তিক নয় যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের বেশ কিছুকাল পূর্বেই তামিলনাডে রামাবতারের কল্পনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চিলপ্পধিকারম্ কাব্যে তাহার প্রথম সাহিত্যরূপ। অর্থাৎ বাল্মীকি রামায়ণ (রচনাকাল খ্রী° পূ° তৃতীয় শতাব্দী) রচিত হওয়ার অর্ধ সহস্রাব্দী না যাইতেই এবং কম্বনের আবির্ভাবের এক সহস্রাব্দী পূর্বেই তামিলনাডে রামভক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। রামভক্তির প্রতিষ্ঠা হইলেও তখনও

কোনো সঙ্ঘবদ্ধ রামইত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

চিলপ্পধিকারম্ কাব্যে রামভক্তির যে উন্মেষ দেখা গেল, তাহার বিকশিত রূপের সন্ধান পাই পঞ্চম ও নবম শতকের মধ্যে আবির্ভূত আলোয়ার সাধকদের রচনায়। কুলশেখরের রচনার একপঞ্চমাংশ রামভক্তি-বিষয়ক। প্রধান কবি নম্মালোয়ার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—রামচন্দ্র প্রভুর কথা ছাড়িয়া যাহারা অন্য কথা শ্রবণ করে তাহারা কিছু জ্ঞানলাভ করিবে কি ?—

কর্পার ইরাম পিরানৈ অল্লাল্ মট্রুম্ কর্পরো ?[১]

নম্মালোয়ারের এই স্পষ্ট ঘোষণার পশ্চাতে যেন একটা শক্তিশালী সম্প্রদায়ের কলধ্বনি শোনা যাইতেছে।

৭৯. কিন্তু প্রশ্ন জাগিতে পারে আর্যাবর্তের সন্তান রামচন্দ্র কি কারণে দাক্ষিণাত্যে প্রথম ভক্তি-আরাধনার পাত্র হইলেন ? রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ হইতে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে। আমরা ইতিপূর্বে রামায়ণের কাহিনীকে আর্য-দ্রাবিড়ের সংঘর্ষ কাহিনী বলিয়াছি (দ্র° ২১)। আবার ঐ রামায়ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষের উপাদানও প্রচুর। অর্থাৎ এই মহাকাব্যের উদার বীর্যবান নায়ককে অবলম্বন করিয়া তৎকালীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন 'জাতীয়' মনোবৃত্তির যে একটা সামঞ্জস্য হইতেছিল তাহা বেশ বোঝা যায়। তৎকালীন সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম, বশিষ্ঠ বংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিত বংশ, তথাপি অল্প বয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া

১ রায় চৌ-সম্পাদিত "আড়্বার্ অমুদু" ৩৪৭ সং পদ

লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিতে পারে নাই।...অকস্মাৎ যৌবরাজ্য অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে-একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রবল এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এইজন্য একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীরপুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" (ইতিহাস পৃ ২৩-২৭)

কিন্তু রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল দলের এই ষড়যন্ত্র কেন? কারণ রামচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা নিধনের দ্বারা তাহার সমাধান করিতে গেলে তাহা অন্তহীন দুশ্চেষ্টায় পরিণত হইবে। প্রেমের দ্বারা, মিলনের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। তাঁহার এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষমতাসীন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণশ্রেণীর মনঃপূত হয় নাই। সুতরাং রাজ্যলাভের অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন।

আর্যাবর্তে তাঁহার স্থান হইল না বটে কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাঁহার বিশেষ সমাদর হইল। কারণ "তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে, তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।" (ইতিহাস পৃ ৩০)

সুতরাং দেখা গেল যে, রামচন্দ্র বানর প্রভৃতি অনার্যদিগকে

এবং বিভীষণ প্রমুখ রাক্ষসগণকে যে জয় করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নয়, প্রেমধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমান ও বিভীষণের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের প্রথম ভক্ত হনুমান ও বিভীষণ—ইঁহারা কেহই আর্যাবর্তের অধিবাসী অথবা আর্যবংশসম্ভূত ছিলেন না। এই সমস্ত কারণে আমরা মনে করি, রামভক্তির উদ্‌ভব ঘটে দাক্ষিণাত্যে আর্যেতর সমাজে।

৮০. আমরা দেখিয়াছি, কম্বনের অনেককাল পূর্বেই রামচন্দ্র আদর্শ পুরুষ হইতে ধীরে ধীরে পুরুষোত্তমে উন্নীত হইয়াছেন, নর হইতে নারায়ণে পরিণত হইয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের হৃদয়মন্দিরে যিনি পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন, কম্বন্ সেই বন্দিত পুরুষোত্তমকে তাঁহার মহাকাব্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিলেন। এই জাতীয় চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ বড় সহজ নয়। বিশেষণের উপর বিশেষণ চাপাইয়া রামের চরিত্র মহিমাকে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কাব্যরস নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হয়। বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের ভগবৎ সত্তাকে কাব্যসম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কম্বন্ যে কবিত্ব ও সামঞ্জস্য-বোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

৮১. কম্বন্ তামিলনাডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিবেচিত হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার ভক্তরূপটির পরিচয় গ্রহণে সচেষ্ট থাকিব। রামায়ণের মূল কাহিনীকে যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়া কিভাবে তিনি তাহার মধ্যে ভক্তিরস সঞ্চার করিয়াছেন তাহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কথাপ্রসঙ্গে হিন্দী রামায়ণকার তুলসীদাসের আলোচনাও কিছু কিছু প্রয়োজন হইবে।

বাল্মীকি, কম্বন্ ও তুলসীদাস এই তিন মহাকবির রচনা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে প্রথমেই যে কথাটি মনে জাগে তাহা হইল রাম-চরিত্রের রূপায়ণ। বাল্মীকি-রামায়ণে যিনি

নর-চরিত্ররূপে অঙ্কিত, তুলসীদাসে তিনি আন্তোপান্ত নারায়ণে পরিণত হইলেন। কম্বনের রাম এই দুই রূপের মধ্যবর্তী।

৮২. ইহা সত্য যে তামিল কবিও তুলসীদাসের ন্যায় রামের ভগবৎ রূপকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে বাল্মীকীয় রামচন্দ্রের মানবিক দিকটাকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তুলসী রামায়ণের সমস্ত ঘটনা, সমস্ত চরিত্র, সমস্ত বর্ণনা একটি কাজের জন্য নিযুক্ত—তাহা হইল রামের ঈশ্বরীয় মহিমার প্রচার। পঞ্চবটী-দণ্ডকারণ্যের মুনিঋষি নিশাচর, অযোধ্যা ও মিথিলার নরনারী, কিষ্কিন্ধ্যার বানর-বাহিনী, লঙ্কার রাক্ষস-কুল—যে-কেহ রামের সংস্পর্শে আসে অতি অবলীলা-ক্রমে তাঁহাকে ভগবানরূপে চিনিতে পারিয়া তাঁহার চরণাশ্রিত হয়। সুযোগ পাইলেই কবি শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাকীর্তন করিয়াছেন, এবং বলা বাহুল্য, সেই সুযোগের স্বাক্ষর তুলসী-রামায়ণের প্রতিটি পৃষ্ঠায় চিহ্নিত।

কম্বনের ভক্তি চেতনা তাঁহার কবি-সত্তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। কম্বন্ কাহিনী অংশে বাল্মীকির যথসম্ভব অনুগামী। তুলসীদাস সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। রামায়ণের যে সমস্ত ঘটনা ভগবানের মহিমা-বৃদ্ধির সহায়ক নয়, হিন্দী কবি সেগুলি সযত্নে বর্জন করিয়াছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের ভর্ৎসনা রামায়ণের একটি সুপরিচিত অংশ। তুলসী রামায়ণে ইহা নাই। লক্ষ্মণ মেঘনাদের শেষযুদ্ধে বিভীষণ অনুপস্থিত। কারণ ভক্ত বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের ঘৃণাসূচক উক্তি ভক্ত কবির লেখনীতে আনা অসম্ভব নয়। অথচ কম্ব-রামায়ণে অংশটি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেখানে ইন্দ্রজিৎ পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। বালি-বধ প্রসঙ্গ অপরিহার্য বলিয়া তুলসীদাস তাঁহার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। বলিয়াছেন, রামের প্রতি বালির যে ভর্ৎসনা তাহা একান্তই মৌখিক, তাহার অন্তরে ছিল প্রীতি—হৃদয়

প্রীতি, মুখ বচন কঠোরা। কিন্তু কম্বন্ এই সমস্ত আবেগমূলক উপাখ্যান বর্ণনায় বিশেষ আনন্দ পাইতেন। কম্বন্ ও তুলসীদাসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বোঝা যাইবে শূর্পণখার প্রসঙ্গ হইতে। শূর্পণখাকে লইয়া হিন্দী কবি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন বোঝা যায়। কারণ, এই পাপীয়সীকে রামের প্রতি ভক্তিমতী দেখাইতে গেলে রামায়ণের আসল কাহিনী অর্থাৎ রামরাবণের যুদ্ধ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার শূর্পণখাকে বাদ দিলেও সেই একই সমস্যা। নিরুপায় তুলসীদাস মাত্র নয়টি চৌপাঈ ও একটি দোহা দিয়া কাহিনীটি কোনোমতে শেষ করিয়াছেন। অন্যদিকে কম্বন্ ১৩৫টি স্তবক-বিশিষ্ট একটি সুদীর্ঘ সর্গে বাল্মীকি রামায়ণ হইতে বিস্তৃততর রূপে শূর্পণখার কথা বলিয়াছেন। ভক্তিরসের দিক হইতে ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও কাব্যরসের দৃষ্টিতে কম্ব-রামায়ণের শূর্পণখা অধ্যায়টি পরম আস্বাদনীয়।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বোঝা যাইবে, ভক্তিসাধক তুলসী-দাসের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভক্তকবি কম্বনের দৃষ্টিভঙ্গী কত পৃথক ছিল।

সীতা: রামচন্দ্রের মিথিলা প্রবেশ প্রসঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণে আছে "রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন" (১।৫০।১)। মাত্র এই একটি বাক্যেই কবিগুরু তাঁহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। অথচ রামের এই মিথিলা প্রবেশ একটি সামান্য ঘটনা নয়, সমগ্র রামায়ণ কাহিনী যাঁহার জন্য কল্পিত সেই জনক-নন্দিনীকে তিনি পত্নীরূপে লাভ করিবেন। ভক্তের দৃষ্টিতে রাম ও সীতা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতার। বিষ্ণু নরদেহ ধারণ করিয়া প্রবেশ করিতেছেন মিথিলায়, সেখানে লক্ষ্মী প্রতীক্ষা করিতেছেন তাঁহার দয়িতের জন্য। কম্বন্ রামের মিথিলা প্রবেশ বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপে (তুলসীদাসে এই জাতীয় বর্ণনা নাই): সেই সমুজ্জ্বল মিথিলানগরী তাহার রত্নখচিত পতাকা উড়াইয়া দিয়া যেন সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতেছে—আমি যে মহাতপস্যা

করিয়াছিলাম তাহারই ফলে লক্ষ্মী তাঁহার কমলালয় পরিত্যাগ করিয়া আমার এখানে আসিয়া জন্ম লইয়াছেন। হে কমলাক্ষ প্রভু, তুমিও পদার্পণ কর।[১]

বাল্মীকি রামায়ণে রামসীতার পূর্বরাগের কিছুমাত্র আভাস নাই। কম্ব-রামায়ণে দেখা যায়, হরধনুভঙ্গের পূর্বে রাম ও সীতার পরস্পর দর্শনে উভয়ের চিত্তে প্রণয় সঞ্চারিত হয়। কম্ব-রামায়ণের এই প্রণয় অংশটি বড়োই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু প্রশ্ন এই ভক্তকবি রাম-সীতার এই পূর্বরাগের বর্ণনা করিলেন কেন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, ইহা লৌকিক নতুন প্রণয়রূপে দেখা দিলেও কার্যত ছিল অলৌকিক চিরপুরাতন প্রেম। রাম মিথিলায় প্রবেশ করিয়া রাজপথ ধরিয়া নগরীর সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলে এক জায়গায় আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া গেল। সখী-পরিবৃতা সীতা দাঁড়াইয়া ছিলেন কন্নিমাডম্-এ অর্থাৎ কুমারীদের জন্য নির্দিষ্ট অলিন্দে। কম্বনের অনুসরণে আমরা সীতার সৌন্দর্য বর্ণনার চেষ্টা করিব না। কবি তাঁহাদের চারিচক্ষুর মিলন বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে: সেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেই দুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারিণী। চোখে চোখে মিলন হইল। একে অন্যকে যেন গ্রাস করিয়া লইল। কাহারও মুখে কথা নাই—তাঁহাদের চিত্ত এক হইয়া গেল। সীতা দেখিলেন রামকে, রাম সীতাকে।[২] কবি বলিতেছেন: কৃষ্ণ সমুদ্রের শয্যার যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিলেন, আজ যখন তাঁহাদের পুনর্মিলন ঘটিল তখন তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার কোনও আবশ্যকতা আছে কি?[৩]

১ মৈ অরু মলরিন্ নীঙ্গি, য়ান্ চেয়্ মা তবত্তিন্ বন্দু—১।১০।১
(বর্তমান প্রবন্ধে কম্বরামায়ণের সংকেত সূত্রগুলি এস্ রাজম্ সংস্করণ হইতে গৃহীত।)

২ এন্ন অরু নলত্তিনাল্ ইনৈয়ল্ নিণ্ড্রী—১।১০।৩৫

৩ করুম্ কডল্ পাল্লয়িল্ কলবি নীঙ্গিপ্ পোয়্প্—১।১০।৩৮

ইহার সঙ্গে তুলনীয় তুলসীদাসের বর্ণনা। তুলসী রামায়ণে রামাসীতার সাক্ষাৎ ঘটে জনকপুরীর উদ্যানে। সদ্যঃস্নাতা সীতা আসিয়াছেন সখীদের লইয়া পার্বতীর পূজা দিতে। জনৈক সখী আসিয়া সীতাকে রামের কথা বলিলে রামকে দেখিবার জন্য সীতা চলিলেন অন্তরের ভালোবাসা লইয়া। সেই পুরাতন ভালোবাসার রহস্য কেহ জানিতে পারিল না—

প্রীতি পুরাতন লখই ন কোঈ।

কম্ব-রামায়ণে হরধনুভঙ্গের পরে বিবাহ-অনুষ্ঠানের পূর্বমুহূর্তে সীতা রামকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখা যায়? হাতের কঙ্কণ ঠিক করিবার অছিলায় সীতা চোখের প্রান্ত দিয়া রামকে একবার দেখিয়া লইলেন। অন্তরে যাঁহার মূর্তি আঁকা ছিল, বাহিরে তাঁহাকেই রূপবান্ দেখিলেন।[১] তুলসী রামায়ণে ঐ একই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সীতা তাঁহার হাতের মণিতে সৌন্দর্যনিধান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইলেন। পাছে এই দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত হন এই আশঙ্কায় সীতা তাঁহার বাহুলতা ও দৃষ্টিকে একটুও বিচলিত করিলেন না—

নিজ পানি মণি মহুঁ দেখ অতি মূরতি সুরূপনিধান কী।
চালতি ন ভুজবল্লী বিলোকনি বিরহ ভয় বস জানকী॥

রাবণ যখন ছিন্ন-নাসা শূর্পণখার কাছে জানিতে চাহিল যে, তাহার এই দুরবস্থা কিরূপে হইল, তখন শূর্পণখা অন্যান্য কথার মধ্যে সীতা সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিল: আমার মনে হয়, সেই রমণী স্বয়ং লক্ষ্মী, পদ্মালয় ত্যাগ করিয়া রামের সহিত বাস করিতে আসিয়াছে—

তম্মৈয়ন্ ইরামনোডুম্ তামরৈ তবিরপ্ পোন্দাল্ (৩।১০।৬৭)

অনুরূপ প্রসঙ্গে তুলসী রামায়ণে—

১ ঐন্নৈ অকত্তু বডিবে অল, পুরত্তুম্—১।২২।৩৭

রূপরাসি বিধি নারি সঁবারী।
রতি সত কোটি তাসু বলিহারী॥

বাল্মীকি রামায়ণে—

সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী।
দেবতেব বনস্যাস্য রাজতে শ্রীরিবাপরা॥

সীতা-প্রসঙ্গে আমরা সর্বশেষে রাবণের কথা উল্লেখ করিতেছি। কুটির-বাসিনী সীতাকে দেখিয়া রাবণ এই বলিয়া মনে মনে আক্ষেপ প্রকাশ করিল: এই যে মণি-কান্তি-ময়ী রমণী—যে তাহার পদ্মালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—তাহার রূপ-দর্শনে আমার এই কুড়িটি নয়ন কি যথেষ্ট? আহা, আমার যদি নিমেষহীন সহস্র চক্ষু থাকিত![1]

বাল্মীকি রামায়ণে আছে, বৈদেহীকে দেখিয়া রাবণ মন্মথ শরাবিষ্ট হইল (৩।৩৪।১৫)। রামচরিতমানসে আছে, সীতাকে দেখিয়া রাবণের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারটা ঠিক দেখার পরেই ঘটে নাই, ঘটিয়াছে সীতার ভর্ৎসনার পরে। ভক্ত কবি বলিতেছেন: সীতার তিরস্কার বাক্য শুনিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু মনে মনে সীতার চরণ বন্দনা করিয়া আনন্দ লাভ করিল—

সুনত বচন দসসীস রিসানা।
মন মহুঁ চরণ বন্দি সুখ মানা॥

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তাহা হইল সীতার অপহরণ। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ সীতার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল (৩।৪৯।১৭-১৮)। কৃত্তিবাসেও তাহাই—'ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।' ভক্ত কবির কল্পনায় ইহা অসহনীয়। তুলসীদাসে আছে, স্বর্ণমৃগরূপী মারীচের আবির্ভাবের পূর্বে লক্ষ্মণ যখন ফলমূল সংগ্রহে বাহির হইল, তখন রাম সীতাকে বলিলেন—"আমি এখন কিছু

১ 'চেয়িতড়্‌ত্‌ ভামৈয়েচ্‌ চেকৈ তীয়ন্দু ইবন্‌—৩।১২।২৯

অনুগ্রহ দেখাইব। সুতরাং যে পর্যন্ত আমি রাক্ষসকুল ধ্বংস না করি ততদিন তুমি অগ্নিতে অবস্থান কর।" রামের উপদেশ অনুযায়ী সীতা অগ্নিপ্রবিষ্টা হইলেন। বাহিরে রহিল তাঁহার ছায়ামূর্তি। রাবণ এই ছায়ামূর্তিকেই অপহরণ করে। প্রকৃত সীতা অগ্নিমধ্যা ছিলেন, অগ্নিপরীক্ষাকালে সেই নিষ্কলঙ্ক রমণীর পুনরাবির্ভাব ঘটিল। তুলসীদাস অবশ্য এই কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে (দ্রষ্টব্য ৩।৭।১-৪)। কম্ব-রামায়ণে সীতা হরণের প্রসঙ্গ একটু অদ্ভুতরূপে কল্পিত হইয়াছে। সেখানে দেখি রাবণ সীতার পর্ণকুটির উৎপাটন করিয়া তাহার বিশাল রথে স্থাপনপূর্বক লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিল (অরণ্যকাণ্ড ১২শ সর্গ দ্রষ্টব্য)।[১]

রাম: শ্রীরামচন্দ্রের ভগবৎরূপ প্রদর্শনে তুলসীদাসের ন্যায় কম্বন্‌ও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নারায়ণ, পরমপুরুষ, বেদাতীত—কম্ব-রামায়ণে এই জাতীয় প্রয়োগ নিতান্ত কম নয়। রাম যখন স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হন, তখন কবির বর্ণনায় "যে চরণ দিয়া তিনি ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন সেই পা বাড়াইয়া দেন'—নীট্টিনান্‌ উলগম্‌ মুণ্ডুম্‌ নিণ্ড্র্‌ এডুত্তু অলন্দ পাদম্‌ (৩।১১।৭১)। তুলসীদাসে আছে, বেদ যাঁহার অন্ত পায় না, শিব যাঁহাকে ধ্যানে আনিতে পারে না, সেই অবাঙমনসোগোচর রাম চলিয়াছেন মায়া হরিণের পশ্চাতে—

> নিগম নেতি সিব ধ্যান ন পাবা।
> মায়ামৃগ পাছেঁ সো ধাবা॥

রাম কর্তৃক অহল্যা উদ্ধারের পর বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন—"তোমার হাতের শক্তি দেখিয়াছি তারকাবধের সময়ে; তোমার

১ তিব্বতী রামায়ণে সীতাহরণের প্রসঙ্গটি কম্ব-রামায়ণের অনুরূপ। দ্র° কামিল বুল্‌কে—রামকথা পৃ ২১০

পায়ের শক্তির পরিচয় পাইলাম অহল্যা উদ্ধারে।"[১] ভগবান অবতাররূপে হস্ত দিয়া শাসন ও দণ্ডবিধান করেন—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্; চরণে শরণ দান করেন—পরিত্রাণায় সাধূনাম্। বিশ্বামিত্রের উক্তির মধ্যে, বোধ করি, এই কথারই ইঙ্গিত আছে। তুলসী রামায়ণে অহল্যা উদ্ধার প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্রের এই জাতীয় কোনও উক্তি নাই।

রাম কর্তৃক পরশুরামের দর্পচূর্ণের পরে পরশুরাম রামের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া বলিল—"হে নীতিনিষ্ঠ, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। আজ আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সকলের আদি, তুমি চক্রায়ুধ, বেদপুরুষ। শিবধনু তোমার মুষ্টিবদ্ধ হইলে কি না ভাঙিয়া পারে?"[২]

রামলক্ষ্মণকে নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করার জন্য গরুড়ের আবির্ভাব প্রসঙ্গে দেখা যায়, পুরুষোত্তমের সম্মুখে প্রণত হইয়া গরুড় বলিতেছে: "হে প্রভু, আত্মগোপন করিয়া তুমি এ কী যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ! ব্রহ্মাদির পিতারও পিতা তুমি, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া এ কী তোমার অতুল্য লীলা! তুমি সকল মানুষের চিন্তাপহারক, আজ গভীর দুঃখে নিমগ্ন ও নৈরাশ্যক্লিষ্ট। ইহা তোমার কিরূপ কার্য? হে পিতা, ভয় পাইও না; হে প্রভু, দুখ পাইও না।"[৩] আশ্চর্য এই যে, রামচরিতমানসে গরুড়প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও তুলসীদাসের ন্যায় ভক্ত কবি ভক্তিধর্ম প্রচারে ইহার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

যুদ্ধকাণ্ডের একটি স্থলে রাক্ষসপতি রাবণের দৃষ্টি পর্যন্ত রামের দিব্যশক্তির মহিমায় বিস্ময়াকুল হইয়াছে। অগ্নিঅস্ত্র, মায়াঅস্ত্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়াও যখন রাবণ রামকে পরাভূত করিতে পারিল

---

১ কৈ বণ্ণম্ অঙ্গুক্ কণ্ডেন্; কাল্ বণ্ণম্ ইঙ্গুক্ কণ্ডেন্—১।৯।২৪

২ নীতিয়ায়্! মুনিন্দিডেল্; নী ইঙ্গু রাবর্ক্কুম্—১।২৪।৩৭

৩ বন্দায়্ মরৈন্দু; পিরিবাল্ বরুন্দুম্—৬।১৯।২৫০

না, তখন তাহার মনে পড়িল বিভীষণের উক্তি। রাবণ ভাবিল—"কে এই রাম? শিব নয়, ব্রহ্মা নয়, বিষ্ণু নয়। তবে কি এ বেদ কথিত প্রথম কারণ?"[১] অবশ্য এই সন্দেহের ফলে রাবণের যুদ্ধ-সংকল্প শিথিল হইল না। বাল্মীকি-রামায়ণে অতিকায় বধের পরে রাবণের বিলাপে এইরূপ একটি উক্তি পাওয়া যায়—

'যস্য বিক্রমমাসাদ্য রাক্ষসা নিধনংগতাঃ।
তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ম্॥ ৬।৭২।১১

তুলসীদাসের রামায়ণে অনুরূপ প্রসঙ্গে রাবণের মুখে যে রামের ভগবৎ-সত্তা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা বিশ্বাসের কথা পাওয়া যায় না তাহা আপাত-শ্রুতিতে বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতে পারে। বস্তুত ভক্ত কবি তুলসীদাস যুদ্ধকাণ্ড (বা লঙ্কাকাণ্ড) পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অরণ্যকাণ্ডেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করিয়াছেন। শূর্পণখার মুখে দণ্ডকারণ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাবণের সেই রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। সে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল—'খর-দূষণ তো আমার তুল্য বলবান। ভগবান ছাড়া আর কাহার হাতে তাহাদের মৃত্যু হইতে পারে? দেবতারঞ্জন ভবভার-ভঞ্জন ভগবান যদি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তবে আমি বলপূর্বক তাঁহার শত্রুতা সাধন করিব এবং প্রভুর বাণের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব। এই তামস দেহে যখন ভজনপূজন হইতে পারে না, তখন কায়-মনোবাক্যে ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প।'—

খরদূষণ মোহি সম বলবন্তা।
তিন্হহি কো মারই বিনু ভগবন্তা॥
সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা।
জৌ ভগবন্ত লীন্হ অবতারা।
তৌ মৈঁ জাই বৈরু হঠি করউঁ।
প্রভু সর প্রান তজেঁ ভব তরউঁ॥

---

১ 'চিবনো অল্লন্, নান্মুখন অল্লন্, তিরুমালাম্—৬।৩৭।১৩৫

হোইহি ভজন্থ ন তামস দেহা।
মনক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহা ॥

সাধারণ কাব্যপাঠকের কাছে বিষয়টি নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইলেও তুলসীদাসের কল্পনায় তামসদেহ-সম্পন্ন রাবণের অন্তর ছিল ভক্তিভাবে পূর্ণ। রামকে না দেখিয়া কেবল তাহার কার্যকলাপের বিবরণ শুনিয়াই যে-রাবণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া সিদ্ধান্ত করে; সীতার ভর্ৎসনায় বাহ্যত ক্রুদ্ধ হইয়াও যে-রাবণ সর্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণ বন্দনা করে তাহার তুল্য ভক্ত কে? কম্ব-রামায়ণের রাবণে এই ভক্তিভাব অনুপস্থিত।

হনুমান: রামাবতার ও ভক্তিধর্মের যে সমস্ত লক্ষণ কম্ব-রামায়ণের নানাস্থলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এতক্ষণ আমরা তাহারই কয়েকটির পরিচয় লইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, কবি রামভক্তির দিক হইতে প্রধানত চারিটি চরিত্রকে বিশেষভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাদের দুইজন বানর—হনুমান ও বালি; দুইজন রাক্ষস-কুল-জাত—বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ।

হনুমান চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাঁহার রামানুগত্য। ঋষ্যমূক পর্বতে বিচরণ-রত রাম-লক্ষ্মণের প্রথম দর্শনেই হনুমানের চিত্তে যে প্রীতি-ভক্তির উদয় হয়, তাহার আনন্দ যেন বহুকাল-বিচ্ছিন্ন বন্ধুর সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎজনিত আনন্দের তুল্য। হনুমান ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল:—সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্রদৃষ্টি ও করালদন্ত পশুগুলি যেমন নিজেদের শাবক দেখিয়া ব্যবহার করে, তেমনি স্নেহ ও মমতা লইয়া তাহারা রামলক্ষ্মণের অনুগমন করিতেছে। সূর্যকিরণের স্পর্শে রামের নীলকান্তমণি বর্ণবিশিষ্ট দেহ পীড়িত হইবে ভাবিয়া ময়ূর প্রভৃতি পাখিগুলি পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে যাহাতে তাঁহার উপর প্রখর রৌদ্র না আসিয়া পড়ে। সর্বত্র দৃশ্যমান মেঘসমূহ ধীরে

ধীরে জলবিন্দু বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে শীতল করিতেছে। রামের প্রতি পদক্ষেপে অগ্নিতুল্য তপ্ত প্রস্তরসমূহ তাঁহার রক্তকমল-সদৃশ চরণের সম্মুখে মধুময় পুষ্পের মতো কোমল হইয়া যায়। রাম যেদিকেই যান না কেন সমস্ত গাছপালা প্রণাম করার ভঙ্গিতে তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া পড়ে। ইঁহারা কি ধর্মমূর্তি?...ইঁহারা কি দেবজন? আমার হৃদয়ে যে প্রেমের উদ্‌ভব হইতেছে তাহার তো অবধি নাই। অপরিমিত ভালোবাসায় আমার অস্থিসমূহ বিগলিত হইতেছে। (৪।২।১০-১৩)

তুলসী রামায়ণে হনুমান রামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে? আপনি কি সেই অখিলভুবনপতি, জগতের মূল কারণ, যিনি ভূভার হরণের নিমিত্ত এবং মনুষ্য-কুলকে ভবসাগর পার করাইবার জন্য স্বয়ং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন?—

জগকারন তারন ভব রঞ্জন ধরনী ভার।
কী তুম্‌হ অখিল ভুবন পতি লীন্‌হ মনুজ অবতার॥

প্রথমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও পরক্ষণেই হনুমানের সন্দেহ দূর হইল এবং প্রভুকে চিনিতে পারিয়া হনুমান তাঁহার চরণযুগল ধরিয়া ভূপতিত হইল—

প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা।

কম্ব-রামায়ণে রামের প্রতি হনুমানের মনোভাব ধীরে ধীরে ভক্তিভাবে পরিণত হয়। তুলসীদাসের ন্যায় তাহা এত দ্রুত ও আকস্মিকভাবে উদ্‌ভূত হয় নাই। সুগ্রীবের কাছে রামের পরিচয় দিতে গিয়া হনুমান যাহা বলিল, তাহার মর্মার্থ এই যে, রাম মনুষ্য দেহধারী হইলেও মানুষ নন, কারণ মারীচকে যিনি বধ করিতে পারিয়াছেন তিনি চক্রধারী বিষ্ণু ব্যতীত আর কে হইতে পারেন (৪।৩।১১)? তুলসীদাসের রামায়ণে হনুমান আসিয়া সুগ্রীবের কাছে রামের পরিচয় দিবার আগেই সুগ্রীব রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া নিজের জন্মকে ধন্য মনে করিল—

জব সুগ্রীবঁ রাম কহুঁ দেখা।
অতিসয় জন্ম ধন্য করি লেখা॥

কম্ব-রামায়ণে রামের ভগবৎ সত্তায় হনুমানের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল সম্পাতির সহিত সাক্ষাতের পরে। ছোট ভাই জটায়ুর মৃত্যু সম্পর্কে সম্পাতির প্রশ্নের উত্তরে হনুমান যখন প্রকাশ করিল যে, রামচন্দ্রের অপহৃতা সহধর্মিণী সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়াই জটায়ুর মৃত্যু হয়, তখন সম্পাতির ভ্রাতৃশোক আনন্দে পরিণত হইল। সে বলিল ঃ ধন্য আমার ভাই। রামপত্নীকে রক্ষা করার জন্য যাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে কি অনন্ত কীর্তির অধিকারী হইয়া জীবিত নাই? তাহার পরিবর্তে যদি বলি—সে মরিয়া গিয়াছে, তবে তাহাই কি অধিকতর সত্য? রামের বন্ধুত্ব-রূপ অলভ্য বস্তু লাভ করিয়া যে অতুল্য কীর্তি পাইয়াছে, মৃত্যু তাহার কাছে তুচ্ছ। ইহার চেয়ে অধিকতর সুখ আর কী আছে (৪।১৬।৪৪-৪৫)? অতঃপর সম্পাতির অনুরোধে বানর-বাহিনী রাম নাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে তাহার দগ্ধ পাখা পুনরায় গজাইতে থাকে। রামনামের মহিমা দেখিয়া হনুমানের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

অশোকবনে সাক্ষাতের সময়ে সীতা যখম জানিতে চাহিল যে, কোনোরূপ নৌকার সাহায্য ব্যতীত হনুমান কিরূপে সমুদ্র পার হইল, তখন হনুমানের উত্তর এইরূপ ঃ যাহারা তোমার অতুল্য প্রভুর চরণ যুগলের ধ্যান করে তাহারা যেমন এই বৃহৎ মায়া-সমুদ্র পার হইয়া যায়, আমিও তেমনি এই ক্ষুদ্র সমুদ্র পার হইলাম।[১] তুলসী রাময়েণে এই জাতীয় কোন প্রসঙ্গ নাই।

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক বন্দী হইয়া হনুমান রাবণের সম্মুখে আনীত হইলে রাক্ষসপতির প্রশ্নের উত্তরে সে যেভাবে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিল তাহা বিশেষভাবে রামচন্দ্রের ভগবৎ-মহিমার পরিচায়ক। হনুমান বলিল ঃ আমি সেই কমল-নয়ন অদ্বিতীয় ধনুর্ধরের দূত। তিনি

১ চুরুঙ্গু ইডৈ! উন্ ওরু তুনৈবন্ তুন্ন তাল্—৫।৪।৯৭

কে যদি জানিতে চাও, তবে বলিতেছি শোন।' এই বলিয়া হনুমান একে একে ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ করিয়া অযোধ্যায় তাঁহার অবতারের কথা প্রকাশ করিল (৫।১২।৬৯-৭৫)। তুলসী রামায়ণে হনুমান কেবল রামাবতারের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সেই সঙ্গে সীতার প্রত্যর্পণ এবং বিশেষভাবে রামের চরণে শরণ গ্রহণের জন্য রাবণকে অনুরোধ জানাইয়াছে। সীতার প্রত্যর্পণের কথা বাল্মীকি রামায়ণেও আছে। কিন্তু রাবণের মতো দুর্বিনীতকে রামের ভক্ত হইবার জন্য উপদেশ দান করা একমাত্র তুলসীদাসের ন্যায় ভক্ত কবির পক্ষেই সম্ভব। তুলসী-রচিত হনুমান-রাবণ-সংবাদের মূল কথা হইল—রামচন্দ্রের গুণ-কীর্তন ও নাম মহিমা খ্যাপন। হনুমান বলিয়াছে: তুমি রামের চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া লঙ্কায় অচল রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর।...মদ মোহ পরিত্যাগ করিয়া বিচার করিয়া দেখ, রামনাম ব্যতীত অন্য কোনও কথা শোভা পায় না—

রাম চরণ পঙ্কজ উর ধরহূ।
লঙ্কা অচল রাজু তুম্হ করহূ॥...
রাম নাম বিনু গিরা ন সোহা।
দেখু বিচারি ত্যাগি মদ মোহা॥

বালি: বালি-বধ প্রসঙ্গ রাম চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়া ভক্ত কবি তুলসীদাস বিষয়টি খুব সংক্ষেপে এবং একটু ভিন্নরূপে সারিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গে বালিবধ সমর্থনে রাম যে সমস্ত যুক্তি দিয়াছেন, তাহার পরেও নিরপেক্ষ পাঠকের মন বালি-বধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাহার হৃদয়ে বাজিতে থাকে রামের উদ্দেশে বর্ষিত বালির সেই প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণ উক্তিগুলি: তুমি বিনা অপরাধে বাণ দ্বারা আমাকে হত্যা করিয়া যে নিন্দিত কার্য করিয়াছ সেই সম্পর্কে সাধুগণের মধ্যে তুমি কী বলিবে?...তোমার মতো পাপ

কিরূপে দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করিল? তুমি যে অধর্ম অনুসারে আমাকে যুদ্ধে নিহত করিলে ইহা অযুক্ত—

হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্॥

কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কৃত্বা কর্ম জুগুপ্‌সিতম্।···

কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা।

অযুক্তংযদধর্মেণ ত্বয়াহং নিহতো রণে (৪।১৭ সর্গ)

এই সমস্ত অভিযোগের উত্তরে রামচন্দ্রের যুক্তি শুনিয়া বালিকে স্বীকার করিতে হইল: হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য—যত্ত্বমাত্থ নর-শ্রেষ্ঠ তদেবং নাত্র সংশয়ঃ (৪।১৮।৪৭)।

তুলসীদাস অত জটিলতার মধ্যে না গিয়া বালির মুখে প্রথমেই দিয়াছেন রামভক্তির কথা। তারা রামের কথা উল্লেখ করিয়া বালিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলে বালি বলিয়া উঠিল: হে ভীরু প্রিয়ে, রামচন্দ্র সমদর্শী। তিনি যদি আমাকে বধ করেন, তবে তাহা আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। কারণ তাঁহার হাতে মৃত্যু হইলে্ আমি সনাথ হইব অর্থাৎ পরমপদ লাভ করিব—

কহ বালী সুনু ভীরু প্রিয় সমদরসী রঘুনাথ।

জোঁ কদাচি মোহি মারহি তৌ পুনি হোউ সনাথ॥

কম্ব-রামায়ণেও বালিকে আমরা শেষ পর্যন্ত ভক্তরূপে দেখিতে পাই। কিন্তু সেখানে তাহার পরিণাম ধীরে ধীরে আসিয়াছে, তুলসী রামায়ণের ন্যায় আকস্মিক হয় নাই। বাল্মীকি রামায়ণে বালি যে তারাকে বলিয়াছিল—

ন চ কার্যো বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে।

ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি॥ ৪।১৬।৫

কম্বন্ সেই সূত্র ধরিয়া আরও অগ্রসর হইলেন। কম্ব-রামায়ণের বালি রামের শৌর্য, মহত্ত্ব, ভ্রাতৃত্ব, উদারতা সম্পর্কে এত কথা শুনিয়াছে যে পূর্ব হইতেই রামের প্রতি তাহার একটা উচ্চ ধারণা দেখিতে পাই। বালির দৃষ্টিতে রামচন্দ্র আদর্শ নায়ক। সুতরাং সেই

রাম তাহাকে বিনা দোষে বধ করিবার জন্য সুগ্রীবের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বালি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কেবল তাহাই নয়, তাহার হৃদয়স্থিত আদর্শপুরুষ সম্পর্কে তারার অশোভন ইঙ্গিত তাহার সহ্য হইল না। সুতরাং তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই বালি বলিল : জগদ্‌বাসীকে ধর্মমার্গ প্রদর্শনের জন্য যাঁহার আবির্ভাব, তুমি স্ত্রীলোক বলিয়াই তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পার নাই। সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও যিনি বিমাতার নির্দেশ মাত্রেই অপরিসীম আনন্দে তাহার পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিলেন, তোমার মুখে তাঁহার প্রশংসা না শুনিয়া অন্যরূপ কথা শুনিলাম। ইহা কি সঙ্গত? ভ্রাতৃগণকে যিনি প্রাণের ন্যায় ভালবাসেন, আমাদের এই ভ্রাতৃযুদ্ধে সেই করুণা-সাগর রাম কি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন? (৪।৭।৩১-৩৫)

কিন্তু সত্য সত্যই সেই শর যখন আসিয়া বালির দেহে বিদ্ধ হইল, তখন বালি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা ভাঙিতে না পারিয়া শরাঙ্কিত নাম দেখিবার জন্য তাকাইল। দেখিল—ত্রিজগতের মূলমন্ত্র, ভক্তজনকে পরমপদদায়ী, ইহলোকে জন্ম-ব্যাধির ঔষধ, মুক্তিপথ-প্রদর্শক রাম-নাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে। বালি একটু হাসিল, লজ্জাবোধ করিল এবং অবশেষে স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, ইহাও কি তাঁহার বৃহৎ ধর্ম? ইহুবুম্ তান ওর্ ঙঙ্গু অরমো? (৪।৭।৭৬-৭৯)

অতঃপর বালি ও রামের দীর্ঘ বিতর্ক। বিতর্কের শেষে বালি বুঝিতে পারিল, ভাই-এর সহিত সে যে অসৎ আচরণ করিয়াছে, তজ্জন্য মৃত্যুই তাহার উচিত শাস্তি এবং ত্রিলোকের অধিপতি রাম কখনও অন্যায় কাজ করিতে পারেন না বলিয়া তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। সুতরাং রামের কাছে প্রণত হইয়া বালি এইভাবে তাঁহার স্তব করিতে থাকে—তোমার প্রেরিত তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে এই মুমূর্ষু অধম কিঙ্করকে তুমি দয়া করিয়া জ্ঞান দান করিয়াছ। তুমি

সেই ত্রিমূর্তি, তুমি তাহাদের মূল কারণ; তুমি সর্বস্ব অথচ তুমি অজ্ঞেয়; তুমিই পাপ, তুমিই ধর্ম; তুমিই শত্রু, তুমিই বন্ধু—

এবু কূর্ বালিয়াল্ এয়্‌তু নায়্ অমৈয়েন্
আবি পোম্ বেলৈবায়্ অরিবু তন্দু অরুলিনায়্;
মূবর্ নী! মুদলবন্ নী! মুট্রুম্ নী! মট্রুম্ নী!
পাবম্ নী! ধর্মম্ নী! পকৈয়ুম্ নী! উরবুম্ নী! ৪।৭।১২৭

ধর্ম আসিয়া যাঁহার মধ্যে মনুষ্যমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে, আমি সেই তোমাকে দেখিয়াছি। আর কী দেখিবার আছে? অতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত যত পাপ আমি করিয়াছিলাম, সমস্ত তিরোহিত হইয়াছে। ইহার পরও কি আমি উচ্চপদ পাইব না।—

উণ্ডু এন্নুম্ ধর্মমে উরুবমা উডৈয় নির্
কণ্ডু কোণ্ডেন্; ইনিক্ কাণ এন্ কডবেনো?
পণ্ডোডু ইণ্ড্রু অলবুমে এন্ পেরুম্ পড়বিনৈত্
তণ্ডমে; অডিয়নেকু উরু পদম্ তরুবদে!—৪।৭।১৩০

তুলসী রামায়ণে আমরা দেখিয়াছি, বালির প্রথম কথাই হইল এই যে, রামের হাতে মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরমপদপ্রাপ্তি হইবে। তাই 'মুখে ভৎর্সনা করিলেও বালির হৃদয়ে ছিল রামের প্রতি প্রীতি—হৃদয় প্রীতি মুখ বচন কঠোরা। সুতরাং বালির ভৎর্সনার উত্তরে রাম প্রতিভৎর্সনা করিলে বালি দুঃখিত হইয়া বলিল: প্রভু, মৃত্যুকালে তোমার আশ্রয় পাইয়া এখনও কি আমার পাপ দূরীভূত হয় নাই যে, তুমি আমাকে ভৎর্সনা করিতেছ?—

প্রভু অজহুঁ মৈ পাপী অন্তকাল গতি তোরি।

কম্ব-রামায়ণে বালি কেবল এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রামের হাত দিয়া মৃত্যু ঘটাইবার জন্য সে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছে: ইহা অপেক্ষা ভাই ভাই-এর আর কী মহৎ উপকার করিতে পারে? সুগ্রীব তোমাকে এখানে ডাকিয়া

আনিয়া আমার অসার রাজ্য লইয়া আমাকে মোক্ষরাজ্য দান করিয়াছে—

> মট্রু ইনি উদবি উণ্ডো ? বানিন্নুম্ উয়র্ন্দ মানক্
> কোট্রব ! নিন্নৈ এন্নৈক্ কোল্লিয় কোণর্ন্দু তোন্নৈচ্
> চিট্রিনক্ কুরঙ্গিনোডুম্ তেরিবু উরচ্ চেয়্দ চেয়্কৈ,
> বেট্রু অরচু এয়্দি এম্বি বীট্রু অরচু এনক্কু বিট্রান্ । ৪।৭।১৩১

অতঃপর মুমূর্ষু বালি সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ বৎস, মুনি, ব্রহ্মা, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র যাঁহার কথা বলিয়াছে, সেই পরম পুরুষ পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য হাতে তীক্ষ্ণ ধনুঃ-শর লইয়া পায়ে নূপুর ধারণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্ররূপে আসিয়াছেন—ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহ করিও না।—

> মরৈকলুম্ মুনিবর্ য়ারুম্ মলর্মিচৈ অয়নুম্ মট্রৈত্
> তুরৈকলিন্ মুডিবুম্ চোল্লুম্ তুণি পোরুল্ তিণি বিল্ তাঙ্কি,
> অরৈ কলল্ ইরামন্ আকি অর নেরি নিরুত্ত বন্দতু ;
> ইরৈ ওরু চঙ্কৈ ইণ্ড্রি এন্নুদি এন্নম্ মিকোয় ! ৪।৭।১৩৭

তুলসী-রামায়ণে সুগ্রীবের প্রতি মুমূর্ষু বালির এই জাতীয় কোন উক্তি পাওয়া যায় না।

আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা বালি-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। বাল্মীকি-রামায়ণে অঙ্গদ ও রামের উদ্দেশ্যে বালির যে শেষ আদেশ ও অনুনয়ের কথা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটু অসঙ্গতি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গে বালি অঙ্গদকে যে উপদেশ দিয়াছে তাহাতে যে রামের কোনো উল্লেখ নাই, ইহা বিস্ময়কর। কম্ব-রামায়ণে বালি অঙ্গদকে বলিতেছে ঃ আমি কঠোর তপস্যা করিয়াছি বলিয়াই আমার এই মঙ্গলময় পরিণাম। সকলের মধ্যে যিনি চিরন্তন সাক্ষী-রূপে বিরাজমান, সেই বীর পুরুষ স্বয়ং আসিয়া আমাকে মুক্তি

বিতরণ করিলেন।...হে বৎস, অজ্ঞান-জনিত জন্মব্যাধির যে মহৌষধ সেই রামকে তুমি নমস্কার কর—

য়ান্ তবম্ উডৈমৈয়াল্ ইব্ ইরুদি বন্দু ইচৈন্দদু ; য়াক্কৈম্
চাণ্ড্রু এন নিণ্ড্র বীরন্ তান্ বন্দু বীডু তন্দান্।...
'মাল্ তরুম্ পিরবি নোয়্ক্কু মরুন্দু' এন্ বণঙ্গু মৈন্দ।

—৪।৭।১৫২-১৫৩

বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় যে বালির শেষ উক্তি অঙ্গদের প্রতি (২২শ সর্গ দ্রষ্টব্য), রামের প্রতি নয়। রামের প্রতি বালির উক্তি শেষ হইয়াছে অষ্টাদশ সর্গে। ভক্ত কবি কম্বনের দৃষ্টিতে এই পারম্পর্য কিছুটা বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল বলিয়াই তামিল কবি হয়ত বালির শেষ সম্ভাষণ রামের উদ্দেশে রচনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, বাল্মীকি, কম্বন্ ও তুলসীদাস তিন কবির রচনাতেই রামের প্রতি বালির উক্তির মধ্যে অঙ্গদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা আছে। বাল্মীকি রামায়ণে—

যা তে নরপতে বৃত্তির্ভরতে লক্ষ্মণে চ যা।
সুগ্রীবে চাঙ্গদে রাজংস্তাং ত্বমাধাতুমর্হসি ॥ ৪।১৮।৫৫

কম্ব-রামায়ণে বালির উক্তি এইরূপ: আমার একমাত্র সন্তান এই অঙ্গদ। আমি তাহাকে তোমার আশ্রয়ে রাখিয়া গেলাম। তুলসী রামায়ণে আছে: হে প্রভু, আমার পুত্র অঙ্গদ বিনয়ে ও বলে আমারই তুল্য। আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। হে দেব ও মনুষ্য-কুলের নাথ, আপনি হাত ধরিয়া ইহাকে আপনার দাস করিয়া লউন।—

য়হ তনয় মম সম বিনয় বল কল্যাণপ্রদ প্রভু লীজিয়ে।
গহি বাঁহ সুর নর নাহ আপন দাস অঙ্গদ কীজিয়ে ॥

স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভক্তিরসের দিক হইতে কম্বন্ অপেক্ষা তুলসী এখানে অধিকতর মর্মস্পর্শী।

বিভীষণ: দক্ষিণ ভারতে বিভীষণ ভক্তশিরোমণি রূপে সম্মানিত

হইলেও বাল্মীকি-রামায়ণে তাহার চরিত্র যে নির্দোষ নয়, ভক্তি-মাধুর্য-মণ্ডিত নয়, বরং কিঞ্চিৎ রাজ্য-লোলুপতার কালিমায় কলঙ্কিত সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে বিভীষণের যে দেশদ্রোহী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে দক্ষিণ ভারতে তাহা অকল্পনীয়। মনে হয় রাম-কথার উদ্‌ভবের যুগ হইতেই তামিলনাড়ের অধিবাসীরা বিভীষণকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছে—বাল্মীকি রামায়ণের সহিত যে দৃষ্টির সম্পূর্ণ ঐক্য স্থাপন করা যায় না। কম্ব-রামায়ণে বিভীষণ তাই ভক্তরূপেই অঙ্কিত এবং তাহার এই ভক্তরূপকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য তামিল কবি বিশেষ সতর্কতার সহিত বাল্মীকি-রামায়ণের অবাঞ্ছিত অংশগুলি বর্জন অথবা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। যেমন, রাম কর্তৃক অভয় প্রদানের পরেই বিভীষণের কাছ হইতে লঙ্কার সেনাবাহিনীর বলাবল জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি অংশকে কম্বন্ অন্য ঘটনার সাহায্যে সুকৌশলে উপস্থিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, নাগপাশবদ্ধ লক্ষ্মণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিভীষণের যে আক্ষেপ, বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে কম্ব-রামায়ণে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক। বাল্মীকি অঙ্কিত বিভীষণের বিলাপে রাজ্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। কম্ব-রামায়ণের প্রাসঙ্গিক অংশ এইরূপ: পাশবদ্ধ লক্ষ্মণের চারিদিকে সকল বন্ধুজন যখন ভূপতিত, তখন একা আমি দাঁড়াইয়া আছি অক্ষত দেহে! মানুষ আমার সম্বন্ধে কী ভাবিবে? তাহারা মনে করিবে —'বিভীষণই সমস্ত ঘটনার মূল। সে লক্ষ্মণের পাশে দাঁড়াইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে দিয়া তাহার নিধনের ব্যবস্থা করিয়াছে।' লক্ষ্মণকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়াও আমি তো তাহার শত্রুর দিকে ধাবিত হই নাই। আজ আমি রাবণের পক্ষেও নই, আবার যাঁহারা আমাকে অভয় দিয়াছিলেন তাহাদের দলেও নই। আজ আমি দুই দিকে ধারযুক্ত শূলের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। (৬।১৯।২০৯-২১২)

মন্ত্রণা পরিষদে বিভীষণ রাবণকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছে তাহা

কেবল নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত সৎকথাই নয়, তাহার সঙ্গে ছিল রামাবতারে বিভীষণের দৃঢ় বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই বিভীষণ রাবণকে হিরণ্যকশিপুর পরিণামের কথা শুনাইয়াছে। বাল্মীকি ও কম্ব-রামায়ণের এই পার্থক্যটি লক্ষণীয়।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রজিতের ভৎসনার উত্তরে বিভীষণ যাহা বলিয়াছে তাহার শেষ কথাটি এইরূপ: আমি জানি অধর্ম কখনও ধর্মকে জয় করিতে পারে না এবং তাহা জানিয়াই দেব-দেব শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইয়াছি। ইহার ফলে বাহ্যজগতে আমার স্তুতি হউক অথবা নিন্দা হউক, ভোগৈশ্বর্য সঞ্চিত হউক অথবা নষ্ট হউক সে বিষয়ে আমার কোনো চিন্তা নাই—

"আরত্তিনৈপ্ পাবম্ বেল্লাতু" এন্নুম্ অতু অরিন্দু "এ্রানত্
তিরত্তিন্নুম্ উরুম্" এণ্ড্রু এণ্ণি দেবক্কুর্ম্ দেবৈচ্ চেরন্দেন্;
পুরত্তিনিল্ পুকড়ে আক; পলিয়োড়ুম্ পুণর্ক; ভোগচ্
চিরপ্পু ইনিপ্ পেরুক; তীর্ক এণ্ড্রনন্ চীট্রম্ ইল্লান্। ৬।২৭।১৭৬

বিভীষণ যে রামচন্দ্রের শরণার্থী হইয়া আসিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে ভক্তি অথবা রাজনীতি যাহাই থাক না কেন, একটা যে গভীর প্রত্যাশা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং সেই প্রত্যাশা যে পূর্ণ হইবেই এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না। বস্তুত বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়, বিভীষণকে আশ্রয় দান সম্পর্কে রামের শিবিরে দুই সর্গব্যাপী (৬।১৭-১৮) আলোচনা চলিয়াছে। কম্বন্ ও তুলসীদাসেও তাহার অনুবৃত্তি আছে। অথচ সুগ্রীব আসিয়া যখন বিভীষণকে রামের সম্মতির কথা জানাইল, তখন বিভীষণের হৃদয় যে রামের করুণার কথা স্মরণ করিয়া আনন্দ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল বাল্মীকি বা তুলসী রামায়ণে তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। কম্ব-রামায়ণের বর্ণনা এইরূপ: সুগ্রীবের মুখে রামের শরণ দানের কথা শ্রবণ করিয়া বিভীষণের চোখে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। দেহমন শীতল হইল এবং অত্যধিক পুলকে

তাহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বিভীষণ ভাবিতে লাগিল —'যে পাপী রামের কাছ হইতে সীতাদেবীকে ছিনাইয়া লইয়াছে, আমি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমাকে তিনি অনুগ্রহ করিলেন? 'এস' বলিয়া আহ্বান করিলেন! আমাকে তিনি গ্রহণের যোগ্য মনে করিলেন? বিষ যেমন শিবের কণ্ঠে স্থান পাইয়া উচ্চ হইয়াছে, প্রভুর কৃপায় আমিও তেমনি উচ্চ হইলাম—

চিঙ্গ এরু অনৈয়ান্ চোন্ন বাচকম্ চেবি পুকামুন্
কঙ্গুলিন্ নিরত্তিনান্ তন্ কণ্ মড়ৈত্ তারৈ কাণ্ড্র ;
অঙ্গমুম্ মনম্ অত্থু এন্নক্ কুলির্ন্দত্থু ; অব্ অকত্তে মিক্কুপ্
পোঙ্গিয় উবকৈ এন্নপ্ পোভিত্তন, উরোমপ্ পুল্লি।
পঞ্জু এনচ চিবক্কুম্ মেন্ কাল্ দেবিয়ৈপ পিরিত্ত পাবি
বঞ্চন্নুক্কু ইলৈয় এন্নৈ 'বরুক' এণ্ড্রু অরুল্ চেয়্দানো?
তঞ্জু এনক্ করুদিনানো? তাড়্চডৈক্ কডবুল্ উণ্ড
নঞ্জু এনচ্ চিরন্দেন্ অণ্ড্রো নায়কন্ অরুলিন্ নায়েন্।

—৬।৪।১২২-১২৩

তুলসী-রামায়ণে করুণা-ঘন রাম সম্পর্কে বিভীষণের অনুরূপ চিন্তার কথা পাওয়া যায় একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে। রাবণ কর্তৃক পদাহত হইয়া বিভীষণ মনের আনন্দে নানারকম চিন্তা করিতে করিতে রামচন্দ্রের শিবিরের অভিমুখে অগ্রসর হইল: আমি গিয়া প্রভুর সেই রক্তবর্ণ কোমল চরণ-কমল দেখিতে পাইব—যে চরণ সেবককে দান করে সুখ, যে চরণের স্পর্শে দণ্ডকারণ্য হইল পবিত্র, ঋষিপত্নী অহল্যা হইল শাপমুক্ত। যে চরণ রহিয়াছে জানকীর হৃদয়ে, যে চরণ ধাবিত হইয়াছিল মায়ামৃগের পশ্চাতে এবং যে চরণ-কমল প্রস্ফুটিত শিবের হৃদয়-সরোবরে। অহো ভাগ্য! আজি আমি সেই চরণ দেখিতে পাইব!—

দেখি হউঁ জাই চরণ জলজাতা।
অরুণ মৃদুল সেবক সুখদাতা॥

জে পদ পরসি তরী রিষিনারী।
দণ্ডককানন পাবনকারী॥
জে পদ জন স্মুতাঁ উর লাএ
কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধর ধাএ॥
হর উর সর সরোজ পদ জেঈ।
অহোভাগ্য মৈঁ দেখিহউঁ তেঈ॥

তুলসীদাস ও কম্বনের ভাষা স্বতন্ত্র হইলেও ভক্ত বিভীষণের দৈন্য, আর্তি, বেদনা ও আনন্দ ফুটাইতে উহা একইভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কুম্ভকর্ণ: রামভক্তির আলোচনায় কুম্ভকর্ণ যে একটি আলোচনার যোগ্য চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বাল্মীকীয় কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠে তাহা মনে হয় না। তুলসী-রামায়ণে দেখা যায়, কুম্ভকর্ণ প্রথম হইতেই বিভীষণের ন্যায় রাম-ভক্ত। কেবল ভক্ত নয়, উগ্র ভক্ত। বিভীষণ রাবণের আচরণ-বিরোধী হইলেও রাবণের উদ্দেশ্যে তাহার কথাগুলি সর্বদাই বিনীত। 'আমি চরণ ধরিয়া আপনার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি'—এই হইল বিভীষণের উক্তি। কিন্তু কুম্ভকর্ণ উদ্দণ্ড। রাবণের কাছে সীতাহরণ বৃত্তান্ত এবং রাক্ষস বংশের ক্ষয়ক্ষতির কথা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ বলিল: অরে মূর্খ! জগজ্জনী সীতাকে চুরি করিয়া তুই এখন কল্যাণ চাহিস? হে রাক্ষসরাজ! তুই ভাল কাজ করিস নাই। এখন আমাকে জাগাইলে কী হইবে? এখনও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামকে ভজনা কর, মঙ্গল হইবে। হনুমানের ন্যায় সেবক যাঁহার, সেই রঘুনাথ কি মনুষ্য! তুমি সেই পরম দেবতার সহিত শত্রুতা করিয়াছ, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি যাঁহার সেবক।—

জগদম্বা হরি আনি অব সঠ চাহত কল্যাণ॥
ভল ন কীন্হ তৈঁ নিসিচর নাহা।
অব মোহি আই জগাএহি কহা॥

অজ হূঁ তাত ত্যাগি অভিমানা।
ভজহু রাম হোইহি কল্যানা॥
হৈঁ দসসীস মনুজ রঘুনায়ক।
জাকে হনুমান সে পায়ক॥
কীন্‌হেহু প্রভু বিরোধ তেহি দেবক।
সিব বিরঞ্চি সুর জাকে সেবক॥

এইরূপ উগ্র প্রকৃতির ভক্ত রামচন্দ্র-রূপী ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে ইহা অকল্পনীয়। তথাপি যে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে গেল তাহার কারণ—'আমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ত্রিতাপনাশন শ্যামশরীর কমলনেত্র রামচন্দ্রকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব।' এই কথা বলিয়া শ্রীরামের রূপ ও গুণ স্মরণ করিয়া কুম্ভকর্ণ একমুহূর্তে প্রেম-বিহ্বল হইয়া পড়িল—

···লোচন সুফল করৌঁ মৈঁ জাঈ॥
স্যাম গাত সরসীরুহ লোচন।
দেখৌঁ জাই তাপত্রয় মোচন॥
রামরূপ গুণ সুমিরত মগন ভয়উ ছন এক।

তুলসীদাসের কুম্ভকর্ণ চরিত্র অতিরঞ্জিত, অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মধ্যে এই একটা সঙ্গতি দেখিতে পাই যে ভগবানের হাতে মৃত্যুবরণ করিয়া অক্ষয় বৈকুণ্ঠলাভের আশাতেই সে অগ্রসর হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই সঙ্গতিটুকুও নাই। প্রথমে দেখি, কুম্ভকর্ণ রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে:

রাম-লক্ষ্মণ যদি সে সামান্য হত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিছে পাথর?
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে।
সামান্য মনুষ্য তারে না ভাবিও মনে॥
কুম্ভকর্ণ বলে, হেন লয় মম মন।
মায়াতে মনুষ্যরূপ দেব নারায়ণ॥

রাম সম্পর্কে কুম্ভকর্ণের এই দেবত্ব-বোধ থাকা সত্ত্বেও রাবণের ভর্ৎসনার পরক্ষণেই তাহাকে দেখিতে পাই সম্পূর্ণ বিপরীত-রূপে। কুম্ভকর্ণ বলিতেছে :

শ্রীরামের মাথা কাটি আজি দিব ডালি।
সীতা লয়ে চিরদিন সুখে কর কেলি॥

রাবণের ধমকের ফলে কুম্ভকর্ণের মত-পরিবর্তনের জন্য তাহাকে একটা ভীরু নির্বোধ বলশালী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

বাল্মীকির কুম্ভকর্ণ মহত্তর হইলেও তাহার চরিত্র-অঙ্কনে বেশ কিছু ত্রুটি ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তুলসীদাস ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে কুম্ভকর্ণকে আমরা কেবল একটি দিনই দেখিতে পাই— যুদ্ধের দিন অকাল নিদ্রাভঙ্গের পরে। এবং সেই দিনেই তাহার মৃত্যু। বাল্মীকি-রামায়ণে কুম্ভকর্ণের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় যথোচিত নিদ্রাভঙ্গের পরে—রাবণের দ্বিতীয় মন্ত্রণাসভায়— যুদ্ধকাণ্ডের দ্বাদশ সর্গে। রাবণ কর্তৃক সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইলে প্রথম বক্তৃতা করে কুম্ভকর্ণ। বাল্মীকি রামায়ণে আছে, কুম্ভকর্ণ (রাবণের প্রতি) অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল— 'সীতাহরণের পূর্বেই আপনার উচিত ছিল আমাদের সহিত পরামর্শ করা।...যে ব্যক্তি প্রথম কর্তব্য কার্য সকল পরে এবং পশ্চাৎ কর্তব্য কার্য সকল প্রথমেই করে, সে রাজার নীতি-অনীতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।...আপনি পরিণাম ফল চিন্তা না করিয়া যে গুরুতর কার্য করিয়াছেন, তাহাতে রামচন্দ্র যে আপনার প্রাণ নাশ করে নাই ইহাই পরম সৌভাগ্য' (৬।১২।২৮-২৯, ৩২,৩৪)। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াও কুম্ভকর্ণ রাবণের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সঙ্কল্প ঘোষণা করিল। রাবণের দুষ্কৃতির জন্য কুম্ভকর্ণ যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে তাহা নৈতিক সদ্‌বুদ্ধির ফল নয়, তাহার সঙ্গে পরামর্শ না করার জন্য অভিমান। কুম্ভকর্ণের শেষ কয়েকটি উক্তি আরও অমর্যাদাকর ও অসার আত্মম্ভরিতার লক্ষণ : "আমি নিশ্চয়ই

বলিতেছি, রামের একটি বাণের পর দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপ করিবার পূর্বেই আমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার রুধির পান করিব। আপনি এখন সুস্থ চিত্তে বারুণী পান করিয়া ইচ্ছানুসারে বিহার করুন। আমি রামচন্দ্রকে যমলোকে পাঠাইলে সীতা চিরকালের জন্য আপনার বশবর্তিনী হইবে" (৬।১২।৩৮, ৪০)। 'চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি'—ইহারই যেন বাংলা সংস্করণ—

'সীতা লয়ে চিরদিন সুখে কর কেলি।'

কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণ প্রথম দিনের সাক্ষাতেই পাঠকের চোখে অধিকতর উন্নত ও জীবন্ত বলিয়া বোধ হইবে। তাহার প্রতিবাদের মধ্যে তুলসী অঙ্কিত কুম্ভকর্ণের ভক্তিও নাই, আবার বাল্মীকীয় কুম্ভকর্ণের অশুচি আত্মম্ভরিতাও নাই। একটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ন্যায়বোধ ও আত্ম-মর্যাদাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিতেছে: তুমি যাহা করিয়াছ তাহা মোটেই শিষ্টজনের কাজ নয়, ইহাতে আমাদের রাক্ষসকুল হীন হইয়াছে। কিন্তু এখন আর সীতাকে ফিরাইয়া দেওয়া চলে না, কারণ তাহাতে আমরা বীর সমাজে কাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। এই যুদ্ধে যদি আমাদের মৃত্যুও ঘটে, আমাদের বীরত্বের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে—

চিট্টর্ চেয়ল্ চেয়্দিলৈ ; কুলচ্ চিরুমৈ চেয়্দায়্ ;
মট্টবিল্ মলর্ক্ কুড়নিনালৈ ইনি মন্না।
বিট্টিডুত্তুমেল্ এলিয়ম্ আকুম্ ; অবর্ বেল্ল
পট্টিডুত্তুমেল্ অত্তুবুম্ নণ্ড্ৰু পড়ি অণ্ড্ৰাল্। ৬।২।৫৩

বাল্মীকি রামায়ণে কুম্ভকর্ণ রাবণের শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প ঘোষণা করিলেও সেদিন তাহাকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে দ্বিতীয়বার এক সঙ্গে পাওয়া যায় যুদ্ধকাণ্ডের ৬৩তম সর্গে—যেখানে কুম্ভকর্ণ প্রায় পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করিয়া পরিশেষে বলিল: কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ সেদিন (অর্থাৎ প্রথম

দিন) যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আমাদের পক্ষে হিতকর কার্য। তবে আপনার যাহা অভিমত হয় তাহাই করুন—

যদুক্তমিহ তে পূর্ব ক্রিয়তামনুজেন চ
তদেব নো হিতং কার্যং যদিচ্ছসি চ তৎ কুরু ॥ (৬।৬৩।২১)

'যদিচ্ছসি চ তৎকুরু' এই উক্তির মধ্যে দিয়া কুম্ভকর্ণের দুর্বল প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। 'বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আমাদের পক্ষে হিতকর কার্য'—এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধপরবশ হইয়া উঠিলে কুম্ভকর্ণ তাহাকে নানারূপ মধুর বাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টা করে। উপদেশ দানের কৈফিয়ত স্বরূপ বলে: আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন, আপনাকে সর্বদা হিতবাক্য বলা উচিত। এই জন্যই বন্ধুভাব ও ভ্রাতৃস্নেহ বশত আমি আপনাকে এরূপ বলিয়াছি।[১] অতঃপর সেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি: 'আপনি বারুণী পান করিয়া যথাসুখে রমণ করুন। আমি রামকে বধ করিলে সীতা চিরকালের জন্য আপনারই হইবে"—

ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ (৬।৬৩।৫৭)

অতঃপর কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ যাত্রা, যুদ্ধ ও নিধন। মোট কথা দ্বিতীয়দিনে কুম্ভকর্ণের মনোভাবে আমরা খুব সামান্য পরিবর্তনই দেখিতে পাই। বাল্মীকি রামায়ণে, কেন জানি না, কুম্ভকর্ণ কোন একটা বিশিষ্ট রূপ লইয়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

কম্ব-রামায়ণে প্রথম দিনের কুম্ভকর্ণকে আমরা দেখিয়াছি। দ্বিতীয় দিনের কুম্ভকর্ণ ঠিক প্রথম দিনের অনুবৃত্তি নয়। প্রথম দিনে দেখিয়াছি তাহার ন্যায়বোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ। দ্বিতীয় দিনে যুক্ত হইল ধর্ম-বোধ। ইহা কিছু আকস্মিক নয়। মন্ত্রণা-

১ অবশ্যং তু হিতং বাচ্যং সর্বাবস্থং ময়া তব ॥
বন্ধুভাবাদভিহিতং ভ্রাতৃস্নেহাচ্চ পার্থিব। (৬।৬৩।৩২-৩৩)

সভায় কুম্ভকর্ণের বক্তৃতার পরে রাবণের প্রতি বিভীষণের সদুপদেশ রাবণকে রুষ্ট করিলেও কুম্ভকর্ণের চিত্তে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। (ইহা বাল্মীকি রামায়ণেও লক্ষ্য করা যায়।) যে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথম দিন সে বলিয়াছিল—'এখন সীতাকে ফিরাইয়া দিলে আমরা বীর সমাজে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইব'—বিভীষণের সৎপরামর্শের পরে সেই মর্যাদাবোধ তাহার কাছে মিথ্যা মনে হইল। স্বচ্ছদৃষ্টিতে সে দেখিতে পাইল—ধর্ম রহিয়াছে শত্রুপক্ষে। তাই সে রাবণকে বলিল: "আমাদের হৃদয়ে আছে কপটতা, তাহাদের হৃদয়ে করুণা। আমাদের কর্মে পাপ, তাহাদের কর্মে ধর্ম। আমাদের কথায় আছে ছলনা, তাহাদের কথায় সত্য। আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই। যদি তাহার তাৎপর্য বুঝিতে পার, গ্রহণ করিও; আর যদি না পার, তবে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আমি বলিতেছি—সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া রামের চরণে প্রণত হও, তোমার কনিষ্ঠ ভাই বিভীষণের সঙ্গে মীমাংসা করিয়া ফেল। ইহাই বাঁচিবার একমাত্র উপায়"। (৬।১৬।৮০-৮৩)

কুম্ভকর্ণের এই শান্তিপ্রিয় ধর্মকথা শুনিয়া রাবণ ঘৃণাভরে উত্তর করিল—ভীরু কাপুরুষ বিভীষণ গিয়াছে, তুমিও যাও। গিয়া সেই নর ও বানরের সেবা কর। অতঃপর রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ গমনের উদ্যোগ করিলে কুম্ভকর্ণের মন দ্বিধাগ্রস্ত হইল। একদিকে ভাই ও অধর্ম, অন্যদিকে শত্রু ও ধর্ম। এই জাতীয় কর্তব্যের দ্বন্দ্বে মানুষ চলে তাহার গুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বিভীষণ বাছিয়া লইল ধর্মের পথ; কিন্তু রজোগুণ-প্রধান কুম্ভকর্ণের কাছে ন্যায়ধর্ম অপেক্ষা লোকধর্মই বরণীয় বলিয়া মনে হইল। কুম্ভকর্ণ যে শেষপর্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল, তাহা রাবণের ভর্ৎসনায় নয়। মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও বিপন্ন ভ্রাতাকে রক্ষার জন্যই সে আত্মোৎসর্গের জন্য অগ্রসর হইল। কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি রামায়ণে

আমরা দেখিয়াছি উক্তি ও আচরণে কুম্ভকর্ণ কতটা ইতর ও ব্যক্তিত্বহীন। কম্ব রামায়ণে তাহার আভাস মাত্র নাই। কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃচরণে প্রণত হইয়া বলিতেছে: "আমি চলিলাম। যুদ্ধ হইতে যে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিব তাহা বলিতে পারি না। বিধি আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিতেছে। আজই আমার শেষ দিন। তোমার কাছে অনুরোধ আমার মৃত্যুর পরে সীতাকে ফিরাইয়া দিও।...শৈশব হইতে আজ পর্যন্ত যদি কোনও অন্যায় করিয়া থাকি, ক্ষমা কর। আমি আর তোমাকে দেখিতে পাইব না"। (৬।১৬।৯০,৯৩)

কম্ব-রামায়ণে কুম্ভকর্ণ চরিত্রের চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে রণক্ষেত্রে। বিভীষণ কুম্ভকর্ণের শিবিরে আসিয়া তাহার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করিল। এই সাক্ষাৎকার দৃশ্যটি তামিল কবির নিজস্ব সংযোজন বলিয়া মনে হয়। ইহা বাল্মীকি রামায়ণে নাই। পরবর্তীকালে অধ্যাত্মরামায়ণে (৬।৮।৯-১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ও তুলসীরামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা কেবল উল্লেখই মাত্র। তুলসীদাস মাত্র ৩টি চৌপাঈ ও ১টি দোহার মধ্যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কম্বন্ প্রায় ৪০টি স্তবকের সাহায্যে দুই ভাই-এর এই সাক্ষাৎকার দৃশ্যটিকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা ও গাম্ভীর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই অংশের পরিকল্পনায় কবি হয়তো মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বের কর্ণ-কৃষ্ণ ও কর্ণ-কুন্তীর সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করিয়া থাকিবেন।

বিভীষণ কুম্ভকর্ণের শিবিরে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলে কুম্ভকর্ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিল: "আমি শুনিয়া আনন্দ পাইয়াছিলাম যে, তুমি আমাদের অভিশপ্ত পক্ষ ত্যাগ করিয়া রামের শরণাগত হইয়াছ। কিন্তু আজ তোমার এই প্রত্যাবর্তনে বিমূঢ় হইলাম। আমরা তো মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া খেলা করিতেছি। তুমি কি অমৃত পানের পরে বিষপান করিবে?—

…কালন্ বায়্ক্ কলিক্কিণ্ড্ম্বাল্
নবৈ উর বন্দহু এন্ নী ? অমুহু উন্বায়্ নঞ্জু উন্বায়ো ?

—৬।১৬।১২৬

তুমি যাঁহাদের শরণ লইয়াছ তাঁহারা ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য আসিয়াছেন। সেই পুরুষোত্তমের সেবা করিয়া অবশেষে কি পরদার লোভীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবে?" প্রকৃত পক্ষে বিভীষণ আসিয়াছিল কুম্ভকর্ণকে রামের কথা জানাইতে—"যে পুরুষোত্তম অযোগ্য আমার উপর তাঁহার মধুর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন, তিনি তোমাকেও তাঁহার বরাভয় দান করিবেন।" কিন্তু বিভীষণ কুম্ভকর্ণকে নানারূপে বুঝাইয়াও সম্মত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার ধর্মবোধের কাছে আবেদন করিয়া বলিল—"ধার্মিক ব্যক্তি কখনও পিতা-মাতা ও সন্তানের কথা চিন্তা করে না। তাহাই যদি হয়, তবে রাবণের কথা ভাবিয়া কেন আমরা এই ঘৃণ্য অপরাধ সমর্থন করিব? শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা শরীরের রুগ্ন অংশকে ছিন্ন করিয়া ফেলিব।—

উডলিডৈত তোণ্ড্রিট্রু ওণ্ড্রে অরুত্তু অদন্ উদিরর্ উট্রি
চুডল্ উরচ্ চুট্টু বেরু ওর্ মরুন্দিনাল্ তুয়রম্ তীর্বর্।

—৬।১৬।১৪১

তাছাড়া, তুমি এখন আর রাবণকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ধর্ম-সংস্থাপক রাম করুণাবশত আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। তুমি আমার অনুসরণ কর।" এই বলিয়া বিভীষণ কুম্ভকর্ণের চরণে প্রণত হইল।

স্বভাবতই বিভীষণের আবেদনে কুম্ভকর্ণের হৃদয় বিগলিত হইল, কিন্তু তাহার সংকল্প শিথিল হইল না। ভাইকে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রু-নয়নে পুনরায় বলিতে লাগিল—"যে আমাকে এতদিন পোষণ করিয়াছে, বিপন্ন হইয়া যে আমাকে জয়লাভের আশায় রণক্ষেত্রে পাঠাইয়াছে, তাহার জন্য প্রাণ বিসর্জন না করিয়া

আমি কোথাও যাইতে পারি না। ভাগ্যক্রমে তুমি ধর্ম-সাধনার অধিকারী হইয়াছ; কিন্তু আমি নীচ মৃত্যুর অভিমুখে চলিয়াছি। বুদ্ধিহীন প্রভু পাপ চিন্তায় মগ্ন হইলে তাহাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হইলে আশ্রিত ব্যক্তি কি অবিচলিত চিত্তে প্রভুর ধ্বংস দেখিতে পারে? রামের তীক্ষ্ণ শরে যখন আমার ভাই-এর দেহ ভূ-লুণ্ঠিত হইবে, তখন কি আমি বেদনা-কাতর হৃদয়ে রাম-নাম লইয়া মত্ত থাকিতে পারিব।...তুমি আর বিলম্ব করিও না। অন্য কোনো কথায় আমার সংকল্প টলিবে না... শৈশব হইতে যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, আজ আমাদের সেই বন্ধন ছিন্ন হইতে চলিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বিভীষণ তাহার চরণতলে পতিত হইল। মন বিষণ্ণ, দেহ অবসন্ন। কুম্ভকর্ণকে সংকল্পে দৃঢ় জানিয়া আর কিছু বলা নিরর্থক হইবে ভাবিয়া বিভীষণ নীরবে রামচন্দ্রের শিবিরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার গমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুম্ভকর্ণের তপ্ত নয়ন হইতে অশ্রু-আকারে যেন রক্ত-ধারা নামিয়া আসিল (৬।১৬।১৬৪)।

প্রলোভনের প্রত্যাখ্যানে কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণ মহাভারতের কর্ণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু কর্ণ ছিল অত্যন্ত রূঢ়-প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় (কর্ণকুন্তীসংবাদ) সেই পৌরাণিক চরিত্র কোমলে কঠোরে পরম হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণকে তাহার সমতুল্য বলিয়া মনে করিলে, আশা করি অতিরঞ্জন হইবে না। "যে পক্ষের পরাজয়, সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান"—ইহা কেবল কর্ণের উক্তি নয়, কুম্ভকর্ণেরও।

বিভীষণকে বিদায় দেওয়ার সময় পর্যন্তও কুম্ভকর্ণের মনে রাম-ভক্তি অপেক্ষা রাবণ-প্রীতি প্রবলতর ছিল। তখনও সত্ত্বগুণ রজোগুণের উপর জয়ী হইতে পারে নাই। তখনও ন্যায়ধর্ম অপেক্ষা লৌকিক ধর্মেই তাহার আসক্তি। তখনও তাহার দৃষ্টির আবরণ অপসারিত হয় নাই। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া

কুম্ভকর্ণের দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া আসিল। রজোগুণের স্থলে সত্ত্বগুণের ক্রমিক আবির্ভাবে তাহার অন্তরে ভক্তিভাব পরিস্ফুট হইতে থাকে। হস্ত-পদ-হীন মুমূর্ষু কুম্ভকর্ণের শেষ প্রার্থনা রাবণের জন্য নয়, বিভীষণের জন্য—"আমার ভাই তোমার চরণে শরণ লইয়াছে। রাক্ষসকুলজাত হইলেও কুলোচিত হীনতা হইতে সে মুক্ত। রাবণ এখনও জয়লাভের কামনা করিতেছে এবং সুযোগ পাইলেই সে বিভীষণের প্রাণ-নাশের চেষ্টা করিবে, ছোট ভাই বলিয়া ক্ষমা করিবে না। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি অথবা লক্ষ্মণ অথবা হনুমান যে কেহ একজন তাহার সঙ্গে থাকিবে"—

উম্বিয়ৈত্তান্ উন্নৈত্তান্ অনুমনৈত্তান্ ওরুপোড়ুদুম্
এম্বি প্রিয়ানাক অরুলুদি য়ান্ বেণ্ডিনেন্। (৬।১৬।৩৫২)

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে বোঝা যাইবে, কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণ ভক্তিরস ও কাব্যরস উভয় দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্রটির রূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বাল্মীকি-রামায়ণে একটা দ্বিধা, অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখিতে পাই, কুম্ভকর্ণ আরও ভ্রষ্ট হইয়া একটা ভোজন-সর্বস্ব ও নিদ্রাপরায়ণ স্থূলবুদ্ধি হাস্যকর চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। অন্যদিকে তুলসীদাস তাঁহার রামভক্তির পরিচয় দিতে গিয়া সম্ভাব্যতার সকল সীমা সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করিয়া বিষয়টিকে অবিশ্বাস্য ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। কম্ব-রামায়ণের কুম্ভকর্ণ একটি জটিল চরিত্র। সে বিভীষণের ন্যায় মহাত্মা নয়, আবার রাবণের ন্যায় দুরাত্মাও নয়। একদিকে তাহার ধর্মবোধ, অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। একদিকে বিভীষণের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে রাবণের জন্য করুণা। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্য কোন রাক্ষস-চরিত্রে নাই। কেবল মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সে নির্দ্বন্দ্ব হইতে পারিয়াছিল। তখন তাহার প্রার্থনা রাবণের জন্য নয়, নিজের জন্য নয়, বিভীষণের জন্য। কুম্ভকর্ণ তাই ভক্ত না হইলেও ভক্ত-কল্প।

কম্বন্ হইতে তুলসীদাস চারশ' বৎসরের ব্যবধান। এই চার শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ভক্তি-সাহিত্যের উদ্‌ভব ও পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া গিয়াছে। দক্ষিণভারতে তামিল সাহিত্যের সমস্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পূর্ণফল যেমন দ্বাদশ শতকের রামভক্ত কবি কম্বন্, উত্তর ভারতে তেমনি হিন্দী-সাহিত্য ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটিয়াছে ষোড়শ শতকের রামভক্ত কবি তুলসীদাসে (১৫৩২—১৬২৩ খ্রী°)। ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহারা দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

(নয়) ভক্তকবি ভারতী

৮৩. তামিল ভক্তিসাহিত্যের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী (১৮৮২-১৯২১খ্রী°)। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিপুলায়তন তামিল ভক্তিসাহিত্যের উপর বিহঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে পারি—আলোয়ার-নায়ন্‌মার কবিদের মধ্যে যে ভক্তিসাধনার সূচনা ও সমৃদ্ধি, দ্বাদশ শতাব্দীর তামিল রামায়ণকার কম্বনের পক্ষে রামচরিতকীর্তনের যাহা প্রধান আশ্রয় এবং যে ভক্তিরসের প্রেরণায় ষোড়শ শতাব্দীর কবি অরুণগিরি তামিলনাডের অন্যতম প্রধান দেবতা মুরুগন্ (কার্তিককে)-কে অবলম্বন করিয়া 'তিরুপ্ পুকল্' কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহারই একটা উৎকৃষ্ট কাব্যসম্মত রূপ লক্ষ্য করা যায় আধুনিক কবি ভারতীর ভক্তিমূলক রচনায়। আধুনিক যুগের কবি হইয়াও ভারতী প্রাচীন তামিলনাডের ভক্তিসাধনাকে অগ্রাহ্য করেন নাই, বরং নব্য তামিলসাহিত্যের এই যুগন্ধর কবি প্রকৃত ভক্তের মনোভাব লইয়া অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা সেতুবন্ধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভারতী-কে বৈষ্ণব কবি আলোয়ার-দের উত্তর সাধকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৮৪. অবশ্য ইহা কবির আংশিক পরিচয় মাত্র। শৈব বা বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় ভারতীর ভক্তিসাধনা কেবল দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই বিকশিত হয় নাই। বরং তাঁহার মুখ্য অবলম্বন ছিল দেশ ও দেশের মানুষ। তামিলনাডে ভারতীর প্রথম ও প্রধান পরিচয় —তিনি দেশভক্তির কবি, জাতীয়তার কবি, মুক্তিপথের সৈনিক। বিংশ শতকের প্রথম দশক হইতে আজ পর্যন্ত তামিলভাষীর দেশাত্মবোধ ভারতীয় জাতীর সংগীতগুলির সহিত এক হইয়া আছে। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্‌-এর তামিল অনুবাদক ভারতী[১] একদিকে তামিলভাষা ও তামিল দেশ এবং অপরদিকে সমগ্র ভারতের গৌরব-গাথা রচনা করিয়া স্বাধীনতালাভের ২৬ বৎসর পূর্বে অকালে লোকান্তরিত হইলেও আজও তিনি মুক্তিসাধনার পুরোহিতরূপে বন্দিত। কবি ভারতীর অবশ্যই ইহা একটি প্রধান পরিচয়, কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। আমরা তাঁহাকে দেশভক্ত অপেক্ষা কেবল ভক্তরূপেই বিচার করিতে চাই।

৮৫. ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাল ভারতীকে পুদুচ্চেরিতে (পণ্ডিচেরী) কাটাইতে হয়। তৎকালীন রাজরোষ এড়াইবার জন্য কবির এই স্বেচ্ছানির্বাসন কিন্তু একদিক হইতে তাঁহার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। কারণ ১৯১০ সালে অরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে আসার পর হইতে ভারতী সুদীর্ঘকাল এই মনীষীর অন্তরঙ্গ সাহচর্যের সুযোগ লাভ করেন। এই সময়ে কবির নিজস্ব চিন্তাধারা যে অরবিন্দ কর্তৃক বিশেষ প্রভাবিত হইয়া মার্জিত রূপান্তর লাভ করিয়াছিল এইরূপ অনুমানে কোনো বাধা নাই।

১ তামিল কবি বন্দেমাতরম্‌ গানখানিকে দুই-দুইবার অনুবাদ করিয়াছেন, এবং তাঁহার একাধিক কবিতায় বন্দেমাতরম্‌ কথাটি ব্যবহার করিয়া বঙ্কিম ও তাঁহার দেশাত্মবোধের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভারতীর শক্তিবন্দনা বিষয়ক কবিতাগুলি এই প্রভাবেরই ফল বলিয়া অনুমান করি।

তাঁহার ৭৭টি "তোত্রপ্ পাডল্‌কল্" অর্থাৎ স্তোত্রমূলক সংগীতের মধ্যে তিনি বিনায়ক-মুরুগ-কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লা ও যীশুখ্রীষ্টের বন্দনা-গানও করিয়াছেন, কিন্তু এই কবিতাবলীর মধ্যে কবির প্রধান আরাধনার বিষয় শক্তি। মোট কবিতাসংখ্যার একচতুর্থাংশেরও বেশি (২০টি) রচিত হইয়াছে শক্তি, শিবশক্তি, কালী, মহাশক্তি, কিংবা পরাশক্তিকে লইয়া। ৬৩নং কবিতা 'মূণ্ড্রু কাদল্' অর্থাৎ 'ত্রি-প্রেম'-এর বর্ণনীয় বিষয় হইতেছেন, সরস্বতী, লক্ষ্মী, এবং কালী।[১] ১০নং কবিতা শিব-শক্তির সূচনাতে কবি বলিয়াছেন "কেহ তোমাকে বর্ণনা করে প্রকৃতি বলিয়া; কেহ বা তোমাকে দেখিতে পায় পঞ্চভূতের মধ্যে; কেহ বলে—তুমি আদি শক্তি; কেহ বা তোমাকে ডাকে অগ্নিরূপে, জ্ঞানরূপে অথবা ঈশ্বর-রূপে। হে জননী, আমি তোমাকে বন্দনা করিতেছি 'ওম্' বলিয়া।"[২] ৪৬টি স্তবক-বিশিষ্ট "শক্তিক্কু আত্মসমর্পণম্" (শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ) নামক কবিতার কবি তাঁহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঁপিয়া দিয়াছেন শক্তির সেবায়—তাঁহার হাত-চোখ-কান-জিহ্বা-স্কন্ধ-হৃদয়-চরণ-মন-মতি-চিত্ত সমস্তই। যাবতীয় সৃষ্টিই তো তাঁহার—মৎস্যদেহের উজ্জ্বলতা, পৃথিবীর আলো, আকাশের জ্যোতি, কবিচিত্তের আনন্দ—এই সমস্ত তাঁহারই অর্থাৎ সেই মহাশক্তির অনুগ্রহের ফল।[৩]

এক সময়ে এই মহাশক্তির চেতনাই বোধ করি কবি-চিত্তে সবচেয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮সং কবিতা 'পরাশক্তি' হইতে

১ এই প্রসঙ্গ অরবিন্দ-রচিত The Mother স্মরণীয়।

২ ইয়র়্‌কৈয়েণ্ড্রুনৈয়ুরৈপ্ পার্—চিলর়্‌....

৩ মীন্‌কল্ চেয়্‌যুম্ ওলিয়ৈচ্ চেয়্‌দাল্—২৭নং কবিতা মহাশক্তি

তো তাহাই মনে হয়। কবির ইচ্ছা এমন গান রচনা করা যাহাতে দেশবাসীর দুঃখদারিদ্র্যের মোচন হয় এবং যাহাতে বিশ্ববাসী এক প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। কবির অনুরাগী বন্ধুরাও তাঁহাকে সেইরূপ কবিতা-রচনায় উৎসাহিত করেন। তাঁহারা অনুরোধ জানাইয়া বলেন—কবি, তুমি আনন্দ-কল্পনার বিস্ময় দ্বারা গীতছন্দের ধারা মুক্ত কর। কবি তখন গীতলক্ষ্মীর দিকে মুখ ফিরাইলে ধ্বনিত হইল পরাশক্তির আদেশ—"তুমি আমারই গান রচনা কর, কবি।" বৃষ্টির বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—পুঞ্জীভূত মেঘে আকাশ আসে আঁধার করিয়া, বিদ্যুৎ চমকায়, আর সেই সঙ্গে বহিতে থাকে প্রবল উত্তুরে হাওয়া। কবি তখন সেই আকাশ ও ধারাপ্রপাতের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে তদুপযোগী শব্দের পরিবর্তে কবিকণ্ঠে বাজিয়া উঠে—"জয় মা পরাশক্তি, এই বৃষ্টি, এই বাতাস তোমারই লীলা।"[১]

৮৬. এইরূপ শক্তি-মহাশক্তি-শিবশক্তি-পরাশক্তির স্তুতি-বন্দনায় কবি ভারতী অনেক কথা বলিলেও ভক্তিকাব্যের ক্ষেত্রে যে অংশকে আমরা তাঁহার বিশেষ দান বলিয়া মনে করি তাহা হইল "কণ্ণন্‌পাট্টু" অর্থাৎ কৃষ্ণগীত। এই কৃষ্ণগীত-পর্যায়ে ভারতী ২৩টি কবিতা রচনা করেন। পূর্বোল্লিখিত ৭৭টি স্তোত্রসংগীতের কতকগুলি কৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহারা 'কণ্ণন্‌পাট্টু' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ভারতীর রচনাবলীর মধ্যে কণ্ণনপাট্টুর একটি বিশেষ স্থান আছে। পণ্ডিচেরীতে অবস্থানকালে রচিত তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে তিনখানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার একখানি এই ক্ষুদ্রাবয়ব কৃষ্ণগীত। ইহাতে ভারতী যে কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাকে আমরা ইংরেজী করিয়া বলিলে বলিতে পারি iridescent imagination. এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কৃষ্ণ কবি-দৃষ্টিতে নানারূপে প্রতিভাত—তিনি কখনো দেবতা, কখনো বন্ধু; কখনো

১ ১৮ নং কবিতা "পরাশক্তি"র ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্তবক

প্রভু, কখনো ভৃত্য ; কখনো শিষ্য, কখনো গুরু ; কখনো প্রেমিক, কখনো প্রেমিকা ; কখনো পিতা, কখনো মাতা ; কখনো বা কবির শিশুকন্যা। 'কৃষ্ণকে তিনি বিচিত্ররূপে দেখিয়াছেন' না বলিয়া যদি বলা যায়—সংসারের বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি কৃষ্ণের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন তবেই বোধ করি ঠিক বলা হইবে।[১]

আমরা কবির বর্ণনাক্রম ধরিয়া কয়েকটি কবিতার সাহায্যে তাঁহার কৃষ্ণগীতের বিশেষত্বটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিব। দ্বিতীয় কবিতাটির নাম "কণ্ণন্—এন্ তায়্" অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার মা। ইহার প্রথম স্তবকটি এইরূপ :

আমার জীবন যেন মাতৃস্তন, আর সেই জীবনের চেতনা যেন মাতৃস্তন-নিঃসৃত ক্ষীর—যাহা যথেষ্ট পান করিয়াও আমার তৃপ্তি নাই। সেই জ্ঞানামৃত সযত্নে রাখিয়া মা আমার মুখে ঢালিয়া দেয়—এমনই আমার মায়ের গুণ। সকলে বলে—নাম তাহার কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ তাহার স্নেহময় দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আমাকে তাহার ভূমি-ক্রোড়ে বসাইয়া কত যে সব অপূর্ব গল্প শোনায়।[২]

১ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পদ্যাংশ দু'টি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

ক স্থানভেদে তব গান মূর্তি নব নব—
সখা সনে হাস্যোচ্ছ্বাস সেও গান তব ;
প্রিয়া-সনে প্রিয়ালাপ, শিশু-সনে খেলা,
জগতে হেথায় যত আনন্দের মেলা।—(উৎসর্গ)

খ ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন ; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ ;
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি। —(মালিনী)

২ উন্ন উন্নত্ তেবিট্টাদে—অম্মৈ···

তৃতীয় স্তবক হইতে আরম্ভ করিয়া কবি বলিয়াছেন নানারকম খেলনার কথা—যাহা মা তাহার শিশু-পুত্রকে দেখাইতে ভালোবাসে। চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, নক্ষত্র, পর্বত—কত রকমের খেলনা। পঞ্চম স্তবকের বর্ণনা এইরূপ :

রমণীয় নদীগুলি সমস্ত দেশের উপর দিয়া খেলা করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়ায় এবং ধীরে ধীরে বহিয়া অবশেষে মিলিত হয় আর একটি অপূর্ব খেলনার সহিত—সেই বৃহৎ সীমাহীন সফেনতরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র। সেই সমুদ্রের নিত্য-শ্রূয়মাণ সংগীতে ধ্বনিত হইতেছে কেবল আমার মায়ের নাম—ওম্…ওম্…।[১]

তৃতীয় কবিতার নাম "কণ্ণন্—এন্ তন্দৈ" অর্থাৎ কৃষ্ণ—আমার পিতা। ইহার শেষ দুইটি স্তবকে (নবম ও দশম) পিতৃ-রূপী কৃষ্ণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে : "বয়সে তিনি অত্যন্ত প্রবীণ হইলেও আমার পিতার যৌবন-দীপ্তি এখনও অটুট। তিনি জরা-দুঃখ-রহিত চির-অক্লান্ত। ব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি নির্ভীক নিরপেক্ষ অনাসক্ত। কোনোদিকেই তাঁহার আকর্ষণ নাই। মধ্যস্থলে একাকী দাঁড়াইয়া তিনি বিধির নির্বন্ধ দর্শনে আনন্দ লাভ করেন।

"যাহারা দুঃখকষ্টে কাতর হইয়া তাঁহার কাছে আসে, তিনি তাহাদিগকে ধিক্কৃত করেন। কিন্তু পরে আবার তাহাদের উপর প্রেমবর্ষণ করিয়া তাহাদের সমস্ত দুঃখমোচন করেন। শরীরের হাড় ভাঙিয়া গেলেও যাহারা হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকে, তিনি তাহাদিগকে অনুগৃহীত করেন। আর যাহারা জীবনকে আনন্দময় দেখে তিনিও তাহাদের প্রতি আনন্দযুক্ত হন।"[২]

চতুর্থ কবিতাটির নাম 'কণ্ণন্-এন্ সেবকন্' অর্থাৎ—কৃষ্ণ আমার

১ নল্ল নল্ল নদীকলুণ্ডু—অবৈ…

২ বয়দু মুদিয়ন্দু বিডিহুম্—এন্দৈ…

সেবক। কবির গার্হস্থ্য-জীবনে একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য আবশ্যক হইয়া পড়িলে একদিন দেখা গেল কোথা হইতে একটি বালক আসিয়া উপস্থিত। কবি তাহার নাম জানিতে চাহিলে ছেলেটি বলিল নাম তাহার বিশেষ কিছুই নাই তবে লোকে তাহাকে কণ্ণন্ (কৃষ্ণ) বলিয়া ডাকে। আরও দু'চার কথার পরে কণ্ণন্ কবিগৃহে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হয়। পরবর্তী অংশটি আমরা যথাসম্ভব মূলানুযায়ী উদ্ধৃতি করিতেছি—

"সেই দিন হইতে আমাদের প্রতি কণ্ণনের অকপট ভালোবাসা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিল। তাহার কাছে যে উপকার পাইয়াছি তাহার কথা আর বলিতে পারি না। চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি ভাবেই সে আমাদের পরিবারটিকে সুন্দরভাবে রক্ষা করিতেছে। একবারও তাহাকে মুন্‌মুন্ করিতে শুনি নাই। সে বাড়ির রাস্তা সাফ করে, ঘর ঝাঁট দেয়। পরিচারিকারা কাজকর্মে ভুলত্রুটি করিলে সে তাহাদের ধমকানি দেয়। আমার ছেলেদের সে সেবা করে নানাভাবে—কখনো শিক্ষক, কখনো ধাত্রী, কখনো চিকিৎসকরূপে। কোনো দিকেই কোনো খুঁত নাই তাহার। দুধে মাখনে এবং আরও সমস্ত দরকারী জিনিসপত্রে সে আমার ভাণ্ডার সাজাইয়া রাখে। বাড়ির মেয়েদের সে ভালোবাসে মায়ের মতো। সে আমার বন্ধু, আমার মন্ত্রণাদাতা, আমার আচার্য। বাহ্যত সে ভৃত্য, বস্তুত সে ভগবান্। কোথা হইতে একদিন সে আসিয়া বলিয়াছিল—'আমি রাখালের ছেলে'। আমি যে তাহাকে ঘরে সেবকরূপে পাইয়াছি, ইহার জন্য আমি কী তপস্যা করিয়াছিলাম?"[১]

……অণ্ড্রু মূদর্ কোণ্ডু
নালাক নালাক নম্মিডত্তে কণ্ণহ্কুপ্
পট্রু মিকুন্দু বরল্ পায়্কুকিণ্ড্রেন্….ইত্যাদি

আর একটি মধুর চিত্র শিশুকন্যারূপী কৃষ্ণ। কবি তাহাকে আদরভরে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তুমি একটি খুব ছোট্ট তোতাপাখি, তুমি আমার সকল ধনের ভাণ্ডার। আমার দুঃখদারিদ্র্য দূর করিয়া তুমি আমায় সুখী করিতে জন্ম লইয়াছ এই পৃথিবীতে। তুমি যেন আমার অমৃতফল, একখানি কথা-বলা সোনার ছবি। যখন তুমি নাচিতে নাচিতে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াও, তোমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। তোমার ধাবমান মূর্তিখানি কোলে লইয়া আমার হৃদয় শীতল হয়। তোমাকে নাচিতে খেলিতে দেখিলে আমার অন্তরাত্মা তোমার কাছে গিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিতে চায়।…তোমার মুখখানি একটু রাঙা হইলে মন আমার চঞ্চল হইয়া উঠে। ললাট ভ্রূকুঞ্চিত দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। তোমার চোখে জল আসিলে বুকে আমার রক্ত ঝরে। তুমি কি আমার চোখের মণি নও? আমার জীবন কি তোমার নয়? তোমার আধো-আধো মধুর কথায় দুঃখ আমার দূর কর; তোমার জুঁইফুলের হাসি দিয়া জড়তা আমার নাশ কর।…বুকে পরিতে তোমার মতো মণিহার আর আছে কি? জীবন সফল করিতে তোমার মতো সম্পদ কৈ?[১]

পাঁচটি কবিতায় কৃষ্ণের বর্ণনা আছে প্রেমিকরূপে। কবিই তাঁহার নায়িকা। নায়িকা তাহার সখীকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় বিরহাবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছে—

বঁড়শির আগায় বাঁধা পোকার মতো, ঘরের বাহিরে বাতাসে কম্পমান দীপশিখার মতো আমার হৃদয় দীর্ঘকাল ক্লেশ ভোগ করিতেছে। পিঞ্জরাবদ্ধ তোতাপাখির মতো আমি কাতর ও একাকী। সমস্ত বাঞ্ছিত দ্রব্যাদি আমার অরুচিকর হইয়া উঠিল। শয্যায় আমি নিঃসঙ্গ। সখি, মাকে দেখিলেও আমি বিরক্ত হই। এমন কি

১ চিন্নম্ চিরু কিলিয়ে কণ্ণম্মা! চেল্বক্ কলঞ্জিয়মে—কবিতা সং ৮

তোমরা যে অবিরত কথা বল, তাহাও আমার ভালো লাগিতেছে না। তোমাদের সংসর্গ ব্যাধির মতোই ভয় করি। আহারে রুচি নাই, নিদ্রাও পলায়িত। সখি, আমি সুগন্ধ চাই না, ফুল আমি ছুঁই না।[১]

এইরূপ বিরহবর্ণনায় অনেক কথাই আসিয়া পড়িয়াছে। দুধ তাহার তেতো লাগিতেছে, শয্যা তাহাকে যন্ত্রণা দেয়, তোতার মধুর ধ্বনিও কানে বিষ ঢালিতেছে। চারিজন বৈদ্য আসিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। জ্যোতিষী আসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—গ্রহ বড়ই প্রতিকূল। কিন্তু সকলের সকল উপদেশ-আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া কবির জীবনে আসিয়া একদিন দেখা দিলেন তাঁহার "দুখ-যামিনীর বুক-চেরা ধন"। কবির সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা এইরূপ—

অবশেষে একদিন স্বপ্ন দেখিলাম—চোখে ভালো করিয়া দেখিতে পাইলাম না—কে তিনি বুঝিতে পারিলাম না—তিনি আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চোখ খুলিলাম—'কে তুমি?' কিন্তু সখি, তাহার আগেই তাঁহার মূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল, আমার মনের মণিকোঠায় রাখিয়া গেল এক নবীন আনন্দের অনুভূতি।...যখনই ভাবি তাঁহার হাত কোথায় আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তখনই মনে জাগে এক অনাস্বাদিত শান্তি, এক অপরূপ স্নিগ্ধতা। আমি ভাবি আর ভাবি—কে তিনি। তখন আমার নয়ন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় কৃষ্ণের শ্রীমূর্তি।[২]

কৃষ্ণকে প্রেমিকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে পাঁচটি কবিতায়। কবি-হৃদয়কে কোমল স্পর্শে অভিভূত করিয়া কৃষ্ণ তো অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু রাখিয়া গেলেন তাঁহার ক্ষণিক ভালোবাসার স্মৃতি।

১ তূণ্ডিল্ পুড়ু্ বিনৈপ্ পোল্, বেলিয়ে চুড়ম্ বিলক্কিনৈপ্ পোল্—১০ সং

২ কনবু কণ্ডিলে ওরুনাল্ কণ্ণুক্কুত্ তোণ্ড্রামল্—১০ সং

সেই স্মৃতি লইয়া চলিল বিরহিণীর করুণ কান্না। ১৪ নং কবিতায় আছে—

'আমার বাঞ্ছিত মূর্তি চলিয়া গিয়াছে স্মরণের বাহিরে—কাহার কাছে সে কথা বলিব সখি? আমার হৃদয় কিন্তু তাঁহার প্রেমের কথা ভোলে নাই। আমি কেমন করিয়া তাঁহার মুখখানি ভুলিব বল?''[১]

কিন্তু কালক্রমে ব্যাপার ঘটিল অন্যরূপ। যদিও বিরহিণীর চোখে ভাসিতেছে একটিমাত্র দৃশ্য—সেই স্বপ্ন-দেখা ছবি, তবু তাহাতে কল্পনের রূপরাশি ক্রমেই আবছা হইয়া আসিতে লাগিল। যদি বা কখনো দেখা যায় কৃষ্ণ তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন, তাঁহার মুখে সেই অনিন্দ্যসুন্দর প্রসন্ন হাসি আর নাই। বিরহিণী নিরন্তর স্মরণ করিতেছে কৃষ্ণপ্রীতি, তাহার রসনা নিত্য কীর্তন করিতেছে সেই মায়াবীর কীর্তিসমূহ। কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁহার মূর্তিও ক্রমশ অপসৃত হইল হৃদয়-মন্দির হইতে। কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা আছে অথচ তাঁহার মুখচ্ছবি অন্তরে নাই—এই অসহনীয় অবস্থার কথা ব্যক্ত হইয়াছে এইভাবে—

''রমণীকুলে আমার মতো মূর্খ স্ত্রীলোক ইতিপূর্বে কেহ দেখিয়াছে কি? হে সখি, এই পৃথিবীতে এমন ব্যাপার তো কখনও হয় নাই যে, মধুকর ভুলিয়াছে মধুকে, পুষ্প ভুলিয়াছে আলোকে, ধান্যশস্যাদি ভুলিয়াছে আকাশকে (অর্থাৎ আকাশের বর্ষাকে)। যদি আমি কৃষ্ণমূর্তিকেই ভুলিলাম, তবে আর এই পোড়া চোখ দু'টি থাকার সার্থকতা কী? তাঁহার সুন্দর চিত্র যদি আমার সামনে নাই আসিল তবে আর বাঁচিয়া থাকারই বা কী প্রয়োজন সখি?''[২]

১ আশৈ মুখমরন্দু পোচ্চে—ইদৈ
আরিডম্ চোল্ বেন্ অডিতোলি?—কবিতা সং ১৪.

২ 'পেন্‌কলিনত্তিলি ইদু পোলে ওরু
পেদৈয়ৈ মুন্‌বু কণ্ডুণ্ডো?—কবিতা সং ১৪.

"কণ্ণন্—এন্ কাদলি" অর্থাৎ "কৃষ্ণ—আমার প্রিয়া" এই পর্যায়ে আছে ৬টি কবিতা। এই কবিতাগুলিতে প্রেমিক-কবি কৃষ্ণকে চিত্রিত করিয়াছেন নায়িকারূপে। অথবা বলিতে পারি, কবি তাঁহার প্রিয়ার মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন কৃষ্ণের অর্থাৎ ঈশ্বরের অনন্ত মাধুরী।[১] কাব্যাংশে এই পর্যায়ের কবিতাগুলি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ১৭ নং কবিতায় দেখিতে পাই, এক মনে ভর সন্ধ্যায় কবি এক উন্নত ভূমি-খণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাকাইয়া আছেন আকাশ ও সমুদ্রের দিকে। সূর্য তখন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সমুদ্রকে চুম্বন করিতে। তল্লীন হইয়া কবি দেখিতেছেন সেই দৃশ্য। তারপরে কবির কথায় শোনা যাক—

"এমন সময় চুপি চুপি আসিয়া কে আমার পশ্চাৎ হইতে চোখ টিপিয়া ধরিল। হাত দুখানি স্পর্শ করিয়া আমি তাহাকে চিনিয়া ফেলিলাম। আমি তাহাকে বুঝিতে পারিলাম তাহার শাড়ির গন্ধে, তাহাকে চিনিলাম আমার অন্তরের আনন্দ প্লাবনে, আর চিনিলাম আমাদের দু'জনার আবেগ-স্পন্দিত হৃদয়ে। আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম—কণ্ণম্মা,[২] তোমার হাত দুখানি সরাইয়া লও। তোমার এই ছলনা কাহার কাছে?[৩]

১ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'-এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে—

"যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারি মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা···বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।···যখন দেখিয়াছে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম স্রোতের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"

২ কণ্ণন্=কৃষ্ণ। স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইতে কণ্ণন্+অম্মা=কণ্ণম্মা।

৩ আঙ্গপ্ পোড়ু নিন্লেন্ পিন্পুরত্তিলে—কবিতা সং ১৭

কবির কাছে ধরা পড়িয়া তাঁহার প্রিয়া কন্নম্মা হাসিয়া উঠিল। কবি তখন তাহার হাত দু'খানি ছাড়াইয়া লইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কন্নম্মা জানিতে চাহিল, কবি কী উদ্দেশ্যে প্রতিদিন আসিয়া এই সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গে, আকাশের নীলিমায়, ফেনরাশির আবর্তনে, বুদবুদের বিস্ফোরণে এমন কী সে দেখিতে পায়? আমরা কবিকণ্ঠেই উহার উত্তর শুনিব—

"সমুদ্র-তরঙ্গে আমি দেখিয়াছি তোমার মুখ। নীল আকাশেও আমি তাহাই দেখিলাম। ফেনিল আবর্তে, বুদবুদের বিস্ফোরণেও দেখিলাম তোমারই মুখ। তোমার মুখ ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই! আবার তুমি যখন হাসিয়া উঠিলে, তখন তোমার হাত ছাড়াইয়া সমুদ্র হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম তোমার মুখ।"[১]

সমুদ্র-তীরে সাক্ষাতের দিনে কবি-প্রেয়সী কন্নম্মা আসিয়া কবির চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিল। ইহা অবশ্যই প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক। কিন্তু পরবর্তী এক সাক্ষাৎকারে লাজমুগ্ধা নারী নিজেই নিজের চোখ ঢাকিয়া রহিল। কবি বলিলেন—

"ইতিপূর্বে আমি তো তোমার ঘোমটা খুলিয়াছি। সুতরাং আজ কী মনে করিয়া তুমি চোখ ঢাকিয়া রাখিলে? তোমার কুমারী বয়সে কি আমি তোমার সহিত দেখা করি নাই? সেদিন কি চুম্বনে তোমার কপোল রক্তবর্ণ হয় নাই? বার বার অনেক (অনাবশ্যক) কথা বলিয়া লাভ কী? যে তোমার ঘোমটা সরাইয়াছে সে কি তোমার হাত সরাইতে ভয় পাইবে? আমাকে তুমি পর মনে করিলে কিরূপে? দুইটি চোখের একটি কি অপরটি দেখিয়া লজ্জিত হয়?[২]

নেরিত্ত তিরৈক্ কডলিল্ নিন্ মুখম্ কণ্ডেন্—১৭ নং কবিতা

.........নিন্ তন্

মতক্কণ্ডু তুকিলিনৈ বলিদুরিন্দেন্ —কবিতা সং ১৯

অবশেষে চম্পকবনে কবির সহিত কণ্ণম্মার নিভৃত সাক্ষাৎ। পূর্বসংকেত অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া কবি কণ্ণম্মাকে দেখিতে না পাইয়া স্বভাবতই খুব বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। অলক্ষ্য প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে তিনি খেদোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন এইভাবে—

তুমি বলিয়াছিলে "নদী-তীরে চম্পক বনের দক্ষিণ কোণে সুমধুর জ্যোৎস্নায় আমি আসিব, তুমি অপেক্ষা করিয়া থাকিও।" কিন্তু কণ্ণম্মা, কথা দিয়া তুমি রাখিলে না। ব্যথিত হৃদয়ে আমি যেদিকেই তাকাই না কেন, সর্বদিকেই দেখি কেবল তোমারই প্রতিমূর্তি। এই জ্যোৎস্না কেমন জড়াইয়া ধরিয়াছে সমস্ত আকাশকে! সমস্ত পৃথিবী কেমন মৌন নিদ্রামগ্ন। কেবল আমিই একা বিরহযন্ত্রণায় জাগিয়া![1]

কবিতায় উল্লেখ না থাকিলেও কণ্ণম্মার সহিত অবশ্যই কবির মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। সেই মিলনমধুর আনন্দঘন নিশীথে কবি-চেতনার অন্তস্তলে যে দিব্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই পরবর্তী ২১ নং কবিতায়। নানা চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি-কণ্ণম্মার নিত্য সম্বন্ধটি সরলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এখানে—

"তুমি আমার আলোর ধারা, আমি তোমার চোখের মণি। তুমি আমার মধু, আমি তোমার-মধুকর।....তুমি আমার বীণা, আর আমি সেই বীণার তারে পরশ বুলানো অঙ্গুলি।....তুমি সখি জ্যোৎস্নাধারা, আমি তোমার মত্ত-সাগর।...আমি বিকশোন্মুখ ফুল, তুমি সেই ফুলের বুকের গন্ধ। আমি শব্দ, তুমি অর্থ।...তুমি আকাশের তারা, আমি তোমার শীতল চন্দ্র।...ধরণীর তলে, গগনের গায়, যত আনন্দ রয়েছে যেথায়, একরূপে তুমি ধরেছ মূরতি অন্তর-সুধা-রূপিণি।"[2]

---

১ তীর্থক্ করৈয়িনিলে তেন্নকু মূলৈয়িল্
চেণ্পকত্ তোট্টত্তিলে—কবিতা সং ২০

২ পায়ুমোলি নী য়েনকু, পার্‌ক্কুম্ বিলি নান্নুনকু
তোয়ুম্ মধু নী য়েনকু, তুম্বিয়ডি নান্নুনকু...

৮৭. এই জাতীয় 'তুমি-আমি' স্তুতি কাব্যক্ষেত্রের একটি প্রচলিত প্রথা। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের মনে আসিতেছে হিন্দীর সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীসূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর (নিরালা) 'তুম্ ঔর মৈঁ' নামক কবিতাটি। তবে পার্থক্য এইটুকু: ভারতী বলিয়াছেন নায়করূপে, আর নিরালা বলিয়াছেন নায়িকারূপে। তাই ভারতী বলেন—তুমি বীণা, আমি বীণাবাদক। নিরালা বলেন—তুমি সেতার, আমি তার বিরহ-রাগিণী। ভারতী বলেন—তুমি জ্যোৎস্না, আমি সাগর। নিরালা বলেন—তুমি গিরিশৃঙ্গ, আমি নদী। ভারতী বলেন—তুমি গন্ধ, আমি ফুল। নিরালা বলেন—তুমি সূর্য, আমি ফুল। ভারতী বলেন—তুমি আকাশের তারা, আমি চন্দ্র। নিরালা বলেন—তুমি আকাশ, আমি তার নীলিমা; তুমি যোগ, আমি সিদ্ধি; তুমি শিব, আমি শক্তি; তুম্ রঘুকুলগৌরব রামচন্দ্র, মৈঁ সীতা অচলা ভক্তি।

বীণৈয়ড়ি নী য়েনক্কু, মেবুম্ বিরল্ নাহ্নক্কু....
বেণ্ণিলবু নীয়েনক্কু, মেবু কডল্ নাহ্নক্কু....
বীচুকমল নী য়েনক্কু, বিরিয়ু মলর্ নাহ্নক্কু;
পেচুপোরুল্ নীয়েনক্কু, পেণুমোঁড়ি নাহ্নক্কু....
তারৈয়ড়ি নী য়েনক্কু, তণ্ মদিয়ম্ নাহ্নক্কু....
ধারণিয়িল্ বাহ্নলকিল্ চান্দিরুক্কুম্ ইন্‌বমেল্লাম্
ওরুরুবমায়্চ্ চমৈন্দায়্! উল্লমুদে! কণ্ণম্মা!

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ণাটকে ভক্তি সাহিত্য

(এক) কন্নড শৈব সাহিত্য

৮৮. বর্তমানে যে অঞ্চল 'মাইসোর' নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ তাহার প্রাচীন 'কর্ণাটক' নামটিও অপরিচিত নয়। ভীমা-কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা-কাবেরী-বিধৌত এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা বরং 'কর্ণাটক' শব্দটির অনুরাগী, কারণ ইহার সহিত তাঁহাদের রাজ্য ভাঙা-গড়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক জয়যাত্রার স্মৃতি বিজড়িত। তাই দেশাভিমানী শিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনায় 'কর্ণাটক'-এর বহুল প্রচলন।[১]

তামিলনাডের ন্যায় কর্ণাটকেও এক সময়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ঘটে।[২] বাদামি বা বাতাপিপুরের চালুক্য বংশ (রাজ্যকাল ষষ্ঠ-অষ্টম শতক) অনেক জৈন পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট শক্তির আক্রমণে চালুক্যবংশের প্রাধান্য হ্রাস পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে

১ কালো মাটির দেশ বলিয়া "কর্ (কৃষ্ণ)+নাডু (দেশ)" হইতে 'কন্নাডু>কন্নড' প্রভৃতি দেশ ও ভাষাবাচক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কন্নডের অধিবাসী—কন্নডিগ। দেশবাচক কন্নড শব্দের সংস্কৃত রূপ 'কর্ণাটক'। বাঙলায় যাহাকে 'মহীশূর' বলা হয় উহার উদ্ভব এইরূপ: 'মহিষের দেশ' অর্থে মহিষ+উরু (জনপদ)>মহিষূরু (বাং মহীশূর) >মৈসূরু>মাইসোর (Mysore)।

২ Buddhism existed in Karnataka from the days of Asoka····Jainisim entered Karnataka earlier than Buddhism, in the days of Chandragupta Maurya. S. Srikantha Sastri —Sources of Karnataka History Vol I—Introduction XXII.

জৈনধর্মের কোনও ক্ষতি হয় নাই। কারণ রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজারাও (রাজ্যকাল অষ্টম-দশম শতক) চালুক্যদের ন্যায় জৈনধর্মের অনুরাগী ছিলেন। শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ (৮১৪-৮৭৭) কেবল জৈনধর্মের পরিপালক ছিলেন না, তিনি স্বয়ং এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রকূট-বংশের রাজ্যকালে কর্ণাটকে জৈন শিল্প ও ভাস্কর্যের যে অভ্যুদয় ঘটে তাহার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জৈন তীর্থঙ্কর গোমটেশ্বরের মূর্তি। মৈসূরু (মহীশূর) শহর হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত শ্রবণবেলগোলার পাহাড়ে এই ৭০ ফুট পরিমিত সুউচ্চ শিলাবিগ্রহটি নির্মিত হয় ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পরে আরও দুইশত বৎসর পর্যন্ত কর্ণাটকে জৈন প্রাধান্য অটুট ছিল। প্রাচীন কন্নড সাহিত্যের প্রথম যুগ (নবম-দ্বাদশ শতাব্দী) জৈন সাহিত্যের যুগ বলিয়া পরিচিত।

প্রাচীন কন্নড সাহিত্যকে সাধারণত যে তিনটি যুগে ভাগ করা হয় তাহার প্রথম যুগের আরম্ভ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কন্নড সাহিত্যের তিনশত বৎসর জৈন সাহিত্যের যুগ। তামিল ছাড়া অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষার প্রাচীন সাহিত্য জৈনধর্মের দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কন্নড সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ "ত্রি-রত্ন" পম্প-পোন্ন-রন্ন ইঁহারা তিনজনেই ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী।

৮৯. নবম শতাব্দীর পূর্বেই তামিলনাডে জৈনধর্ম শক্তিহীন হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কর্ণাটকে তখনও তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ধীরে ধীরে দক্ষিণের ভক্তিধর্ম উত্তরাভিমুখে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একাদশ শতকের একেবারে শেষভাগে (১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) তামিলনাডের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য রঙ্গনাথ-সেবক রামানুজের কর্ণাটকে আগমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কর্ণাটকের তৎকালীন রাজধানী দেবসমুদ্রে (বর্তমান হালেবীড) উপস্থিত হইয়া রামানুজ হোয়সল্ বংশীয় জৈনধর্মাবলম্বী নরপতি বল্লালরাজকে

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নতুন নামকরণ করিলেন বিষ্ণুবর্ধন।

এই গেল বৈষ্ণবধর্মের কথা। শৈবভক্তিও তামিলনাডে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। রামানুজের ন্যায় কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শৈবাচার্যের উত্তরাভিযানের কথা জানা যায় না বটে, কিন্তু শৈবধর্ম যে রাজানুকূল্যে উত্তরাঞ্চলে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণের পল্লবরাজবংশ এবং পাণ্ড্যরাজবংশ বৌদ্ধ-জৈনদের প্রভাবে আসিলেও চোলরাজবংশ বরাবরই তাহাদের পরম্পরাগত শৈবধর্মে অবিচলিত ছিল। তামিলনাডের যে ৬৩ জন শিবভক্ত নায়নমার্-রূপে পরিচিত, তাঁহাদের জীবৎ-কালের শেষ সীমারেখা নবম শতাব্দী। সুতরাং দশম শতাব্দীর শেষভাগে (৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) রাজরাজ চোল যখন কর্ণাটকের একাংশ অধিকার করিয়া লইলেন, তখন যে রাজধর্ম শৈবধর্মের সহিত নায়নমার্ ভক্ত-বৃন্দের আশ্চর্য জীবনকাহিনী অধিকৃত অঞ্চলে প্রচারলাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। রাজরাজ চোলের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ১ম রাজেন্দ্র চোলের রাজ্যকালে (১০১৮—১০৪৩ খ্রী°) শৈবধর্মের প্রচার আরও কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকিবে। ইহারই ঠিক একশত বৎসর পরে আবির্ভূত হন কর্ণাটকে বীর শৈবধর্ম সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় ধর্মগুরু বসবন্ বা বসবেশ্বর বা বসব।

৯০. বসবেশ্বরই বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ কিনা এ সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই সাধক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অনেককাল পূর্ব হইতেই ছিল, বসবন্ নতুন করিয়া তাহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত করিলেন মাত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যের যে স্থান, কর্ণাটকের বীরশৈব সাধনায় বসবন্ও সেই স্থানের অধিকারী।

ভক্তিমার্গের ব্যাপক প্রচারণায় বসবের একটি বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, তিনি কেবল ভক্ত পুরুষই ছিলেন না, ব্যবহারিক

জীবনেও ছিল তাঁহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। চালুক্যদের সেনাপতি কল্‌চুরি-বংশীয় বিজ্জল চালুক্যরাজ্য অধিকার করিয়া বসিলে (১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হইলেন বসবন্। একাধারে যিনি সন্ত ও রাজনীতিজ্ঞ, সমাজ ও ধর্মসংস্কারক, বিশিষ্ট কবি, বীরশৈব আন্দোলনের পুরোধা, শাসক ও সেনাপতি, তিনি যে অত্যন্ত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই।

৯১. বসবনের ভক্তি-আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে রাজধানী কল্যাণ-নগরে "শিবানুভব মণ্ডপ" প্রতিষ্ঠার পর হইতে। বাংলাদেশে একদিন যেমন শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপ শহরে শ্রীবাসের গৃহে ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তেমনি দ্বাদশ শতকের কর্ণাটকে ভক্তি-সাধনার সূচনা হইয়াছিল ঐ শিবানুভব মণ্ডপে। শতশত ভক্ত সেখানে সমবেত হইতেন—তাঁহাদের মধ্যমণি বসবন্। বসবন্ কেন্দ্রীয় পুরুষ হইলেও কিছু কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ভক্তেরও সেখানে পদার্পণ হইত। গৌরাঙ্গের কীর্তন-মণ্ডলীতে যেমন থাকিতেন প্রবীণ ভক্ত অদ্বৈত প্রভু, বসবের শিবানুভব মণ্ডপেও তেমনি আসিতেন সে যুগের বিশেষ তপস্বী পুরুষ—অল্লম প্রভু। বসব, তাঁহার ভাগিনেয় চেন্ন (সুন্দর) বসব এবং অল্লম প্রভু—শৈব সম্প্রদায়ে এই তিনজন "শিবশরণত্রিমূর্তি" নামে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে বসব ছিলেন ভক্তির প্রতিমূর্তি, চেন্ন বসব জ্ঞানের এবং অল্লম প্রভু বৈরাগ্যের। এই 'ত্রিমূর্তি' ব্যতীত কর্ণাটকের 'পণ্ডিতত্রয়' এবং 'আচার্যপঞ্চক'-এর কথাও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ইঁহাদের অনেকেই ছিলেন বসবনের অগ্রজ সমসাময়িক। মঞ্চন্ন (বা শিবলেঙ্ক), শ্রীপতি পণ্ডিত এবং মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য—ইঁহারাই হইলেন পণ্ডিতত্রয়। আচার্য পঞ্চকের তালিকায় আছেন রেণুকাচার্য (বা রেবণসিদ্ধ), মরুলসিদ্ধ, মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য, একোরামি এবং বিশ্বেশ্বরাচার্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য পণ্ডিত এবং আচার্য উভয়

তালিকায় স্থান পাইয়াছেন। ইনিই আন্ধ্রদেশে বীরশৈবাচারের প্রথম প্রচারক এবং তেলুগু শৈবসাহিত্যের জনকরূপে সম্মানিত।

৯২. কর্ণাটকের শৈব সম্প্রদায় তামিল শৈব সাধনার নিকট বিশেষ ঋণী ছিল সন্দেহ নাই এবং তামিলনাডের ৬৩ জন নায়ন্মার 'পুরাতন' বলিয়া কর্ণাটকী শৈবদের নিকট সর্বদাই শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতেন।[১] কিন্তু দুয়েকটি বিষয়ে বসবন্ প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। সমাজ পুনর্গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসবন্ যে সংস্কার কার্যে ব্রতী হইলেন তাহার কয়েকটি সিদ্ধান্ত এইরূপ—

(১) বর্ণাশ্রম ধর্মের পূর্ণ বিরোধিতা এবং জাতিভেদ বর্জন

(২) বেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে অনাস্থা

(৩) মূর্তিপূজা অস্বীকার

(৪) ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞোপবীত ধারণের অনাবশ্যকতা

১ In spite of many divergencies in philosophy and ritualism between Virasaivaism and the Saiva Siddhanta, there appears to be something common to both. We have no authentic books on Virasaivism written before the 12th century, which would have helped us to ascertain its exact relation to other Saiva schools before that date; but after that century, when the revival took place, the sixty three canonical Saiva saints, whom the Saiva Siddhanta considers to be its apostles, were raised to the position of puratanas, the ancient ones, the pillars of Virasaivism as well. There is ample reference to these sixty three Saiva saints in the Vacanas of Basava and his colleagues. Their conception of Cod exactly coincides with that of Saiva Siddhanta. Many passages from the Vacana sastra contain not only the ideas found in the Tiruvacakam of Manikkavacagar and other Saiva saints, but are also couched in similar words, so as to suggest borrowing. S. C. Nandimath—A Hand Book of Virasaivisim (p. 94)

(৫) সাত্ত্বিক নিরামিষ ভোজনের আবশ্যকতা

(৬) শিবলিঙ্গ ধারণের অপরিহার্যতা

বিজয়াপুরের ব্রাহ্মণ-সন্তান বসবনের উল্লিখিত সংস্কার সমূহের কয়েকটি বিশেষ দুঃসাহসের পরিচায়ক বলা যায়। বেদব্রাহ্মণ সম্পর্কে বসবন্-প্রবর্তিত সংস্কার সকলের পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব হইল না। সেই কারণেই বোধকরি বীর শৈবদের মধ্য হইতে মল্লিকার্জ্জুন পণ্ডিতারাধ্যের নেতৃত্বে 'আরাধ্য শৈব' বলিয়া বেদ-ব্রাহ্মণে আস্থাশীল একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। প্রধানত আন্ধ্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রচার হয়। বসবের অনুগামীদল যথার্থ বীরত্বের সঙ্গে শৈবধর্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিল বলিয়া ইহারা 'বীর শৈব' নামে পরিচিত।[১] গলায় সর্বদা শিবলিঙ্গ ঝুলাইয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া এই সম্প্রদায় 'লিঙ্গায়ৎ' বলিয়াও অভিহিত হয়।

৯৩. দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় সাহিত্য রচনায় বিশেষ তৎপর হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই ধারা চলিলেও পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে আর একটি সাহিত্য-ধারা প্রবল হইয়া উঠে—তাহা কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্য। তখন হইতে প্রাচীন কন্নড সাহিত্যের তৃতীয় যুগের সূচনা। শৈব সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগে ব্রাহ্মণ হইতে হরিজন এবং বসবনের স্ত্রী-কন্যা হইতে সামান্যা রমণী—নানা স্তরের নরনারীকেই আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই। ইঁহারা সকলেই উচ্চাঙ্গের কবি নন, কিন্তু প্রবল ধর্মোন্মাদনার ফলে সাহিত্যে যে একটা বিশেষ ভাবাবেগ দেখা দিয়াছিল, ছোট বড় কবিদের অজস্র রচনা তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

১ …Stalwart Saivas worshipping Siva alone. Farquhar -An outline of the religious literature of India p. 261

৯৪. সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় "বচন সাহিত্যে"র কথা। কেবল শৈব সাহিত্যের নয়, সমগ্র কন্নড সাহিত্যের ইহা একটি গৌরবময় শাখা। "বচন" কথাটির প্রকৃত অর্থ হইল গদ্য-গীতি। বসবন্ এবং তাঁহার সমকালীন অন্যান্য শৈব কবিবৃন্দ সাহিত্যের পূর্বতন পদ্য রূপ পরিত্যাগ করিয়া গদ্যকেই তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত বাহনরূপে বাছিয়া লইলেন। জনসাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য সমবায়ে গঠিত এক একটি নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদই হইল বচনসাহিত্যের ভিত্তি। একই কবির রচিত পর পর অনুচ্ছেদগুলিতে ভাবের অনুবৃত্তি যে থাকিবেই এমন নয়। মোটকথা প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এইগুলি আকারে ছোট ; কোনও কোনও বচন কয়েকটি শব্দের সমষ্টিমাত্র, আবার কোনোটি কোনোটি দুই পৃষ্ঠাব্যাপীও হইতে পারে। তবে সেইরূপ দীর্ঘ বচন সংখ্যায় খুব কম। সংক্ষিপ্ততা বচনসাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। গদ্যে রচিত হইলেও বচন-সাহিত্যে ছন্দের বিশেষ প্রবাহ, লয় এবং অনুপ্রাসও দুর্লক্ষ্য নয়। মূল রচনাগুলি গদ্যের রীতিতে লিখিত হইলেও আধুনিক সংকলন গ্রন্থে কোথাও কোথাও সেগুলি পদ্যের ভঙ্গিতে সাজানো হইয়া থাকে। (এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' ও 'পুনশ্চ' স্মরণীয়।) এই বচনশাস্ত্রগুলি শিবভক্তদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় এবং আধুনিককালেও ইহার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয় নাই।

৯৫. ভক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে সাহিত্যিক দৃষ্টিতেও এই বচন-কবিতাগুলি কন্নড সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষার ক্ষেত্রে ইহা এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। পূর্বে যেখানে সাহিত্যের ভাষা ছিল জনসাধারণের দুর্বোধ্য সংস্কৃত-নিষ্ঠ কন্নড, সেখানে সেই প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন করিয়া বচনকার কবিরা খুবই সাহসের সঙ্গে নিরক্ষর লোকেও বুঝিতে পারে এমন কথ্যভাষায় বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। কন্নড যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের কাছে

এই বচন কবিতাগুলি যে কিরূপ আদরের বস্তু, তাহা বোঝা যাইবে নিম্নলিখিত অংশ হইতে—"কন্নড সাহিত্যে বিচরণ করিতে করিতে আমরা যখন বচনসাহিত্যের তপোবনে প্রবেশ করি, তখন এমন দিব্য আনন্দের অনুভূতি জন্মে যে, মনে হয় যেন আমরা সিদ্ধ সাধক মুনিঋষিদের সাক্ষাৎলাভ করিলাম, যেন তাঁহাদের উদাত্ত জীবন এবং ধার্মিক উপদেশে আমাদের অন্তর নির্মল হইল, যেন আত্মার বন্ধন খসিয়া গিয়া আমরা মুক্তাবস্থায় উত্তীর্ণ হইলাম। এখানে নাগরিক জীবনের কোলাহল নাই, রাজ-সভার ঐশ্বর্য নাই। এখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তপোবনের সহজ শান্তি, প্রেম ও সাম্য। সত্য জিজ্ঞাসা যেন সাহিত্যের রূপ ধরিয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিল। বচনসাহিত্যকে বলা যায় তপোবনের উপনিষৎ সাহিত্য; আর বচনকার কবিদের বলা যায় উপনিষদের মহর্ষি। এখানে জতি লিঙ্গ বর্ণ ভেদের আভাস নাই, অধিকারী-অনধিকারী ভেদ নাই, বেদ বড় না আগম বড় এই তর্কও এখানে অনুপস্থিত। (এম্. আর. শ্রীনিবাস-মূর্তি—"বচন ধর্মসার" পৃ ১)

৯৬. কন্নড সাহিত্যের ইতিহাসে বচনকার কবিদের সংখ্যা দুই শতেরও বেশি, এবং তাঁহাদের মধ্যে ২৮ জন মহিলা। আমরা কেবল ৬ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা এই ৭ জন কবির রচনা হইতে বচনসাহিত্যের বস্তু, রূপ ও মাধুর্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের নির্বাচিত সকল কবিরই আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী।

বচনসাহিত্য প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বাঙালী বৈষ্ণব কবির পদের শেষে যেমন ভণিতা থাকে, এবং সেই ভণিতা হইতে কোন্ পদটি কাহার রচনা চিনিয়া লইতে পারি, সেইরূপ কন্নডিগ বচন-কবিদের প্রতিটি বচনের শেষে 'অঙ্কিত' থাকে। কিন্তু তাহা সাধারণত কবির নিজের নামের নয়, তাঁহার আরাধ্য দেবতার নামের 'অঙ্কিত'। ঐরূপ নামাঙ্কিত পদের সাহায্যেই পাঠক

উদ্দিষ্ট কবির নামটি জানিয়া লইতে পারেন। অবশ্য সেই সঙ্গে কোন্ কবির কী 'অঙ্কিত' তাহাও জানা চাই। যেমন বসবনের 'অঙ্কিত' কূডল সঙ্গমদেব; চেন্নবসবের 'অঙ্কিত' কূডল চেন্নসঙ্গমদেব; অল্লমপ্রভুর 'অঙ্কিত' গুহেশ্বর; সিদ্ধরামের 'অঙ্কিত' কপিলসিদ্ধ মল্লিকার্জুন; মহিলা-ভক্তকবি মহাদেবিয়ক্ক-র 'অঙ্কিত' চেন্ন মল্লিকার্জুন; শিবলেঙ্কর 'অঙ্কিত' ঈশান মূর্তি মল্লিকার্জুনলিলিঙ্গ; এবং মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্যের 'অঙ্কিত' অমরগুণ্ডদ মল্লিকার্জুন। অঙ্কিত বিভিন্ন হইলেও সকলেরই উদ্দিষ্ট দেবতা শিব—বিভিন্ন স্থানীয় নামে তিনি চিহ্নিত হইয়াছেন এই যা।

ষটস্থল বচন, শিখারত্ন বচন, কালজ্ঞান বচন এবং মন্ত্রগোপ্য—বসবের নামে প্রচলিত এই চারিখানি গ্রন্থের মধ্যে 'ষটস্থলবচন' প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেবল বসব নয়, অন্য কোনো কোনো বচন-কারও ষটস্থল সম্পর্কে বচন লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ বীর শৈবমতের ভক্তিমার্গকে বলা হয় ষটস্থল সিদ্ধান্ত। সাধকের সাধনাবস্থার ছয়টি বিভাগ এবং এই ছয়টি বিভাগ বা ষটস্থলের স্বতন্ত্র নাম রহিয়াছ—ভক্তস্থল, মহেশ্বরস্থল, প্রসাদিস্থল, প্রাণলিঙ্গস্থল, শরণস্থল, এবং ঐক্যস্থল। এই ষটস্থল সাধকের ভক্তিসাধনার পথে যেন ছয়খানি সিঁড়ি। সাধক যখন যে স্থলে অবস্থান করিবেন, তাঁহার ভক্তিসাধনাও তদনুরূপ বিকাশ লাভ করিবে। সুতরাং ষটস্থলের অনুরূপ ষড়্ভক্তির কথাও রহিয়াছে—সদ্ভক্তি, নিষ্ঠাভক্তি, অবধানভক্তি, অনুভব ভক্তি, আনন্দভক্তি এবং সমরসভক্তি।

বসবের একটি বচনে দেখা যায় প্রচলিত মূর্তিপূজা, তীর্থাটন প্রভৃতির তীব্র বিরোধিতা। কবি বলিয়াছেন—পাথরের দেবতা দেবতা নয়, মাটির দেবতা দেবতা নয়, কাঠের দেবতা দেবতা নয়, পঞ্চধাতু নির্মিত দেবতাও দেবতা নয়। সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, গোকর্ণ, কাশী, কেদার প্রভৃতি আটষট্টি কোটি পুণ্যতীর্থে অবস্থিত

দেবতারাও দেবতা নয়…ইত্যাদি।[১] বেদ-বিহিত পূজা উপাসনা ওঁকার ধ্বনির পরিবর্তে ভক্তিই যে মানবজীবনের পরম পাথেয় সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: আমাদের আরাধ্য দেবতা নাদপ্রিয় নন, বেদপ্রিয় নন, তিনি কেবল ভক্তিপ্রিয়।[২]

ভক্তের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া কিরূপে যে সাধনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে সেই প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন: মনের চঞ্চলতা আর কী বলিব? বানর যেমন গাছের এক ডাল হইতে অন্য ডালে লাফাইয়া চলে, আমিও সেইরূপ চলিতেছি। এইরূপ দুষ্ট মনকে আমি কিরূপে বিশ্বাস করি?[৩]

ভক্তিপ্রিয় দেবতার কাছে কবি ইহার প্রতিবিধান চাহিয়াছেন। কিন্তু ভক্তের আহ্বান হইলেই যে দেবতা সাড়া দিবেন তাহা নয়। ভক্তের সেই কাতর বেদনার কথা বলা হইয়াছে এইভাবে—'প্রভু, প্রভু' বলিয়া আমি তোমাকে ডাকিতেছি; 'প্রভু, প্রভু' বলিয়া আমি চীৎকার করিতেছি; 'এই যে আমি' বলিয়া তুমি সাড়া দিতেছ না কেন? সর্বদা তোমাকে ডাকিতেছি। 'এই যে আমি' না বলিয়া তুমি মৌন রহিয়াছ কেন।[৪]

এদিকে সংসার জ্বালায় কবি জ্বলিয়া যাইতেছেন। ওদিকে তাঁহার আরাধ্য দেবতা নির্বিকার। তাই কবির কণ্ঠে আবার শোনা যায় কাতর প্রার্থনা: সাপের ছায়ায় ব্যাঙ্ যে অবস্থায় থাকে, তেমনি

১ কল্লদেবরু দেবরল্ল; মণ্ণ দেবরু দেবরল্ল; মরদেবরু দেবরল্ল; পঞ্চলোহদল্লি মাডুব দেবরু দেবরল্ল; সীতুরামেশ্বর গোকর্ণ কাশী কেদার মোদলাদ অষ্টাষষ্টি কোটি পুণ্যতীর্থঙ্গলু পুণ্যক্ষেত্রঙ্গলল্লি ইহ দেবরু দেবরল্ল ইত্যাদি।—কর্ণাটক কবি চরিতে (১ম খণ্ড) বচন নং ৩৭৭

২ নাদপ্রিয় নল্ল, বেদপ্রিয় নল্ল, ভক্তিপ্রিয় নম্ম কূডলসঙ্গমদেব

—বচনধর্মসার, বচন সং ৫০

৩ বচনধর্মসার, বচন সং ৭২

৪ ঐ বচন সং ৪৯

হইয়াছে আমার জীবন। হায়! সংসার বৃথা হইল। হে কূডলসঙ্গমদেব আমাকে ইহা হইতে মুক্ত করো ও রক্ষা করো।[১]

আর একটি বচনে বলা হইয়াছে: পিতা তুমি, মাতা তুমি, বন্ধু তুমি, আত্মীয় তুমি; তোমাকে ছাড়া আমার আর কেহ নাই। তুমি আমাকে দুধের মধ্যেও ডুবাইতে পারো, আবার জলের মধ্যেও ডুবাইতে পারো।[২]

কবি তাঁহার অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। বিদ্যাপতির ন্যায় তিনিও বলিতেছেন—'গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি', তবে তোমার কাছে যখন আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছি তখন 'দয়া জনু ছোড়বি মোয়'। বসবন্ বলিতেছেন: যখন আমার অপরাধসমূহ গণনা করি, তখন তাহার শেষ দেখি না। আমার আচার-ব্যবহারে দোষ, কাজেকর্মে দোষ, দানে গ্রহণে দোষ। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমার অনেক দোষ। হে দেব, তুমি এই দোষের কথা উপেক্ষা করিয়া আমাকে ক্ষমা কর।[৩] কবির আকাঙ্ক্ষা অতি সামান্যই, এককথায় তিনি শিব-ভক্তের চরণরেণু-প্রার্থী—'আমি ব্রহ্মপদবী চাই না, বিষ্ণুপদবী চাই না, রুদ্রপদবী চাই না। অন্য কোনো প্রকার উচ্চপদও আমার কাম্য নহে। হে দেব, তুমি আমার প্রতি এই করুণাই কর যাহাতে আমি তোমার সদ্‌ভক্তের চরণে আশ্রয় পাই।'[৪]

"শিবশরণত্রিমূর্তি"র অন্যতম চেন্ন বসব (অর্থাৎ সুন্দর বসব বা বীর বসব)। একজন প্রকৃত সদ্‌ভক্তের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন: 'শীল শীল'

১ ঐ বচন সং ৫৮

২ ঐ বচন সং ৯৪

৩ ঐ বচন সং ৭৪

৪ ঐ বচন সং ১০০

বলিয়া চীৎকার করিয়া তুমি খুবই গর্ব বোধ করিতেছ। তুমি কি জানো শীল কাহাকে বলে? শোন ভাই, যাহা আছে তাহা গোপন না করাই শীল; যাহা নাই তাহা উদ্ধার লওয়াই শীল; পরধন ও পরস্ত্রীকে স্পর্শ না করাই শীল। গুরুনিন্দা শিবনিন্দা শ্রবণ না করাই শীল, আমাদের কূড়লচেন্নসঙ্গমের (শিবের) শরণে আসিবার পরে নিজের সব কিছু বিলাইয়া দেওয়াই শীল।[১]

উল্লিখিত বচনে কবিকে অনেকটা উপদেষ্টার ভূমিকায় পাওয়া যায়, যেন সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি সমস্ত লৌকিক স্খলন-পতন-ত্রুটির উর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু নিম্নলিখিত বচনে পাওয়া যাইবে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া কবি যে কিরূপ উন্মত্ত হইয়া অবশেষে দুর্গতি-হরণ দেবতার চরণে শরণ লইয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: পরের সম্পদের প্রতি লোভ আমাকে জ্বরের মত পাইয়া বসিয়াছে —আমি বিকল। স্বর্ণ, রমণী ও ভূমি চাহিয়া চাহিয়া আমি বৈকল্য-প্রাপ্তের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছি। হে প্রভু, তুমি আমার এই দুঃস্বপ্ন বন্ধ করিয়া তোমার করুণামৃত বর্ষণ কর এবং সকল প্রলোভনের উত্তাপ হইতে আমাকে বাঁচাও।[২]

বীর শৈবদের দৃষ্টিতে জীব মূলতঃ শিব। তবে সেই জীব আবদ্ধ হইয়া আছে অজ্ঞান-রূপী আবরণে। শিবৈক্য-প্রাপ্তির জন্য জীবকে এই আবরণমুক্ত হইতে হইবে এবং তাহার সহায় হইতে হইতে পারে—গুরু, লিঙ্গ, জঙ্গম (শিবভক্ত), প্রসাদ, পাদোদক, বিভূতি, রুদ্রাক্ষ ও মন্ত্র। এই আটটি বিষয়ের স্তোত্র 'অষ্টাবরণস্তোত্র' নামে পরিচিত। কোনো কোনো কবি 'অষ্টাবরণস্তোত্র' লিখিয়াছেন। অল্লম প্রভুদেব তাঁহার একটি বচনে শিবৈক্য প্রাপ্তির আনন্দানুভূতি প্রকাশ

১ ঐ বচন সং ১৩৪

২ কর্ণাটক কবিচরিতে (প্রথম খণ্ড) বচন সং ৩৮০

করিয়াছেন এইভাবে : সেই লিঙ্গের সহিত মিলন নবমুক্তার হারের ন্যায় মনোহর। স্ফটিক-নির্মিত পাত্রের প্রভার ন্যায় মনোহর। নির্মল বায়ুর পরিমলের ন্যায় মনোহর।[১] কিন্তু সেই লিঙ্গৈক্য প্রাপ্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদাচার ও সদ্‌ভক্তি। বীরশৈব-ভক্তি সাধনায় সদাচার ও সদ্‌ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝাইতে গিয়া অল্লম প্রভুদেব বলিয়াছেন—যাহার ভিতরে সদাচার-সদ্‌ভক্তি নাই সে কিরূপে গুরুত্ব পাইবে? সদাচার-সদ্‌ভক্তি-শূন্য কিরূপে নিজলিঙ্গ লাভ করিবে? তাহার জঙ্গম ও শরণত্ব-ও বা কিরূপে হইবে? লিঙ্গের প্রতি সদ্‌ভক্তিশূন্য ব্যক্তি কখনও মুক্তি পায় না।[২] অপর একটি স্থলে বলিয়াছেন—যে সত্য বলে না, যে সদাচারী নয়, যাহার মধ্যে সদ্‌ভক্তি নাই, যে সৎক্রিয়া করে না, যাহার সম্যক জ্ঞান নাই, তাহার বেশভূষা দেখিয়া গুহেশ্বর লিঙ্গ হাসিতেছে। ধিক্ ধিক্ এইরূপ লোকগুলিকে।[৩]

পণ্ডিতত্রয়ের অন্যতম শিবলেঙ্ক একটি বচনে মানুষকে কায়লোক হইতে শিবলোকে উন্নীত হওয়ায় প্রেরণা দিয়া বলিয়াছেন : শরীরকে ভুলিয়া গিয়া জীবকে জানিবে; জীবকে ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানকে জানিবে; জ্ঞানকে ভুলিয়া গিয়া আলো-কে জানিবে; আলো-কে ভুলিয়া গিয়া প্রভু শিবকে জানিবে।[৪]

মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য তাঁহার একটি বচনে মানুষের যাবতীয় অন্যায় দুষ্কৃতির জন্য স্বয়ং প্রভুকে অভিযুক্ত করিয়া বলিতেছেন : চিন্তা করা যে মনের ধর্ম তাহাকে তুমি জমি দেখাইয়া লুব্ধ কর; তোমাকে দেখিতে চায় যে চোখ তাহাকে তুমি নারী দেখাইয়া প্রলুব্ধ কর; তোমার পূজা করিবে যে হাত সেই হাতে তুমি তুলিয়া

১ কর্ণাটক কবি চরিতে (১ম খণ্ড) বচন সং ৩৮৮

২ বচনধর্মসার, বচন সং ১৫৩

৩ ঐ বচন সং ১৫৪

৪ কর্ণাটক কবিচরিতে (প্রথম খণ্ড) বচন সং ৪৮৬

দাও কাঞ্চন। এই তিনটি বস্তু দেখাইয়া তুমি মানুষকে নষ্ট করিয়াছ। হে প্রভু, আমি তোমার বিলাস দর্শনে অবাক হইয়া আছি।[১]

দ্বাদশ শতাব্দীর অন্যতম বচনকার সিদ্ধরাম একটি বচনে সংসারকে সর্পের সহিত তুলনা করিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন এইভাবেঃ সংসার-রূপী সর্পের মুখের নিম্নভাগে আমি বসিয়া আছি। ইহা কোন্ সময়ে আমাকে গিলিয়া ফেলিবে জানি না; আবার কোনো সময়ে বা আমাকে ফেলিয়াও দিতে পারে, তাহাও জানি না। হে প্রভু, তুমি আমাকে এই সর্পের মুখ হইতে তুলিয়া রক্ষা কর।[২]

দ্বাদশ শতাব্দীর বচনকারদের মধ্যে আমরা একজন ভক্ত মহিলার নামোল্লেখ করিয়াছি, তিনি হইলেন মহাদেবিয়ক্ক (বা অক্ক মহাদেবি) অর্থাৎ ভগিনী মহাদেবী। কন্নড শৈব সাহিত্যে ইনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী; মহিলা কবিদের শীর্ষস্থানীয়া। দরিদ্র ঘরের সন্তান হইলেও মহাদেবীর রূপের খ্যাতি ছিল। তৎকালীন জৈন রাজা কৌশিক মহাদেবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাঁহার সেই প্রেম-ভিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হইল। তখন সেই গোপন ভিক্ষা দরিদ্র পিতামাতার কাছে আসিল রূঢ় রাজ-আজ্ঞা রূপে। পিতামাতাকে বাঁচাইবার জন্য মহাদেবী বিবাহে সম্মতি দিলেন কয়েকটি শর্তে। একটি শর্ত ছিল এই যে, রাজা কোনোদিন তাঁহার সাধন-ভজন-উপাসনায় বাধা দিতে পারিবে না। রাজা সমস্ত শর্ত মানিয়া লইল বটে, কিন্তু সর্বদা শিবধ্যানে তন্ময় পূত-চিত্ত রমণীর পক্ষে একটা ভক্তিহীন কামুক পুরুষের সাহচর্য অসহনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে একদিন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মহাদেবীকে বাহির হইয়া পড়িতে হয় কল্যাণনগরের শিবানুভবমণ্ডপের উদ্দেশ্যে। হিতৈষীবৃন্দ পথের

১ ঐ বচন সং ৪৮৮

২ কর্ণাটক কবিচরিতে (১ম খণ্ড) বচন সং ৩৯৯

দুঃখকষ্টের কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেনঃ যদি ক্ষুধা পায় ভিক্ষান্ন খাইব; যদি পিপাসা লাগে পুষ্করিণীর জল পান করিব; নিদ্রার জন্য আছে ভগ্ন মন্দির, আর রক্ষকরূপে সর্বদা সঙ্গে রহিয়াছেন শিব।[১]

মহাদেবীর ভক্তিসাধনায় মধুর ভাবের সুন্দর প্রকাশ হইয়াছে। গিরিধর গোপালের জন্য মীরার যে প্রেমবিহ্বলতা ও বিরহবেদনা, রঙ্গনাথের জন্য তামিল মহিলা কবি আণ্ডালের যে ব্যাকুলতা, অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে মহাদেবীর রচনায়। তাঁহার কোনো কোনো বচনে আমরা দেখিতে পাই সেই প্রেম-ভক্তির চিত্র। একটি প্রসিদ্ধ বচনের ভাব এইরূপঃ হে কূজনরত শুকবৃন্দ, তোমরা কি দেখিয়াছ? হে গায়ক কোকিলকুল, তোমরা কি দেখিয়াছ? ওগো উড়িয়া-চলা ভ্রমরপুঞ্জ তোমরা কি দেখিয়াছ? সরোবরে ক্রীড়ারত হংসবৃন্দ, তোমরা কি দেখিয়াছ? ওগো গিরি-কন্দরে নৃত্যরত ময়ূর, তোমরা কি দেখিয়াছ? নীবু কাণিরে, নীবু কাণিরে? যদি তোমরা দেখিয়া থাকো, তবে বলো না কেন আমার শিব কোথায় আছেন?[২]

পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার এই যে অভিসার, সেখানে মাঝে মাঝে আসিয়া বাধার সৃষ্টি করে দেহের বিক্ষোভ। দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বে বিক্ষত কবি চিৎকার করিয়া বলিতেছেনঃ দগ্ধ হোক এই দেহ—পুঁজের পাত্র, মলমূত্রের হাঁড়ি, হাড়ের কাঠামো; বাঁচিয়া থাক আত্মা।[৩]

আর একটি বচনে দেখিতে পাই জগতের নিন্দা-স্তুতি সম্পর্কে গভীর ঔদাসীন্য লইয়া পরম শান্তিতে কবির আত্ম-সমাহিত হওয়ার চেষ্টা। সেখানে ভাবপ্রকাশের রূপটি লক্ষণীয়ঃ পাহাড়ের উপর

১ বচনধর্মসার, বচন সং ২০০

২ ঐ বচন সং ২১৪

৩ কর্ণাটক কবিচরিতে সং ৪১২

ঘর তৈরি করিয়া বন্য জন্তুকে ভয় করিলে চলিবে কেন? সমুদ্রে ঘর বাঁধিয়া ফেনিল তরঙ্গে ভীত হইবে? হাটের মধ্যে কুটির তুলিয়া গোলমালকে ভয় করিলে কেমন হয়? পৃথিবীতে যখন জন্ম লইয়াছ, তখন স্তুতিনিন্দা শুনিয়া মনকে ক্রোধে বিচলিত না করিয়া শান্ত চিত্তে অবস্থান কর।[১]

৯৭. যে বচন সাহিত্য কন্নড শৈব সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান অংশ, দ্বাদশ শতাব্দীর সাতজন ভক্ত-কবির রচনা হইতে আমরা তাহার পরিচয় লইলাম। অন্যান্য রচনার মধ্যে দেখা যায় কিছু কিছু প্রবন্ধ কাব্য, কিছু জীবন-চরিত এবং কিছু শতক সাহিত্য। এই জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য দ্বাদশ শতাব্দীর কবি হরিহর। পম্পাশতক, মুডিগেয় অষ্টক প্রভৃতির রচয়িতা হইলেও হরিহর প্রধানত 'গিরিজাকল্যাণ'-এর কবিরূপে পরিচিত। দশটি 'আশ্বাস' বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই চম্পূ-কাব্যখানির বিষয়বস্তু গিরিজার কল্যাণ অর্থাৎ পার্বতীর বিবাহ। কালিদাস তাঁহার কাব্যের জন্য যে বিষয়টিকে বাছিয়া লইয়াছিলেন, পরবর্তীকালের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে বহু কবিকেই (বিশেষত শৈব) সেই বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা করিতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে হরিহরের প্রায় সমকালীন তেলুগু শৈব কবি নন্নিচোড রচিত "কুমার-সম্ভবমু" কাব্যের কথা।[২]

পার্বতীর চরিত্র-চিত্র বর্ণনায় কন্নড কবি হরিহর কয়েকটি ক্ষেত্রে কালিদাস হইতে ভিন্নরূপ দেখাইয়াছেন। কালিদাসের পার্বতী পিতার আদেশে শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু হরিহরের পার্বতী পূর্ব হইতেই শিবানুরক্তা। কুমারসম্ভবের পার্বতী মদন-ভস্মের পরে শূন্যহৃদয়ে ও অবনতমস্তকে গৃহাভিমুখে যাত্রা

১ ঐ বচন সং ৪১৪

২ দ্বাদশ শতাব্দীর তেলুগু কবি নন্নিচোড প্রণীত কুমারসম্ভবমুকাব্যের জন্য দ্র° ১২৫

করিলেন। গিরিজাকল্যাণের পার্বতী মদন-ভস্মের সঙ্কটকে নিজের উপরে লইয়া বিধবা রতিকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কুমারসম্ভবে 'নবপরিণয়লজ্জাভূষণা' পার্বতীর সঙ্কোচের অবধি নাই, কিন্তু গিরিজাকল্যাণে পার্বতী যেন শিবের চির-সহধর্মিণী। কালিদাসের পার্বতী সামান্য বালিকা, হরিহরের পার্বতী অসামান্যা। এইরূপে হরিহরের গিরিজা যদিও দৈবসৌন্দর্য ও তপঃশক্তির সাকার মূর্তি, তথাপি কখনও কখনও কবি তাঁহার মধ্যে ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদি বৃত্তির সঞ্চার করিয়া পার্বতীকে মানবিক গুণেও ভূষিত করিয়াছেন।

৯৮. অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "হরিশ্চন্দ্র কাব্য"-রচয়িতা রাঘবাঙ্ক (দ্বাদশ শতাব্দী), "উদ্ভটকাব্য" রচয়িতা সোমরাজ (ত্রয়োদশ শতাব্দী), পালকুরিকি সোমনাথ (ত্রয়োদশ), ভীমকবি (চতুর্দশ), চামরস এবং নিজগুণ-শিবযোগী (পঞ্চদশ)। সোমনাথ ও ভীমকবি প্রধানত তেলুগু ভাষার কবি। তেলুগু ভাষায় রচিত সোমনাথের "বসবপুরাণমু"র উপর ভিত্তি করিয়া ভীম কবি কন্নড ভাষায় লিখিয়াছেন "বসবপুরাণ"। কন্নড ভাষায় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ জীবনী-কাব্য হইতেছে চামরস-প্রণীত "প্রভুলিঙ্গলীলে" (রচনাকাল ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। অন্যতম প্রবীণ শৈব ভক্ত অল্লম প্রভুদেবের জীবন ও কীর্তি অবলম্বনে রচিত এই কাব্যখানি তামিল, তেলুগু, মরাঠী ও সংস্কৃত এই চারিটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই কবির ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি স্তবক উদ্ধৃত করা যাইতেছে: ক্রোধাবেশে কষ্ট পাইয়া, দর্পের তাপে নষ্ট হইয়া, মাৎসর্যের কূপে বসিয়া থাকিয়া, আত্মাহংকারে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল। হে প্রভু, আমার ন্যায় মহাপরাধ-নিমগ্ন পাপীর পক্ষে ভক্তিলাভ কি সম্ভব?[১]

১ কর্ণাটক কবি চরিতে (২য় খণ্ড) পৃ ৬১

৯৯. ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বীরশৈব কবিদের লিখিত অনেক শতক কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর যেমন বিশেষ রচনা বচনসাহিত্য, তেমনি ষোড়শ শতকের বিশেষ রচনা শতকসাহিত্য। তেলুগু শতককাব্যের আদর্শে গঠিত এই কন্নড শতককাব্যে বীরশৈব সম্প্রদায়ের তত্ত্বনিরূপণের সঙ্গে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কন্নড ভাষায় দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ (বড় জোর পঞ্চদশ) শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে আমরা শৈব-সাহিত্যের যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সুতরাং অতিক্রান্ত-শৈবযুগে যে উচ্চাঙ্গের শৈবসাহিত্য রচিত হয় নাই ইহাই স্বাভাবিক। তবু উহারই মধ্যে ষোড়শ শতকের শেষভাগে এক মহান্ শৈব সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি 'সর্বজ্ঞ' নামে পরিচিত। তাঁহার পূর্ব নাম জানা যায় না। শোনা যায়, পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও মাতা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর রমণী। পিতামাতার এই অসবর্ণ বিবাহের জন্যই বোধ করি শিশুপুত্রকে প্রতিবেশীর তাড়নায় বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করিতে হয়। সম্ভবত এই কারণেই উত্তরকালে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিতেন—'আমি শিবের পুত্র'।

১০০. সর্বজ্ঞের কিছু কিছু মিল দেখিতে পাওয়া যায় তেলুগু শৈব কবি বেমনার সহিত। বেমনা জন্মিয়াছিলেন শৈব আন্দোলনের শেষে বৈষ্ণব আন্দোলনের যুগে। সর্বজ্ঞও তাই। বেমনা রচনা করেন প্রধানত তেলুগুর একটি ক্ষুদ্র ছন্দ 'আটবেলদি'তে; সর্বজ্ঞ রচনা করেন কন্নড ভাষার একটি ক্ষুদ্র ছন্দ 'ত্রিপদী'তে। শিবের ভক্ত হইয়াও বেমনা শৈব সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ সীমায় বাঁধা থাকিতে পারেন নাই। সর্বজ্ঞ-কেও আমরা ঠিক সাম্প্রদায়িক কবি বলিতে পারি না। তেলুগুভাষীদের মধ্যে বেমনার ন্যায়, কন্নডিগদের মধ্যে সর্বজ্ঞের রচনাও এক একটি প্রবাদবাক্যরূপে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বেমনা-রচিত পদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার; সর্বজ্ঞ-রচিত পদের সংখ্যা দুই হাজারের কিছু বেশি। (চন্নপ

উত্তঙ্গি সংকলিত 'সর্বজ্ঞ-বচনগলু'তে ২০৯২টি পদ পাওয়া যায়।) সর্বজ্ঞের বচন বস্তুত কন্নডিগদের জ্ঞান-ভাণ্ডার। ভক্তি ও ভক্তের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—ভক্তিতেই মুক্তি মেলে; ভক্তিতেই শক্তি। যদি ভক্তি ও বিরক্তি (বৈরাগ্য) না জন্মে, তবে জগতে মুক্তি নাই।[১] বহিরঙ্গ ভক্তি অপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—দেহই দেবালয়; জীবই শিবলিঙ্গ। বাহ্য ব্যাপার হইতে মুক্ত হইয়া যে ভজনা করে নিশ্চয়ই সে মুক্তি পায়।[২]

১০১. সর্বজ্ঞ একজন সিদ্ধ পুরুষ, 'অনুভাবী'। হিন্দী ভাষায় যাহাকে বলা হয় সন্ত, কন্নড ভাষায় তাহাকে বলা যায় 'অনুভাবী'। 'অনুভাব' অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে তিনিই অনুভাবী। এই কারণে শৈব-বৈষ্ণব-নির্বিশেষে কন্নড ভক্তিসাহিত্যকে বলা হয় 'অনুভাবী সাহিত্য'। হিন্দী সন্ত সাহিত্যের সহিত কন্নড অনুভাবী সাহিত্যের মিল যথেষ্ট। হিন্দী সন্তকাব্যের মধ্যে আমরা যে সকল প্রসঙ্গের বিচার দেখিতে পাই, সর্বজ্ঞের রচনাতে যেন তাহার অবিকল প্রতিধ্বনি। গুরু ঈশ্বর অপেক্ষাও বড়ো, ভক্তিহীন হইয়া জপতপ তীর্থযাত্রা প্রভৃতি বাহ্য অনুষ্ঠান একান্তই নিরর্থক, যিনি ভক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরকে বাহিরে খোঁজার কোনো আবশ্যকতা নাই, উদ্ধারকর্তা ভগবান যখন অন্তরেই রহিয়াছেন তখন ঘাটে ঘাটে ঘুরিবার কী প্রয়োজন, আত্ম-জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান বিনা ভক্তির বিকাশ হয় না, ইত্যাদি প্রসঙ্গ সর্বজ্ঞের বচন সমূহে নানাভাবে ছড়াইয়া আছে।

---

১ ভক্তিয়িন্দলে মুক্তি। ভক্তিয়িন্দলে শক্তি
ভক্তিবিরক্তিয়লিদরী জগদল্লি।
মুক্তিয়িল্লেন্দ সর্বজ্ঞ।—বচনগলু সং ২৪৪

২ দেহ দেবালয়বু। জীববে শিবলিঙ্গ।
বাহ্যংগললিদু ভজপঙ্গে মুক্তিসন্
দেহবিল্লেন্দ সর্বজ্ঞ।—ঐ সং ২৬১

(দুই) কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্য

১০২. তামিল নাড হইতে কর্ণাটকের অভিমুখে বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রগতির ধারাটি এইরূপ : আড়্বার (এবং তৎসহ শৈবসাধক নায়ন্‌মার্)-দের ভক্তিসাধনা ও ভক্তি সংগীতের প্রভাবে যখন তামিল-নাডের জৈন ও বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া পড়ে, তখন কেরলের কালডি গ্রামে আর্বিভূত হন অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য। নবম শতকের এই ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা যেভাবে সগুণোপাসনার বিপক্ষে নির্গুণবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মনে করিতেও অনেকে দ্বিধাবোধ করেন নাই। শঙ্করের আবির্ভাবের ফলে প্রতিপক্ষ সগুণপন্থিগণ নতুন শক্তি সংগ্রহে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

দশম শতাব্দীর দিকেই তাহার নিদর্শন পাওয়া গেল। এতদিন আড়্বার-দের কাব্য সাধনা ও ধর্ম-সাধনার বাহন ছিল দক্ষিণের প্রত্যন্ত প্রদেশের ভাষা তামিল। কিন্তু তামিলনাডের বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে সেই ভক্তিসাধনাকে পৌঁছাইয়া দিতে হইলে ভারতের শাস্ত্রীয় ভাষা সংস্কৃতকে অবলম্বন করা আবশ্যক। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দও তাহাই করিলেন। দশম শতাব্দীতে রচিত হইল ভারতবর্ষের অনুপম ভক্তিগ্রন্থ "ভাগবত-পুরাণম্"। ভাগবতের রচয়িতা যিনি বা যাঁহারাই হউন না কেন, তিনি বা তাঁহারা যে আড়্বার সম্প্রদায় হইতেই উদ্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাগবতে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক আড়্বারদের ভক্তির অনুরূপ—সেই কৃষ্ণচিন্তা, কৃষ্ণগুণ কীর্তন, কৃষ্ণরূপদর্শনে বিহ্বলতা। আড়্বারদের এই ভক্তিকে নব্যভক্তি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে—যে ভক্তি আরাধ্য দেবতার আভাস মাত্রেই ভাবোন্মাদমত্ততায় নৃত্যগীতগানে বিহ্বল হইয়া পড়ে, যাহা প্রাচীনতর

ভাগবত সম্প্রদায়ের ধীর, প্রশান্ত ও মহিমান্বিত ভক্তি-সাধনা হইতে পৃথক্, যাহা ভগবদ্‌গীতা হইতে ভাগবতপুরাণকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে।[১]

আড়্‌বারদের যুগ শেষ হইলে বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে আরম্ভ হয় আচার্যের যুগ। এতকাল যাহা ছিল স্থানীয় আন্দোলন, প্রদেশ-বিশেষে সীমাবদ্ধ, তাহাকে আরও ব্যাপক করিয়া তোলার আয়োজন হইতে লাগিল। যাহা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস, তাহাকে শাস্ত্রীয় বিচার-পদ্ধতির মধ্য দিয়া উপস্থাপনের চেষ্টা করা হইল। তামিলের পরিবর্তে ভাবপ্রকাশের বাহন হইল সংস্কৃত। কাব্যের পরিবর্তে রচিত হইল শাস্ত্র। বেদান্তের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যায় ও প্রতিব্যাখ্যায়, ভাষ্যে-অনুভাষ্যে টীকা-টিপ্পনীতে সাহিত্যরস বিচার-বিতর্কের মরুপথে হারাইয়া গেল। আড়্‌বারদের (রসিকদের) যুগ শেষ হইয়া আরম্ভ হইল আচার্যের (তার্কিকের) যুগ।

আড়্‌বার-প্রবর্তিত পন্থায় প্রথম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য নাথমুনি বা রঙ্গনাথমুনি আবির্ভূত হন শঙ্করের কিছুকাল পরে—ভাগবত-রচনার সম-সাময়িক যুগে। ইনিই আড়্‌বারদের রচিত চারিসহস্র পদ সংকলন করেন—যাহা "নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্" নামে পরিচিত।

নাথমুনির পরবর্তী আচার্য আলবন্দার[২] (জন্ম—৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ) —যমুনাদর্শন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে যিনি যমুনাচার্য (বা

১ With the youthful Krishna at the centre, it (the Bhagavata) weaves its peculiar theory and practice of intensely personal and passionate Bhakti, which is somewhat different from the speculative Bhakti of the Bhagavadgita. S. K. De—Early History of the Vaishnava faith and movement in Bengal, p. 5.

২ আল (শাসন কারী)+বন্দার (রাজা)=আলবন্দার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের শাসক, রাজা বা গুরু।

যামুনাচার্য) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অবশ্য এই ধারার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা একাদশ শতাব্দীর রামনুজাচার্য (১০১৮-১১৩৭ খ্রী°)। একাদশ শতকের একেবারে শেষভাগে (১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) রামানুজ তামিলনাড হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কন্নড দেশের তৎকালীন রাজধানী দেবসমুদ্রে (বর্তমান হালেবীড) আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হোয়সল্‌বংশীয় জৈনধর্মাবলম্বী নরপতি বল্লালরাজকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নতুন নাম-করণ করিলেন বিষ্ণুবর্ধন।

১০৩. প্রকৃতপক্ষে রামানুজের সময় হইতেই কর্ণাটকে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচলন হইলেও তখন সেখানে বীরশৈব সম্প্রদায়ের পূর্ণ আধিপত্য। কর্ণাটকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার এবং কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্‌গমের সহিত যাঁহার নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগুরু মধ্বাচার্য (১২৩৮—১৩১৭ খ্রী°)।[১] অনেক গ্রন্থাদিতে নিজেকে তিনি 'আনন্দতীর্থ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই তুলু-ভাষী ব্রাহ্মণের জন্মভূমি দক্ষিণ কানারা জিলার উডুপি হইতে আট মাইল দূরবর্তী পাজক গ্রামে।

দ্বাদশ শতকের উত্তরার্ধে শ্রীবসবন্‌ যেমন তাঁহার পূর্বগামী শৈব-সাধকদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, সেইরূপ বসনের প্রায় এক শত বৎসর পরে মধ্বাচার্য তাঁহার পূর্ববর্তী বৈষ্ণবদের সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া

১ রামানুজের অব্যবহিত পরেই উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবগুরু তেলুগুভাষী ব্রাহ্মণ নিম্বার্কাচার্য (১১১৪—১১৬২ খ্রী°)। কিন্তু ইঁহার জীবন অতিবাহিত হয় বৃন্দাবন অঞ্চলে।

Virasaivism continued to flourish in Karnataka until it received a check at the hands of the Vaishnava acharya Madhva in the thirteenth century. S. Sirkantha Sastri—Sources of Karnataka History Vol. I Introduction XXIV

দ্বৈতবাদের প্রচার করেন।[১] বীরশৈব সম্প্রদায় তাহাদের সংগঠনী শক্তি ও সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধীয় বিচার-ধারার জন্য কর্ণাটকের জনচিত্তে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও অংশে ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট ও উগ্র বিরোধিতার ফলে কর্ণাটকের বাহিরে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। কিছুটা পারিয়াছে আন্ধ্র দেশে, কিন্তু তাহাও বসবন্-প্রবর্তিত বীরশৈববাদ নয়, তাহা মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্যের সংশোধিত আরাধ্য শৈবমত। অন্যদিকে, মাধ্বমত মোটামুটিভাবে প্রাচীন বৈদিক ধর্মকে মান্য করিয়া কর্ণাটকের বাহিরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। উত্তর ভারতের পরবর্তী বৈষ্ণব আন্দোলনে মধ্বাচার্যের প্রভাব সামান্য নয়।

১০৪. মধ্ব-প্রতিষ্ঠিত দ্বৈত-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যে বিশিষ্ট ভক্ত-মণ্ডলী গঠিত হয়, কর্ণাটকে তাহারা দাসকূট (দাসপন্থ বা দাস মণ্ডল) নামে পরিচিত। ইহাদিগকে 'ভক্ত হরিদাস' রূপেও অভিহিত করা হয়। মধ্বমতাবলম্বী হরিদাস সম্প্রদায়ের উদ্ভব যে ত্রয়োদশ শতকেই ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।[২] কেহ কেহ অচলানন্দ দাস নামক জনৈক কবিকে হরিদাস সম্প্রদায়ের আদি রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সাধারণ বিশ্বাস এই যে, মধ্বাচার্যের শিষ্য নরহরিতীর্থই কন্নড ভাষায় পদরচনাকারী প্রথম 'হরিদাস' (হরির দাস বা সেবক অর্থাৎ হরিভক্ত)। তবে তাঁহার রচনার মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক পদই বর্তমান যুগ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একটি পদে তিনি বলিয়াছেন—হে রঘুকুলতিলক,

১ At Srirangam he came into contact with the followers of the Ramanuja School and must have exchanged views with them, and noted his own points of agreement and difference. B.N.K. Sharma—Madhva's teachings in his own words p. 5

২ স্বামিরায়াচার্য পঞ্চমুখী-রচিত "কর্ণাটকদ হরিদাস সাহিত্য" পৃ ২৩

আমি এমনই প্রমত্ত হইয়াছি যে, নামে মাত্র আমি তোমার দাস। বস্তুত আমি সংসারের সুখ ভোগের ক্রীতদাস। ধন ও মন্দ বিষয় সমূহে আমার আসক্তি। ঈশ্বর ও গুরুর বিরুদ্ধে দ্রোহ করিতে আমার কোনও ভয় নাই। গোপনে আমি চাই ধন, কিন্তু প্রকাশ্যে দেখাই বৈরাগ্য। শ্রীকান্তের সেবায় আমি দ্বিধাবোধ করি, কিন্তু রাজার সেবাকে মনে করি গৌরবজনক।[১]

১০৫. মধ্বাচার্যের সমকালীন অপর একজন বৈষ্ণব কবির কথা জানা যায়। তাঁহার নাম রুদ্রভট্ট। 'জগন্নাথ-বিজয়' নামে তিনি যে বৃহৎ কাব্য রচনা করেন তাহা বিষ্ণুপুরাণের কন্নড অনুবাদ। কবি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—কাব্য-সমাধিতে পরম-জ্যোতি মুকুন্দকে মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নির্মল তত্ত্ববোধলাভের উদ্দেশ্যে আমি এই প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করিয়াছি (অধ্যায় ১ পথ ১৭)। কাব্যের স্থানে স্থানে কৃষ্ণভক্তির তন্ময়তার পরিচয় আছে। বিশেষভাবে অক্রূর-কৃত বিষ্ণু-বিজয় গানের অংশে। তবে এই গ্রন্থে নির্মল বিষ্ণুভক্তি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে অভেদ-স্থাপনের যে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তাহা হইতে মনে হয় রুদ্রভট্ট বোধকরি হরিদাস সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[২] মধ্বাচার্যের আবির্ভাবের পরে অনেক শিব-ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। রুদ্রভট্টের সমন্বয়-সূচক মনোভাব হইতে মনে হয়, তিনিও বোধ করি হরি-হরের উপাসক ছিলেন।

১০৬. ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কন্নড ভাষায় যে বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয় তাহার মধ্যে কমপক্ষে দুই শত সাধক-কবির সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীপাদ রায়, শ্রীব্যাস রায় বা ব্যাসতীর্থ, বাদিরাজ তীর্থ, পুরন্দর দাস, কনক দাস, বিজয় দাস, গোপাল দাস এবং জগন্নাথ দাস।

---

১ হিন্দী ঔর কন্নডমেঁ ভক্তি আন্দোলনকা তুলনাত্মক অধ্যয়ন

২ ঐ পৃ ১৭৮—১৭৯

১০৭. মধ্বাচার্যের জন্মস্থান দক্ষিণ কানারা জিলার অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী উডুপি। হরিদাস কবিদের রচনায় এই উডুপির কৃষ্ণ[১] এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ তিরুপতির বেঙ্কটেশ্বর ব্যতীত উপাস্য দেবতারূপে যাঁহার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি পাঁঢরপুরের দেবতা বিঠল (বিট্‌ঠল) বা বিঠোবা।[২] ভীমা নদী এবং তাহার শাখা চন্দ্রভাগার তীরে অবস্থিত এই অঞ্চল মহারাষ্ট্রের শোলাপুর শহর হইতে ৪০ মাইল পশ্চিমে। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এবং জ্ঞানেশ্বর-নামদেব-তুকারাম প্রমুখ মরাঠী ভক্তকবি ও বারকরী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে পরিগণিত হইলেও পাঁঢরপুর তীর্থ এবং উহার তীর্থদেবতার সহিত কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বর্তমান মহারাষ্ট্রের আহমদনগর, সতারা, শোলাপুর প্রভৃতি অঞ্চল এককালে কর্ণাটক রাজাদের শাসনাধীন ছিল এবং সেই যুগে বহু কন্নডিগ (কর্ণাটকের অধিবাসী) এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। পরে অবশ্য এখানে ধীরে ধীরে মরাঠীদের প্রভাবে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য ঘটে।[৩] সে যাহাই হউক, কাশী ও

১ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদে এইরূপ উল্লেখ আছে:

মধ্বাচার্য স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপকৃষ্ণ দেখি হৈল প্রেমোন্মাদী॥

২ পাঁঢরপুর ও বিঠল সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে:

......পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্‌ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ।।

এই পাণ্ডুপুর বা পাঁঢরপুরেই শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাতের যে মনোরম বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামী দিয়া গিয়াছেন চৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক তাহা অবশ্যই স্মরণে আনিবেন।

৩ There is evidence to show that Karnataka had cultural sway over Pandharpur and its neighbourhood,

বৃন্দাবন যেমন ভৌগোলিক দৃষ্টিতে বাংলার বাহিরে থাকিয়াও বাঙালীর হৃদয়ের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত, পঁঢরপুর তীর্থ ও কর্ণাটকের অধিবাসী সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা বলা চলে। বস্তুত ত্রয়োদশ শতকের পঁঢরপুরে বিঠোবা-র প্রতিষ্ঠা হয় পুণ্ডলীক নামক জনৈক কর্ণাটকী সাধুর হাতে। তিনিই ছিলেন দেবতার প্রথম পূজারী।[১] এবং তাঁহার সমকালে কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যের তথা হরিদাস সাহিত্যের উদ্‌ভব। (দ্রষ্টব্য ২০৯)

where the worship of Viththala developed in ancient times, though, in later days the region passed under the political and cultural hegemony of Maharashtra ; and Pandharpur itself was looked upon as the holy city of Maharashtra mysticistm. But even as late as the time of the Maharastra saint Jnanadeva, Viththal of Pandharpur was still spoken of as কানডা হা বিঠ্ঠলু কর্ণাটকু, the deity beloved of the Karnataka enshrined in Karnataka.

—Sri Madhva's Teachings in his own words p. 166

১ বিঠ্ঠল বা বিঠোবা শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা যায়: কন্নড ভাষায় 'বিষ্ণু' শব্দের অপভ্রংশরূপ 'বিট্টু'। উহার সহিত আদরার্থে 'ল' এবং 'বা' প্রত্যয় যোগে 'বিট্ঠল' এবং 'বিঠোবা' শব্দ গঠিত হয়। এই দেবতা পাণ্ডুরঙ্গ নামেও পরিচিত। শব্দটির তাৎপর্য লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। কেহ মনে করেন, 'পাণ্ডুরঙ্গ' হইতেছেন 'শিব'। ভাণ্ডারকর ও রানডে (Ranade) এই মতাবলম্বী। কিন্তু Mystic Teachings of the Haridasas of Karnataka গ্রন্থে বলা হইয়াছে : The word .Ranga' always denotes Krishna in the Kannada country (p. 25). Rev. F. Kittel-এর ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত A Kannada-English Dictionary-তে পাওয়া যায় এইরূপ : রঙ্গ= বিষ্ণু ; পাণ্ডুরঙ্গ=কৃষ্ণ। পঁঢরপুরের 'বিঠোবা' যে কৃষ্ণের সহিত অভিন্নরূপে কল্পিত তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়াছেন G. A. Deleury তাঁহার The Cult of Vithoba গ্রন্থে। (দ্র' মরাঠী ভক্তিসাহিত্য)

১০৮. হরিদাস কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম বলিতে হয় শ্রীপাদ রায়ের কথা। কর্ণাটকে ইনিই ভাগবতধর্মের পুনরুদ্ধার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মাধ্বসম্প্রদায়ে ভজন কীর্তন আরম্ভের পূর্বে যে শ্লোকটির বিশেষ প্রচলন রহিয়াছে, তাহাতেও কর্ণাটকী ভক্তিধর্মের পরিপুষ্টিতে শ্রীপাদ রায়ের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হয়—

নমঃ শ্রীপাদরাজায় নমস্তে ব্যাসযোগিনে।
নমঃ পুরন্দরার্যায় বিজয়ার্যায় তে নমঃ॥

শ্রীপাদরায়ের জন্ম পঞ্চদশ শতকের পূর্বার্ধে মৈসূরের কোলার জিলায়। তিরোভাব ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার পূর্বে মাধ্ব মঠগুলিতে পূজার্চনাদি সম্পন্ন হইত সংস্কৃত ভাষায়। শ্রীপাদ রায় সেই পুরাতন রীতির পরিবর্তে কন্নড ভাষায় ভজন কীর্তনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন। তিনি স্বয়ং কন্নড ভাষায় ভ্রমর-গীত, বেণুগীত ও গোপীগীত রচনা করেন। শ্রীপাদ রায়ের সময় হইতে হরিদাস সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় এবং সম্ভবত এই কারণেই তাঁহাকে দাসকূট সাহিত্যের জনক বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১] ইনি উত্তর ভারতের তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া কাশীতে কীর্তনের বিশেষ প্রচার করেন বলিয়া জানা যায়। বস্তুত, পুরন্দর দাসের পূর্বে কর্ণাটকী সংগীত সাধনায়, বিশেষত কীর্তনের বিকাশ সাধনে, শ্রীপাদ রায়ের সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। হরিদাস সম্প্রদায়ের মহান্ আচার্য শ্রীব্যাস রায় বা ব্যাসতীর্থ ছিলেন শ্রীপাদ রায়ের শিষ্য।

কবির একটি প্রার্থনাপদে আছে (না নিনগেন্নু বেড়ুব দিল্ল)—হে কৃষ্ণ, আমি তোমার কাছে আর ভিক্ষা করিব না। তুমি আমার হৃদয়মণ্ডপে অধিষ্ঠিত হও। আমার শির তোমার চরণতলে নত হউক; আমায় চক্ষুদ্বয় তোমার রূপদর্শন করুক; আমার কান শুনুক তোমার গান; আমার নাসিকা আঘ্রাণ

১ কর্ণাটকদ হরিদাস সাহিত্য পৃ. ২৫।

করুক তোমার নির্মাল্য। হে কৃষ্ণ, আমার জিহ্বা তোমার স্তুতি করুক; আমার করদ্বয় তোমার জন্য কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হউক; আমার পা তীর্থযাত্রায় রত থাকুক। হে হরি, তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকিতে পারি এইরূপ শক্তি দাও। আমার বুদ্ধি তোমার মধ্যে নৃত্য করুক; আমার চিত্ত তোমাতে আনন্দ লাভ করুক। হে রঙ্গ, আমি যেন ভক্তজনের সঙ্গ পাই। হে হরি বিঠল, আমার প্রতি দয়া হউক।

অপর একটি পদে অনেকটা যেন অভিমান ভরেই কবি বলিয়াছেন (ইদনাদরূ কোডদিদ্দরে নিন্ন): যদি তুমি আমার উপর এই দয়াটুকুও অর্পণ না কর তবে কেন আমি পূর্ণ বিশ্বাসে তোমার চরণ-কমল ভজনা করিব? অন্ন বা আশ্রয়ের অভাব জানাইয়া আমি তোমাকে বিরক্ত করিতে আসি নাই। হে বাসুদেব, যদি তোমার দাসের ও দাসানুদাসের দাসত্ব করিবার অধিকার দাও তবেই যথেষ্ট।

১০৯. যদিও নরহরিতীর্থ সর্বপ্রথম হরিদাস সম্প্রদায়কে সংগঠিত করিয়া দ্বৈত-মতানুসারিণী ভক্তি-ভাগীরথী-ধারা প্রবাহিত করেন, তথাপি সেই প্রবাহ অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রীপাদ রায়ের কালে তাহা কিছুটা ব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু হরিদাস-সম্প্রদায়কে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী করিয়া তোলার কৃতিত্ব যাঁহার প্রাপ্য, তিনি শ্রীপাদ রায়ের শিষ্য ব্যাসরায় (১৪৪৭-১৫৩৯ খ্রী°)।

ব্যাসরায়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় হরিদাস-মণ্ডলীতে উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ভক্তসম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে সর্বপ্রকার জাতি-পাঁতির কুসংস্কার দূর করিয়া সাম্যস্থাপনের কৃতিত্ব ব্যাস রায়ের। হরিদাস সম্প্রদায় সাধারণত 'দাসকূট' নামে পরিচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায়ে 'ব্যাসরু' ও 'দাসরু' নামে দুইটি পৃথক্ উপদলের অস্তিত্বের কথা জানা যায় (কন্নড ভাষায় 'রু' প্রত্যয়ের ব্যবহার গৌরবার্থে)।

পরে 'ব্যাসরু' ও 'দাসরু'-র পরিবর্তে 'ব্যাসকূট' ও 'দাসকূট' শব্দ দুইটির প্রচলন হয় ('কূট' শব্দটির অর্থ হইল 'পন্থ')। মূলে এই শব্দ দুইটির দ্বারা ঠিক কী বুঝাইত বলা কঠিন। কন্নডিগ পণ্ডিত-গণের মতে 'ব্যাসকূট' শব্দটির সঙ্গে ব্যাসরায়ের কোনো সম্পর্ক নাই।

এই দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয় যে, 'ব্যাসকূট' সম্প্রদায় ছিল শিক্ষিত ও উচ্চবংশজাত ব্যক্তিদের জন্য। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকার ফলে তাঁহারা অনেক মূল শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ পাইতেন। 'দাসকূট' সম্প্রদায় ছিল তাঁহাদের জন্য—শিক্ষা ও জন্ম কোনোদিকেই যাঁহারা মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ভক্তশ্রেণীরও সমাবেশ হইত, কিন্তু প্রথম দিকে তাঁহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ইঁহারা সংস্কৃতের পরিবর্তে দেশীয় অর্থাৎ কন্নড ভাষার মধ্য দিয়া দ্বৈতবাদের দর্শন ও তত্ত্ব-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন এবং ভক্তি, জ্ঞান, নীতি ও সদাচারের উপদেশ দিয়া যান। ব্যাস রায়কে বলা হয় এই দাসকূট দলের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই শিষ্যবৃন্দ প্রথমে 'দাস' উপাধি গ্রহণ করেন।[১] পুরন্দর দাস, কনক দাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দাস কবিরা ব্যাস রায়ের শিষ্য। পুরন্দর ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার সতীর্থ কনক দাস ছিলেন নিম্নশ্রেণীর সন্তান। তাই ব্যাসরায় যখন তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন, তখন গোঁড়া ব্রাহ্মণ ভক্তদের পক্ষ হইতে প্রবল আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু ব্যাসরায় তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

কেহ কেহ ব্যাসরায়ের কাছে চৈতন্যদেবের শিক্ষালাভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[২] এই অভিমত কতদূর সত্য বলা কঠিন।

---

১ A. P. Karmarkar—Mystic Teachings of the Haridasas of Karnataka p. 10

২ (ক) Ibid p. 41

(খ) T. V. Subba Rao—Karnataka Compsoers—The Journal of the Music Academy, Madras Vol. XI. p. 35.

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে যখন কর্ণাটকে আসেন তখন মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন ব্যাসরায়। "কর্ণাটকদ হরিদাস সাহিত্য" নামক গ্রন্থে (পৃ. ২০) এই দুই ভক্ত-প্রবরের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে—

মধ্বাচার্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপকৃষ্ণ দেখি হৈল প্রেমোন্মাদী॥
তত্ত্ববাদী আচার্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥ (২।৯)

বর্ণনা হইতে মনে হয়, মহাপ্রভু 'দীন হইয়া' যে শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্ববাদী প্রবীণ আচার্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনিই ব্যাসরায়। এই সাক্ষাতের সময়ে চৈতন্যদেব যুবক, ব্যাসরায়ের বয়স ষাট অতিক্রম করিয়াছে। সমগ্র কর্ণাটকে তাঁহার তুল্য ব্যক্তিত্ববান্ ও প্রভাবশালী পুরুষ দ্বিতীয় ছিল না। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণদেব রায় (রাজ্যকাল ১৫০৯—১৫৩০) ছিলেন তাঁহারই শিষ্য।[১] মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসু চিত্ত যদি এই তত্ত্ববাদী প্রবীণ আচার্যের কাছ হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে তাহাতে অমর্যাদার কোন কারণ নাই।

ব্যাসরায়ের একটি পদে মানব-চিত্তের অসহায়তার কথা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে (কণ্ডু কণ্ডু পতঙ্গ): পতঙ্গ যেরূপ জানিয়া শুনিয়া আগুনে ঝাঁপ দেয়, আমিও সেইরূপ সজ্ঞানে ঘৃণ্য বিষয়সমূহে লিপ্ত হইতেছি। পতি কাছে থাকা সত্ত্বেও নারী যেরূপ অন্য পুরুষ কামনা করে, আমিও তদ্রূপ অগতির গতি তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় খুঁজি। একটি শশকের উপর ছয়টা ব্যাঘ্রের ঝাঁপাইয়া পড়ার মতো ষড়্ রিপু আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে।

---

১ Karnataka Darshana. p: 20

তথাপি ঈশ্বরের অনন্ত করুণা সম্পর্কে পাপবুদ্ধি কবির কোনো সংশয় নাই। কবি বলিতেছেন (এন্ন মহাদোষগলনন্তবাদরে): আমার দোষ যদি অনন্তও হয়, আমি ভয় করি না, কারণ তোমার করুণাও যে অনন্ত। যখন তোমার কল্যাণগুণ অনন্ত, তখন আমি আমার অনাদি অনন্ত দোষের জন্যও ভয় করি না। নিম চন্দনের সহিত মিশিয়া গেলে চন্দন ছাড়া নিম কি আর থাকিবে? নিজের শিশুর দোষের জন্য জননী তাহাকে হাত ছাড়া করিবে কি? তোমার ভক্ত বলিয়া আমি পরিচিত ইহাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমার দোষ যদি অনন্তও হয় দয়াসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে আমার কোনো ভয় নাই।

অপর একটি পদে দেখিতে পাই, দ্বৈতবাদী কবির দ্বৈতবোধ যেন লোপ পাইয়াছে (এন্ন বিম্ব মূরুতিয় পূজিসবু নান্নু): প্রত্যহ আমি পূজা করিতেছি আমার অন্তরস্থ প্রভুর মূর্তিকে। আমার শরীর তাঁহার মন্দির। আমার হৃদয় তাঁহার মণ্ডপ। আমার চক্ষু দুইটি প্রদীপ, আমার হস্তদ্বয় চামর। আমার তীর্থযাত্রা তাঁহার প্রদক্ষিণ। আমার নিদ্রা হইল প্রণিপাত। স্তুতি তাঁহার মন্ত্র। আমার বাণী তাঁহার পুষ্প ইত্যাদি।

পরিশেষে কবির সিদ্ধিলাভ। ভক্তজীবনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরে লক্ষ্যস্থলে উপস্থিতি। কবি বলিতেছেন (সেরিদেন্নু সেরিদেন্নু জগদীশন): এখন আমি জগদীশ্বরে পৌঁছিয়াছি। নরকের ভয় কিছুমাত্র নাই। আমার চোখ দেখিতেছে কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি, কান শুনিতেছে তাঁহার কথা। দিবারাত্রি আমার চিত্ত রত আছে শ্রীরঙ্গে। আমার দেহ প্রস্তুত তাঁহার সম্মুখে। আমার হাত পরিছন্ন করিতেছে তাঁহার মণ্ডপ, আমার মাথা নত হইয়াছে তাঁহার চরণ-তলে। আমার নাক লইতেছে কস্তুরী ও তুলসীর সুগন্ধ। হরি-সুধা পান করিয়া আমার শরীর হরির প্রিয় হইয়াছে। আজ আমি মনো-মন্দিরে দেখিতে পাইতেছি শ্রীকৃষ্ণকে।

১১০. হরিদাস সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ—ব্যাস রায়ের শিষ্য পুরন্দর দাস (১৪৮০—১৫৬৪ খ্রী°)। পুণা হইতে ১৮ মাইল দূরে যে গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কবির নামানুসারে উত্তরকালে তাহা পুরন্দরগড় নামে পরিচিত হয়। পুরন্দরের পূর্ব নাম শীনপ্প নায়ক বা শ্রীনিবাস নায়ক। বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান পুরন্দর পূর্বাশ্রমের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া যে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ব্যাসরায়ের মতো প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষকেও শিষ্যের মহিমা কীর্তন করিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে যে 'দাস' বলিতে একজনকেই বুঝায়—তিনি পুরন্দর দাস (দাসরেন্দরে পুরন্দরদাসরয্য)। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ব্যাসরায়ের নেতৃত্বে পুরন্দর দাস, কনকদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ মধ্যযুগের কন্নড সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে বিজয়নগরের রাজবংশ বৈষ্ণবধর্মপ্রচারে ও বৈষ্ণব সহিত্য রচনায় বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন। প্রসিদ্ধ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় (রাজ্যকাল ১৫০৯—১৫৩০ খ্রী°) ছিলেন ব্যাসতীর্থের শিষ্য। আন্ধ্র প্রদেশের বৈষ্ণব কবিরা যে বিজয়নগরের রাজশক্তির প্রত্যক্ষ সহায়তা লাভ করেন তাহার প্রমাণ—কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভার সুপ্রসিদ্ধ "অষ্ট দিগ্‌গজ"এর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন তেলুগু বৈষ্ণব কবি। রাজা স্বয়ং তেলুগু ভাষায় প্রাচীন তামিল বৈষ্ণব কবি শ্রীমতী আণ্ডালের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন "আমুক্তমাল্যদা"। কৃষ্ণদেব রায়ের নিজস্ব ভাষা তেলুগু বলিয়া স্বভাবতই তেলুগু সাহিত্যের পোষণে তাঁহার আগ্রহ বেশি ছিল।

কর্ণাটকের দাস কবিরা রাজসভা হইতে প্রত্যক্ষ আনুকূল্য কতটা লাভ করিয়াছিলেন জানা যায় না। তবে যে-দুইজন ভক্ত সাধকের আধ্যাত্মিক প্রেরণা তাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতর চৈতন্য-দেব।[১] আমাদের মনে হয় এই যুগের তেলুগু বৈষ্ণব

১ They (Dasa poets) received their inspiration from

সাহিত্য রাজসভার সঙ্গে যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল, কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যের সেরূপ কোনো যোগ ছিল না। এই কারণেই বোধ করি সমকালীন দুই সমধর্মী প্রতিবেশী সাহিত্যে দুই ভিন্ন আঙ্গিকের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য জন্য তেলুগু বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হইয়াছে আখ্যান কাব্যের ছাঁচে। আর মন্দিরে মন্দিরে ভক্তমণ্ডলীর সংকীর্তনের জন্য কন্নড সাহিত্য রচিত হইয়াছে পদ বা গীতের আকারে।

প্রকৃতপক্ষে হরিদাস বৈষ্ণবসাহিত্যের একটি বিশেষ দান দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট গীত পদ্ধতি যাহা সাধারণত 'কর্ণাটকী সঙ্গীত' নামে পরিচিত। বৈষ্ণবধর্ম সাধনার যাহা অন্যতম প্রধান অঙ্গ সেই কীর্তন-গীত যে পূর্বতন তামিল বৈষ্ণবদের (আড়বারদের) অজ্ঞাত ছিল তাহা নয়। কিন্তু তামিল কবিদের রচনা পদ্যের সাধারণ চতুষ্পদিক স্তবক হইতে পৃথক কোনো গীতরূপ গ্রহণ করে নাই যাহাকে পদ বা পদকীর্তনরূপে অভিহিত করা যায়। সেই পদকীর্তনের স্রষ্টা হইতেছেন কর্ণাটকের 'দাসকূট' বৈষ্ণব কবিগণ।[১] গানের লঘুতা ও সরলতা আড়বারদের তুলনায় কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত বেশি পাওয়া যায়।[২] কর্ণাটকে প্রচলিত বিশ্বাস এই

Madhvacharya, and from Chaitanya who, about 1510, visited all the chief shrines of South India, teaching every where to chant the name of Hari. Edward P. Rice—A History of Canarese Literature. p. 59

১ In its present from it (Kirtana) is very much the contribution of the composers of Karnataka known as Dasakuta.—The Journal of the Music Academy, Madras, Vol XI p. 22

২ They (Dasa poets) differed from the authors of Tamil Devaram and Prabandham literature whose style was highly literary. B' N. K. Sharma—Madhva's Teachings in his own words. p. 167

যে, বৈষ্ণব গুরু মধ্বাচার্যের সময় হইতেই ভজন কীর্তনের ধারা চলিয়া আসিতেছে। হরিদাস ভক্ত-সম্প্রদায় যেভাবে দলবদ্ধ হইয়া কণ্ঠে গান লইয়া তীর্থে তীর্থান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত,[১] স্বভাবতই তাহা তামিলনাডের আড়বার-নায়নমার এবং মহারাষ্ট্রের বারকরী সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দাস কবিদের অগ্রণী হইলেন পুরন্দর দাস। সঙ্গীতে, সাধনায়, রচনাশক্তিতে কন্নড় বৈষ্ণব সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় এই কবি দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাতে যে নবজীবন সঞ্চার করিয়া যান, তাহারই জন্য দাক্ষিণাত্যের গীত-পদ্ধতি 'কর্ণাটকী সঙ্গীত' নামে পরিচিত হয় এবং পুরন্দর দাসকে বলা হয় কর্ণাটক সঙ্গীতের 'আচার্যপুরুষ', 'জন্মদাতা', 'কর্ণাটক সঙ্গীত পিতামহ।'[২] কর্ণাটকী সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবনে, উহার বৈচিত্র্য ও বিকাশসাধনে পুরন্দরদাসের দান যে কত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় তাহা বোঝা যায় তাঁহার সম্পর্কে পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ কর্ণাটকী গীতকার তেলুগুভাষী ভক্তকবি ত্যাগরাজের সসম্ভ্রম উক্তি হইতে। ত্যাগরাজ শৈশবে তাঁহার মায়ের কাছে পুরন্দরদাসের কীর্তন শুনিয়া ভক্তিমার্গের প্রতি

---

১ The sight of the Haridasas walking on foot from place to place with their tambura singing Kritnas, despising comfort and rest, suffering hardship and privation, exhorting people to live a life of truth, virtue and devotion to God, conveying their teaching through the attractive means of stirring music was perhaps the most inspiring sight that human eye could light upon. The Journal of the Music Academy, Madras, Vol XIV, p. 48

২ (ক) Purandaradasa has been justly termed the father of carnatic music. The Journal of the Music Academy, Vol. XIII p. 67

(খ) He laid the foundation of the pattarn of carnatic music with which we are familiar. R. R Iyengar—Carnatic Music. p. 97

আকৃষ্ট হন এবং উত্তরকালে সঙ্গীত সাধনায় সমগ্র কর্ণাটকের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

ত্যাগরাজ কেবল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সহজ ভাষায় সঙ্গীত রচনার আদর্শও তিনি পুরন্দর দাস হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ণাটকবাসীদের ধারণা, পুরন্দর ছিলেন নারদের অবতার। বীণা হস্তে নারদের ন্যায় পুরন্দরদাসকেও তাই সর্বদা দেখা যায় তম্বুরা হস্তে ভ্রাম্যমান গীতকাররূপে।[১]

১১১. হিন্দী সাহিত্যের কথা বলিলে প্রথমেই যেমন মানসপটে উদিত হয় তুলসীদাসের নাম, কন্নড সাহিত্যের সঙ্গে তেমনি অচ্ছেদ্য-সূত্রে আবদ্ধ পুরন্দর দাস।[২] কবি-রচিত পদসংখ্যা দুই হইতে আড়াই সহস্রের মধ্যে। 'হরিদাসকীর্তনতরঙ্গিণী' (১ম ও ২য় ভাগ), 'হরিভক্তিসুধে' প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থে পুরন্দরদাসের কিছু পদ সংকলিত হইয়াছে। একটি পদে কবি বলিয়াছেন (অনুগালবু চিন্তে) ঃ যে পর্যন্ত মন শ্রীরঙ্গে না আসক্ত হয় সে পর্যন্ত এই জীবনে সর্বদাই দুশ্চিন্তা। স্ত্রী থাকিলেও চিন্তা, না থাকিলেও চিন্তা। পুত্র না জন্মিলে যেমন দুশ্চিন্তা, জন্মিলেও তদ্রূপ। ধনী হইলে যে চিন্তা, নিঃস্ব হইয়াও উহার হাত হইতে মুক্তি নাই। কবির বক্তব্য এই যে, এই অবস্থায় হরিই একমাত্র আরাধনার বস্তু।

অপর একটি পদে (মানবজন্ম দোড্‌ডদু) বলা হইয়াছে এই

১ পুরন্দর দাসের উদ্দেশ্যে কর্ণাটকবাসীর বন্দনা এইরূপ—

জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নং ভক্তিমার্গপ্রবর্তকম্।
পুরন্দরং গুরুং বন্দে দাসশ্রেষ্ঠং দয়ানিধিম্॥

বাবুরাও কুমঠেকর—শ্রীপুরন্দরদাসকে ভজন পৃঃ ১৮

২ তুলসীদাসের ন্যায় পুরন্দরদাসেরও বৈরাগ্যগুরু ছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী। তুলসীদাস ছিলেন কামোন্মত্ত, পুরন্দরদাস ধনোন্মত্ত। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দুই উন্মত্ত পুরুষকে ভাবোন্মত্ত মহাপুরুষে রূপান্তরিত করেন দুই নেপথ্যবর্তিনী নারী।

গুরুত্বপূর্ণ মানবজীবনে আমাদের হস্তপদ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহকে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করার কথা। মৃত্যুর দূত আসিয়া যখন দ্বারে উপস্থিত হইবে, তখন কোনও অনুরোধের কথা সে শুনিবে না। অর্থ বা আত্মীয়স্বজন কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং আমাদের উচিত হইবে মৃত্যুর আগমনের পূর্বেই অধ্যাত্ম-সাধনায় নিজেদের বলীয়ান্ করা। 'কবে হইতে' সে জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন নাই। আজই অখণ্ড মনঃসংযোগের সহিত ঈশ্বরের পূজায় ব্রতী হও।

হরিনাম বারবার আবৃত্তি করিলে কী হইবে সেই প্রসঙ্গে কবি একটি পদে (ইন্নেকে য়মন বাধেগলু) বলিয়াছেন যে, হরিনাম স্মরণ করিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না। ইহা পতিত মানুষকেও শুদ্ধ করিয়া তোলে। ইহা কোটি যজ্ঞের পুণ্যফলের সমান, ইহাই সদ্‌গতি লাভের সাধন। প্রহ্লাদ, দ্রৌপদী, অজামিল, ধ্রুব প্রভৃতি পুরাতন ভক্তবৃন্দ তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অপর একটি পদে (স্মরণে ওন্দে সালদে) আছে, গোবিন্দ নাম স্মরণই তাঁহাকে পাওয়ার একমাত্র উপায়। নিতান্ত মূর্খ অথবা পাপী বলিয়া কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না। এখানে জাতি-পাঁতিরও কোনো বাধা নাই। কেবল ভক্তিপূর্বক আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতি-দিন নাম কীর্তন করিলেই যথেষ্ট।

"কল্লু সক্করে কোল্লিরো নীবেল্লরু" এই পদটিতে কবি ফুল্ললোচন শ্রীকৃষ্ণের নামকে মিশ্রীখণ্ডরূপে বর্ণনা করিয়া ভক্তসম্প্রদায়কে আহ্বান জানাইয়াছেন এই অপূর্ব বস্তু ক্রয়ের জন্য। যে পরিমাণেই ক্রয় কর না কেন ইহার জন্য কোনো মূল্য দিতে হইবে না। এক হাটে হইতে অন্য হাটে বহনের কোনো পরিশ্রম নাই। ইহা কখনও নষ্ট হয় না, বা পিপীলিকার মুখে পড়িয়া ফুরাইয়া যায় না। ইহা সর্বদাই ভক্তজনের হৃদয়ে ও মুখে বিরাজ করে ইত্যাদি।

ইংরেজ কবি যেভাবে বলিয়াছেন 'Abide with me', বাঙালী

কবি যে আর্তি লইয়া গাহিয়াছেন 'সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া তুমি তো আমার রহিবে', কন্নড়িগ কবি পুরন্দরদাসের কণ্ঠেও সেই বেদনা, সেই দৈন্যবোধ। "য়ারু বিট্টরু কৈয় নী বিডদিরু কণ্ড্য নারায়ণ স্বামি"—হে নারায়ণ, সকলে আমাকে ছাড়িয়া গেলেও তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না। যখন আমি সম্মুখে তাকাই, সেখানে দেখি বিরাট অজগর; পশ্চাতে তাকাইলে দেখিতে পাই বৃহৎ ব্যাঘ্র। হে নারায়ণ, আমি কিরূপে রক্ষা পাইব?

অতঃপর আর কাতর প্রার্থনা নয়। 'মানবাত্মার অন্ধকার রাত্রি' অতিক্রম করিয়া কবি আসিয়া প্রভাত সূর্যালোকে উপনীত হইলেন। তখন গুরু, হরিভক্ত ও হরির সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার জীবন ধন্য হইল। "হরিদাসর সঙ্গ দোরকিতু এনগীগ ইন্নেনিন্নেনু"—আমি হরিভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়াছি, আমার আর কী চাহিবার আছে? গুরুর উপদেশ এখন ফলবান হইয়াছে, আমার আর কিছু চাহিবার নাই। মায়ার সংসারের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রভু কমলাক্ষের নাম আমার জিহ্বায় সংলগ্ন। তিনিই আমার পিতা ও মাতা। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে মুকুন্দের দয়া আমি লাভ করিয়াছি।

সর্বশেষ কবির উন্মত্ততা—ঈশ্বরপ্রাপ্তির মত্ততা। "হুচ্চু হিডিয়িতু এনগে হুচ্চু হিডিয়িতু"—আমি পাগল হইয়াছি, আমি পাগল হইয়াছি। এই পাগল হওয়া যে কী তাহা ভক্ত ব্যতীত আর কে জানিতে পারে? একটি পদে কবি বলিয়াছেন (অম্বরদ আলবন্নু রবিশশি অল্লদে): রবি-শশী ব্যতীত আকাশের অসীমতা কি জানিতে পারে নিচে উড্ডীয়মান পক্ষিবৃন্দ? পদ্ম ব্যতীত জলের গভীরতা কি জানিতে পারে উপরে ভাসমান শৈবালগুলি? কোকিল ব্যতীত আম্রফলের স্বাদ কি জানিতে পারে চীৎকারোন্মত্ত কাকের দল? ভ্রমর ব্যতীত পুষ্পের পরিমল কি জানিতে পারে ভন্‌ভনে মাছিগুলি?...

১১২. পুরন্দরদাসের পরে বলিতে হয় ধারবাড (ধারোয়াড়) জিলার কাগিনেলে-নিবাসী কবি কনকদাসের কথা। আচার্য ব্যাস-তীর্থের এই শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে পুরন্দর ব্রাহ্মণবংশে জাত, আর কনকদাস ছিলেন নিম্নকুলের সন্তান। 'কুরুব' অর্থাৎ ব্যাধের বংশে জন্ম বলিয়া কনকদাসকে হরিদাস-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক নিগ্রহ-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ সহজে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে চাহেন নাই, অনেকদিন তাঁহার প্রতি উপেক্ষা অবহেলার ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন। পরে গুরু ব্যাসরায়ের চেষ্টায় ও আগ্রহে কনকদাস ভক্ত-সম্প্রদায়ের মর্যাদা লাভ করেন।

কবির প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁহার স্বসম্প্রদায় এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিয়া হিংস্র নীচ জীবন হইতে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়নের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে উচ্চবর্ণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণ চালাইতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার এই দ্বিমুখী প্রবৃত্তি হিন্দী সাহিত্যের সন্ত কবি কবীরদাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কুলে ও কর্মে কবীরদাস ও কনকদাস প্রায় সম-পর্যায়ভুক্ত। নিম্নলিখিত পদে কনকদাসের বিড়ম্বিত জীবনের ক্ষুব্ধ বেদনা কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে (কুল কুল কুল বেন্নুতি হরো): মানুষ তো সর্বদা কুলের কথা বলে। আচ্ছা বলত, যে সমস্ত সজ্জন সত্য সুখ পাইয়াছেন তাঁহাদের কুল কী? কাদামাটিতে যে পদ্ম জন্মিয়াছে ভগবানের চরণে কি তাহা অর্পণ করা যায় না? গোমাংস হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ কি ব্রাহ্মণ পান করে না? মৃগদেহ হইতে উৎপন্ন কস্তূরী কি ব্রাহ্মণ স্বীয় শরীরে লিপ্ত করে না? স্বয়ং নারায়ণের বংশ কী বল।

কনকদাসের রচনায় দাস্যভাব, কাতর আর্তভাব, আত্ম-নিবেদন প্রভৃতির সুন্দর প্রকাশ হইয়াছে। কখনও অত্যন্ত দৈন্যের সহিত তিনি তাঁহার পাপ গণনা করেন। কখনও বলেন—"হে প্রভু, আমার

প্রতি তোমার দয়া কেন বর্ষিত হয় না?" আবার কখনও প্রার্থনা করেন—"আমি তোমার দাসেরও অনুদাস, আমাকে তুমি রক্ষা করিও।" আবার কখনও পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলেন—"প্রভু আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। পাহাড়ের শিখরে উৎপন্ন বৃক্ষের মূলে কে জলসেচন করে? ময়ূরের পাখায় কে রঙ্ লাগাইয়া দেয়? পাথরে উৎপন্ন ব্যাঙ্‌কে কে সেখানে আহার যোগায়? ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আদিকেশব সকলকেই রক্ষা করিবেন।"

কেনই বা করিবেন না? বিশ্বের সকল কিছু তো তাঁহারই মধ্যে। কবি বলিয়াছেন (নী মায়েয়োলগো নিন্নোলু মায়েয়ো): হে হরি, তুমি কি মায়ার মধ্যে, না মায়া তোমার মধ্যে? তুমি কি দেহের মধ্যে, না দেহ তোমার মধ্যে? আলয় কি শূন্যস্থানে. না শূন্যস্থান আলয়ে, না দুই-ই নয়নের মধ্যে? নয়ন কি বুদ্ধিতে, না বুদ্ধি নয়নে, অথবা উভয়ই তোমাতে? মাধুর্য চিনিতে, না চিনি মাধুর্যে, অথবা দুই-ই রসনায়? গন্ধ কুসুমে, না কুসুম গন্ধে, অথবা দুই-ই নাসিকায়? হে আদি কেশব কোন্‌টা যে সত্য বলা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে সকলই তোমার মধ্যে।

এমন একদিন ছিল যখন প্রভু সম্পর্কে কবির ধারণা ছিল অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত। সেদিনের কথা বলিতে গিয়া কবি অকপট স্বীকারোক্তি করিয়াছেন (ঈস্থু দিন ঈ বৈকুণ্ঠ এষ্টু দূর এন্নুতিদে): এতদিন আমি ভাবিতাম বৈকুণ্ঠ বুঝি অনেক দূরে। কিন্তু গুরুর কৃপায় অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আজ দেখিতেছি, বৈকুণ্ঠ আছে এখানে—আমার হৃদয়ে।

১১৩. পুরন্দর দাসের অন্যতম সমকালীন কবি বাদিরাজ তীর্থ (১৪৮০-১৬০০ খ্রী°)। সংস্কৃত ও কন্নড ভাষায় ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাহা ছাড়া কর্ণাটকের অস্পৃশ্য শ্রেণীদের জন্য তিনি 'তুলু' ভাষাতেও অনেক গান রচনা করিয়াছেন। বাদিরাজ কেবল পণ্ডিত ও কবিই ছিলেন না, বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও

তাঁহার কার্যাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর ও দক্ষিণ কানারা জিলার গোটা স্বর্ণকার সম্প্রদায়কে তিনি বৈষ্ণব মতে আনয়ন করেন।

একটি পদে (ঈগলো ইন্নাবাগলো ঈ তনুবু) কবি কাতর প্রার্থনা জানাইয়া বলিয়াছেন : আজ হউক অথবা কাল হউক এই দেহ নষ্ট হইবে। হে নাগশয়ন নলিননয়ন প্রভু, আমাকে এই ভোগ-দাসত্ব হইতে মুক্ত কর···আমার মমত্ববোধ হ্রাস পায় না, মন পুণ্যকর্ম গ্রহণ করে না। ধন্যজন অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তির সম্মুখে আমার মাথা নত হয় না। কান তোমার কথা শুনিতে চায় না, অথচ অন্য কথা শোনার মতো সময় তাহার আছে। আমি বৃদ্ধ জরাতুর, দন্ত বিগলিত, চক্ষু ক্ষীণ। আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। হে হয় বদন তুমি আমাকে তুলিয়া ধর, আমার মনকে শুদ্ধ কর। আমি যেন তোমার চরণকমল ধ্যান করিতে পারি।

অপর একটি পদে হরিনাম মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে : সহস্র শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজন কী? হে মন, চতুর্দশ ভুবনের অধিপতি হরির নাম একবার উচ্চারণ কর। দুষ্ট সংসর্গ অনেক হইয়াছে। কামিনী কাঞ্চনে আর বিচলিত হইও না। সংসারের দুর্বিপাকে ব্যথিত হইও না। জনার্দনকে ভুলিও না। নিষ্পাপ সন্ত ব্যক্তিদের সংসর্গ লাভ কর। তোমার প্রতিদিনের আচরণ পবিত্র হউক। আর সেই সঙ্গে শ্রবণ কর হরিনাম ও হরিমাহাত্ম্য।

১১৪. বিজয়দাস, গোপালদাস, ও জগন্নাথদাস—রায়চুরু জেলার এই তিনজন কবির আবির্ভাব-কাল অষ্টাদশ শতাব্দী। বিজয়দাস (১৬৮৭-১৭৫৫ খ্রী°) একটি পদে (সদা এন্ন হৃদয়দল্লি) ভগবানের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন এইভাবে : শ্রীহরি, তুমি আমার হৃদয়ে সর্বদা অধিষ্ঠান কর। তুমি নাদমূর্তি। জ্ঞানরূপ নবরত্নমণ্ডিত মণ্ডপের মধ্যে রাখিয়া আমি তোমার পূজা করিতে চাই। আমি তোমার পূজা করিব ধ্যানের মধ্য দিয়া (পুষ্প দিয়া নয়)। ভক্তি-রসরূপ মণিমুক্তা দিয়া তোমার সম্মুখে আরতি করিব।

হে প্রভু, তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমাকে ত্যাগ করাও তোমার পক্ষে উচিত হইবে না। ভক্তজনের কথা তোমাকে অবশ্যই শুনিতে হইবে।

অপর একটি পদে (অন্তরঙ্গদ কদবু তেরেয়িতিন্দু) দুয়ার-খোলার চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি গাহিয়াছেন সিদ্ধি-লাভের আনন্দ-সঙ্গীত ঃ আজ আমার অন্তরের দুয়ার খুলিয়া গেল। আজ পুণ্যফলের প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার আগে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই। হরি-করুণা, গুরু-কৃপা এবং পরমভাগবত ভক্তজনের সহবাস—এই তিনের সংযোগে আজ দুয়ার খুলিয়াছে। দ্বারে যে সমস্ত প্রহরী ছিল (মহান্ধকারের প্রহরী) তাহারা পলাইয়াছে। সেই পদ্মনাভের প্রাসাদে বাহিরের চারিটি এবং ভিতরের পাঁচটি দুয়ার। আমি দিব্যজ্ঞানের প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম কোটিসূর্যকল্প স্বমূর্তিগণ মধ্যস্থিত রমাপতি সচ্চিদানন্দকে।

১১৫. বিজয়দাসের শিষ্য গোপালদাস (১৭১৭-১৭৬২) সম্পর্কে একটি স্মরণীয় তথ্য এই যে, গোপালদাস তাঁহার প্রতিভাধর শিষ্য জগন্নাথদাসের অকালমৃত্যু হইবে জানিতে পারিয়া নিজের পরমায়ু হইতে ৪০ বৎসর কাল শিষ্যকে দান করেন। এবং এইভাবে কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি মূল্যবান কবি জীবন রক্ষা পায়। গোপাল-দাস একটি পদে (এন্ন বেডলি নিন্ন বলিগে বন্দু) বলিয়াছেন যে প্রভুর কৃপা ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনীয় বস্তু নাই। কারণ কবি জানেন যে সংসারে পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ধন-পুত্র ইত্যাদি কামনা করিয়াও মানুষ অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। মাতা কর্ণকে কী দিয়াছিল, পিতা প্রহ্লাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? পুত্রলাভে ধৃতরাষ্ট্রের কী দশা হইয়াছিল? ধনলাভের ফলে দুর্যোধনের পরিণতির কথা কবি ভোলেন নাই। বালি তাহার ছোট ভাই-এর কাছে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল তাহাও কবির স্মরণ আছে। সুতরাং এই পৃথিবীতে তাঁহার একমাত্র কাম্যবস্তু প্রভুর করুণা।

১১৬. কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যের শেষ প্রতিনিধি কবি জগন্নাথদাস। ইনি প্রথম জীবনে ভক্তি-মার্গ হইতে অনেক দূরে ছিলেন। হরিদাস সম্প্রদায়ের সম্মানিত সাধক কবিদের জ্ঞানের স্বল্পতা লইয়া হাস্য-পরিহাস করায় তিনি বিশেষ আমোদ পাইতেন। বৈষ্ণব ভক্তগণ মনে করেন, তাঁহার এই ধৃষ্টতাই তাঁহার ক্ষয়রোগের কারণ। পরে অবশ্য তিনি গুরুকৃপায় রোগমুক্ত হইয়া গোপালদাসের আয়ুষ্কাল হইতে ৪০ বৎসর অতিরিক্ত পরমায়ু লাভ করিয়া পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হন। জগন্নাথদাসের রচনাবলীর মধ্যে পদাকারে রচিত ভক্তিসঙ্গীত ব্যতীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য "হরিকথামৃতসার।" মধ্বপন্থী কন্নডিগদের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থখানি বিশেষ শ্রদ্ধা ও আদরের সামগ্রী।

একটি পদে ভক্তজনের স্বরূপ ও সৌভাগ্য সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন, (রঙ্গ নিম্ন কোণ্ডাডুব মঙ্গলাত্মর): হে রঙ্গ, যে সমস্ত মঙ্গলাত্ম ব্যক্তি তোমার স্তুতি করে, তুমি তাহাদের সঙ্গসুখ দান করা করিয়া রক্ষা কর। তুমি ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে তাহারা জানে না। তোমার অনিমিত্ত উপকার তাহারা বিস্মৃত হয় না। তাহারা কোনোদিকেই তোমার চরণসেবা পরিত্যাগ করে না, পরম তত্ত্ব ছাড়া অন্য বিচার তাহারা জানে না। তাহারা মূক ও বধিরতুল্য, কখনও তাহাদের মনে অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র থাকে না। তোমাকে যাহা দেওয়া হয় না, তাহারা তাহা গ্রহণ করে না। তাহারা কি কৈবল্য-সুখ কামনা করে? তাহারা অনুদিন চিন্তা করে—জয়-পরাজয়, লাভক্ষতি, মান-অপমান, ভয়াভয়, সুখ-দুঃখ, লোষ্ট্র-কাঞ্চন, ভালমন্দ, নিন্দাস্তুতি সমস্ত তোমারই অধীন। সর্বত্র তাহারা তোমার বিশ্বরূপ দেখে। তাহারা যাহা খায় এবং অপরকে খাওয়ায়, সে সমস্ত তোমাতেই অর্পিত। মৌমাছির ন্যায় তাহারা তোমার কথামৃত পান করে। তাহাদের স্ত্রীপুত্র তোমারই দাস। তাহারা হাসে, কাঁদে ও নাচে। ভাগ্যবান ভাগবতেরা কখনও দারিদ্র্যের কথা ভাবে না,

তোমাতে নিবদ্ধ মন কখনও অন্যত্র সরাইয়া লয় না। হে জগন্নাথ বিঠল তোমার অনুগতজনই ধন্য।

১১৭. কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যের এই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, ইহাতে ভগবদ্‌ভক্তির বিভিন্ন ভাবের মধ্যে দাস্য-ভাবের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। হিন্দীসাহিত্যের রামভক্ত কবি তুলসীদাসের ন্যায় কন্নডিগ হরিদাস-সম্প্রদায় দাস্য ভক্তিকেই আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তুলসীদাস তাঁহার রামচরিতমানসে যে বলিয়াছেন সেব্য-সেবক-ভাব ব্যতীত এই ভব-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না,[১] কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্য তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

পুরন্দর দাস একটি পদে বলিয়াছেন (দাসন্ন মাডিকো এন্ন)— আমাকে তোমার দাস করিয়া লও, হে প্রভু বেঙ্কটরমণ। দূর কর আমার দুষ্টবুদ্ধি। তোমার করুণারূপী কবচ আমাকে পরাইয়া দাও, আমাকে তোমার চরণসেবার কাজ, আর তোমার অভয় করপুষ্প দিয়া আমার শির অলঙ্কৃত কর। দৃঢ়ভক্তির প্রার্থনা জানাইয়া আমি বারংবার তোমার চরণে পতিত হইতেছি। নয়নের প্রান্ত দিয়া (উপেক্ষার ভঙ্গীতে) দেখিয়া আমাকে ত্যাগ করিও না। আমার চিত্ত নির্মল করিয়া তুমি আমাকে এমন করিয়া দাও যেন আমি তোমার ধ্যান করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি। শরণাগত-রক্ষণ তোমার অন্যতম উপাধি, তুমি আমার সমস্ত সঙ্কট দূর কর।

১১৮. প্রধানত দাস্যভাবের ভক্ত বলিয়া হরিদাস বৈষ্ণব কবিদের রচনায় অন্যভাবের সমাবেশ খুব বেশি হয় নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের বাল-লীলার মাধুর্য বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু হিন্দী কবি সুর-দাসের ঐ জাতীয় পদের কথা স্মরণে রাখিলে বুঝা যাইবে যে, বাৎসল্য ভক্তির ক্ষেত্রে কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্য উৎকর্ষে ও পরিমাণে

১ সেব্য-সেবক-ভাব বিনু ভব ন তরিয় উরগারি।
ভজিয় রাম পদ পঙ্কজ অস সিদ্ধান্ত বিচারি॥—উত্তরকাণ্ড

কতটা সীমাবদ্ধ। পুরন্দরদাসের একটি পদ এইরূপ (জো জো শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ): শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ, তুমি ঘুমাও। গোপীপুত্র মুকুন্দ তুমি ঘুমাও। হে ক্ষীর-সাগর শায়ী, বটপত্রনিবাসী, লক্ষ্মীর হৃদয়-বল্লভ, বালক তুমি, তোমাকে আমি গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইব। রত্নজটিত পালঙ্কে থাকিয়া তুমি কাঁদিও না; হে পদ্মনাভ, আমি গান গাহিয়া তোমাকে ঘুম পাড়াইব। হে গুণনিধি, এখন যদি তোমাকে কোলে তুলিয়া লই, তবে ঘরের কাজ কে করিবে? শীঘ্রই তুমি সুখনিদ্রায় অভিভূত হও। হে শেষ-শয়ন, আমি গান গাহিয়া তোমায় ঘুম পাড়াইব।

তামিল কবি পেরিয়াড়বার বা হিন্দীকবি সূরদাসের বাৎসল্য পদে যে মানবিকতার পরিচয় আছে, কন্নড সাহিত্যে তাহা দুর্লভ। এখানে কৃষ্ণ কোনো সাধারণ মানব সন্তান নন, তিনি স্বয়ং ভগবান। ফলে বাৎসল্যরসের কবিতার মধ্যেও ঐশ্বর্য লীলার প্রকাশ। যেমন, শ্রীবাদিরাজতীর্থের একটি পদে আছে: যশোদা কিরূপ ভাগ্যের অধিকারিণী। শ্রীনিধি কৃষ্ণকে হাতে তুলিয়া সে চুম্বন করে। গঙ্গার পিতাকে ঘড়ার জল দিয়া স্নান করায়, নিত্যমঙ্গলকে অলঙ্কৃত করে। যিনি ভূধর ধারণ করিয়াছেন তাঁহাকে পালঙ্কে শয়ান করায়; যিনি অগোচর তাঁহাকে তুলিয়া আদর স্নেহ করে। ব্রহ্মার পিতাকে নিজের পুত্রের ন্যায় হাতে তুলিয়া লয়; শ্রুতি যাঁহার স্তব করে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য গীত গায়; যাঁহার কোন ভয় নাই, তাঁহার রক্ষা-বন্ধন করে। যাঁহাতে অগণিত সদ্‌গুণ আছে, তাঁহাকে গুণ দিয়া বাঁধে; যিনি নিত্য তৃপ্ত তাঁহাকে দুধ পান করায়।

শ্রীপাদ রায়ের একটি পদে দেখিতে পাই গোপীরা যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু উল্‌টো গোপীরাই যশোদা কর্তৃক এইরূপ ভর্ৎসিত হইতে লাগিল: থামো, তোমাদের কথা আমি বুঝিয়াছি। এইরূপ কাজ কি এই

বালক কখনও করিতে পারে? এ তো চার পা-ও চলিতে পারে না। তোমাদের বাঁধা বাছুরগুলি কি এই শিশু খুলিতে পারে? তোমাদের মনে এ কিরূপ ঈর্ষ্যা? ঘরে যেদিন দুধ-ক্ষীর খাওয়ানো হয় সেদিন সে আর কিছুই খায় না। একথা বলিতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না যে, কৃষ্ণ ঘরে ঘরে গিয়া দুধ-মাখন খাইয়াছে এবং রমণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়াছে? তোমরা কি দেখিতে পাও না আমার ঘরে দুধ-দধির কিছু অভাব নাই? গোপালকে দেখিয়া তোমাদের লোভ আর ধরে না। এই ভব-সমুদ্র পার করাইবার মালিক আমাদের রঙ্গ বিঠল।

পুরন্দরদাসের একটি পদে (অম্মা এন্ন কূডাডুব) বালক কৃষ্ণ আসিয়া মাতা যশোদার কাছে এই বলিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছে: "মা, আমার খেলার সাথীরা আমাকে খুব বিরক্ত করে। বলে, তোকে জন্ম দিয়াছে কে? বলে কিনা, আমি বাড়ি বাড়ি গিয়া মাখন চুরি করিয়া খাই। বলে কিনা তুমি আমার মা নও, আমার বাবা এখানে নাই, মামার উৎপাতের ভয়ে আমাকে মথুরা হইতে এখানে আনিয়া বেচিয়া দিয়াছে। ওরা বলে, আমার মা নাকি দেবকী, বাবা বসুদেব।" পুরন্দর দাসের এই কবিতাটি পড়িলে হিন্দীসাহিত্য রসিকের মনে জাগিবে সূরদাসের সেই প্রসিদ্ধ পদটি যেখানে কৃষ্ণ বলরামের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ তুলিয়া যশোদাকে বলিতেছে:

মৈয়া মোহি দাউ বহুৎ খিঝায়ো।
মোসোঁ কহত মোল কৌ লীন্হোঁ তূ জসুমতি কব্ জায়ো?

১১৯. দাস্যভাব-প্রধান কন্নড় সাহিত্যে মধুরভাবের ব্যঞ্জনা না থাকিবারই কথা। যে সমস্ত রচনায় মাধুর্যভাবের কিছু পরিচয় আছে পরিমাণের দিক হইতে তাহা একপ্রকার নগণ্যই বলা চলে। সমগ্র হরিদাস সাহিত্যে এরূপ পদের সংখ্যা বোধ করি একশতের বেশি হইবে না। আমরা ৪।৫টি পদের সাহায্যে এই দিকটির যৎসামান্য পরিচয় লইব।

ব্যাসরায়ের একটি পদে মুরলী-সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যাতুর গোপীচিত্তের বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে এইভাবে ঃ আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি আর থাকিতে পারি না। চল আমরা সেই কৃষ্ণের সঙ্গে গিয়া মিলিত হই। যে বেণু বাজাইয়া গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে তাহাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করি। শোন সখী, ঐ মুরলীর কত সৌভাগ্য! একদিকে সে কৃষ্ণের অধররস পান করে, অন্যদিকে তাহার প্রিয় সখীগণকে সেই রসপান হইতে বঞ্চিত করে।

পুরন্দরদাসের একটি পদে (সদ্দু মাডলু ব্যাডবো নিন্নু কালিগে বিদ্দু না বেডিকোম্বে) আছে মিলনেচ্ছু 'গোঁয়ার গোবিন্দ' কৃষ্ণের প্রতি ভীতা গোপীর কাতর প্রার্থনা ঃ হে কৃষ্ণ, তোমার পায়ে পড়ি, কিছু শব্দ করিও না। যাহারা ঘুমাইয়া আছে তাহারা জাগিয়া উঠিয়া জানিয়া ফেলিবে যে তুমি এখানে আসিয়াছ। হাত ধরিয়া তুমি টানিও না, চুড়িগুলি বাজিয়া উঠিবে। বুকের উপর হইতে আঁচল সরাইও না, কী জানি গলার হার হইতে শব্দ শোনা যাইবে। অধর রস পান করিও না, আমার পতির মনে ঈর্ষ্যা জাগিবে। কেন বাজে কথা বলিতেছ, এখন তো গান গাওয়ার সময় নয়।

পুরন্দর দাসের অপর একটি পদে আছে বিপরীত চিত্র। মিলনের উপযুক্ত মুহূর্তের বর্ণনা করিয়া গোপী কৃষ্ণকে আহ্বান জানাইতেছে (ইদে সময় রঙ্গ, বারেলো) ঃ হে কৃষ্ণ, ইহাই ঠিক সময়, এখন তুমি এস। এই সময় ননদ এক লক্ষ বাতি তৈরির কাজে ব্যস্ত, সে শীঘ্র তাহার জায়গা হইতে উঠিবে না। শাশুড়ী গিয়াছে পুরাণ শুনিতে, পতি আমার প্রতি উদাসীন। এখনই তোমার আসার উপযুক্ত সময়। আমি না করিব মাতাপিতার চিন্তা, না করিব ছেলের প্রতি মমতা। হে মন্দারপর্বতধারী পুরন্দর-বিঠল, তুমি আসিলে আমি তোমার চরণ সেবা করিব।

পরবর্তী দুইটি পদে আছে বিরহ বেদনার কথা। একটি শ্রীপাদ

রায়ের, অপরটি পুরন্দর দাসের। "কোম্ব্ কোললনূতুত নম্বিসি"— শ্রীপাদ রায়ের এই পদটিতে বলা হইয়াছে : হে সখী, মুরলী বাজাইয়া আমার মনে বিশ্বাস জাগ্রত করিয়া কৃষ্ণ কোথায় চলিয়া গেল। আমি বিকল হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছি। ঘরের কাজ আমার কিছুই ভালো লাগে না। আমার মন চলিয়া গেছে মনসিজ-পিতার (কৃষ্ণের) সঙ্গে। আমি এক পাও চলিতে পারিতেছি না, চরণ আমার অচল। প্রিয়কে না দেখিয়া আমার কিছুই সহ্য হইতেছে না। কাল হইতে আমার চোখে ঘুম নাই। সেই নটবরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই নারী জন্মের কী দুর্দশাই না হইল। গোপীনাথের দেখা না পাইয়া আমার বিরহ-তাপ বাড়িয়া যাইতেছে।

পুরন্দর দাসের পদটি উদ্ধব-সন্দেশ পর্যায়ের। "য়াকে বৃন্দাবন য়াকে গোকুল নমগে য়াকে বন্দেলো উদ্ধবা"—গোপীরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে : হে উদ্ধব, তুমি কেন আসিলে? গোকুলে বৃন্দাবনে আজ আমাদের কীই-বা আছে? এখন সেই স্নেহ কোথায়? আমাদের কৃষ্ণ গিয়া মিলিত হইয়াছেন কুবুজা-র সঙ্গে। আমরা কিরূপে তাহার কটাক্ষ পাইব জানি না। ভালোবাসিয়া অধরামৃত পান করিয়া যিনি আনন্দ দিতেন, মনের কথা বুঝিয়া লইয়া যিনি মিষ্টি কথায় জ্বালাইতেন, সেই কৃষ্ণ আজ আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো। হে উদ্ধব, আর একবার তাঁহার সঙ্গে মিলাইয়া দাও। কপট নাট্যধারী কৃষ্ণকে লোকে বলে করুণা সাগর। হায়! তিনি আমাদের ভুলিয়া গেলেন! হে উদ্ধব, যাঁহার পাদস্পর্শে পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই বাসুদেবের সঙ্গে মিলাইয়া দাও।

মধুরভাব হরিদাস সাহিত্যের মুখ্য অংশ নয় বলিয়া কৃষ্ণের রূপমাধুরী, মুরলী-ধ্বনি, বস্ত্রহরণ, রাস-ক্রীড়া, জলকেলি, বসন্ত বর্ণনা, অক্রূরের বৃন্দাবন আগমন, কৃষ্ণের মথুরা-গমন গোপীদের উদ্বেগ ও বিরহ, উদ্ধবের ব্রজে আগমন ইত্যাদি প্রসঙ্গসমূহের সঙ্কেতমাত্র দেওয়া হইয়াছে কয়েকটি পদে ; বিস্তৃত ভাবোদ্গার

নাই। আবার এমনও দেখা যায় যে, মধুরভাবের পদ শেষপর্যন্ত পরিণত হইয়াছে ইষ্টদেবের স্তুতি বন্দনায়। হরিদাস সাহিত্যে রাধার প্রবেশ ঘটে অনেক পরবর্তীকালে—অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। বলা বাহুল্য, ইহা বহিঃপ্রভাবের ফল। রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা-বিষয়ক কিছু কিছু পদ পাওয়া গেলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের আয়তনের তুলনায় তাহা নগণ্য।[১]

১ এই প্রসঙ্গে দুইটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল :

(ক) Unlike the Vaishnava lyricists of Bengal they (Dasa poets) did not advocate the erotic forms of personal devotion to God. Their attitude in this respect was more restrained and austere—Madhva's teachings in his own words p. 167

(খ) Nowhere do they (Haridasas) seem to have followed the school of chaitanya, which has given a unique pre-dominance to the love element of Krishna and the Gopis. They always look towards God as their mother, father and brother and their all-in-all in life. Still they remain at a distance and show a peculiar kind of reverence and awe towards Him. Mystic Teachings of the Haridasas of Karnataka, p. 128

পঞ্চম অধ্যায়

আন্ধ্রদেশ ও ভক্তিসাহিত্য

(এক) তেলুগু শৈবসাহিত্য

১২০. তেলুগু শৈবসাহিত্যের আলোচনায় কন্নড শৈবসাহিত্যের প্রসঙ্গ অনিবার্যরূপেই আসিয়া পড়ে। কর্ণাটক ও আন্ধ্র এই দুইটি অঞ্চলে শৈবধর্ম প্রায় একই সময়ে শক্তিশালী হইয়া উঠে। জৈনধর্ম নবম শতাব্দীর পূর্বে তামিলনাডে হতপ্রভ হইয়া পড়িলেও কর্ণাটক অঞ্চলে তখনও তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বস্তুত কন্নড সাহিত্যের নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জৈন সাহিত্যের যুগ বলিয়া পরিচিত। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কল্যাণ-রাজ বিজ্জলের মন্ত্রী বসবন্-এর নেতৃত্বে যে বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়, উত্তরকালে তাহারাই কয়েক শত বৎসর ধরিয়া কন্নড ও তেলুগু সাহিত্যকে প্রভাবিত করিতে থাকে। দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই উভয় সাহিত্যকেই আমরা প্রধানত শৈবসাহিত্য বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

১২১. দ্বাদশ শতাব্দীতে আন্ধ্রে (কাকতীয় বংশ) এবং কর্ণাটকে (হোয়সল বংশ) স্বতন্ত্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটিলেও এই দুইটি প্রদেশ সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া চালুক্য রাজবংশের শাসনাধীন থাকার ফলে ইহাদের মধ্যে প্রতিবেশী-সুলভ তিক্ততা অপেক্ষা একটা সুস্থ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্গে তেলুগু-কন্নড-র ভাষা ও লিপিগত সাদৃশ্যের কথাও মনে রাখিতে হইবে। সেই যুগে আমরা দেখিতে পাই, কর্ণাটকী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ত্রিরত্নের পম্প ও পোন্ন এই দু'জন কবির মাতৃভাষা ছিল তেলুগু। আবার পাল্‌কুরিকি সোমনাথ এবং ভীম কবির কিছু রচনা কন্নড ভাষায় নিবদ্ধ থাকিলেও তাঁহারা প্রধানত তেলুগু সাহিত্যের কবিরূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

এই পারস্পরিক আদান প্রদানের ফলে এই দুটি অঞ্চলে শৈবধর্মের আবির্ভাব এবং শৈবসাহিত্যের সৃষ্টি যেমন সমকালীন, তেমনি আবার পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে প্রায় একই সময়ে।

১২২. বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু বসবন্-এর পরেই যে তিনজন পণ্ডিত (পণ্ডিতত্রয়) এবং পাঁচজন আচার্যের (আচার্য পঞ্চক) নাম উল্লেখ করা হয়, তাঁহারা সকলেই মোটামুটি ভাবে বসবন্-এর সমসাময়িক। পণ্ডিতত্রয় এবং আচার্যপঞ্চক স্বতন্ত্র ব্যক্তিসঙ্ঘ হইলেও উভয় তালিকায় যাঁহার স্থান হইয়াছে তিনি হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ শৈবগুরু মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য। এই পণ্ডিতারাধ্যকেই আমরা আন্ধ্রদেশে বীরশৈবাচারের প্রথম প্রচারক এবং তেলুগু শৈবসাহিত্যের জনক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

১২৩. সাধারণভাবে শৈবসম্পদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পণ্ডিতারাধ্যের শিষ্যবৃন্দ বিশেষভাবে "আরাধ্যশৈব" বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন। বীরশৈব-নেতা বসবন্ হইতে কতগুলি বিষয়ে পণ্ডিতারাধ্যের আদর্শগত পার্থক্যের জন্যই এইরূপ স্বতন্ত্র নামকরণের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বেদের প্রামাণিকতায় সন্দেহ, বর্ণভেদে অবিশ্বাস এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞোপবীত ধারণের অনাবশ্যকতা —বসবন্-প্রবর্তিত এই বৈপ্লবিক সংস্কারগুলি আরাধ্য শৈব সম্প্রদায় মানিয়া লইতে পারে নাই। তৎসত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসদ্‌ভাব কখনও উগ্র হইয়া উঠে নাই এবং জাতীয় দুর্দিনে ইহারা যে নিজেদের মত-পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকে মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহাদের সংহত প্রতিরোধে। এইভাবেই ইহারা বিজয়নগর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি-পর্ব সমাপন করে।

১২৪. মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য (দ্বাদশ শতাব্দী) হইতেই তেলুগু শৈবসাহিত্যের সূচনা। যদিও এক শতাব্দী পূর্বে তেলুগু

মহাভারতকার নন্নয়্য-র (নন্নাইয়া) সময় হইতেই আন্ধ্রদেশে জৈনপ্রভাব ক্ষীয়মাণ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি নন্নয়্য-র কালে শৈবধর্ম একটা বিশিষ্ট আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার জন্য বসবন্ এবং পণ্ডিতারাধ্যের ন্যায় নেতার সংগঠন-শক্তির আবশ্যকতা ছিল। কন্নড শৈবসাহিত্যের পথিকৃৎ যেমন বসবন্, তেলুগু শৈবসাহিত্যের প্রবর্তক তেমনি মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য। তাঁহার গ্রন্থের নাম "শিবতত্ত্বসারমু" ৪৮৯টি স্তবকে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে যে বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি এইরূপ: পশুপাশুপাতজ্ঞান, অদ্বৈতমতখণ্ডন, জগৎকর্তৃত্ব বিচার, শিবভক্তির বিবরণ, ভক্তের মহিমা, শিবভক্তিহীন পতি, ভক্তি বিনা মুক্তি নাই, বাহ্য পূজা, শিবনিন্দক বধার্হ, মৃত শিবভক্তের পারলৌকিক কার্য নিষ্প্রয়োজন, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, প্রলয় বর্ণনা, শিবের অনুচর বর্ণনা, ভক্তিমহিমা ইত্যাদি।

পণ্ডিতারাধ্য বড়ো পণ্ডিত ও বিদ্বান ছিলেন বটে, কিন্তু বড়ো কবি ছিলেন না। শাস্ত্রীয় নির্দেশ রচনায় তাঁহার যতটা আগ্রহ, কাব্য-রসসৃষ্টিতে সেরূপ দক্ষতা ছিল না। পতি-পত্নীর মতাদর্শে পার্থক্য ঘটিলে তাহাদের দাম্পত্য জীবনেও বিচ্ছেদ ঘটিবে আধুনিক পণ্ডিতও এরূপ নির্দেশ-প্রদানে সাহসী হইবেন না। কিন্তু পণ্ডিতারাধ্য বলিয়াছেন, শিবের প্রতি ভক্তিসম্পন্না নারী তাহার স্বামীকে শিবভক্ত হইবার জন্য অবিরত অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেও যদি সেই পুরুষ স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত না করে, তবে সেই রমণী ভক্তিনত চিত্তে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে।[১]

১২৫. মল্লিকার্জুনের শিষ্য নন্নিচোড-বিরচিত "কুমারসম্ভবমু" তেলুগু শৈবসাহিত্যের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। "কবিরাজ শিখামণি"-রূপে পরিচিত নন্নিচোড-র এই দ্বাদশ আশ্বাস বা অধ্যায়-বিশিষ্ট গ্রন্থখানিতে কালিদাসের নামোল্লেখ করা হইলেও এবং

১ শতক বাঙ্‌ময় সর্বস্বমু পৃ ২৩, পদ সং ৪

আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণে কালিদাসের স্পষ্ট অনুসরণ থাকিলেও তেলুগু কবি প্রধানত শিবপুরাণের কাহিনী লইয়াই এই বিশাল প্রবন্ধ-কাব্য রচনা করেন। তেলুগু সাহিত্যে ইহাই প্রথম প্রবন্ধকাব্য।

নন্নিচোড-র একশত বৎসর পূর্বে তেলুগু মহাভারতকার নন্নয়্য যে ক্ল্যাসিক কাব্যরীতির প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তী শৈবকবি কিন্তু সেই মার্গ-রীতির পরিবর্তে একটা দেশীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। বনচর এবং তাহাদের জীবনযাত্রা, শিব-সতী-দক্ষের পারিবারিক সম্পর্ক, পার্বতী ও তাহার ক্রীড়াসঙ্গিনীদের শিক্ষা ও বাল্যজীবন, বিবাহের রীতিনীতি ও যুদ্ধ প্রভৃতির বর্ণনায় এই কাব্যখানিতে এমন একটা স্থানীয় রূপ-রঙের পরিচয় পাওয়া যায় যাহা সহজেই ইহাকে তেলুগু ভাষীদের কাছে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

প্রবন্ধ-কাব্যের উপযোগী পুর-সমুদ্র-সূর্য চন্দ্র-বনবিহার প্রভৃতি অষ্টাদশ বর্ণনার চাতুর্য ও প্রাচুর্য দেখাইলেও শৈব কবি নন্নিচোড যে শিবভক্তি প্রচারের জন্যই তাঁহার কুমার-সম্ভব লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।[১] পার্বতীর ও রতিব প্রসঙ্গ হইতেই বিষয়টি বোঝা যায়। কালিদাসের কাব্যে "ক্রীড়ারসং নির্বিশতী" বালিকা পার্বতী অথবা "বেদি-বিলগ্ন-মধ্যা" যুবতী পার্বতীর যে বর্ণনা আছে সেখানে শিবভক্তির লেশমাত্র আভাস নাই। নন্নিচোড কিন্তু পার্বতীর বাল্যক্রীড়া-প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বালিকার শিবভক্তির কথাই শুনাইয়াছেন। গিরি-সুতা তাঁহার মধুর কণ্ঠে প্রথমেই যে কথা বলিলেন, তাহা হইতেছে "ওঁ নমঃ শিবায়। হে শঙ্কর, মহাদেব, বরদানকারী, তোমাকে নমস্কার। তুমিই আমাদের পরম আশ্রয়।" যথার্থ শিবভক্ত না হইলে কোনো কবির পক্ষে এইরূপ কল্পনা বোধ করি স্বাভাবিক হইত না।

১ এই প্রসঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীর কন্নড শৈব কবি হরিহর-রচিত 'গিরিজাকল্যাণ' কাব্যখানি স্মরণীয় (দ্র ৯৭)

রতির চরিত্র-চিত্রণেও কবির শিব-ভক্তির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের কাব্যে মদনভস্মের পূর্বে রতির কোনো ভূমিকা নাই। একবার মাত্র আমরা তাহাকে মদনের নির্বাক্ সহচরীরূপে দেখিতে পাই। কিন্তু তেলুগু শৈবকবি নন্নিচোড রতিকে শিবভক্ত-রূপে অঙ্কিত করিয়া মন্মথের পারিবারিক জীবনে একটা দ্বন্দ্বের আভাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইন্দ্রের নিদারুণ প্রস্তাবে মদন সম্মত হইয়াছে জানিতে পারিয়া রতি ইহার অনৌচিত্যের প্রতি তাহার স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিল। পতি-পত্নীর এই মত-বৈষম্যের প্রসঙ্গ লইয়া নন্নিচোড তাঁহার কাব্যের চতুর্থ আশ্বাসে রতি মন্মথ-সংবাদ রচনা করিয়াছেন। শিবপুরাণে এই প্রসঙ্গ আছে বলিয়া জানা নাই। কালিদাসের কাব্যে ঐ যে একটি পঙ্‌ক্তি আছে—স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ (৩।২৩), মনে হয় তেলুগু কবি উহারই মধ্যে তাঁহার কল্পনার সূত্র পাইয়াছিলেন। অবশ্য ইহা তাঁহার মৌলিক চিন্তাও হইতে পারে এবং শৈবকবির পক্ষে তাহা কিছু অসম্ভব নয়।

কালিদাসের কাব্যে মদন-সখা বসন্ত শোকাতুরা বন্ধু-পত্নীর নিদারুণ বিলাপের কালেও নিষ্ক্রিয় শ্রোতা মাত্র। শৈবকবি নন্নিচোড সেখানেও সুকৌশলে শিবভক্তির প্রসঙ্গটি আনিয়া ফেলিলেন। বসন্ত রতিকে উপদেশ দিল: 'ঈশ্বরুভক্তি যুক্তি সংযমমতি গোল্‌চুণ্ডুমু'—ভক্তি-সহকারে সংযত চিত্তে তুমি শিবের উপাসনা কর। তখন 'রতি নিরতিশয় ভক্তিং পরমেশ্বরারাধনম্বু চেয়ুচুণ্ডে' নিরতিশয় ভক্তিসহ-কারে রতি পরমেশ্বরের আরাধনায় ব্যাপৃত রহিল।

১২৬. রচনারীতির দিক হইতে তেলুগু সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা শতক-সাহিত্য নামে পরিচিত। অন্যান্য ভাষায় শত-স্তবকবিশিষ্ট শতক-কাব্য রচনার অল্প-বিস্তর প্রচলন থাকিলেও তেলুগু-সাহিত্য এই ধারায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভক্তি, শৃঙ্গার, বৈরাগ্য ও নীতি—এই চারিটি বিষয় অবলম্বনে তেলুগু ভাষায় যে সকল শতক-কাব্য রচিত

হইয়াছে তাহার সংখ্যা সহস্রাধিক বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন যুগে রচিত এই সমস্ত শতক-কাব্যের প্রাপ্ত নিদর্শন লইয়া আধুনিক কালে শতক-কাব্য-সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের তেলুগু-কবির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। শৈবসাহিত্যের পথিকৃৎ মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্যকে আমরা শতক-সাহিত্যেরও প্রবর্তক বলিয়া মনে করিতে পারি। অবশ্য তেলুগু শতক-কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ সর্বদা তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট হয় নাই। সেই লক্ষণটিকে এক কথায় বলা যায় 'মকুট' অর্থাৎ মুকুটের ব্যবহার। যে দেবতার উদ্দেশ্যে কাব্যকুসুমাঞ্জলি অর্পিত হইবে, প্রতিটি স্তবকের শেষে তাঁহার নামোল্লেখ থাকা চাই। ইহাকেই বলা হয় 'মকুট'। এই মকুটের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শতক-কবিরা তাঁহাদের কাব্যের ছন্দ নির্ণয় করিয়া লইতেন। পণ্ডিতারাধ্যের শিবতত্ত্বসার গ্রন্থে এই লক্ষণ নাই বলিয়া অনেকে ইহাকে শতক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে অনিচ্ছুক।[১]

কোনো কোনো শতক-সংকলন-গ্রন্থে এবং তেলুগু-সাহিত্যের ইতিহাসে পালকুরিকি সোমনাথকেই প্রথম শতক-কবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] সোমনাথের আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত ধারণাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়।[৩] বস্তুত যতদূর

১ বেদমু বেঙ্কটকৃষ্ণ শর্মা তাঁহার "শতক বাঙ্‌ময় সর্বস্বমু" গ্রন্থে (প্রকাশকাল ১৯৫৪) অবশ্য শিবতত্ত্বসার সম্পর্কেই প্রথম আলোচনা করিয়াছেন।

২ দ্রষ্টব্য—"ভক্তিরসশতকসম্পুটমু" (প্রথম খণ্ড) এবং A History of Telugu Literature—P. Chenchia.

৩ অধিকাংশ তেলুগু পণ্ডিত সোমনাথকে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে করিলেও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠশাস্ত্রীর মতে সোমনাথ ছিলেন কাকতীয়-রাজ ২য় প্রতাপরুদ্রের (১২৯১-১৩৩০খ্রী°) সমকালীন।

জানা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি 'য়থা বাকুল অন্নময়্য' (১২১৮-১২৮৫ খ্রী°) বিরচিত "সর্বেশ্বর শতকমু" প্রাচীনতম শতক-কাব্য। অন্নময়্য সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া স্বভাবতই তাঁহার রচনা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই সংস্কৃত-প্রবণতার আতিশয্যে কোনো কোনো স্তবক দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পুরাপুরি দেবভাষায় পরিণত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ "ভক্তিরস-শতকসম্পুটমু" হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল—

উরুসংসারগজেন্দ্রদর্পদলন ব্যূঢ় প্রতাপোগ্র কে-
সরি, দুষ্প্রাপশরীরবন্ধ বিপুল স্মাজপ্রজচ্ছেদ বি-
স্ফুরিত ক্রূরকুঠারধার, ত্বরিত প্রোদ্‌ভূতজীমূত দু-
স্তর সংঘাত বিঘাতমারুতমু, নী সদ্‌ভক্তি সর্বেশ্বরা।

—১ম খণ্ড, ৫৭ সং পদ

১২৭. শৈবসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পাল্‌কুরিকি সোমনাথের জীবৎকাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কেহ কেহ তাঁহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।[১] সোমনাথ কেবল তেলুগু ভাষাতেই নয়, কন্নড ও সংস্কৃতেও অনেক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনা-সমূহ তেলুগু ভাষায় লিখিত। সোমনাথের শিবভক্তিবিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চারখানি—পণ্ডিতারাধ্যচরিত্রমু, বসবপুরাণমু, অনুভব-সারমু, বৃষাধিপশতকমু। শেষোক্ত গ্রন্থখানির জন্য সোমনাথ তেলুগু-সাহিত্যে 'শতক-কবিব্রহ্মা' নামে পরিচিত। বৃষাধিপ বসবেশ্বর শিবের

১ সোমনাথের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত দেওয়া হইল: নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ। 'আন্ধ্রকবি-তরঙ্গিণী'র রচয়িতা চাগণ্টি শেষয়্য-র মতে ১২৪০-১৩২০; 'আন্ধ্র-গ্রন্থমালা' প্রকাশিত 'বসবপুরাণমু'র সম্পাদক বেঙ্কট রাও-র মতে ১১৯০-১২৬০; Telugu Literature প্রণেতা P. T. Raju-র মতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

প্রতি কবির অপরিমেয় ভক্তি প্রতিটি স্তবকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আরাধ্য দেবতার নামগুণকীর্তনে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই। তিনি একটির পর একটি শ্লোকে বলিয়া যাইতেছেন—হে বসবন্, হে বৃষাধিপ, তুমি সমস্ত জগতের নিদান, তুমি আমার ভব্যনিধি, তুমি অমৃত-সাগর, মহানিধি, সুবর্ণগিরি, তুমি কল্পতরু, মহাবলী, তুমি আমার পেটিকা ; উজ্জ্বল মণি তুমি। আমাকে জয় করিয়া তুমি আমাকে রক্ষা করো প্রভু। হে আমার শরীর-রক্ষক, বিভু, হৃদয়েশ্বর, হে মনোরম, হে আমার গৃহদেবতা, হে প্রভু, হে আমার সন্ন্যাসী, হে অধিনাথ, বরদানকারী, হে ভক্তযোগী-বন্দিত বৃষাধিপ, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করো।[১]

পাল্কুরিকি সোমনাথের প্রথম গ্রন্থের নাম "অনুভবসারমু"। ২৩৪টি স্তবকে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থখানিতেও ভক্তিতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। শৈবসাধক যে জাগতিক সমস্ত ভোগ-বাসনার উর্ধ্বে থাকিয়া তাঁহার সাধনায় রত থাকিবেন সেই প্রসঙ্গে একটি শ্লোকে কবি শিবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে ভক্তি-চিন্তামণি, যিনি শিবলিঙ্গের অর্চনাকারী ভক্ত, তাঁহার পক্ষে কি কখনও আলস্য ও মনোবিকার শোভা পায়? সৎক্রিয়া সম্পাদনে তিনি কখনও বৃথা কালক্ষেপ করিবেন না। জড়তা, অহংকার, সাংসারিক বিষয়ে ডুবিয়া থাকা, মানসিক অস্থিরতা, অশিষ্ট আলাপ প্রভৃতি শিবভক্তের পক্ষে অশোভন।[২]

সোমনাথের প্রধান কীর্তি দুইখানি জীবন-চরিত গ্রন্থরচনা—বসবপুরাণমু এবং পণ্ডিতারাধ্যচরিত্রমু। বসব ও পণ্ডিতারাধ্য এই দুই বিশিষ্ট শৈব নেতার জীবনী অবলম্বনে কন্নড ও তেলুগু ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে সোমনাথের রচনাই প্রাচীনতম। চরিত-কাব্য হিসাবে তাঁহার গ্রন্থদ্বয় শৈবসাহিত্যে শীর্ষস্থানীয়।

১ ভক্তিরস শতক সম্পুটমু (প্রথম খণ্ড) পদ সং ১০৩-১০৪

২ অনুভবসারমু পদ সং ১৬৪

বসব পুরাণে ৭টি আশ্বাস বা অধ্যায়। ইহার প্রথম আশ্বাসের 'অবতারিকা'য় কবি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি অলঙ্কার-বহুল ভাষার পরিবর্তে সর্বসাধারণের বোধগম্য সহজ সরল তেলুগুতে দ্বিপদী ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিবেন।[১] অতঃপর কথারম্ভ। একদিন নারদের কৈলাসে আগমন এবং শিবের নিকট ভূলোকের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন। নারদের কথা হইতে জানা গেল, নরলোকে শিবভক্ত কিছু আছেন বটে এবং তাঁহাদের ভক্তিকে উন্নত সদ্‌ভক্তি বলিতেও বাধা নাই, কিন্তু তাঁহারা ভক্তিতত্ত্বের মূল কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। সুতরাং নরলোকে পুনরায় অবতারের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। শিব তখন 'দ্বিতীয়শম্ভু' নন্দিকেশ্বরকে আদেশ দিলেন লোকহিতার্থে সকলভক্ত-হিতার্থে এবং স্বয়ং শিবের বিনোদার্থে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে। তখন তাঁহার নাম হইবে বসবন্‌![২] ইহাই বসবজন্মের অলৌকিক বৃত্তান্ত। অতঃপর তাঁহার লৌকিক জীবনের কথা। বসবন্‌ কর্তৃক সম্রাট বিজ্জলের দণ্ডনায়ক পদপ্রাপ্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গের বর্ণনা থাকিলেও গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বসবন্‌ এবং তাঁহার সমসাময়িক খ্যাত-অখ্যাত শিব-ভক্তদের অলৌকিক উপাখ্যান।

সোমনাথের দ্বিতীয় চরিত-কাব্য পণ্ডিতারাধ্যচরিত্রমু। পরবর্তী-কালে গুরুরাজ কবি বইখানির সংস্কৃত অনুবাদ করেন। সাংখ্য-জৈন চার্বাক-শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীর তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়া শৈবমতের প্রতিষ্ঠাই এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় তর্কপূর্ণ একটি অংশের ভাবানুবাদ এইরূপ : তুমি আর সাংখ্যবাদী নও, তুমি চার্বাকবাদী, বেদবিরুদ্ধ চার্বাকবাদী।... এই দেহই আত্মা, গভীরভাবে বিচার করিলে দেহের মধ্যেই আত্মা রহিয়াছে দেখিবে। দেহের কোনো কোনো অংশ কাটিয়া দেখিলে দেহের মধ্যে তুমি কি অন্য কোনোরূপ আত্মা দেখিতে

১ আন্ধ্রগ্রন্থমালা প্রকাশিত 'বসবপুরাণমু' (১৯৫২) পৃ ৪

২ বসবপুরাণমু পৃ ১১

পাও ?…যথাবিধি অনুধাবন করিলে দেখা যায়, পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারি পরমাণু যোগে দেহ গঠিত। এই দেহ ভস্ম হইলে পুনর্জন্ম ঘটে না। সুতরাং মৃত্যুই মুক্তি।…পরলোক বলিয়া কিছু নাই। পাপপুণ্য বলিয়াও কিছু নাই। এই জগৎ মিথ্যা। সুতরাং ইহার উৎপত্তি কর্তাও নাই, আবার দেব-নামধারী কোনো মোক্ষদাতাও নাই ইত্যাদি।[১]

১২৮. তেলুগু-ভাষীদের বিশেষ প্রিয় কবি পঞ্চদশ শতকের শ্রীনাথ (১৩৬৫-১৪৪০খ্রী°)। ধর্মে তিনি শৈব-মতাবলম্বী হইলেও তাঁহার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে ধর্ম-নিরপেক্ষ সংস্কৃতানুসারী মহাকাব্য 'শৃঙ্গারনৈষধমু"। শৈবসাহিত্য-বিষয়ক তিনখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। একখানি শিবরাত্রির মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক "শিবরাত্রিমাহাত্ম্যমু", দ্বিতীয়খানি সোমনাথের পূর্বালোচিত পণ্ডিতারাধ্যচরিত্রের অবলম্বনে রচিত জীবনী-কাব্য, এবং তৃতীয় গ্রন্থের নাম "হরবিলাসমু"। এই শেষোক্ত কাব্যখানি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা হইতেছে।

'হরবিলাসমু' সাতটি আশ্বাস বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একখানি প্রবন্ধ-কাব্য। ইহার কাহিনী অংশে মদন-দহন, গৌরী বিবাহ, দেবদারুবন-বিহার, সমুদ্রমন্থন, হলাহল-ভক্ষণ, কিরাতার্জুন প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি স্থান পাইয়াছে। ভারবি, কালিদাস এবং পূর্ববর্তী কন্নড-কবিদের রচনা হইতে রত্ন আহরণ করিয়া শ্রীনাথ তাঁহার কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। কালিদাসের কুমার-সম্ভব হইতে তিনি যে কয়টি চিত্র লইয়াছেন তাহার একটি এইরূপ—করেণু নিঃশঙ্কচিত্তে মদমত্ত হস্তীর মুখে পদ্মরাগগন্ধি পল্বলবারি তুলিয়া দিল; গজরাজ অর্ধভুক্ত পদ্মমৃণাল তুলিয়া দিল তাহার অঙ্গনাকে; অদূরে তপোধন মুনিরা প্রসন্ন চিত্তে এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছেন (হরবিলাসমু ৩।৬৯)। ইহার স'হিত স্মরণীয় কালিদাসের কুমার-সম্ভবের "দদৌ রসাৎ

১ আন্ধ্র কবিতরঙ্গিণী (৩য় খণ্ড) পৃ ১১৩-১১৪

পঙ্কজরেণুগন্ধি” ইত্যাদি শ্লোকটি (৩।৩৭)। আর একটি অংশে কবি পার্বতীর সৌন্দর্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—একটি পদ্মগন্ধ-লিপ্সু ভ্রমর কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছে না যে, ঐ মনোহর গন্ধ কেলিপদ্ম হইতে আগত অথবা পার্বতীর মুখ-নিঃসৃত (৩।৭১)। ইহার সহিত তুলনীয় কালিদাসের “সুগন্ধিনিশ্বাসবিবৃদ্ধতৃষ্ণং” ইত্যাদি শ্লোকটি (৩।৫৬)। কুমার-সম্ভবে যুবা ব্রহ্মচারী রূপে মহাদেব পার্বতীকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে “কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি” (৩।৫০) এই শ্লোকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারই আদর্শে শ্রীনাথ যে শ্লোকটি রচনা করিলেন তাহার ভাবার্থ এইরূপঃ হে তরলনয়নে, আমি ব্রহ্মচারী, আর তুমি কুমারী কন্যা। এত কাল পর্যন্ত তোমার বিবাহ হয় নাই। সেজন্য চিন্তার প্রয়োজন কী? আমি মুনিগণ কর্তৃক সম্মানিত; তুমি আমাকে বিবাহ কর। উঠ। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে আমি আমার তপস্যার অর্ধাংশ তোমাকে দান করিব; তুমি এই কৃচ্ছ্রসাধন হইতে নিরস্ত হও (হরবিলাসমু ৪।২৫)। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রীনাথ কালিদাসের কথা স্মরণে রাখিলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছু-না-কিছু ভিন্ন কথা বলিয়াছেন।

১২৯. যাঁহার রাজত্বকাল বিজয়নগরের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়, সেই সুপ্রসিদ্ধ নরপতি কৃষ্ণদেব রায়ের (রাজ্যকাল ১৫০৯-১৫২৯ খ্রী°) সমকালে শিল্পসাহিত্যের নানামুখী সমৃদ্ধি ঘটিলেও শৈবসাহিত্যের ধারা ততদিনে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। কন্নড সাহিত্যেও এই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায় ঐ একই সময়ে। রাজধর্ম বলিয়া হয়তো এ যুগে বৈষ্ণব ধর্মই অধিকতর রাষ্ট্রীয় পোষকতা লাভ করিয়াছে। তথাপি কৃষ্ণদেব রায় ধর্ম সম্পর্কে যে নিতান্ত অনুদার ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে, রাজসভার যে আটজন কবি-পণ্ডিত ‘অষ্ট দিগ্‌গজ’ নামে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন শৈবকবি। তাঁহার নাম ধূর্জটি।

তেলুগু শব্দটি 'ত্রিলিঙ্গ' হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। তেলেঙ্গী, তেলেঙ্গানা, ত্রৈলিঙ্গ (গোস্বামী) প্রভৃতি শব্দের গঠনেও উল্লিখিত ব্যুৎপত্তির সমর্থন পাই। প্রাচীনকালে তিনটি শিব-লিঙ্গের অবস্থান-ক্ষেত্র বা শৈবতীর্থের দ্বারা তেলুগু বা ত্রিলিঙ্গ-দেশের সীমা নির্ধারিত হইত। তাহাদের একটি গোদাবরী জিলার দাক্ষারাম (ভীমেশ্বরলিঙ্গ); দ্বিতীয়টি কর্ণূল জিলার শ্রীশৈল (মল্লিকার্জুনলিঙ্গ); তৃতীয়টি চিত্তুর জিলার কালহস্তী (ঈশ্বর-লিঙ্গ)। এই কালহস্তী-নিবাসী শৈবকবি ধূর্জটি কালহস্তী তীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণনা করিয়া প্রবন্ধকাব্য লিখিয়াছেন—"কালহস্তি-মাহাত্ম্যমু"। কিন্তু তাঁহার সমধিক প্রসিদ্ধ রচনা ঐ কালহস্তীর মহাদেব অবলম্বনে রচিত শতক-ভক্তিকাব্য "শ্রীকালহস্তীশ্বর শতকমু"।

মর্ত্যবাসী মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়াও যে পরম যোগীশ্বরের ভজনা করে না ইহা কবির পক্ষে বিস্ময়কর। তাই অনেকটা খেদের সঙ্গেই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে: মানুষ কি গতকল্যের দিকে চাহিয়া দেখে না? চাহিয়া দেখে না গত পরশ্বের দিকে? প্রতিদিন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তথাপি তাহার ধনলোলুপতার বিরাম নাই। হে কালহস্তীশ্বর, মর্ত্যবাসী যদি তোমার পূজা না করে কিরূপে তাহারা রক্ষা পাইবে? (ভক্তিরসশতকসম্পুটমু পদ সং ৮৯)

কবিত্ব অপেক্ষা ধূর্জটির ব্যক্তিত্ব ছিল প্রখরতর। পূর্ববর্তী শৈবকবি শ্রীনাথের সঙ্গে তুলনা করিলেই বিষয়টা বোঝা যাইবে। শ্রীনাথ নামে শৈবকবি হইলেও শিবের প্রতি তাঁহার যে বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল মনে হয় না। ভক্তি ও কৃচ্ছ্রসাধন অপেক্ষা রাজানুগ্রহ লাভের জন্যই তিনি বেশি লালায়িত ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে অশেষ কষ্টভোগ করিলেও মধ্যজীবনে তাঁহার বৈষয়িক সুখ-সম্ভোগের সীমা ছিল না। ধূর্জটি ছিলেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। রাজসভায় স্থান পাইয়াও তিনি রাজশক্তির কাছে শিবভক্তিকে

বিসর্জন দিতে পারেন নাই। তাই রাজসভার অন্যান্য কবিরা যখন কৃষ্ণদেব রায়ের স্তুতিবন্দনায় মুখর এবং স্বরচিত গ্রন্থাদি রাজার নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ, তখন ধূর্জটি রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া কালহস্তীর দেবতার চরণেই তাঁহার গ্রন্থ সমর্পণ করিয়া অনন্যসাধারণ শিবভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

১৩০. তেলুগু শতক-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি বেমন্না বা বেমনা। বেমনার জীবৎকাল সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে করিলেও আমরা নানা কারণে ১৫৬৪ হইতে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ এই সময়কেই তাঁহার জীবৎকাল বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। বেমনা মূলত ছিলেন শৈব। পূর্বতন শৈবকবিদের স্তুতি-বন্দনার পরে নিজেকে তিনি শিবভক্ত এবং শৈবকবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্পষ্টই বলিয়াছেন—'গানের মধ্যে যেমন সামগান, তেমনি ধ্যানের মধ্যে শিবধ্যানই শ্রেষ্ঠ—'গানমুললো সামগানমু ধ্যানমুললো শিবধ্যা-নমু শ্রেষ্ঠমু'। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বেমনাকে পুরাপুরি শৈবকবি বলিয়া ধরা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আন্ধ্রদেশে শৈবধর্ম ও শৈব-সাহিত্যের যে প্রাধান্য ছিল ষোড়শ শতকে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আন্দোলনের সেই তীব্রতা এবং ধর্মের সেই গোঁড়ামি আর রহিল না। তখন আরাধ্য দেবতার উপাসনাকেও খানিকটা মুক্তদৃষ্টিতে বিচার করিবার প্রেরণা দেখা দিয়াছিল। বেমনা সেই যুগের সন্তান। তাই সমকালীন শিবভক্তদের উদ্দেশ্যে তাঁহার কণ্ঠে ভর্ৎসনা উচ্চারিত হইয়াছিল—চিত্তশুদ্ধি বিনা শিবপূজা করিলে কোনো লাভ নাই—'চিত্তশুদ্ধি লোনি শিবপূজা লেলরা'।

১৩১. বস্তুত এই শৈবসন্তানকে ঠিক শৈবসম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা চলে না। আসলে তিনি কোনো সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন না। ভক্তি অপেক্ষা নীতির কথাই তিনি বেশি বলিয়াছেন। তাঁহাকে আন্ধ্রের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। হিন্দী-

সাহিত্যে কবীরদাসের যে স্থান, তেলুগু সাহিত্যে বেমনাও প্রায় সেই স্থানের অধিকারী। কবীরদাসের সময়ে উত্তর ভারতে ছিল হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ; বেমনার সময়ে আন্ধ্রদেশে ছিল শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব। কবীরদাস যেমন পণ্ডিত-মৌলবী কাহাকেও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই, শৈব-বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি বেমনারও সেইরূপ নির্মম ভর্ৎসনা: মূর্খলোক অজ্ঞতাবশত শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিভেদে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হইতেছে। ইহাদের শৈবত্ব ও বৈষ্ণবত্ব শেষপর্যন্ত টিকে না। এইরূপ গোঁড়া লিঙ্গধারী (বীরশৈব) এবং বৈষ্ণদেব জীবন ভার মাত্র (বেমনপত্যমুলু ৪৪৬০ সং পদ)।

কবীরের ন্যায় বেমনাও ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। অন্ধবিশ্বাস লইয়া যাহারা মূর্তি পূজা করে, কবি তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—মন্দিরের কঠিন শিলার সম্মুখে মাথা কুটিলে কি সেই শিলার কাঠিন্য দূর হয়? এই শরীরই মন্দির এবং আত্মাই ভগবান। সুতরাং ব্যর্থ শিলাপূজা ছাড়িয়া দাও (২৯৫১)। বেমনা সর্বাধিক কঠোর ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ের উপর। বীরশৈবভক্ত ভক্তির প্রতীক রূপে গলায় ও হাতে লিঙ্গ ধারণ করে। উহাকে বলে চরলিঙ্গ ও অচরলিঙ্গ। কিন্তু এই বাহ্য আড়ম্বরে আসল শিবতত্ত্ব কিরূপে বোঝা যায়? শেষ পর্যন্ত শিব-লিঙ্গকে বন্দী করিয়া ইহারা সেই অষ্ট তনুমূর্তি সর্বব্যাপী ভগবানকে দূরে সরাইয়া রাখে (২৮০)। আর একটি পদে কবি লোক-প্রচলিত তীর্থযাত্রা মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন: মানুষ 'কাশী কাশী' করিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করে। কিন্তু তাহা কি এখানে নাই? যদি হৃদয় খাঁটি ও পবিত্র হয়, তবে ভগবানকে সর্বত্রই পাওয়া যায় (১৩৫১)। এইরূপে বেমনা চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধিকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। একটি পদে আছে—আত্মশুদ্ধি বিনা আচারের মহত্ত্ব কী? পাত্রশুদ্ধি বিনা রান্নার প্রয়োজন কী? চিত্তশুদ্ধি বিনা শিবপূজাও ব্যর্থ (৩১৪)।

যতদূর জানা যায় বেমনা-রচিত পদ্যসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। ইহার অধিকাংশ পদে নীতি-বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কবীরদাস হইতে বেমনার একটি বড়ো পার্থক্য এই যে, কবীর যেমন বেদনারঞ্জিত প্রেমের মাধুরী দিয়া নীরস অদ্বৈত পন্থাকে সরস করিয়াছেন, বেমনার রচনায় তাহার আভাসমাত্র নাই। রহস্যবাদের মধুর ছায়া-পরিমল তাঁহার রচনায় একান্তই অনুপস্থিত। মাঝে মাঝে কেবল উত্তমযোগীর ভগবদ্‌ভক্তির আকুলতা বুঝাইবার জন্য কবি দাম্পত্য-জীবন হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। যেমন একটি পদে আছে—আদর্শ পতি সর্বদা নিজের স্ত্রীর কথা চিন্তা করে। আদর্শ স্ত্রীও সর্বদা তাহার পতির কথা ভাবে। সেইরূপ উত্তম যোগীও সর্বদা পরমাত্মার ধ্যানে লগ্ন থাকে (৩৫২৭)। আর একটি পদ এইরূপ : রতির ইচ্ছায় পুরুষ যেরূপ তাহার স্ত্রীর কাছে প্রার্থনা জানায়, প্রকৃত যোগীও সেইরূপ দৈন্য ও উৎকণ্ঠা লইয়া পরমগতি লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। (৪১০৯)

ভক্তিপ্রসঙ্গ ব্যতীত বেমনার পদে মানব-জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বাণী সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত পদ্যগুলি তেলুগু-ভাষীদের পরম আদরের সামগ্রী। একটি পদে মানুষের মূঢ়তা সম্পর্কে বলা হইয়াছে : মানুষ অল্প সুখের প্রলোভনে পড়িয়া অনেক দুঃখে পীড়িত হইতে থাকে, তথাপি শাশ্বত সুখের অধিকারী হইয়া সে বাঁচিতে চাহে না (২২৭)। সংসারজীবনে নারী-প্রসঙ্গের বর্ণনায় বলা হইয়াছে : যেখানে স্ত্রীলোক, সেখানেই আনন্দহাসি। স্ত্রীলোকের অভাবে সংসার শূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আবার এই স্ত্রীলোকের জন্যই পুরুষ প্রপঞ্চের ফাঁসে জড়াইয়া পড়ে (৪৮৭৯)।

কবীরের যেমন দোহা, বেমনার তেমনি "আটবেলদি"। কথাটির মূল অর্থ নর্তকী। ইহা তেলুগু ভাষার একটি সরল ছন্দ। বেমনার পদ্যাবলীতে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এমন শিক্ষিত বাঙালী নাই যিনি রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্‌ক্তিও জানেন না; এমন

হিন্দী-ভাষী দুর্লভ, কবীরের একটি দোহাও যাঁহার জানা নাই; তেমনি তেলুগু যাঁহার মাতৃভাষা তাঁহার পক্ষে বেমনার একটি "আটবেলদি"ও না বলিতে পারা বিশেষ অগৌরবের কথা।

(দুই) তেলুগু বৈষ্ণব সাহিত্য

১৩২. উত্তর ভারতের ভক্তিসাধনায় দাক্ষিণাত্যের যে কয়জন ভক্ত মহাপুরুষ প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন তেলুগুভাষী আন্ধ্র-সন্তান। ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যের ইতিহাসে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্য (১১১৪-১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্যের (১৪৭৮-১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। নিম্বার্ক জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান কর্ণাটকের অন্তর্গত বল্লারী জেলার নিম্বাপুর গ্রামে। কিন্তু তাঁহার ভক্তি সাধনার ক্ষেত্র ছিল ব্রজভূমি। রাধাবাদের অন্যতম উদ্ভাবক এই তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ যে পরবর্তীকালে তাঁহার স্বদেশ ও স্বভূমির সহিত বিশেষ যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তেলুগু ভাষায় তাঁহার রচনার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না; তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত। জীবনের অধিকাংশ কাল আন্ধ্রপ্রদেশ হইতে বহুদূরে মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে অতিবাহিত হওয়ার ফলে নিম্বার্ক তেলুগুভাষী হইয়াও তেলুগু সাহিত্যে কোনো প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই দ্বাদশ শতকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে নিম্বার্ক-পন্থী (?) জয়দেবের আবির্ভাব ঘটিলেও ঐ যুগের আন্ধ্র সাহিত্যে বৈষ্ণবতার কোনো লক্ষণীয় আভাস পাওয়া যায় না। তেলুগু ভক্তি-সাহিত্যের প্রথম কয়েক শত বৎসর (একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী) প্রধানত শিব-ভক্তির যুগ।

১৩৩. বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তেলুগু ভক্তিসাহিত্যের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি—ভাগবতকার বম্মের

পোতন (বম্মেরা পোতানা) এবং পদকর্তা তাল্লপাক অন্নমাচার্য প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইঁহাদের কিছু পূর্বেই অন্তত একজন কবির সন্ধান পাই, যিনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণ অবলম্বনে শতক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বেন্নেলকন্টি জন্মমন্ত্রি।[১] প্রসিদ্ধ শৈবকবি শ্রীনাথের সম-সাময়িক এই অখ্যাতনামা বৈষ্ণবকবি যে অন্নমাচার্য ও পোতানা-র আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহার সার্থকতা। 'আন্ধ্র কবি তরঙ্গিণী' হইতে আমরা তাঁহার দু'একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। একটি পদে কবি বলিয়াছেন—মানুষ তাহার অন্তঃশত্রুকে জয় করিতে পারে না; মমতা, অহঙ্কার প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারে না; ভিতরকার মূর্খতা ছাড়িতে পারে না; তাহারা তোমার চরণ দুইটি পর্যন্ত দেখিতে পায় না; হে কৃষ্ণ দেবকীনন্দন, তোমার চরণে শরণ না লইলে এই দুশ্চিত্ত মানুষের বৃথা বেদান্ত পড়িয়া কী হইবে? (পদ সংখ্যা—৭৬)

অপর একটি পদে কবি যেভাবে ভগবদ্‌ভক্তি প্রসঙ্গে দরিদ্র মানুষের অসহায়তার কথা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় কবি নিজেও বোধ করি একসময়ে আর্থিক অনটনের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন—হে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, দারিদ্র্য-অনলে তপ্ত মনুষ্যসমূহ তোমার কথা কিরূপে চিন্তা করিবে? কিরূপে তাহারা পুণ্য কর্মানুষ্ঠানে আগ্রহ বোধ করিবে? ভালো মন্দ বিচার করিবার মতো বিবেক এবং বাক্‌নৈপুণ্য তাহারা কোথায় পাইবে? (পদ সংখ্যা—১০৭)

১৩৪. তেলুগু ভক্তিসাহিত্যের, বিশেষ করিয়া গীতমূলক পদ-সাহিত্যের, পথিকৃৎরূপে সাধারণত যাঁহার নামোল্লেখ করা হইয়া থাকে, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি তাল্লপাক অন্নমাচার্য (১৪০৮-১৫০৩ খ্রী°) তামিলনাডের আড়বার সাহিত্যের যেমন প্রধান দেবতা

১ আন্ধ্র কবি তরঙ্গিণী—৪র্থ ভাগ, পৃ ২৪৬-২৪৭

শ্রীরঙ্গম্-এর শ্রীরঙ্গনাথ, কর্ণাটকী দাস-সাহিত্যের যেমন প্রধান দেবতা পাঁঢরপুরের বিঠোবা, তেমনি অন্নমাচার্যের রচনায় যাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে তিনি তিরুপতির বেঙ্কটেশ্বর। শ্রীরঙ্গম, কাঞ্চীপুরম্ এবং তিরুপতি—দাক্ষিণাত্যের এই তিনটি অঞ্চল বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। কুলশেখর প্রভৃতি আড়বার কবিদের রচনায় বেঙ্কটেশ্বরের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। রামানুজের আবির্ভাবের পর হইতে তিরুপতির মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বাড়িয়া যায়। এই অঞ্চলে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচারক বেদান্তদেশিক ছিলেন রামানুজের শিষ্য মহাজ্ঞানী বৈষ্ণব-আচার্য এবং যে 'তাল্লপাক' বংশে অন্নমাচার্য জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশেরই কোনো পূর্বপুরুষ বেদান্তদেশিকের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের সেবকরূপে নিযুক্ত হন।[১]

অন্নমাচার্য উৎপল-চম্পক-মালা ছন্দে বেঙ্কটেশ্বরের উপর যে ১০৫টি স্তবক রচনা করেন তাহা "শ্রীবেঙ্কটেশ্বর শতকমু" নামে পরিচিত। কবির "শৃঙ্গার সংকীর্তনলু" গ্রন্থে মধুর রসের যে স্ফুরণ ঘটিয়াছে, শতকগ্রন্থেও তাহার বেশ কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগত দুইটি স্তবকের ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিরুপতির বেঙ্কটেশ্বরের সহধর্মিণী অলিমেলুমঙ্গ[২] বা পদ্মাবতী দেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—তাঁহার চূর্ণ কুন্তলগুলি চিবুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; সুন্দর মুখমণ্ডল, শিথিল কবরী এবং তন্দ্রাতুর নয়ন লইয়া তিনি যে

১ S. Krishnaswami Ayangar—A History of Tirupati (Vol. II) p. 237

২ দ্বাপর যুগের অন্তে কলিযুগের সূচনায় ধর্মের দুরবস্থা দেখিয়া বেচারা ভৃগুঋষি ইহার প্রতিকার কল্পে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলে ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে কলিযুগে তিনি (বিষ্ণু) মর্ত্যে থাকিবেন। বিষ্ণু আসিলেন বেঙ্কটেশ্বরূপে তিরুপতি পর্বতে, লক্ষ্মী জন্ম লইলেন পদ্মাবতী নামে (তেলুগু ভাষায় অলিমেলুমঙ্গ)।

উন্নত মহিমায় আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইলেন, হে বেঙ্কটেশ্বর, আমি ভাবিতেছি তখন তাঁহার মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল (চেন্দরিন চিন্নিলেগুরুলু ইত্যাদি)।

একদিন অলিমেলুমঙ্গ অর্থাৎ পদ্মাবতী উচ্চ শাখার পুষ্পচয়ন করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে আসিয়া বলিলেন—আমি ফুল তুলিতে পারিতেছি না, তুমি তুলিয়া দাও। এই কথা বলিয়া কাছে গিয়া পদ্মাবতী তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—ইহা আমার পক্ষেও অলভ্য। এই বলিয়া গভীর অনুরাগভরে তিনি ইন্দুমুখীকে তুলিয়া ধরিলেন যাহাতে পুষ্পচয়ন তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠিল (অন্দবু কোসিয়িম্ম বিরুলঞ্জুম্ম ইত্যাদি)।

অন্নমাচার্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শৃঙ্গার সংকীর্তনলু"। ইহাতে শৃঙ্গাররস বিষয়ক তাঁহার রচিত গেয় পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। তিরুপতি দেবস্থানম্ প্রকাশিত সংস্করণে এইরূপ ৩৭৯টি পদ পাওয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ সংকলন নয়, নির্বাচিত পদের সংকলন মাত্র। ইহার মধ্যে কিছু সংস্কৃত পদেরও সন্ধান পাই। একটি পদ এইরূপ :

জানাম্যহং তে সরসলীলাং
নানাবিধ কপটনাটক সখত্বম্॥
কিং করোমি ত্বাং কিতব পরকান্তান-
খান্কুর প্রকটনমতীব কুরুষে
শঙ্কাং বিসৃজ্য মম সংব্যানকর্ষণং।
কিং কারণমিদং তে খেলনমিদানীম্॥
কিং ভাষয়সি মাং কৃতকমানসতয়া
দাম্ভিকতয়া বিট বিডম্বয়সি কিম্
গাম্ভীর্যমাবহসি কাতরত্বেন তব
সম্ভোগচাতুর্য সাদরতয়া কিম্॥

কিমিতি মামনুনয়সি কৃপণ বেঙ্কটশৈল
রমণ ভবদভিমত সুরতমনুভব
প্রমদেন মৎপ্রিয়ং প্রচুরয়সি মানহর
মমতয়া মদননির্মাতা ন কিং ত্বম্॥ (পদ সংখ্যা ১৩৫)

একটি তেলুগু পদে কবি বিরহিণীর বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপেঃ হায়, কবে সে আসিবে? কতকাল চলিয়া গেল। আমি তাহার পদধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইলাম। একদিন আমরা দুইজনে নির্জন স্থানে বসিয়া যে আলাপ করিয়াছিলাম সেই কথা স্মরণ করিয়া আমি ব্যাকুল হইতেছি। আমার মানস-নয়নে ভাসিতেছে তাঁহার কস্তুরী-তিলক-চিহ্নিত সুন্দর ললাটখানি। হায়! কবে সে আসিবে? যে গৃহে আমরা শয়ন করিতাম, সেখানে গিয়া আমি তাহাকে না পাইয়া বিষণ্ণমুখে ফিরিয়া আসিলাম। সে যে আমার বক্ষোদেশে বক্র-চন্দ্র-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে সেই দিকে চাহিয়া আমি বিকল হইতেছি। হায়! কবে সে আসিবে? একদিন যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, সেই আনন্দের স্মৃতি আজ আমাকে ব্যথাতুর করিয়াছে। তবু এইটুকু সান্ত্বনা যে, একদিন সেই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর আমার সহিত খেলা করিয়াছিল। (পদ সং ৪৬)

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশের নাম 'ভ্রমরগীত'। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৭ সংখ্যক অধ্যায়ের দশটি শ্লোক এই 'ভ্রমরগীত' সাহিত্যের মূল উৎস। একটি ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া দূর প্রবাসী কৃষ্ণের প্রতি বিরহিণী গোপীদের উক্তি এই শ্লোকগুলি। ভাগবতের এই বিষয়টি অবলম্বনে ব্রজভাষায় রচিত সূরদাস, নন্দদাস প্রভৃতির 'ভ্রমরগীত' হিন্দী সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। অন্নমাচার্য রচিত এই শ্রেণীর একটি পদের ভাব এইরূপঃ হে ভ্রমর (অর্থাৎ বেঙ্কটেশ্বর কৃষ্ণ), তুমি আমাদের অনাদর না করিয়া পূর্বের মতই আশীর্বাদ করিও। আমাদের প্রতি অর্ধদৃষ্টিতে না তাকাইয়া তুমি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাও। নবীন

যৌবনে তুমি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছ। আর এখন তুমি আসিয়াছ আমাদের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিতে। হে ভ্রমর, হে বেঙ্কট-গিরির রাজা, তুমি আমাদের কবরী স্পর্শ করিতেছ কেন? আমরা তোমার প্রেমের কথা বুঝিতে পারিলাম।[1]

১৩৫. তেলুগু ভক্তিসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নাম—বম্মের পোতন। অন্নমাচার্যের সমসাময়িক এই কবি (১৪০৫-১৪৭০ খ্রী°) তেলুগু ভাষায় যে অপূর্ব ভাগবত রচনা করিয়াছেন, তাহা ধর্মমত-নির্বিশেষে সমস্ত আন্ধ্রবাসীর বিশেষ আদরের সামগ্রী। হিন্দীভাষী জনসমাজে তুলসীদাসের রামায়ণের যে স্থান, তেলুগুভাষী জনসমাজে পোতানা-র ভাগবত অনেকটা সেই স্থানের অধিকারী। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে হিন্দী, বাংলা, তামিল প্রভৃতি ভাষায় রামায়ণ যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত তেলুগু ভাষায় সেই মর্যাদা পাইয়াছে মহাভারত ও ভাগবত। তেলুগু-সাহিত্যে মহাভারতই প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নন্নয়্যা (একাদশ শতক), তিক্কন্ন (১২২০—১৩৩০) এবং এর্র্া প্রগড (১২৮০—১৩৫০)—এই কবিত্রয়ের সাধনায় তেলুগু মহাভারত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই মহাভারতে রহিয়াছে জীবনের বিচিত্র রূপের পরিচয়, কিন্তু তেলুগু-ভাষীর হৃদয়ের ক্ষুধা মিটিয়াছে পোতানার ভাগবতে। মহাভারতের তুলনায় তাই ভাগবতই আন্ধ্র প্রদেশে অধিকতর জনপ্রিয়। ভাগবতকার পোতানাই আন্ধ্রের ভক্তকবিদের শীর্ষস্থানীয়—ভাবুকতায় সূরদাস, পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিতে তুলসীদাস। ভাষা-ভাগবত রচনা করিয়া পোতানা ভক্তিরসের যে অমৃতধারা প্রবাহিত করেন, আজিও তেলুগু-ভাষী তাহা সমান আনন্দে পান করিয়া চলিয়াছে।

এমন ভক্ত কবিরও প্রথম জীবনে কিছু কলঙ্কের স্পর্শ লাগিয়াছিল। তখন তিনি রাজ-আশ্রয়ে প্রতিপালিত। সুতরাং অনুগ্রাহকের

১ তুম্মেদপদমু—প্রাচীন কাব্য মঞ্জরী।

আদেশে তাঁহাকে রাজ-রক্ষিতার ভ্রূকুটি-বিলাস এবং ভাব-ভঙ্গিমার মনোহর বর্ণনা করিয়া লিখিতে হইল—"ভোগিনী-দণ্ডকমু", এবং সেই গ্রন্থও উৎসৃষ্ট হইল রাজার চরণে। কিন্তু মহত্তর সৃষ্টির জন্য যাঁহার জন্ম, রাজসভার কলুষিত আবহাওয়ায় তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সুযোগ্য গুরুর উপদেশ তাঁহাকে ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত করিল। গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বেই তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িলে রাজা কবিকে আদেশ দিলেন তাঁহারই নামে গ্রন্থ উৎসর্গের জন্য। তদুত্তরে ভাগবতের সূচনাতেই কবি এই মর্মে একটি শ্লোক যুক্ত করিয়া দিলেন—এই সমস্ত অধম রাজাকে গ্রন্থ সমর্পণ করিয়া তাহাদের কাছ হইতে কিছু ধন-রত্ন, জমি-জায়গা এবং হাতিঘোড়া লাভের পরিবর্তে পোতানা-কবি জগৎহিতের জন্য রচিত তাঁহার ভাগবত শ্রীহরির চরণে সমর্পণ করিল।[১] আর একটি শ্লোকে কবি বলিয়াছেন—হাত যদি ভগবানের পূজা না করে, মুখ যদি তাঁহার গুণ-কীর্তন না করে এবং মন যদি দয়া সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের চিন্তা না করে, তবে আর এই জন্মগ্রহণের সার্থকতা কী।[২]

পোতানার ভাগবত কেবল দশম স্কন্ধের নয়, সমগ্র ভাগবতের তেলুগু সংস্করণ। মূল ভাগবতের কোনো কোনো প্রসঙ্গ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তেলুগু ভাগবত আকারে সংস্কৃত ভাগবত অপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়াছে। গজেন্দ্র মোক্ষণ, বামন-কথা, গোপী-গীত, কৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রভৃতি প্রসঙ্গ পোতানার গ্রন্থে সুন্দর রসরূপ লাভ করিয়াছে। পেরিয়াড়বার কিংবা সূরদাসের বালকৃষ্ণের তুলনায় পোতানার বালকৃষ্ণ অনেকটা অস্ফুট সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, পোতানার দৃষ্টিতে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে সেব্য-সেবক সম্পর্ক। অর্থাৎ দাস্যরসই তাঁহার রচনায় প্রাধান্য

১ ইম্মনুজেশ্বরাধমুল কিচ্চি ইত্যাদি

২ চেতুলারঙ্গ শিবুনি ইত্যাদি

লাভ করিয়াছে। এই কারণে প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, ধ্রুব, গজেন্দ্র প্রভৃতির উপাখ্যান বর্ণনায় কবির আগ্রহের সীমা নাই।

গজেন্দ্র মে অংশটি তেলুগুভাষীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় পর্বতবিহারী গ ন্দ্র একদা তৃষ্ণার্ত হইয়া চিত্রকূট পর্বতের সরোবরে নামিলে কুম্ভীর আসিয়া তাহার পা কামড়াইয়া ধরে। অনেক যুদ্ধের পরে মুমূর্ষু গজেন্দ্র নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে তিনি আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। এই কাহিনীটুকু পোতানার গ্রন্থে অষ্টম স্কন্ধের ১৭ হইতে ১৪১ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করিয়া গজেন্দ্র কঠিন সংগ্রাম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়। এই বলিয়া সে সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—কাহার দ্বারা এই জগৎ রচিত হইয়াছে? কাহার মধ্যে এই জগৎ লীন হইয়া আছে? এবং ধ্বংসের পরে কাহার মধ্যে এই জগৎ চলিয়া যায়? কে সেই পরমেশ্বর? কে সেই মূল কারণ? কাহার মধ্যে জগতের আদি-মধ্য-অন্ত? কে সেই সর্বেসর্বা? আমি সেই ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি (৮।৭৩)। কাব্যের এই অংশে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে গজেন্দ্রের এই প্রার্থনার মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের দীনতা অনুপস্থিত। ইহার মধ্যে সেই কাতরতা নাই যাহা ভগবানকে আকৃষ্ট করিতে পারে। বিষ্ণু তাই সাড়া দিলেন না।

তখন নিরুপায় গজেন্দ্র তাহার শক্তির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—আমার আর কিছুমাত্র শক্তি নাই, আমার সাহস নিঃশেষিত, প্রাণ বাহির হইয়া আসিতেছে, শরীর অবসন্ন, আমি মূর্ছিতপ্রায়। দীন আমি, আমাকে ক্ষমা কর; তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানি না। হে ঈশ্বর, তুমি এস, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। (৮।৯০)

এমন ডাকে ভগবান সাড়া না দিয়া পারেন না। বৈকুণ্ঠপুরীতে

বিষ্ণু তখন লক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়ারত ছিলেন। গজেন্দ্রের কাতর আর্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এই অংশে কবির বর্ণনা এইরূপ :—

সুদূর বৈকুণ্ঠপুরে নগরীর একপ্রান্তে প্রাসাদের সন্নিকটে বহির্ভাগে সরোবরের তীরে মন্দার-বনে চন্দ্রকান্ত-খচিত পদ্ম-পালঙ্কে শরণাগত-রক্ষণ বিষ্ণু তখন লক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়ায় রত ছিলেন। তখন তিনি শুনিতে পাইলেন—বিহ্বল গজেন্দ্রের করুণ আর্তনাদ—'আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর'। তৎক্ষণাৎ সেই বিপন্ন হস্তীর প্রাণরক্ষার জন্য তিনি ছুটিলেন ; লক্ষ্মীকে কিছু বলিলেন না, শঙ্খ-চক্র লইবার মতো সময় তাঁহার হইল না, অনুচরদের ডাকিলেন না ; পক্ষিপতি গরুড়কেও জাগাইবার সময় নাই। সুন্দর কেশরাশি যেমন ছিল তেমনই রহিল ; লক্ষ্মীর কুচযুগ হইতে উত্থিত ঊর্ধ্ব-বস্ত্র তাঁহার গায়ে যেমন লাগিয়াছিল তেমনই রহিল—ছাড়াইবার অবকাশ পর্যন্ত নাই। যেমন করিয়া হউক ভক্তকে রক্ষা করিতে হইবে। (৮৷৯৫, ৯৬)

স্বয়ং বিষ্ণু যখন এইভাবে ছুটিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন লক্ষ্মী, তাঁহার পশ্চাতে পরিচারকবৃন্দ, তাহাদের পশ্চাতে পক্ষীন্দ্র গরুড়, তাহার পশ্চাতে শঙ্খ, চক্র ও কৌমূদকী ধনুঃ ; অতঃপর নারদ এবং সেনানী-পতি। অর্থাৎ সমগ্র বৈকুণ্ঠবাসী ছুটিয়া চলিল বিষ্ণুর গমনপথে (৮৷৯৮)।[১]

১ গজেন্দ্রের কাতর প্রার্থনা কর্ণগোচর হইবামাত্র বিষ্ণু তাহার উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু কোনোরূপ অস্ত্র লইয়া যান নাই। পোতানার শ্যালক প্রসিদ্ধ শৈব কবি শ্রীনাথ এই অংশ পাঠ করিয়া পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার বিষ্ণু কি শত্রু-নিধনের কথা ভুলিয়া গিয়া বিপন্ন ভক্তের সহিত চোখের জল ফেলিতে গিয়াছিল? পোতানা তখন কিছু বলিলেন না। শ্রীনাথের আহারের সময় তাঁহার শিশু-সন্তানকে লুকাইয়া রাখিয়া কূপে মস্ত বড়ো একটা পাথর ফেলিয়া আসিয়া শ্রীনাথকে বলিলেন—তোমার ছেলে জলে ডুবিয়াছে। শ্রীনাথ

ভক্তিরসের আস্বাদন যাহার ভাগ্যে একবার ঘটিয়াছে, সে যে পৃথিবীর অন্য কোনো বিষয়ে আসক্ত হইবে না তাহারই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইতেছে : যে মধুপ একবার মন্দারপুষ্পের মকরন্দ-মাধুর্যে ভাসমান হইয়াছে, সে কি আর নিমগাছের কাছে যাইবে? যে রাজহংস একবার নির্মল মন্দাকিনীর তরঙ্গে দোলায়িত হইয়াছে, সে কি আর সামান্য নদীতে উড়িয়া যাইবে? যে কোকিল একবার ললিত রসালের পল্লব ভক্ষণ করিয়াছে, সে কি আর সাধারণ বৃক্ষের উপর বসিবে? যে চকোর একবার পূর্ণেন্দুর জ্যোৎস্নার স্বাদ পাইয়াছে সে কি আর ঘন শিশিরবিন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইবে? যে চিত্ত একবার পদ্মনাভ বিষ্ণুর দিব্য পাদপদ্মের ধ্যানামৃত পানে বিশেষ মত্ত হইয়াছে, সেই চিত্ত কি আর অন্য কিছু গ্রহণ করিবে? হে বিনীত গুণশীল রাজা, কেন হাজার কথা বলিতেছ? (৭।১৫০)

১৩৬. আন্ধ্র-ভাগবতের উল্লিখিত অংশের সহিত সূরদাসের নিম্নলিখিত পদটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

মেরৌ মন অনত কহাঁ সচু পাবৈ।
জৈসে উড়ি জহাজ কৌ পংছী ফিরি জহাজ পৈ আবৈ॥
কমলনৈন কোঁ ছাঁড়ি মহাধম ঔর দেব কোঁ ধ্যাবৈ।
পরম গঙ্গকো ছাঁড়ি পিয়াসৌ দুর্মতি কূপ খনাবৈ॥
জিন মধুকর অম্বুজ-রস চাখ্যৌ ক্যোঁ করীল ফল খাবৈ।
সূরদাস প্রভু কামধেনু তজি ছেরী কৌন দুহাবৈ॥

তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া পাগলের মতো সেই কূপের তীরে দাঁড়াইয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পোতানা তখন তাঁহার শিশু-সন্তানকে আনিয়া দিয়া বলিলেন—তুমি যেমন সন্তানের স্নেহে পুত্রোদ্ধারের জিনিসপত্র সঙ্গে আনিতে ভুলিয়া গিয়াছ, বিষ্ণুও তেমনি অস্ত্রশস্ত্রের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভক্তের প্রতি বিষ্ণুর ভালবাসা তোমার পুত্রস্নেহ অপেক্ষা কিছু কম নয়।

কবি সূরদাসের যশোদা উদ্ধবের মারফত দেবকীর কাছে এইরূপ সংবাদ পাঠাইয়াছেন :

সঁদেসৌ দেবকী সোঁ কহিয়ো।
হোঁ তো ধায় তিহারে সুতকী কৃপা করত হী রহিয়ো॥
জদপি টেব তুম জানতি উনকী তউ মোহিঁ কহি আবৈ।
প্রাত উঠত মেরে লাল-লড়ৈত হিঁ মাখন-রোটী ভাবৈ॥

পোতানার যশোদা উদ্ধবকে দিয়া কোনো সংবাদ পাঠান নাই। উদ্ধবের সম্মুখে নন্দ পুত্রের গুণকীর্তন করিতেছে শুনিয়া অসহ্য বেদনায় তাঁহার মাতৃ-হৃদয় বিকল হইয়া পড়ে। মুখে কিছু তিনি বলিতে পারিলেন না ; কেবল তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু-ধারা এবং বক্ষ হইতে স্তন্য-ধারা প্রবাহিত হইতেলাগিল। (দশমস্কন্ধ—পূর্বভাগ-পদ্য সং ১৪৪৩)

১৩৭. সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতকার বম্মের পোতানা প্রথম জীবনে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেও ভাগবত রচনা কালে তিনি ইচ্ছাক্রমেই রাজসভার আশ্রয় হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছিলেন। বস্তুত পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত রাজসভার সহিত তেলুগু বৈষ্ণব সাহিত্যের কোনো সম্পর্কের কথা জানা যায় না। সেই সম্পর্ক প্রথম স্থাপিত হইল বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যকালে (১৫০৯-১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। দাক্ষিণাত্যের যে সকল নরপতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন, কৃষ্ণদেব রায় তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। একদিকে যেমন সমর-কুশলী, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন শিল্প, সংগীত ও সাহিত্য-প্রেমী। বর্তমান কর্ণাটক ও আন্ধ্র প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত এই বিজয়নগরে কন্নড ও তেলুগু উভয় ভাষার যুগপৎ সমাদর হইয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের মাতৃভাষা তেলুগু এবং কুলধর্ম বৈষ্ণব-ধর্ম বলিয়া স্বভাবতই তাঁহার রাজসভায় তেলুগু বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চা হইয়াছিল বেশি। যে “অষ্ট দিগ্‌গজ” রাজকবি সাহিত্যের ইতিহাসে যশস্বী হইয়া

রহিয়াছেন তাঁহাদের সকলের রচনা তেলুগু ভাষাতে নিবদ্ধ। রাজা স্বয়ং ছিলেন তেলুগু কবি। অষ্ট দিগ্‌গজের মধ্যে একমাত্র ধূর্জটি ব্যতীত আর কেহ শৈব কবি ছিলেন না। রাজা নিজেও ছিলেন বৈষ্ণব কবি।

অষ্ট দিগ্‌গজের অন্যতম কবি অল্লসানি পেদ্দন্ন এবং পিঙ্গল সূরন্ন-কে আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলিতে পারি না। তাঁহারা ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রবন্ধ কাব্যের রচয়িতা। রাজসভায় রচিত বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে তিনখানির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কৃষ্ণদেব রায়ের "আমুক্তমাল্যদ"; নন্দি তিম্ময়্য-রচিত "পারিজাতাপহরণমু" তেনালি রামকৃষ্ণ-বিরচিত "পাণ্ডুরঙ্গ মাহাত্ম্যমু"।

১৩৮. "আমুক্তমাল্যদ" গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তু তামিলনাডের অন্যতম বৈষ্ণব কবি পেরিয়াড়্‌বার এবং তাঁহার পালিতা কন্যা আণ্ডাল বা গোদাদেবীর জীবনকাহিনী। প্রাচীন যুগের এই ভক্ত কবয়িত্রীর জীবন-কথা উত্তর ভারতের পাঠকের মনে মীরাবাঈ-এর কথা জাগাইয়া তোলে। উত্তরাপথের মীরা, দক্ষিণাপথের আণ্ডাল। ভক্তিনম্র রসমাধুর্যে উভয় কবির রচনা শান্ত ও স্নিগ্ধ। উভয় নারীর জীবন-কথা কিঞ্চিৎ অলৌকিক মাহাত্ম্য মণ্ডিত। অলৌকিক অংশটুকু বাদ দিলেও তাঁহাদের লৌকিক মাধুর্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। উদয়পুরের রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ হইলেও মীরা গিরিধর গোপালকে তাঁহার স্বামী বলিয়া জানিতেন। আণ্ডাল স্বামী বলিয়া জানিতেন শ্রীরঙ্গম্-এর রঙ্গনাথ-কে (শ্রীকৃষ্ণকে)।

পাণ্ড্যনাডুর অন্তর্গত বর্তমান রামনাদ (রামনাথপুরম্) জেলার শ্রীবিল্লিপুত্তুর্[১] নামক গ্রামে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের পুজারী ছিলেন পেরিয়াড়্‌বার। গোদা দেবী তাঁহার পালিতা কন্যা। কিংবদন্তী এই যে, একদিন পেরিয়াড়্‌বার তাঁহার পুষ্পোদ্যানে তুলসী

১ তামিল ও তেলুগু ভাষার এই শব্দটির বিভিন্ন বানান দেখা যায়। আমরা বাঙালী উচ্চারণ অনুযায়ী একটি সহজ বানান রাখিলাম।

মন্দের কাছে এই বালিকাটিকে কুড়াইয়া পান। কালক্রমে এই শিশু বালিকাই তামিল সাহিত্যের অন্যতম বৈষ্ণব কবি আণ্ডালে পরিণত হইলেন।[১] তাঁহার রচিত 'তিরুপ্পাবৈ' এবং 'নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি' সাধারণ পাঠকেরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব চূড়ামণি স্বয়ং রামানুজ পর্যন্ত 'তিরুপ্পাবৈ'কে তাঁহার নিত্যপাঠের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আজিও তামিলনাডের পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা মার্গলি (অগ্রহায়ণ) মাসের প্রভাতে 'তিরুপ্পাবৈ' গাহিতে গাহিতে পল্লী পরিক্রমা করিয়া থাকে (দ্র° ৬৭)।

যৌবনে পদার্পণ করিয়াও আণ্ডাল মর্তলোকের কোনো পুরুষকে জীবন-সঙ্গীরূপে পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। বিষ্ণুই তাঁহার দেবতা, তাঁহার স্বামী।[২] কাব্যে তিনি সেই দেবতার সহিত নিজের মিলন-কথা বর্ণনা করিলেন। পেরিয়াড়্বার কন্যার উপর ভার দিয়াছিলেন দেবতার পুষ্পমাল্য রচনার। আণ্ডাল মালা গাঁথিয়া নিজেই একবার পরিয়া দেখিতেন—কিরূপ হইল। তাঁহার কাছে দেবতা ও প্রিয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য রহিল না। এইরূপ বেশ কিছুকাল কাটিয়া গেলে পেরিয়াড়্বার একদিন ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন। তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। মানুষের ব্যবহৃত মাল্য তিনি এতদিন ধরিয়া দেবতার কণ্ঠে পরাইয়া আসিয়াছেন। সেদিন আর মালা পরানো হইল না। কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া পেরিয়াড়্বার নিদ্রাভিভূত হইলে দেবতা তাঁহাকে স্বপ্নে বলিয়া

---

১ গো অর্থাৎ পৃথিবীর দান বলিয়া প্রথমে ইহার নাম রাখা হয় গোদৈ (গোদা)। তামিল ভাষায় তাঁহার নামান্তর হইল আণ্ডাল অর্থাৎ রমণী।

২ আণ্ডাল সম্পর্কে অরবিন্দের একটি মন্তব্য এইরূপ:

It would seem as if this human symbol—God becoming the Love—were the natural culminating point for the mounting flame of the soul's devotion.

—Tamil Literature (1960) p. 51

গেলেন—"তোমার কন্যা আমাকে ভালবাসে; আমিও তাহার কণ্ঠমাল্য গ্রহণের জন্য উৎসুক। তুমি শ্রীরঙ্গম্-এ আসিয়া আমার সহিত তাহার বিবাহের ব্যবস্থা কর।" শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে আণ্ডালকে বিবাহ করেন সেই উদ্দেশ্য কবি গোপীভাবে ভাবিতা হইয়া কৃষ্ণের স্তুতিমূলক অনুষ্ঠানাত্মক একটি দিব্যপ্রবন্ধ (তিরুপ্পাবৈ) রচনা করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুচিত্ত আড়্বার এই দিব্যস্বপ্নাদেশ পান। একই দিনে শ্রীরঙ্গম্-এর প্রধান পুরোহিতও এই মর্মে স্বপ্নাদেশ পাইলেন। দৈব সমারোহে বৈষ্ণব কন্যাকে দেবতার সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে অর্চাবিগ্রহ শ্রীরঙ্গনাথ হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতেই আণ্ডাল দিব্যদেহে মিলাইয়া গেলেন।

উল্লিখিত কাহিনী অবলম্বনে কৃষ্ণদেব রায় রচনা করিলেন তাঁহার ছয়টি আশ্বাস বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কাব্য "আমুক্তমাল্যদ"।[১] এই গ্রন্থের একটি প্রধান চরিত্র বিষ্ণুচিত্ত (পেরিয়াড়্বারের নামান্তর) বলিয়া গ্রন্থখানির নামান্তর "বিষ্ণুচিত্তীয়মু"। অবশ্য 'আমুক্তমাল্যদ' নামটি অধিকতর প্রচলিত। সংস্কৃতভাষার পঞ্চমহাকাব্যের (রঘুবংশ কুমারসম্ভব-কিরাতার্জুনীয়-শিশুপালবধ-নৈষধ) ন্যায় তামিল ও তেলুগু ভাষাতেও পঞ্চমহাকাব্যের প্রচলন আছে। আমুক্তমাল্যদ তন্মধ্যে একটি। এই গ্রন্থের কাব্যরস ও ভক্তিরসের মূল উৎস শ্রীবিল্লিপুত্তুরের সেই ভক্তরমণীর মনোহর আখ্যায়িকা। কবি কৃষ্ণদেব রায়ও যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন তামিলনাডের পল্লীচিত্র অঙ্কনে তাঁহার সেই শক্তির পরিচয় রহিয়াছে। আমরা তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:

---

১ আমুক্ত অর্থাৎ ব্যবহৃত মাল্য খুলিয়া লইয়া যে রমণী অপরকে দান করে তাহাকে বলা যায় আমুক্তমাল্যদা। শব্দটির তেলুগু বানান 'আমুক্তমাল্যদ'।

অতি প্রত্যূষে ভক্তিমান ব্রাহ্মণ আসিয়া নদীতে স্নান করিয়া যায়। তখনও প্রভাতের আলো ফুটিতে অনেক বাকি। বকগুলি নদীর জলের কিনারে ডানার মধ্যে এমনভাবে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া থাকে যে গ্রামরক্ষী দূর হইতে দেখিয়া সেইগুলিকে সদ্যস্নাত ব্রাহ্মণদের পরিত্যক্ত বস্ত্র মনে করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইলে পাখিগুলি উড়িয়া পলাইয়া যায়। যে সকল গ্রাম্য রমণী শস্য রক্ষার জন্য ক্ষেতে পাহারা দিতে আসে তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া কৌতুকে হাসিয়া উঠে।...সেই গ্রামের আম্রকুঞ্জসমূহে প্রাচীন পবিত্র ঘন পুষ্পাবৃত দীঘি হইতে ভাসিয়া আসে কর্পূর-কুমুদের সুরভি। সেই দীঘির জলে খেলা করে ছোট ছোট মাছ এবং সেই মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে বকগুলি তাহাদের বাঁকা ঘাড় জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিলে বুদ্‌বুদের শব্দ আসে। সন্ধ্যাবেলায় সেই গ্রামের বিষ্ণুমন্দিরে শোনা যায় বাদ্যধ্বনি। এবং তাহার প্রতিধ্বনিরূপে যেন উদ্যানের শাখায় শাখায় বাজিয়া উঠে পক্ষিসমূহের কলধ্বনি আর পাখার ঝটপট শব্দ। সন্ধ্যাকালে সেই পাখিরা দীঘির পাড় হইতে কুলায়ে ফিরিয়া আসে। (১।৬৫, ৭১-৭২)

১৩৯. কৃষ্ণদেব রায়ের দ্বিতীয় রাজকবি নন্দিতিম্ময়্য (বা মুক্কু তিম্ময়্য)-বিরচিত কাব্যের নাম "পারিজাতাপহরণমু"। পাঁচটি আশ্বাসে সম্পূর্ণ এই কাব্যখানির বিষয়বস্তু লওয়া হইয়াছে 'হরিবংশম্' হইতে। শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামার সেই মান-অভিমানের কাহিনী বাঙালী পাঠকের সুপরিচিত। কাহিনী-অংশ পৌরাণিক হইলেও তেলুগু কবি ইহাতে কিছু মৌলিকতা সঞ্চার করিয়াছেন, বিশেষত সত্যভামার চরিত্র অঙ্কনে। যে দুইটি পৌরাণিক চরিত্র ভাষা সাহিত্যের মধ্য দিয়া তেলুগু ভাষীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাদের একটি হইল তেলুগু মহাভারতকার তিক্কন্ন-চিত্রিত দ্রৌপদী এবং অপরটি তিম্ময়্য-অঙ্কিত সত্যভামা। (প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, মহাভারত ও ভাগবতের তুলনায়

তেলুগু জনসমাজে রামায়ণের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প)। অভিমানিনী সত্যভামার চরিত্র-চিত্র তেলুগুভাষীদের একটি বহু-আলোচিত বিষয়। তিম্ময়্য-র 'পারিজাতাপহরণমু' হইতে উহার আংশিক পরিচয় দেওয়া হইতেছে—

সত্যভামার অন্তরে যে কোপ সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা কোনো মতেই দূর করিতে না পারিয়া জগন্নাটক-সূত্রধার যদুনন্দন কৃষ্ণ সেই রমণীর কাছে প্রণত হইলেন। তখন তাহার মৃদুপল্লব-কোমল চরণ-দ্বয়ের রক্তিমাভা যেন কৃষ্ণের মণি-খচিত মুকুটে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের পূজাভাজন যে কৃষ্ণ, সত্যভামা সেই অবনত মন্মথপিতাকে বাম পাদ দিয়া সরাইয়া দিলেন। পতিরা যখন কোনো প্রকার ভুল করে, তখন অভিমানিনী পত্নীদের কাছে তাহারা এইরূপ ছাড়া অন্য কোনোরূপ শিক্ষা পায় কি?...প্রখর ঈর্ষ্যাজনিত শোকের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে ললিতাঙ্গী সভ্যভামা পঙ্কজবদন কৃষ্ণের মুখের প্রতি একবার তাকাইয়া স্বীয়বস্ত্রাঞ্চল দিয়া নিজের মুখখানিকে আড়াল করিলেন এবং প্রাণ বিভুর সম্মুখে আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; মনে হইল যেন কোনো কচিপল্লবভক্ষণকারিণী মধুরকণ্ঠী কোকিলবধূ কলকাকলীতে ডাকিয়া উঠিল। (১।১২০-১২১, ১৩৩)

১৪০. তেলুগু পঞ্চমহাকাব্যের অন্যতম গ্রন্থ "পাণ্ডুরঙ্গ মাহাত্ম্যমু"-র রচয়িতা তেনালি রামকৃষ্ণও ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি। পাঁচটি আশ্বাসে সম্পূর্ণ এই কাব্যখানির মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় ভীমা ও চন্দ্রভাগা নদীর তীরস্থিত মহারাষ্ট্রের তীর্থক্ষেত্র পাঁচরপুর এবং উহার বিষ্ণুদেবতা পাণ্ডুরঙ্গের মাহাত্ম্য-কীর্তন। পাণ্ডুরঙ্গের প্রথম ভক্ত কর্ণাটকবাসী পুণ্ডরীকের কথা এই গ্রন্থে আছে বলিয়া ইহার নামান্তর 'পৌণ্ডরীকমাহাত্ম্যমু'। তবে এই নামটির ব্যবহার কম। এই গ্রন্থে পাণ্ডুরঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনমূলক অনেক কাহিনী ও

উপকাহিনী আছে। তন্মধ্যে নিগম শর্মার উপাখ্যানটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কলিঙ্গের পীঠিকাপুরে জাত এই নিগম শর্মার পিতা বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। পুত্রও অতি অল্পবয়সে পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নিগম শর্মা নৈতিক চরিত্রের শুচিতা রক্ষায় যত্নবান ছিলেন না। তাঁহার বিবাহিতা ভগিনী তাঁহাকে এই অধঃপতনের কবল হইতে রক্ষা করিবার নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হন। অবশেষে নিগম শর্মার মৃত্যু ঘটে চন্দ্রভাগার তীরে পঁঢরপুরের অতি-সন্নিহিত নরসিংহক্ষেত্রে। যথাসময়ে যমলোক ও বিষ্ণুলোক হইতে দূত আসিয়া উপস্থিত। যমদূতের বক্তব্য—অসচ্চরিত্র পাপী নিগম শর্মার স্থান নরকে। কিন্তু বিষ্ণুর দূত বলিলেন—যতই পাপাচারী হউক না কেন, পঁঢরপুর অঞ্চলে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে বৈকুণ্ঠলোকে তাহার স্থান অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে বৈকুণ্ঠধামে আশ্রয় পাইয়া নিগম শর্মা পাণ্ডুরঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকট করিল।

১৪১. রাজসভার অভ্যন্তরে যেরূপ, রাজসভার বাহিরেও তদ্রূপ ভক্তি সাহিত্যের লক্ষণীয় চর্চা দেখা গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ যুগের সাহিত্য প্রধানত বিষ্ণুভক্তিবিষয়ক। সরকারি ও বেসরকারি সাহিত্যের মধ্যে আমরা এই একটা প্রধান পার্থক্য দেখিতে পাই যে, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য মুখ্যত বর্ণনা-নির্ভর আখ্যায়িকা-কাব্য ; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য মুখ্যত ভাব-নির্ভর গীতি-কাব্যের সগোত্র। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে প্রেরণা আসিয়াছিল পোতানা-র ভাগবত হইতে ; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যের মূল উৎস তাল্লপাক অন্নমাচার্য। অন্নমাচার্যের পরে তেলুগু সাহিত্যে এই ধারার ছোট-বড়ো অনেক কবির সন্ধান পাওয়া যায়। অন্নমাচার্যের পুত্র তাল্লপাক পেদতিরুমলাচার্য, পত্নী তিম্মক্ক, চিন্নন্ন, বেন্নেলকন্টি সুরন্ন, রামদাস, কালুস পুরুষোত্তম প্রভৃতি কবির মধ্য দিয়া গেয়কাব্য ও শতক কাব্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। তবে গেয়-কাব্যের ধারাটি ক্ষীণ,

শতক সাহিত্যের ধারাই প্রবল। পরবর্তীকালে কিভাবে অন্নমাচার্য প্রবর্তিত পদসাহিত্য ক্ষেত্রয়্য-শ্যামাশাস্ত্রী-মুত্তুস্বামী-ত্যাগরাজের মধ্য দিয়া এক অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়া তেলুগু ভাষাকে গেয়-কাব্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দান করিয়াছে সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। (দ্র° ১৫২-১৭২)

১৪২. তাল্লপাক পেদতিরুমালাচার্য (১৪৬০-১৫৪৭ খ্রীঃ) হইতে আমরা একটি শতক পদ এবং একটি গেয় পদ উদ্ধৃত করিতেছি। বেঙ্কটেশ-শতক কাব্যের একটি স্তবকে কবি বলিয়াছেন :—

ভোজনের সময় আহার্যবস্তুগুলি একে একে চলিয়া যায়, চন্দনের গন্ধও ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসে, নবীন বস্ত্র পরিধান করিলে জীর্ণ হইতে থাকে, মাথায় ফুল পরিলে তাহা অনতিবিলম্বেই শুকাইয়া যায়, রমণীর সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা মিলনের পরেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুন্দর অলঙ্কার পরিধান করিলে ভারি বোধ হয়, বাহনে আরোহণ করিলে আরোহণ-স্পৃহা আর থাকে না, হে সর্বজগদ্ব্যাপী লক্ষ্মীপতি! আমরা কি এই সকল বস্তুর মধ্যে নিত্যসুখ লাভ করিতে পারি? হে কোটি-সূর্য-সঙ্কাশ বেঙ্কটেশ! তোমার পূজার উপাসনার মধ্যেই স্থায়ী আনন্দ নিহিত। (৫৪ সং স্তবক)

অপর একটি পদে ঐ বেঙ্কটেশ্বরকেই সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন : হে সর্বেশ্বর, শোন। এই জগৎ তোমার নাট্যশালা। তুমি ইহার সূত্রধার। আমি নানা জন্মে তোমার সম্মুখে এই নাট্যশালায় বহুরূপে অভিনয় করিতেছি, বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ এই তূর্যত্রয়ের (নৃত্য-গীত-বাদ্য) দ্বারা আমি তোমার পূজা করিয়া আসিতেছি। আমার পদক্ষেপ, নৃত্য, ক্রিয়াকলাপ ও সংলাপ—এই সমস্ত তোমারই কাজ। আমাদের ভোগ্যবস্তুসমূহ তো তোমারই দান। তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর আমরা ততক্ষণ এইরূপ খেলা করি। আমরা তো তোমারই সভার নর্তক। তোমার আনন্দবিধানের জন্য আমরা মোক্ষ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তুমি দয়া করিয়া যাহা

দিবে আমাদের তাহাই হোক। তুমি তো সর্বদাই আমাদের আশীর্বাদ করিতেছ, তবে আর তোমার কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপনের প্রয়োজন কী? (প্রাচীন কাব্য মঞ্জরী)

১৪৩. অন্নমাচার্য-পেদতিরুমলাচার্য হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বহু শতক কাব্যের সৃষ্টি হয়। শেষাদ্রি সংকলিত "ভক্তিরস শতক সম্পুটম্" গ্রন্থে দেবকীনন্দন শতকমু, লক্ষ্মী শতকমু, মারুতি-শতকমু মাতৃশতকমু, মহিষাসুরমর্দিনী শতকমু, রুক্মিণীপতি শতকমু, মুকুন্দ-শতকমু, সীতাপতিশতকমু, পার্থসারথি শতকমু, শ্রীরঙ্গেশ শতকমু প্রভৃতি ৬০টি শতককাব্য সংকলিত হইয়াছে। বলা আবশ্যক, ইহা বিশাল শতকসাহিত্যের ভগ্নাংশমাত্র। আমরা এই শতকসাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয়ের স্পর্ধা রাখি না। কেবল দু'তিনজন কবির গুটিকয়েক নিদর্শন তুলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

১৪৪. দাশরথিকে সম্বোধন করিয়া ভদ্রাচলের রামভদ্রদাস কবি বলিয়াছেন—ভিখারী মহাদেব যে পার্বতীকে বিবাহ করেন তাহাতে কি পার্বতীর অন্নবস্ত্রের অভাব হইয়াছে? ব্রহ্মাকে বিবাহ করিয়া সরস্বতী কি গৃহহীন হইয়াছে? পৃথিবী পদশূন্য ফণীন্দ্রকে বিবাহ করিয়া কি বসবাসের গ্রাম পায় নাই? তনুহীন অনঙ্গকে বিবাহ করিয়া রতিদেবী কি দেবভোগ্য বস্তুসমূহ আস্বাদন করেন নাই? হায় রাম! তোমার ন্যায় প্রভুর পাণি গ্রহণ করিয়া জননী সীতা ধৈর্যের সঙ্গে সকল প্রকার দুর্গতি ভোগ করিলেন। (শতক সম্পুটমু তৃতীয় খণ্ড ৬৫)

আরাধ্য দেবতার প্রতি এইরূপ কটূক্তি করিয়া কবির অনুতাপ হইল। অপর একটি পদে পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলিলেন: পুরাকালে তুমি কুচেল-র কাছ হইতে একমুঠো চিঁড়া খাইয়া পরিবর্তে তাহাকে সম্পদশালী করিয়াছিলে; কুম্ভীরের কাছে পরাভূত গজরাজের ক্রন্দন শুনিয়া তুমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে; স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া বালক প্রহ্লাদকে বাঁচাইয়াছিলে; বিপন্না

দ্রৌপদী তোমাকে স্মরণ করিতেই তুমি তাহাকে অপমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। হে প্রভু, আমি না বুঝিয়া তোমাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছি। (ঐ ৭৮)

অপর এক কবি (গোপ কবীন্দ্র অথবা ভদ্রাচল্ রামদাস) 'দাশরথি শতকমু' কাব্যে তাঁহার আরাধ্য দেবতার কাছে এইরূপ নিবেদন করিয়াছেন ঃ বার্ধক্যে উপনীত হইলে যমরাজের দূত যখন প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইবে, যখন রোগ অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিবে এবং কফে মুখ ভরিয়া আসিবে, আত্মীয় বন্ধুগণ আমার শব আবরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে, সেই অন্তিম দিনে আমি তোমার নাম স্মরণ করিতে যদি অসমর্থ হই, তাই হে করুণাসাগর দাশরথি, আমি আজই তোমার ভজনা করিতেছি। (শতক সম্পুটমু প্রথম খণ্ড ১৬)

অপর একটি পদে বলিয়াছেন ঃ হে প্রভু, শবরী কি তোমার কোনো ভক্তের আত্মীয় যে সে তোমার আশীর্বাদ লাভ করিল? গুহক কি তোমার দাসানুদাস যে তুমি তাহাকে তোমার দাসত্ব গ্রহণে সস্নেহ অনুমতি দিয়াছ? তাহাই যদি হয় তবে আমি এমন কী অপরাধ করিলাম যে আমার প্রার্থনা সত্ত্বেও তুমি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছ না? আমিও তোমার দাসগণের মধ্যে একজন। (ঐ ৫৪)

১৪৫. আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি (দ্র° ১১৪) রামভদ্রদাস কিরূপে সীতার দুঃখকষ্টের জন্য প্রভু রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কেবল কটূক্তি, তাহার মধ্যে কোনরূপ ব্যঙ্গ বা তীব্র কটাক্ষ ছিল না। কাসুল পুরুষোত্তম কবি তাঁহার প্রভুর বিরুদ্ধে এমন ঝাঁঝালো অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাহাতে দেবতার রীতিমত গৌরবহানি ঘটিয়াছে। যাহারা ভক্ত নয়, কবির এই কথা শুনিবার পরে তাহাদের আর ভক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না। কবি যাঁহার উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য

নিবেদন করিয়াছেন, তিনি "শ্রীকাকুলান্ধ্রদেব"—সাধারণত আন্ধ্রবিষ্ণু বা আন্ধ্রনায়ক নামে পরিচিত। সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমুখ খ্রী° পূ° তৃতীয় শতাব্দীতে কৃষ্ণানদীর তীরে শ্রীকাকুলু নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এইখানেই আন্ধ্রবিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। রাজা কৃষ্ণদেব রায় এই আন্ধ্রবিষ্ণুর আদেশে তাঁহার কাব্য 'আমুক্তমাল্যদ' রচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাসুল পুরুষোত্তম সেই দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:—"তোমার পত্নী ভূদেবী সমস্ত ভার বহন করিয়া মরিতেছে, আর সেই ভার-বহনের গৌরব অর্জন কহিয়াছ তুমি; প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন লক্ষ্মী, কিন্তু সেই দানের গৌরব তোমার; তোমার পুত্র সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সমস্ত প্রজাকুলের জন্মদাতা, কিন্তু সেই সৃষ্টির গৌরবও তোমার; তোমার কন্যা গঙ্গা সমস্ত কলুষ বিনাশ করেন, অথচ 'পতিতপাবন' আখ্যা পাইয়াছ তুমি; তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তোমার কীর্তি বহন করিতেছে; হে বিচিত্র প্রভাবশালী, হে মৃতের মোক্ষদায়ক, হে কাকুলান্ধ্রদেব, তুমি তো প্রথম হইতেই দামোদর।...তুমি তোমার ভাইকে লাঙল দিয়া স্বয়ং শঙ্খ প্রভৃতি পঞ্চায়ুধ গ্রহণ করিয়াছ; জ্যেষ্ঠকে সামান্য বস্ত্রাদি দিয়া তুমি স্বয়ং কনকাম্বর পরিধান করিয়াছ; অগ্রজকে মত্ততাজনক মদ্য পান করাইয়া তুমি নিজে দুগ্ধ-দধি-নবনীত ভক্ষণ করিয়াছ; হে বিচিত্র প্রভাবশালী, হে মৃতের মোক্ষদায়ক কাকুলান্ধ্রদেব, (কুরু-পাণ্ডুদের) ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মীমাংসা সাধনে তুমিই যোগ্য ব্যক্তি বটে। তোমার মতো এ কাজ আর কেহ কি করিতে পারে!" (আন্ধ্রবিষ্ণুশতকমু, স্তবক সং ২৬, ৩৬)

১৪৬. কৃষ্ণদেবের সমসাময়িক অন্য কবিদের মধ্যে তল্লাপাক চিন্নন্ন তাঁহার অষ্টঅধ্যায়বিশিষ্ট "পরমযোগি বিলাসমু" গ্রন্থে তামিলনাডের দ্বাদশ আড়বার এবং তৎসহ যামুনাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তদের জীবনচরিত বর্ণনা করেন। এই

সময়ে বেম্মেলকন্টি সুরন্ন বিষ্ণুপুরাণের তেলুগু অনুবাদ করেন। কিন্তু এই সমস্ত রচনা তেলুগু জনসমাজে কোনো স্থায়ী প্রভাব রাখিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা একজন বৈষ্ণবাচার্যের উল্লেখ করিতেছি যিনি তেলুগুভাষী হইলেও যাঁহার ভক্তিসাধনায় সর্বাপেক্ষা লাভবান হইয়াছে ব্রজভূমি ও ব্রজসাহিত্য। উত্তর ভারতে পুষ্টি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহাপ্রভু বল্লভাচার্যের পৈতৃক নিবাস ছিল গোদাবরী তীরবর্তী কাঁকরবাড়া। পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট পত্নী ইল্লমাগারুকে সঙ্গে লইয়া উত্তরাপথের গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া কিছুকাল কাশীধামে অবস্থান করেন। তখন দিল্লীর সিংহাসনে আফগান সুলতান বহলুল লোদী (রাজ্যকাল ১৪৫১-১৪৮৯ খ্রী°)। কাশীতে লোদী সুলতানের আসন্ন আক্রমণের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ভট্ট এবং তাঁহার দক্ষিণদেশীয় আত্মীয়বন্ধুগণ স্বদেশের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জিলার চম্পারণ্য নামক স্থানে ইল্লমাগারুর একটি পুত্রসন্তান জন্মে (১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে)। এই শিশুই আগামী কালের বল্লভাচার্য। আচার্যের শৈশব ও শিক্ষা-নিকেতন কাশী। পরবর্তী জীবনেও তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন কখনও বৃন্দাবনে, কখনও প্রয়াগে, কখনও কাশীতে। ৫২ বৎসর বয়সে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নরলীলার অবসান হয় কাশীতে।

মধ্যজীবনে তিনি বিস্তর দেশভ্রমণ করেন। ৩২ বৎসর বয়সে একবার স্বগ্রাম কাঁকর্‌বাড়ায় আসিয়া শুনিতে পান বিজয়-নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আহ্বানে এক বিশাল পণ্ডিত-সভার আয়োজন হইতেছে। ঐ সভায় বৈষ্ণব পক্ষের মুখপাত্ররূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য কর্ণাটকবাসী ব্যাসতীর্থ। কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করপন্থী বিদ্যাতীর্থের সম্মুখে বৈষ্ণব পক্ষের পরাজয় হইতেছে শুনিয়া বল্লভাচার্য সেই পণ্ডিত সভার আলোচনায় যোগদান করেন এবং তাঁহারই পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের জয়

সুনিশ্চিত হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় এই বিজয়ী পণ্ডিতের কনকাভিষেক করিয়া তাঁহাকে উপাধি দিলেন—'আচার্যচক্রচূড়ামণি জগদ্‌গুরু শ্রীমদাচার্য মহাপ্রভু।'

মহাপ্রভু বল্লভাচার্যের যাবতীয় রচনা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ। উত্তরভারতে তাঁহার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যান হইত ব্রজভাষায়। সম্প্রতি তেলুগু ভাষায় রচিত তাঁহার কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে।[১] কিন্তু তেলুগু ভক্তিসাহিত্যের মূল ধারায় এই অল্প সংখ্যক অখ্যাত পদ কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসন লাভের প্রথম বৎসরেই (১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ) বল্লভাচার্য প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিয়া যেভাবে বিজয়নগরের পণ্ডিত সভায় বৈষ্ণবধর্মের জয়ধ্বজা প্রোথিত করেন, তাহা অবশ্যই আন্ধ্র ও কর্ণাটকের ভক্তিসাহিত্যে অসামান্য প্রেরণা সঞ্চার করিয়া থাকিবে। তেলুগু ভক্তিসাহিত্যে বল্লভাচার্যের দান পরোক্ষ হইলেও উপেক্ষণীয় নয়।

ভক্তিধর্মের যে উৎসভূমি তামিলনাড, তেলুগু ভক্তিসাহিত্যেও আমরা তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছি। কৃষ্ণদেব রায়ের 'আমুক্তমাল্যদা' এবং তাল্লপাক চিন্নন্ন-রচিত 'পরমযোগি-বিলাসমু' জাতীয় গ্রন্থের বিষয়-বস্তুও আহরণ করা হইয়াছে প্রাচীনতর তামিল জীবন হইতে। ভাগবতমাহাত্ম্য বর্ণনায় ভক্তিধর্মের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও অগ্রগতির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আন্ধ্রদেশের নাম অনুল্লিখিত। আমাদের মনে হয়, শ্লোক-রচয়িতা দক্ষিণাপথকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন—উত্তর ও দক্ষিণ। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ অংশ (বর্তমান তামিলনাড ও কেরল) দ্রাবিড় নামে এবং উত্তর অংশ (বর্তমান মাইসোর ও আন্ধ্র) কর্ণাটক নামে গৃহীত হইয়া থাকিবে। তাই দাক্ষিণাত্যে ভক্তিধর্মের প্রসার সম্পর্কে বলা হইয়াছে—দ্রাবিড়ে উৎপন্ন হইয়া ইহা কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

১ প্রভুদয়াল মীতল—অষ্টছাপ পরিচয় পৃ ১৪

হইল। বিষ্ণু-ভক্তির কথা মনে রাখিয়া আমরা বলিতে পারি কর্ণাটক (অর্থাৎ বর্তমান মাইসোর) অপেক্ষা আন্ধ্রপ্রদেশের ঐতিহ্য কিছুমাত্র ন্যূন নয়। মধ্বাচার্য যেমন কর্ণাটকের সন্তান, তেমনি নিম্বার্কাচার্য এবং বল্লভাচার্য আন্ধ্রসন্তান। ষোড়শ শতাব্দীর পুরন্দরদাস যেমন কর্ণাটকের কবি, পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্নমাচার্য (যাঁহার কাছে কন্নড়িগ কবি পুরন্দরদাস প্রত্যক্ষভাবে ঋণী) এবং বম্মের পোতানা আন্ধ্রদেশের কবি। দাক্ষিণাত্যের ত্রি-বৈষ্ণবতীর্থের দুইটি (শ্রীরঙ্গম্ ও কাঞ্চীপুরম্) তামিলদেশে, একটি (তিরুপতি) আন্ধ্রদেশে। (কর্ণাটকের বৈষ্ণব সাধনা প্রধানত মহারাষ্ট্রের পঁঢরপুর তীর্থের দেবতা পাণ্ডুরঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে।) আমরা বলিতে চাই বৈষ্ণব সাধনা ও সিদ্ধিতে আন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলুগু সাহিত্য যথার্থই গৌরবান্বিত। উত্তরকালে যখন তেলুগু ভাষার সহিত তামিলনাডের মৃত্তিকার সংযোগ ঘটিল, তখন যে ভক্তিসাহিত্যের ক্ষেত্রে সোনা ফলিবে ইহাই স্বাভাবিক।

১৪৭. উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের একবার দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে। তামিলনাডের পল্লব, চোল এবং পাণ্ড্য রাজবংশ একে একে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া আবার দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই শক্তিহীন হইয়া পড়িল। অতঃপর দাক্ষিণাত্যে প্রবল রাজশক্তি আত্মপ্রকাশ করিল বিজয়-নগরে—চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা হইলে অনতিবিলম্বে উহার শাসন-শক্তি উত্তরে তুঙ্গভদ্রা হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইরূপে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে তামিলনাডের উত্তরাংশ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। মহান্ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তামিল জনগণ ভিন্নভাষী রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়নগরের সম্রাট নরসিংহ একবার তামিলদের বিদ্রোহ দমন

করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে আন্ধ্র রাজশক্তি তামিলনাডে ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হইতে থাকে। দূরবর্তী প্রদেশে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য মত্তুরৈ (মাতুরা), তঞ্জাবূর্ (তাঞ্জোর) প্রভৃতি অঞ্চলে আন্ধ্র শাসন-কর্তা প্রেরিত হয়। এই শাসকগোষ্ঠীর সাঙ্গোপাঙ্গরূপে দলে দলে তেলুগুভাষী জনসাধারণ মাতুরা-তাঞ্জোর-তিরুচিরাপল্লির মনোরম ভূমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করে।

প্রথম প্রথম তামিলনাডের প্রাদেশিক শাসকগোষ্ঠী বিজয়নগরের অধীনে থাকিয়া সামন্তরাজরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে অর্থাৎ কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পরে (মৃত্যু ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ইহারা স্বাধীন রাজশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে চোল-পাণ্ড্য-শাসিত তাঞ্জোর-মাতুরা অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে তেলুগুভাষী নায়কবংশের শাসনাধীন হইয়া পড়ে। হতবল তামিলদের পক্ষে এই বি-ভাষী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা রহিল না। তামিলদের এই দুর্বলতার সুযোগে উত্তরাঞ্চল হইতে অধিক সংখ্যক তেলুগু সন্তান তামিলনাডের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারা তামিল ভাষায় সাধারণত "বডদেশত্তু বডমাল" অর্থাৎ "উত্তরদেশাগত উত্তরী" সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

১৪৮. তেলুগু জনসাধারণ সুদীর্ঘকাল তামিলনাডে বাস করিয়াও তাহাদের মাতৃভাষা বিস্মৃত হইল না। কারণ, প্রথমত ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে না থাকিয়া এক একটি অঞ্চলে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিল। দ্বিতীয়ত, তেলুগু-ভাষী রাজারা তাঁহাদের মাতৃভাষার চর্চা ও উন্নতি বিধানের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপে "উত্তর দেশাগত উত্তরী" সম্প্রদায় তামিল ভাষার দেশে বসিয়া ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে তেলুগু ভাষায় যাহা কিছু রচনা করিলেন, তাহা "দক্ষিণদেশীয় তেলুগু সাহিত্য" (দক্ষিণ দেশীয়াান্ধ্র বাঙ্‌ময়মু বা Southern School in Telugu Literature) নামে পরিচিত।

দক্ষিণদেশীয় তেলুগু সাহিত্যের দিক হইতে তাঞ্জোর অগ্রগণ্য। আমাদের আলোচ্য ভক্তিসাহিত্যের সব কয়টি নাম তাঞ্জোরের সহিত যুক্ত। তাঞ্জোরের নায়কবংশ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে সপ্তদশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত প্রায় দেড় শত বৎসর শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বিজয়নগরের সম্রাট অচ্যুত দেবরায়ের সময়ে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোরে নায়কবংশের প্রতিষ্ঠা করেন সেবপ্পনায়ক। এবং এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন বিজয় রাঘব (১৬৩৩-১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। অতঃপর শাসন-ক্ষমতা মরাঠীদের হাতে চলিয়া গেলেও তাঁহাদের সুদীর্ঘ রাজ্যকালে এই একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, তাঁহারাও পূর্বগামী নায়ক রাজাদের ন্যায় তেলুগু (এবং সংস্কৃত) সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।[১]

১৪৯. দক্ষিণদেশীয় তেলুগু ভক্তিসাহিত্যের আলোচনায় প্রথমে যাঁহার নামোল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি নারায়ণতীর্থ। তেলুগু ভাষায় তিনি পারিজাতহরণের কাহিনী লইয়া একখানি নাটক রচনা করিলেও তাঁহার সার্থক রচনা "কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী" (রচনাকাল ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)। সংস্কৃতে রচিত এই গেয় নাট্যখানি যে প্রধানত জয়দেবের "গীতগোবিন্দম্" এর আদর্শে পরিকল্পিত সে

১ (ক) It is a peculiar phenomenon that even the Maratha rulers of Tanjore have patronised Telugu which was neither their own language nor that of the people who were under their sway. ('দক্ষিণ দেশীয়ান্ধ্র বাঙ্‌ময়মু' গ্রন্থের ইংরেজী ভূমিকা হইতে গৃহীত)

(খ) It is a sad contrast to find comparatively little of Tamil literature during the Maratha period, the literature of the people. There was a revival of Sanskrit and Telugu, but not of Tamil. The new dynasty continued the Nayaka legacy and cared as little for Tamil as its predecessors. —K. R. Subramanian—The Maratha Rajas of Tanjore (1928) pp. 34-35.

বিষয়ে সন্দেহ নাই। গীতগোবিন্দে ১২টি সর্গ; কৃষ্ণলীলা-তরঙ্গিণীর দ্বাদশ তরঙ্গ। গীতগোবিন্দ শ্লোক ও গীতের সমন্বয়ে গঠিত; কৃষ্ণ-লীলাতরঙ্গিণীও তাই। মধুরকোমল-কান্তপদাবলীর প্রয়োগেও নারায়ণতীর্থ অনেকটা জয়দেবের অনুগামী। সুতরাং কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী পাঠে গীতগোবিন্দের কথা মনে না আসিয়া পারে না। বস্তুত দাক্ষিণাত্যের ভক্তসমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে জয়দেবই পুনরায় নারায়ণ তীর্থ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের ভজনসংগীতে গীতগোবিন্দ এবং কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী সমান মর্যাদার অধিকারী।

১৫০. কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই দুখানি গ্রন্থের পার্থক্যের কথাও মনে না আসিয়া পারে না। কাহিনী-অংশে নারায়ণতীর্থ জয়দেব হইতে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের গল্পাংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী ভাগবতের দশম স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত-সার। কৃষ্ণাবতার হইতে রুক্মিণী বিবাহ—এই সুদীর্ঘ কালের কতগুলি নির্বাচিত অংশ লইয়া তেলুগু কবি তাঁহার গীতিনাট্য রচনা করেন। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণের পরেই রাধা; কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণীর বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ভূদেবী, দেবকী, বসুদেব, যশোদা, গোপী, কৃষ্ণ, রুক্মিণী প্রভৃতির বহু চরিত্রের ভিড়ের মধ্যে রাধা অনুপস্থিত। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর পার্থক্য এই যে, জয়দেব ছিলেন শৃঙ্গাররসের কবি, নারায়ণতীর্থ ছিলেন দাস্যভক্তির উপাসক। জয়দেবের ভাষায় বলিতে পারি—যদি বিলাসকলায় কুতূহল থাকে গীতগোবিন্দ পড়ুন; আর যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার বাসনা থাকে 'কৃষ্ণলীলা-তরঙ্গিণী' পাঠ করুন।[১]

১ জয়দেব সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত—"জয়দেব যে করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী।...জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ...জয়দেব ভোগ...জয়দেব সুখ....জয়দেব বসন্ত।" (বিদ্যাপতি

১৫১. আমরা কেবল দুইটি তরঙ্গ হইতে (৬ষ্ঠ ও ৯ম) নারায়ণতীর্থের রচনাশৈলীর একটু বিস্তৃত পরিচয় লইব। ষষ্ঠ তরঙ্গের নাম "শ্রীকৃষ্ণগোপীসমাগমবর্ণনম্"। ইহাতে মোট ১৮টি শ্লোক এবং ১০খানি গান আছে। শরৎকালের এক জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে গোপীরা আসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল—

পরমপুরুষমনুযাম বয়ং সখি পরমপুরুষমনুযাম
সুরুচিরহাসং সুন্দরনাসং তরুণারুণকিরণাধরসরসম্ ॥ পরম···
নন্দকুমারং নগবরধীরং বৃন্দাবনভুবি বিবিধবিহারং
বৃন্দারকগণবন্দিতচরণারবিন্দমিলিত মণিমধুকরনিকরম্ ॥ পরম···
ভাবুকচরণং ভবসন্তরণং ভব্যসেবকজনভাগ্যবিতরণং
অব্যয়বিমলবিভূতিবিজৃম্ভিত দিব্যমণিরচিতবিবিধাভরণম্ ॥ পরম···
পরমোদারং পাপবিদূরং স্মরসায়ক স্রগ্ধরমতিচতুরং
বিরচিতমুরলী গীতরসামৃতভরিত ঘনং ঘনকৌস্তুভহারম্ ॥ পরম···
যুবতীগীতং যোগিস্থলিতং কবিজনমানসকমলবিলসিতং
শিবনারায়ণতীর্থবিরচিতং শ্রীগোপালদয়ারসমিলিতম্ ॥ পরম···
(৬।১ম গীত)

তখন কৃষ্ণ গোপীদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন।[১] কৃষ্ণের গান—

বল্লবাঙ্গনা মা কলয়ত ধর্মোল্লঙ্ঘনম্ ॥
বল্লবাঙ্গনা নিজবল্লভপদযুগ-
পল্লবসেবনমেব পরো ধর্মো ॥ বল্লবা···

তোমরা রমণী হইয়া এই যে স্বামী পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষের

ও জয়দেব, বিবিধ প্রবন্ধ)। "যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদন-ধর্মোৎসব।" (কৃষ্ণচরিত্র—দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ)

১ জ্ঞাত্বা হরিঃ স্থিরং ভাবং পরস্মিন্ পুংসি যোষিতাং
আবিষ্করিষ্যন্ গোবিন্দস্তাসাং প্রাহেদমাদরাৎ ॥ (৬।৯ম শ্লোক)

পশ্চাতে নিশাকালে নিভৃতস্থানে আসিয়াছ, ইহা কি তোমাদের পক্ষে রমণীয় আচরণ? যাও, রমণীর পরম আশ্রয় পতির কাছে ফিরিয়া যাও—

রহসি নিশি বনে কিং রমণীয়চরণং
মহনীয়গৃহপতিমপহায় তরুণং
সহসা পরপুরুষানুসরণেনালমিহ
গৃহপতিমিহ যাত গৃহিণীশরণম্‌॥ বল্লবা...

(৬।৪র্থ গীত)

গোপীরা নিবৃত্ত না হইয়া আরও ব্যগ্র হইয়া উঠিল। একজন গোপী গাহিল—

পূরয় মম কামং গোপাল পূরয় মম কামং
বারং বারং বন্দনমস্তুতে বারিজদলনয়ন গোপাল॥

(৬।৬ষ্ঠ গীত)

আর একজন গোপী গাহিল—

ভূয়ো ভূয়ো যাচেঽঞ্জলিনা
ভূমন্‌, ত্বয়ি মে দাস্যং দেহি॥ (৬।৮ম গীত)

কৃষ্ণের নৈরাশ্যব্যঞ্জক উত্তরে ব্যাকুল হইয়া কোনো গোপী তাহার সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—বল সখি এখন কী করি—

বদ কিং করবাণি সখি হে বদ কোকিলশুকবাণি!

অর্ধনিমেষও যাঁহার বিরহে সহস্রযুগ বলিয়া মনে হইত, তাঁহাকে না পাইয়া আমি কত দিন ও মাস কাটাইয়াছি। আজ যদি বা তাঁহাকে পাইলাম, সেই অমিতকৃপানিধি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। স্বামী-পুত্র-ধনে কি আর আগ্রহ আছে? তাঁহার মুরলীমন্ত্রে যে গৃহাকর্ষণ দূর হইল। মহৎ তপস্যার বলে কল্পতরু লাভ করিয়া কেহ কি তাহা ত্যাগ করিতে পারে? (৬।৯ম গীত)

অতঃপর সেই বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণকে মধ্যস্থলে রাখিয়া গোপীরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া গাহিতে লাগিল—

বনভুবি গোপালমিহ বিহরন্তং
বল্লবযুবতিজনবলয়ভাস্বন্তম্ ॥ (৮।১০ম গীত)

নবম তরঙ্গের নাম "কৃষ্ণমথুরাপ্রবেশবর্ণনম্"। কংসের আদেশে অক্রূর বৃন্দাবনে চলিয়াছে কৃষ্ণকে মথুরায় আনিবার জন্য—কণ্ঠে তাহার কৃষ্ণগুণগান—

অক্রূরো গোকুলং গচ্ছন্ মধ্যে মার্গং মুহুঃ স্মরন্
কৃষ্ণস্য গুণরত্নানি গায়ং গায়ং যযাবিতি ॥ (৯।৯ম শ্লোক)

অক্রূরের গান

দ্রক্ষ্যামি গোকুলনিলয়ং গোপীমাধবং
প্রক্ষীণকল্মষযোগি প্রত্যক্ষদৈবং নূনম্ ॥···
চন্দ্রবদনস্মরং কন্দহসনং, চারু-চম্পকনাসমরুণারবিন্দলোচনং
নন্দনন্দনমমররচিতবন্দনং, ভূরি নন্দিতনারায়ণতীর্থানন্দরসঘনং নূনম্ ॥
(৯।২য় গীত)

যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইয়া অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের ধ্বজ-বজ্রচিহ্ন দেখিতে পাইয়া আনন্দে গাহিয়া উঠিল—

ধন্যধন্যোঽহং ধরণীতলে ধন্যধন্যোঽহং
ধন্যধন্যেয়ং কালিন্দী ধন্যকালিন্দীপুলিনম্ ॥ (৯।৩য় গীত)

অক্রূরের মথুরাগামী রথে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া গোপিকাবৃন্দ খিন্ন চিত্তে গাহিতে লাগিল—দেখ সখি, মায়াবী অক্রূরের ধৃষ্টতা। গোপীজনহৃদয়কমল-সূর্যকে সে সবলে মথুরায় লইয়া চলিয়াছে। নন্দনন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র তাহার রথে—

অক্রূরো গময়তি মধুরামচ্যুতমিহ সখি সুতরাং
ন ক্রূরো মায়াবী তস্য সাহসমথ সখি পশ্য ॥ অক্রূরো····
সবলং গোপীজনহৃদয়াম্বুজসবিতারং সখি সহসা
[illegible] কলিতাগমকারণমসুরবিদারণমীশং ॥ অক্রূরো···
বৃন্দাবনচন্দ্রমসং নিজনিজচন্দনমিস্রাদিম্নতং
নন্দনন্দনমানন্দিতবিধিমুখবৃন্দমনিন্দিতস্যন্দননিয়তম্ ॥ অক্রূরো···

সংসারার্ণবতারকবিজয়গোপালকমখিলৈকগুরুং
কংসারিং শিবনারায়ণতীর্থকলিতমিদং কবিহৃদয়বিহারম্ ॥ অক্রূরো...
—(৯।৭ম গীত)

রথ ছুটিয়া চলিয়াছে মথুরার অভিমুখে—অক্রূর সবেগে চালাইতেছে রথ। একজন গোপী তাঁহার পার্শ্ববর্তিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

স্বামিনং বনমালিনং সখি কলয় স্বামিনং বনমালিনম্ ॥
—(৯।৮ম গীত)

কিন্তু কৃষ্ণই যে মথুরাগমনে উৎসাহী। সুতরাং গোপীরা নিরস্ত হইল। কোনোরূপ কান্নাকাটি করিয়া তাঁহার যাত্রাপথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির পরিবর্তে তাহারা কৃষ্ণের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—

বিজয়গোপাল তে মঙ্গলং জয় বিশ্বম্ভর তে মঙ্গলম্ ॥
(৯।৯ম গীত)

তাঞ্জোর শহরের ১৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে বরাহূর(বরাহপুরী) গ্রামে এখনও প্রতিবৎসর কৃষ্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেই অনুষ্ঠানে রাগ-তাল-সমন্বিত সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণীর গানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

১৫২. তেলুগু সাহিত্যের ‘বিদ্যাপতি’ ক্ষেত্রয্যর (১৬১৫-১৬৭৩খ্রী°) জন্ম আন্ধ্রপ্রদেশে হইলেও তাঁহার ভক্তি-জীবনের একটা বড়ো অংশ অতিবাহিত হয় তামিলনাড়ে—কাঞ্চী-মাদুরা-তাঞ্জোরে। সুতরাং তাঁহাকে দক্ষিণ-দেশীয় তেলুগু সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা কিছু অসঙ্গত নয়। চণ্ডীদাসের উপর যেমন বাঁকুড়া ও বীরভূম দুই জিলা হইতে দাবি উপস্থিত করা হইয়াছে, ক্ষেত্রয্য সম্পর্কেও অনুরূপ দাবি উঠিয়াছে চিত্তূর ও কৃষ্ণা জিলা হইতে। কবির জন্ম বোধ করি কৃষ্ণা জিলার মুব্বপুরী গ্রামে। প্রসিদ্ধ আন্ধ্রবিষ্ণুর নামাঙ্কিত শ্রীকাকুলম্ হইতে এই গ্রাম বেশি দূরে নয়। কবি তাঁহার প্রথম জীবনে স্বগ্রামের গোপাল-দেবতাকে লইয়া পদ রচনা করিতেন। কিন্তু বেশি দিন স্বগ্রামে থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। গোপাল-মন্দিরের এক দেব-

দাসীকে ভালোবাসিয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া কবি চলিয়া গেলেন কৃষ্ণা নদীর তীর হইতে কাবেরী নদীর দেশে। দূরে গিয়াও হয়তো তিনি তাঁহার গ্রামকে ভুলিতে পারেন নাই, ভুলিতে পারেন নাই গোপাল-মন্দিরকে। তাই ক্ষেত্রয়্যর পরবর্তীকালের গানের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই সেই "মুব্বগোপাল"-কে। কাঞ্চীর বরদরাজ, চিদম্বরম্-এর গোবিন্দরাজ এবং শ্রীরঙ্গম্-এর রঙ্গনাথ-কে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি অনেক পদ লিখিয়াছেন, কিন্তু পদের শেষে 'মুদ্রা' (ভণিতা) সেই একই—"মুব্বগোপাল"। ক্ষেত্রয়্য আর কোনোদিন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না ; মুব্বগোপালের সেই দেবদাসীর কথাও আমরা কিছু বলিতে পারি না। মুব্বপুরীর সেই অপরিচিত কবি দক্ষিণের নানা তীর্থক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জনসমাজে ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রয়্য নামে পরিচিত হন। তাঁহার আসল নাম বরদয়্য আজ আর বড়ো একটা উচ্চারিত হয় না।

১৫৩. তেলুগু ভক্তিসাহিত্যে শৃঙ্গাররসের সাধনায় ক্ষেত্রয়্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নারায়ণতীর্থকে 'জয়দেবের অবতার' না বলিয়া ক্ষেত্রয়্য-কে ঐ নামে অভিহিত করা উচিত। ক্ষেত্রয়্যর দুই শত বৎসর পূর্বে তাল্লপাক অন্নমাচার্য বেঙ্কটেশ্বরের গুণকীর্তন করিয়া শৃঙ্গার ও বৈরাগ্য-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ক্ষেত্রয়্য তাঁহার পূর্বসূরীর কেবল 'শৃঙ্গার সংকীর্তনলু' হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া শৃঙ্গারমিশ্র ভক্তিরস সৃজনে তেলুগু সাহিত্যে অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন।

'আন্ধ্রগান কলাপরিষৎ' কর্তৃক প্রকাশিত "ক্ষেত্রয়্য পদমুলু" গ্রন্থে ৩১৫টি নির্বাচিত পদ সংকলিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ৯।১০টি পদের সাহায্যে আমরা এই অগ্রণী শৃঙ্গার-কবির পরিচয়লাভের চেষ্টা করিব।

১০৪ সং পদে নায়িকার মুখ হইতে নায়কের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাহা বাঙালী পাঠককে স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গোঁয়ার

গোবিন্দের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। নায়ক বলপূর্বক প্রিয়া-মিলনের চেষ্টা করিয়া প্রস্থান করিলে নায়িকা এই বলিয়া কপট আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে—

কে সে? কে সে? সখি, সে কে? আমি যখন নিদ্রামগ্ন ছিলাম, তখন কে আমার প্রতি পুষ্পবাণ ছুঁড়িয়া আমার ঘুম ভাঙাইল? বেলা দ্বিপ্রহরে আমার গৃহে আসিয়া সাহসের সঙ্গে কঠিন আলিঙ্গনপাশে আমাকে আবদ্ধ করিয়া আমার মুখে ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া গেল। সখি, সে কে? আমি কি তাহার যোগ্য সাথী? আমার সহিত এইরূপ আচরণ কি তাহার উচিত হইয়াছে?…… এই যে সে পথের সকলকে দেখাইয়া শৃঙ্গার-ক্রীড়া করিয়া গেল, ইহার জন্য কি পৃথিবীতে কাহারও কাছে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিব না? কে সে? বুঝিয়াছি, এ সেই জলধরশ্যাম পীতাম্বরধর গোপীজন-বল্লভ মুব্বগোপাল।

১৫৪. কপট আক্ষেপের যুগ পার হইয়া নায়িকা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। সে কখনো অভিমানিনী, কখনও মদমত্তা। এইরূপ অবস্থায় সখীরা একদিন তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া মুব্ব-গোপালের বিরহদশা বর্ণনা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গের (সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ) দশম গীতটি স্মরণীয়। সখীরা বলিল: হে ললনে, তুমি মুব্বগোপালকে ছাড়িয়া কেন চলিয়া আসিলে? তোমার পদযুগল এই কাজে কিরূপে সম্মত হইল? সেখানে সে বেচারা তোমাকে স্মরণ করিয়া প্রলাপ বকিতেছে। কখনো সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়ে, কখনো বা চমকিয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসে। আবার কখনো বা সাশ্রুনয়নে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে। দিবারাত্রি সে গৃহের মধ্যে থাকিয়া তোমার প্রবাল-অধরের কথা স্মরণ করিয়া ধৈর্য মানে। হে কামিনি, সে কখনো বিধাতাকে গালি দেয় এবং মনে মনে ব্যর্থ কামনা করে। তুমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত আছ মনে করিয়া সহসা সে তোমাকে

আদর করিতে আরম্ভ করে। অন্য রমণীদের মধ্যে থাকিয়াও তোমাকেই সে সুন্দরীশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করে। এইরূপ কৃপালু প্রভুকে তুমি কিরূপে ত্যাগ করিলে? (পদ সং ১৪৩)

মান-পর্যায়ের একটি প্রসিদ্ধ পদ "মানিনি রো! চের রম্মনি" এই গানখানি। আলোচ্য পদে কবি সহৃদয়তা অপেক্ষা কৌশলের উপর বেশি জোর দিয়াছেন; ইহাতে নায়িকার মাধুর্য অপেক্ষা চাতুর্য অধিক পরিস্ফুট। অভিমানিনীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অবশ্য কাব্যের এই পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী। কথা মাত্র একটি— কৃষ্ণ কেন তাহাকে বলিতেছে না, 'তুমি আসিয়া আমার সহিত মিলিত হও'? এমন ব্যক্তির ভালোবাসা কি আর ভালোবাসা? অতঃপর সখীর কাছে নায়িকার ইনাইয়া-বিনাইয়া বিলাপ। তাহা আর কিছুই নয়, এক একটি করিয়া দৃষ্টান্তের মাল্য-রচনা! নির্হেতুক মানে যেরূপ অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি হয়, তাহার প্রকাশেও আতিশয্য ঘটিয়াছে। নায়িকা বলিতেছে:

হে সখি, যে ব্যক্তি কখনো বলে না 'তুমি আসিয়া আমার সহিত মিলিত হও, (অর্থাৎ যে আমার অযাচিত আত্মসমর্পণ কামনা করে) তাহার প্রেম কি প্রেম? যে পুরুষ তাহার প্রণয়িনীর যৌবন উপভোগ করিল না সেই পুরুষ কি পুরুষ? যে কখনো জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া গান শোনে নাই, তাহার আনন্দ কি আনন্দ? যে চিত্ত হইতে কখনো মন্দহাস্য বিচ্ছুরিত হয় নাই, সেই চিত্ত কি চিত্ত? 'তুমিই আমার প্রাণ-নায়িকা'—এইরূপ যে চিন্তা করে না তাহার বন্ধুত্ব কি বন্ধুত্ব? ইত্যাদি বলিতে বলিতে শেষে বলিতেছে, 'হে সখি, মুব্বগোপাল যদি প্রশংসা না করে, তবে আমার রূপ রূপ নয়। (পদ সং ২৫৬)

কৃষ্ণ আসিলেন বটে, অত্যাশার কাল উত্তীর্ণ করিয়া। প্রতীক্ষমাণা তখন খণ্ডিতা। কবি ক্ষেত্রয়্যর এই পর্যায়ের একটি পদ (বদরক পো পোবে) জয়দেবের "হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব

মা বদ কৈতববাদম্" (৮।১৭ গীত) পদটির কথা মনে করাইয়া দেয়। তফাত এই, জয়দেবে নায়িকার প্রত্যক্ষ ভৎর্সনা; এখানে ভৎর্সনা পরোক্ষ। আমরা কল্পনা করিতে পারি—ভীরু নায়ক কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া; আর দূতী-রূপিণী সখী সুন্দরীর কোপশান্তির জন্ম অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিতেছে, কিন্তু তাহা 'প্রকোপায় ন শান্তয়ে'। নায়িকা বলিতেছে:

অধিক বকিও না। তুমি যাও এবং তাহাকেও যাইতে বল। সে কেন আসিয়াছে? অতীতে সে এক যুগ ছিল। এখন আমার ভিন্ন জন্ম হইয়াছে। হে সখি, এখন সে-ই বা কে, আর আমি-ই বা কে? 'আজ সে নিশ্চয় আসিবে, আজ যদি না হয় কাল অবশ্য আসিবে'—এইরূপে আমি দিনের পর দিন কাটাইয়াছি। আমার অধর শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাকে বিনা আমি অনেক জ্যোৎস্না-রজনী একাকিনী কাটাইয়াছি। হে সখি, এখন আর কিসের প্রয়োজন? তাহার ভালোবাসায় আমার মনে আশা জন্মিয়াছিল; আমি তাহার আসার আশায় এদিক ওদিক তাকাইয়াছি। মাসের পর মাস গণনা করিয়া আমি ক্লান্ত। সে আমার ভালোবাসার প্রতিদান দেয় নাই। মধু-কণ্ঠ শুকপাখীর ডাক শুনিয়া শুনিয়া আমি বসন্তকাল কাটাইয়া দিলাম। এইরূপ দিন আমি আর চাহি না। হে সখি, মুগ্ধগোপাল কখন আসিবে ভাবিয়া আমি সকলের কাছে শুভ মুহূর্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। অন্য রমণীরা তাহাদের প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইতেছে দেখিয়া আমার চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল। হায়! আমি আর কি তাহার মুখ দেখিব? আমার জীবনে সেই প্রথম মিলনই যথেষ্ট। (পদ সং ২৮৪)

অনুতপ্ত মাধব যেমন যমুনার তীরবর্তী কুঞ্জে বসিয়া 'চিন্তয়ামি তদাননং' বলিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন (গীতগোবিন্দ ৩।৭), প্রত্যাখ্যাত মুগ্ধগোপালকেও আমরা কতকটা তদবস্থায় দেখিতে পাই। অবশ্য এখানে নায়ক কেবল নায়িকার চিন্তাই করিতেছে না,

তাহার চিত্রাঙ্কনেও রত। মনে হয়, এই পদটি রচনাকালে কবি ক্ষেত্রয়্য কালিদাসের মেঘদূতের 'ত্বামালিখ্য প্রণয়-কুপিতাং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রয়্যর পদে আছে:

হে ভামিনি, আমি এখন কী করিব? কিরূপে আমার এই মোহ (উৎকণ্ঠা) দূর করিবে? কোন্ হিতৈষী বন্ধু এখানে তোমাকে লইয়া আসিবে? আমি তো তোমার মুখপদ্মখানি আঁকিয়াছি, কিন্তু তাহাতে পদ্মের গন্ধ সঞ্চার করিতে পারি নাই। আমি আমার সমস্ত কলানৈপুণ্য প্রয়োগ করিয়া তোমার অধর চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে মাধুর্য সঞ্চার করিতে পারিলাম না। তোমার সুন্দর চোখ দু'টি আঁকা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে দর্শকের ধৈর্যহারী সচকিত চাহনি দিতে পারিলাম কৈ? শঙ্খের ন্যায় তোমার গলার রেখাগুলি আঁকিয়াছি, কিন্তু কী লাভ? তোমার কোকিলের ন্যায় যে মধুর স্বর তাহা তো সেই গলায় দিতে পারি নাই।......(পদ সং ১২৭)

বিরহ-খিন্ন নায়ক প্রিয়া-মিলন কামনায় বিধাতার কাছে যে প্রার্থনা জানাইয়াছে, তাহা একেবারেই লৌকিক—প্রভু, যদি প্রিয়ার মুখচন্দ্র দেখিতে পাই তবে পূর্ণিমার দিন নির্জলা ব্রত পালন করিব। যদি তাহার নয়ন-চুম্বনের সুখ পাই তোমাকে দুইটি বিকশিত কুমুদ উপহার দিব। আর তাহার বক্ষ-দর্শনের সুযোগ ঘটিলে তোমার মন্দিরের শিখরে স্বর্ণকুম্ভ স্থাপন করিব।... (পদ সং ৬৬)

এদিকে নায়িকাও বিরহ-ক্লিষ্টা। মুব্বগোপালের অদর্শনে তাহার বিলাপ ক্ষেত্রয়্য একটি পদে বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে:

সখি, আমার মুব্বগোপাল কত ভালোবাসিয়া একদিন এই দেহকে আলিঙ্গন করিয়াছিল? আজ আমি কোথায়, আমার প্রাণেশ্বরই বা কোথায়? বিরহিণী নারী মন্মথ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। অনন্ত বিরহাগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছে। পৃথিবীতে আর কি কোনো জন্ম নাই, সখি? আমি তাহার মুখখানি একবার দেখিতে চাই,

অধর মিলাইতে চাই তাহার অধরে। অঝোরে বহিতেছে আমার অশ্রুধারা। আমার মুগ্ধগোপাল অন্যের সহিত কান্তকেলি করিতেছে চিন্তা করিয়া আমার মন নানাভাবে উদ্‌ভ্রান্ত। সখি, আমার পতির সংবাদ না শোনা পর্যন্ত আমি বলিতে পারি না ব্রহ্মা আমার অদৃষ্টে কী লিখিয়াছেন। এখনও আমি ধৈর্য ধরিয়া আছি। (পদ সং ৬৯)

অবশেষে নায়িকার দিন ফিরিল। চারিদিকে সে শুভ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছে। পতিমিলনের আভাস সর্বত্র পরিস্ফুট। দরজার উপরে মাকড়সা তাহার জাল ছিঁড়িয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে। পৈঁডিগণ্টা পাখী আজ হঠাৎ কলরব শুরু করিয়া দিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, নায়িকার নীবি-বন্ধনও অকারণ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। বৃক্ষ পুষ্পিত, অধর স্পন্দিত, শিথিল ভুজ বন্ধন দৃঢ়। বামবাহুর স্পন্দনের সঙ্গে ঐ যে টিক্‌টিকিও ডাকিয়া উঠিল—সত্য সত্য সত্য। (পদ সং ২৯৪)

একটি সম্ভোগশৃঙ্গারের পদ দিয়া আমরা ক্ষেত্রয়্যর প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তাঁহার "মগুব তন কেলিকা…মন্দিরমু" এই পদটি তেলুগু বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। কবির বর্ণনা এইরূপ : ভগবান বরদরাজস্বামীর নাম লইয়া সেই রমণী ভোরবেলায় তাহার কেলি-মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার শিথিল বেণী হইতে পুষ্পমাল্য স্খলিত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার গলার হার আটকাইয়া গিয়াছে চুলের মধ্যে। তাহার আয়তলোচনে নামিয়া আসিয়াছে তন্দ্রা। চরণ তু'খানি লইয়া সে যেন ঠিক মতো দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাহার কাজলমাখা চোখে প্রেমের লুকোচুরি খেলা, চারিদিকে তাহার ঘনসারের সুগন্ধ। প্রবাল-অধরের লালিমা আর নাই, তাহার অর্ধ-উন্মুক্ত বক্ষে আঁকা দ্বিতীয়ার চন্দ্র। সম-সুরত-ক্লান্তি তাহার প্রতিটি অঙ্গে। জরীদার শাড়ির আঁচল লুটাইয়া পড়িয়াছে মাটিতে। তুই পাশে তুই সখী তাহাকে

সামলাইতেছে। এই অপূর্ব সজ্জায় নায়িকা মুব্বগোপালকে স্মরণ করিয়া তাহার কেলি-মন্দির হইতে ভোরবেলায় বাহির হইয়া আসিল। (পদ সং ২৪৮)

দাক্ষিণাত্যের ভক্তিসাহিত্যে, বিশেষ করিয়া ভক্তিসংগীতে, ক্ষেত্রয়্য-র নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে যে কোনো ভক্তিরসাত্মক গীতকে পদ বলা হইত। এই অর্থে পুরন্দর দাস প্রভৃতি ষোড়শ শতকের কন্নড়িগ বৈষ্ণব কবিদের সমস্ত রচনা 'দাসর পদগলু' (অর্থাৎ দাস কবিদের পদ) এই নামে পরিচিত। পরে কেবল মধুর ভক্তিবিষয়ক গীত সম্পর্কে এই শব্দটির ব্যবহার হইতে থাকে। এইদিক হইতে ক্ষেত্রয়্য প্রথম যথার্থ পদকর্তা এবং তাঁহার হাতেই পদসাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ঘটে।[১]

১৫৫. ক্ষেত্রয়্যর মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে দক্ষিণদেশীয় তেলুগু ভক্তিসাহিত্যে যে নব-শক্তির আবির্ভাব ঘটিল, তাহা কেবল তেলুগু বা দাক্ষিণাত্যের ভক্তিসাহিত্যকে নয়, সমগ্র ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যকে এক গৌরবময় ঐতিহ্যে মণ্ডিত করিল। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে এই গৌরবের অধিকারী তাঞ্জোর। তিরুমল নায়ক (এবং নায়ক রাজবংশ) কর্তৃক নির্মিত মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির সমগ্র ভারতে তেলুগু ভাষীদের গৌরব ঘোষণা করিলেও, সাহিত্যের দিক হইতে স্বর্ণপ্রসূ—তাঞ্জোর। সুপ্রাচীন চোলরাজাদের কাল হইতে এই কাবেরীধৌত ভূমি মৃৎ-শক্তি ও চিৎ-শক্তিতে গরীয়সী। তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রামভক্ত কবি কম্বন্ জন্মিয়াছিলেন এই কাবেরী নদীর তীরে। তেলুগু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রামভক্ত কবি ত্যাগরাজও এই কাবেরীর সন্তান। কাবেরী দাক্ষিণাত্যের সরযূ।

১ Kshetraya is the architect of this form (padam) and it reached its perfection in his hands. He is rightly called the father of the modern padam. P. Sambamoorthy—History of Indian music p. 65

১৫৬. অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঞ্জোর জেলার তিরুবারুর্ গ্রামে প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হন তিনজন ভক্তকবি—শ্যামা-শাস্ত্রী (১৭৬২-১৮২৭), মুত্তুস্বামী দীক্ষিতর্ (১৭৭৬-১৮৩৫) এবং ত্যাগরাজ (১৭৬৭-১৮৪৭)। ইঁহারা একাধারে কবি ও সুরকার। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঞ্জোর একটি প্রধান গীতকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইলেও এই সংগীত-ত্রিমূর্তির (তামিলে 'সংগীত মুম্মণিকল্') সাধনার ফলেই দাক্ষিণাত্যের সাংগীতিক মানচিত্রে তাঞ্জোর উজ্জ্বলতম হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের আবির্ভাবে কর্ণাটকী সংগীত সাধনায় এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।[১] ত্যাগরাজ ইঁহাদের মধ্যমণি।

১৫৭. রসভাবের দিক হইতে ইঁহারা দাস্য ও সখ্যভাবের উপাসক। ত্যাগরাজে দাস্য-ভক্তি, শ্যামাশাস্ত্রীর রচনায় সখ্যভক্তি এবং মুত্তুস্বামী দীক্ষিতর্-এর কবিতায় দাস্য ও সখ্যের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভক্তিসাহিত্যে যাঁহারা মধুর-রসের সন্ধানী তাঁহারা এই ত্রিমূর্তির রচনায় শৃঙ্গার-মাধুর্যের আপেক্ষিক অভাব দেখিয়া হতোদ্যম হইতে পারেন, কিন্তু এই সত্যটিকে ভুলিলে চলিবে না যে দক্ষিণী ভক্তচিত্ত ইঁহাদের কীর্তন শ্রবণে যেমন রোমাঞ্চিত ও রসাপ্লুত হইয়া উঠে এমন আর কিছুতে নয়। ইঁহাদের ভক্তি সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অতীতের শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতির সম্প্রদায়-গত ভেদবুদ্ধি হইতে ইঁহারা মুক্ত। ভক্তি-পূত পুণ্য-মন্দিরে এই কবিরা সকল দেবতাকে ঠাঁই দিয়াছেন। অথবা বলিতে পারি, পূর্ব-পূজিত সকল দেবদেবীর মধ্যে ইঁহারা সেই একই পরমেশ্বরের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। শ্যামাশাস্ত্রী বিশেষভাবে বলিয়াছেন হিম-গিরিসুতা অম্বিকার কথা, ত্যাগরাজ করিয়াছেন রামগুণকীর্তন।

১ With the appearance of the musical trinity on the horizon of South Indian music a new chapter in the history of musical composition begins. Ibid. p. 32.

কিন্তু কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুগামী হইয়া তাঁহারা ইহা করেন নাই। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নাম ভক্ত, সাধনার নাম ভক্তি। মুত্তুস্বামী দীক্ষিতর্ তো সর্বদেবদেবীর বন্দনা গাহিয়াছেন। তাঁহার রচনায় গণেশ-কার্তিক-শিব-দুর্গা-কমলা-রাম-কৃষ্ণ সকল দেবতার সন্ধান পাই। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভক্তিই পরমা গতি, ভক্তিই পরমা মুক্তি, ভগবান তাহার আশ্রয় মাত্র।

কবিত্রয়ের রচনাশৈলী ও সুরপদ্ধতি এক প্রকৃতির নয়। মুত্তুস্বামীর রসাস্বাদন একটি কঠিন ব্যাপার, শ্যামাশাস্ত্রী অপেক্ষাকৃত সহজ, আর ত্যাগরাজের রচনা সরলতম—এই কথাটি বুঝাইবার জন্য দক্ষিণীদের মধ্যে এই মর্মে একটি উক্তি প্রচলিত আছে যে, মুত্তুস্বামী নারিকেল-তুল্য, শ্যামাশাস্ত্রী কদলীর সমান এবং ত্যাগরাজ দ্রাক্ষারস। মুত্তুস্বামীর অধিকাংশ পদ সংস্কৃতে রচিত। কোনো কোনো পদে তিনি মণিপ্রবালম্ (মিশ্ররীতি) ব্যবহার করিয়াছেন—উহার কিছুটা তামিল, কিছুটা তেলুগু, কিছু অংশ বা সংস্কৃত। শ্যামাশাস্ত্রী তেলুগু ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ত্যাগরাজের অধিকাংশ পদের ভাষা তেলুগু। রচনার উৎকর্ষে ও পরিমাণে ত্যাগরাজ অবশ্যই শীর্ষস্থানীয়।

১৫৮. শ্যামাশাস্ত্রীর প্রথম রচনা—জননি নটজনপরিপালিনি পাহি মাং ভবানি। দীক্ষিতর্ ও ত্যাগরাজের মতো অধিক সংখ্যায় শিষ্যসেবক না থাকায় এবং ত্যাগরাজের ন্যায় সহজ সরল ভাষায় লিখিতে না পারায় শ্যামাশাস্ত্রীর প্রচার খুবই সীমাবদ্ধ। তাঁহার রচনা জনপ্রিয় না হইতে পারার অন্যতম কারণ রাগ ও তালের দুরূহতা। ওস্তাদ গায়কের পক্ষেও শ্যামাশাস্ত্রীর গান গাহিতে পারা রীতিমত গর্বের বিষয়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শ্যামাশাস্ত্রীর রচনা যে অপরিচিত তাহার প্রধান কারণ, আমাদের মনে হয়, তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদের এক অদ্ভুত সংকীর্ণ বুদ্ধি। গুরুদেবের গান প্রচারিত হইলে তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে এই অবিশ্বাস্য

মনোভাবই শ্যামাশাস্ত্রীর রচনাকে জনসাধারণের অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছে।

১৫৯. দীক্ষিতর্ দক্ষিণভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমাকালে সেই সমস্ত তীর্থ-দেবতার বন্দনা-গীত গাহিয়াছেন দেবভাষায়, ক্বচিৎ কখনও মিশ্রভাষায়। কমলা-অম্বিকা-অভয়া জননীরূপে বন্দিতা। মিশ্রসংস্কৃতে তাঁহার রাম-বন্দনার একটি পদ এইরূপ—

শ্রীরামচন্দ্রো রক্ষতু মাং রাক্ষসাদিহরো রঘুবরঃ ॥
ভরতাগ্রজো কৌশিকযাগরক্ষকো তাটকান্তকঃ ॥
মিথিলানগর প্রবেশমহেশ্বর ধন্নুর্ভেদকো
সীতাকল্যাণমহোৎসববৈভবযুতচিত্রবেষকো
মাধুর্যগানামৃতপানপ্রিয়গুরুগুহবিশ্বাসো
মহাদেবীভক্তপরশুরামগর্বহরোল্লাসঃ ॥

গোপিকাবসন্তম্ রাগে গেয় কৃষ্ণবন্দনার একটি পদ এই—

বালকৃষ্ণং ভাবয়ামি বলরামানুজং বসুদেবজম্ ॥
নীলমেঘগাত্রং স্তুতিপাত্রং নিত্যানন্দকন্দং মুকুন্দম্ ॥
কমললোচনং কর্মমোচনং কপটগোপিকাবসন্তং
অমরার্চিতচরণং ভবতরণং অর্জুনসারথিকরুণানিধিং
মমতারহিতং গুরুগুহবিহিতং মাধবং সত্যভামাধবং
কমলেশং গোকুলপ্রবেশং কংসভঞ্জনং ভক্তরঞ্জনম্ ॥

দক্ষিণের ভক্তি-সংগীতে ত্রি-মূর্তির নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হইলেও মুত্তুস্বামী ও শ্যামাশাস্ত্রীর তুলনায় ত্যাগরাজ ছিলেন দুর্লভ ঐশ্বর্যের অধিকারী। এই সাধক-কবির রচনায় সংগীত, সাহিত্য ও ভক্তি এমন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাঁহাকে আমরা বিনা দ্বিধায় 'ভক্তিরসরাজ ত্যাগরাজ' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। তেলুগু ভক্তিসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফল এবং কর্ণাটকী সংগীত সাধনার শ্রেষ্ঠ নাম—ত্যাগরাজ।

(তিন) ভক্তিরসরাজ ত্যাগরাজ

১৬০. ভারতীয় ভাষাভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তেলুগু ভাষার মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া উহার নাম দিয়াছেন—প্রাচ্য দেশের ইতালিয়ান্। তামিল কবি ভারতী তাঁহার 'ভারতদেশম্' নামক কবিতার এক জায়গায় বলিয়াছেন, সিন্ধু নদীর বুকে জ্যোৎস্নাফুল্ল রজনীতে তিনি যখন কেরল সুন্দরীদের সহিত নৌবিহার করিবেন তখন তাঁহার কণ্ঠে থাকিবে সুমধুর তেলুগু সংগীত। ইহা হইতে তেলুগু ভাষার কান্ত-কোমল স্বাভাবিক মাধুর্যের কথা বুঝা যাইবে। অন্যদিকে ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে তামিলনাডের ঐতিহ্যও ভুলিবার নয়। তাহার কাবেরী-তাম্রপর্ণী আজও বহন করিয়া চলিয়াছে সুপ্রাচীন ভক্ত কবিদের স্মৃতি। এইরূপ ভক্তি-পূত মৃত্তিকার সহিত মধুর তেলুগু ভাষার সংযোগ ঘটিলে যে কিরূপ অমৃত ফল ফলিতে পারে, তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ত্যাগরাজ (১৭৬৭-১৮৪৭)।

১৬১. সাধনা, কবিত্ব ও গীতনৈপুণ্যে তাঞ্জোরের এই তেলুগু ব্রাহ্মণ যাহা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল আন্ধ্র প্রদেশের নয়, সমগ্র দাক্ষিণাত্যের অনুপম সম্পদ্। ত্যাগরাজের কিছু রচনা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ, কিছু সংখ্যক পদের ভাষা তেলুগুমিশ্র সংস্কৃত, কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং অধিকাংশ পদ রচিত হইয়াছে মাতৃভাষায়। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হওয়া সত্ত্বেও ত্যাগরাজের পদাবলী যে দক্ষিণাবর্তে এতটা জনপ্রিয় তাহার প্রধান কারণ, বোধ করি, তাহার সুর গৌরব। সংগীত-বিশেষজ্ঞদের মতে কর্ণাটক সংগীত ত্যাগরাজের কণ্ঠে মহত্তম রস-রূপ লাভ করিয়াছে।[১] এখন পর্যন্ত

১ The period of Tyagaraja is the brightest epoch in the history of Karnatic Music. P. Sambamoorthy, History of Indian Music.

ত্যাগরাজই উক্ত গীতধারার শ্রেষ্ঠ সুরকার।[১] এইরূপে সংগীত, সাহিত্য ও ভক্তিরসের মধুর সংমিশ্রণে ত্যাগরাজের রচনা ভক্তজনের পরম আদরের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। আলোয়ারদের কণ্ঠে তামিল ভাষায় যাহার সূচনা, ত্যাগরাজের কণ্ঠে তেলুগু ভাষায় তাহার সার্থক পরিণাম।

১৬২. ত্যাগরাজের রচনাবলীর মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করিতে হয় তিনখানি গেয়নাট্য বা গীতাভিনয়ের কথা—সীতারাম বিজয়ম্, প্রহ্লাদ-ভক্তি বিজয়ম্ এবং নৌকাচরিত্রম্।

সীতারাম বিজয়ম্ অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত রচনা। রামের উত্তর চরিত অবলম্বনে লিখিত এই গেয়-নাট্যের একখানি গান এইরূপ: হে রাম, তুমি যে এই মহত্ত্ব অর্জন করিয়াছ তাহা কেবল আমাদের জানকীকে বিবাহ করিয়া। তাহারই ফলে তুমি রাবণজয়ী রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছ। জানকী তোমার সঙ্গে বনে গেলেন, অগ্নি পার্শ্বে তাঁহার নিজস্ব কায়া রাখিয়া রাবণের সঙ্গে গেলেন মায়ারূপ ধারণ করিয়া। অশোক বনে তিনি যে রাবণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে (কোপদৃষ্টি দিয়া) বধ করেন নাই তাহা কেবল তোমাকে শত্রুজয়ের গৌরব দানের জন্য।[২]

প্রহ্লাদ ভক্তি বিজয়ম্ পঞ্চাঙ্কে সম্পূর্ণ দীর্ঘতম নাটক। ইহাতে গান আছে ৪৫ খানি। গল্পাংশ এইরূপ:

সর্পবন্ধনে বাঁধিয়া প্রহ্লাদকে ফেলিয়া দেওয়া হয় সমুদ্রে। জলাধিপতি মহাযোগী প্রহ্লাদের সংস্পর্শে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া

১ Tyagaraja is the greatest name in the history of modern South Indian music... He has shed lustre on South Indian music by his melodious and soul-stirring compositions. ....Tyagaraja is the greatest composer of the modern period. P. Sambamoorthy—Great Composers, Book II.

২ মা জানকি চেট্টবট্টগ-মহারাজ বৈতিবি॥ ইত্যাদি

তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। গরুড়ের কাছে প্রার্থনা জানাইতে গরুড় আসিয়া প্রহ্লাদকে সর্প-বন্ধন হইতে মুক্ত করে। অতঃপর প্রহ্লাদ কর্তৃক সমুদ্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন (১ম অঙ্ক)। ভগবানের কাছে প্রহ্লাদের নিরন্তর প্রার্থনা। একটি পদে রামরূপী ঈশ্বরের বন্দনা এইরূপ : হে সেতু-বন্ধন ভক্তচন্দন রঘুনন্দন রাম। আমি কি তোমার অপরিচিত ? তুমি কি আমার এই দুর্দশায় আনন্দ পাও ? হে রমাহৃদয়বাসী, আমাকে আশীর্বাদ করা কি তোমার পক্ষে ভার-স্বরূপ ? তোমার কীর্তি কথা শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি এবং তোমাকে উপস্থিত হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। তোমার প্রতি আমার যে ভক্তি তাহা বিসর্জন দিয়া আমি অপরের কাছে ভিক্ষা করিব না। তুমি আসিয়া আমাকে বর দাও। হে মুনিবন্দিত রাম। ইহা কি তোমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ? অথবা আমাকে আশীর্বাদ করার মতো কাজকে তুমি হেয় মনে করো ? তোমার নাম নিত্য মঙ্গলদায়ী। হে করুণাসাগর, তুমি এস।[১] নারদ আসিয়া বলিলেন, বৈকুণ্ঠলোক হইতে হরি শীঘ্রই প্রহ্লাদকে দর্শন দিবেন (২য় অঙ্ক)। প্রহ্লাদ একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর-বন্দনায় রতঃ যে নয়ন সর্পশয়ন প্রভুর সৌন্দর্য দেখিল না সেই নয়নের কী প্রয়োজন ? যে দেহ সেই নীলসমুদ্রকান্তি শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিতে পারিল না তাহা তো পিঞ্জরের তুল্য। পদ্ম তুলসী প্রভৃতি দিয়া যে হাত তাঁহার পূজা করিতে পারিল না সেই হাত থাকা না থাকা সমান। যে রসনা ত্যাগরাজ-রক্ষক রামমূর্তির স্তুতিগান করিল না সেই রসনার কোনো সার্থকতা নাই। সেই ব্যক্তির সূত্র মালিকা পরিধানও নিরর্থক।[২] এমন সময়ে শ্রীহরি আসিয়া প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন (৩য় অঙ্ক)। চতুর্থ অঙ্কে হরি-প্রহ্লাদ সংবাদ। পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে হরি বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাওয়ার

১ বন্দনমু রঘুনন্দন সেতুবন্ধন ভক্তচন্দন রাম ! ··

২ এন্নগ মনসুকুন্নানি পন্নগশায়ি সোগসু

সংকল্প জানাইলে প্রহ্লাদের ভক্ত হৃদয় এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল : আমাকে একা ফেলিয়া তুমি যাইও না। অর্ধনিমেষের জন্যও আমি তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি না। ডুবুরী যেমন শ্বাস বন্ধ করিয়া সমুদ্রে ডুব দিয়া মুক্তা পায় তোমাকে আমি সেইরূপ পাইয়াছি। আমি যেন সূর্যের প্রখর কিরণ হইতে কল্পতরুর ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছি। ভূমি-খননকারী যেমন ধনভাণ্ড লাভ করে, আমিও সেইরূপ তোমাকে পাইলাম। আমাকে তুমি রক্ষা কর। এই দেহ তোমারই সম্পত্তি।[১] হরির অন্তর্ধানের পরে প্রহ্লাদের গীত—আমি কিরূপ পাপ করিয়াছি যে প্রভু আমার সঙ্গে নাই? আমি এখন কী করিব? কিরূপে ইহা সহ্য করিব? দুঃখ-হরণ হরিকে একবার দেখিলে আর কি তাঁহার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করা যায়? প্রথমে আমাকে স্নেহ দেখাইয়া এখন কি তিনি বঞ্চনা করিলেন? সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আমি এখন যন্ত্রণা ভোগ করিব ইহাই কি আমার বিধিলিপি? আমি আমার প্রভুকে দেখিতে পাই না। জীবন দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া শেষে ইহাই আমার ভাগ্যে ছিল![২] প্রহ্লাদের পুনঃপুনঃ আবেদনের ফলে হরি আবার আসিয়া দর্শন দিলেন, এবার অবশ্য লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া। এইরূপে প্রহ্লাদের ভক্তি ফলপ্রসূ হইল।

ত্যাগরাজের সর্বাধিক জনপ্রিয় গেয়নাট্য নৌকাচরিত্রম্। পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই একাঙ্ক নাটকখানির বিষয়বস্তু মোটামুটি বাংলা-দেশের সুপরিচিত 'নৌকা বিলাস' পালাকীর্তনের সগোত্র। গল্পাংশ এইরূপ—একদিন সন্ধ্যায় গোপীরা কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়া যমুনার তীরে আসিয়া দেখিতে পায় একখানি সুন্দর নৌকা। নৌবিহারের সংকল্প করিয়া তাহারা বালক কৃষ্ণকে সঙ্গে লইবে কিনা এই বিষয়ে বলাবলি করিতে লাগিল। "কৃষ্ণ বালকমাত্র, জল

১ নন্নু বিডচি কদলকুরা রাময়্য বদলকুরা।

২ এন্ত পাপিনৈতি নেমি সেয়ুদু হায়েলাগু দালুদুনে ও রাম!

কেলিতে অনভিজ্ঞ" ইত্যাদি মন্তব্য শুনিয়া কৃষ্ণ বলিয়া উঠিল—তোমরা কি আমার ক্ষমতার কথা জান না? তোমরা কি জান না বেদে বলিয়াছে আমাকে ছাড়া পৃথিবীর কোনো কিছুই ঘটে না? এই লইয়া গানের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে বেশ রসালো বচসা হইল। অবশেষে কৃষ্ণসহ গোপীদের নৌবিহার। মনোহর সন্ধ্যায় সেই মনোহর নৌ-বিলাসের আনন্দ ব্যক্ত হইয়াছে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম গানে। বহুরূপী কৃষ্ণ একই সময়ে সকল গোপীর সঙ্গে ক্রীড়া করিলে তাহারা নিজেদেরকে ভাগ্যবান্ বলিয়া গাহিতে থাকে। কৃষ্ণও গোপীদের রূপের প্রশংসা করে। তখন গোপীরা বলিল—সকল মানুষই নারী সৌন্দর্যের বশীভূত। হে কৃষ্ণ! তুমিও তাহাদেরই দলে। এই ভাবে রূপ-যৌবনের অহঙ্কারে গোপীরা মত্ত হইয়া উঠিলে কৃষ্ণ তাহাদের শিক্ষাদানের জন্য মায়াবলে ঝড়ের সৃষ্টি করিল। ভীত নারীদের কাতর আর্তনাদে সে তাহাদের অঙ্গ হইতে বস্ত্র অপসারণের আদেশ দিলে (বস্ত্র কি কামনা-বাসনার প্রতীক?) গোপীরা সম্পূর্ণরূপে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঝড় থামিলে দেখা গেল গোপীরা যমুনার তীরে অবস্থিত।

ত্যাগরাজ এই গেয়নাট্য রচনায় বিশেষ শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। ভাগবত-বহির্ভূত এই লৌকিক কাহিনীর পরিকল্পনার জন্য তিনি বোধ করি বাংলাদেশের নিকট ঋণী। ভাগবতের বস্ত্রাপহরণ এবং রাসলীলার প্রসঙ্গও তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে।

১৬৩. তিনখানি গীতাভিনয় রচনা করিলেও ত্যাগরাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার পদ সমূহ—দাক্ষিণাত্যে যাহা 'কৃতি' নামে পরিচিত। ত্যাগরাজের এই কৃতি বা পদগুলি বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের জন্য ধারাবাহিক রূপে বা পালা আকারে রচিত হয় নাই। তাঁহার অধিকাংশ রাম ভক্তিবিষয়ক হইলেও সেগুলির মধ্যে রামায়ণের কাহিনী অনুসরণের কোনো চেষ্টা নাই। নানা পদে বিক্ষিপ্তরূপে

লক্ষ্মণ-জানকী-ভরত-হনুমান্-রাবণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ থাকিলেও কোনো ক্ষেত্রে (যেমন প্রহ্লাদভক্তিবিজয়ম্ নাটকে) 'রাম' বলিতে তিনি দশরথ-পুত্রকে বুঝাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কবীরদাস প্রভৃতি সন্ত কবি যেমন পরব্রহ্ম অর্থে রাম, হরি, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, ত্যাগরাজের পদেও আমরা কখনো কখনো সেই প্রবণতা লক্ষ্য করি।

১৬৪. কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ত্যাগরাজের ভক্তি ও রামভক্তির প্রেরণা আসিয়াছিল অন্য দিক হইতে। পূর্বসূরিদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকারে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'এন্দরো মহানুভাবুলন্দরিকি বন্দনমু' পদটি স্মরণীয়। কবির বক্তব্য এই যে, তাঁহার পূর্বে কত কত মহানুভব জন্মগ্রহণ করিয়া ধরণীকে পূত পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে নমস্কার। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়পদ্মে প্রভুকে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়াছেন, সামগানপ্রিয় প্রভুর লাবণ্য দর্শনে তাঁহারা ধন্য। কত ভক্ত সেই মানস-অরণ্যচারীর দর্শন পাইয়াছেন, কত ভক্ত তাঁহার পদযুগলে সঁপিয়া দিয়াছেন চিত্ত কমল, কত ভক্ত স্বরলয়রাগে গুণগান করিয়াছেন সেই পতিত-পাবনের। নারদ প্রহ্লাদের ন্যায় কত পরমভাগবত, কত মুনিবর! প্রভুর নাম-বৈভব-শক্তি পরাক্রম-প্রশান্তির কত গায়ক! আরও কত যাঁহারা ভাগবত রামায়ণ গীতা বেদ-শাস্ত্রে-পুরাণের মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, যাঁহারা ভাব-রাগলয় সমৃদ্ধ গীত সাধনায় আয়ুষ্মান্—যাঁহারা ত্যাগরাজের বন্ধু। আরও কত ভক্ত পরিপূর্ণ প্রেমে শ্রীরামচন্দ্রের নাম অনুধ্যান করিয়া ত্যাগরাজ-বন্দিত সেই প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে বন্দনা করি—এন্দরো মহানুভাবুলন্দরিকি বন্দনমু।

'প্রহ্লাদ ভক্তি বিজয়' নাটকে কবি যাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন, সেই তালিকায় আমরা প্রথম নাম পাই তুলসীদাসের। উত্তর

ভারতের এই শ্রেষ্ঠ রামভক্তের মূল কৃতির সহিত ত্যাগরাজ কতটা পরিচিত ছিলেন জানি না, কিন্তু সর্বাগ্রে তাঁহার নামোল্লেখ হইতে ত্যাগরাজের মনোভাব কতকটা বুঝা যাইবে। তুলসীদাসের পরে যাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন তাঁহাদের তালিকা এইরূপ—পুরন্দর দাস, ভদ্রাচল রামদাস, নামদেব, জ্ঞানদেব, জয়দেব, তুকারাম, নারায়ণ তীর্থ। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানদেব (জ্ঞানেশ্বর), নামদেব ও তুকারাম মরাঠী ভক্ত, জয়দেব বাঙালী, পুরন্দর দাস কর্ণাটকের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কবি, সংস্কৃত গেয়নাট্য কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণীর রচয়িতা নারায়ণ তীর্থ এবং কবি ভদ্রাচল রামদাস আন্ধ্র-সন্তান। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে রামভক্ত কবি একমাত্র ভদ্রাচল রামদাস। পুরন্দর দাস এবং তৎসহ কনকদাস প্রভৃতি পুরোগামী কন্নডিগ বৈষ্ণব কবিদের রচনা হইতে ত্যাগরাজ যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছিলেন বলা হইলে তাঁহার ভক্তি এবং বিশেষ ভাবে রামভক্তির উৎস-সন্ধান শেষ হইয়া যায় না। বস্তুত ত্যাগরাজ তাঁহার পূর্বগামী সকল ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্যের সুফল।

তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত[১] হইতে জানা যায়, তাঁহার মা সীতাম্মা (সীতাদেবী) ভালো গান জানিতেন। এবং শৈশব হইতে ত্যাগরাজ তাঁহার মায়ের কণ্ঠে অন্নমাচার্য, পুরন্দর দাস প্রভৃতি ভক্ত মহাজনের পদাবলী শোনার সুযোগ লাভ করেন। তেলুগুর শ্রেষ্ঠ ভাগবতকার পোতানা সম্পর্কে ত্যাগরাজের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তেলুগুভাষী সংস্কৃত কবি নারায়ণ তীর্থের "কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী"র কোনো কোনো পদ ত্যাগরাজের তেলুগু পদের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে রাধা-কল্যাণ, রুক্মিণী-কল্যাণ ও সীতা কল্যাণের বার্ষিক উৎসবগুলিতে নারায়ণ তীর্থের ভজন সংগীত একটি অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠান। সুতরাং অতি স্বাভাবিকভাবেই ত্যাগরাজের "গিরিরাজ

১ Great Composers (Book II)—P. Sambamoorthy.

সুতা-তনয়", "বিনতা-সুত-বাহন", "রাগসুধারস" প্রভৃতি পদগুলিতে কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ত্যাগরাজের পদাবলীতে যে সকল রামকথার উল্লেখ রহিয়াছে তাহার সবগুলি বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতে মধ্যযুগে রামোপাসনার যে বৃহৎ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মূল প্রচারক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ রামানন্দ। এই রামায়ৎ সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ হইল অধ্যাত্মরামায়ণ। তাছাড়া আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, অগস্ত্য সংহিতা, রামগীতা, রাম সহস্রনাম, রামরহস্যোপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থাদির মধ্য দিয়া রাম-ভক্তির ক্রমবিস্তার ও ক্রম-বিকাশ হইতে থাকে। রূপ গোস্বামী যেমন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে কৃষ্ণ-ভক্তিকে একটা অলঙ্কার শাস্ত্র-সম্মত রূপদানের চেষ্টা করিয়াছেন, রাম-ভক্তি সম্পর্কে সেই কাজ করিয়াছেন বঘেল-রাজ বিশ্বনাথ সিংহ।[১] উত্তর ভারতে এই রাম-ভক্তি বিকাশের ধারা সম্পর্কে ত্যাগরাজ অবহিত ছিলেন বলিয়াই হিন্দীর শ্রেষ্ঠ রামায়ণকার তুলসীদাসকে তিনি প্রণাম জানাইয়াছেন।

১৬৫. দাক্ষিণাত্যেও বৈষ্ণবভক্তসম্প্রদায় হইতে শুরু করিয়া ত্যাগরাজের কাল পর্যন্ত নানাভাবে রামায়ণ-চর্চা ও রামভক্তির প্রসার ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তামিল ভাষার শ্রেষ্ঠ রামায়ণকার কাবেরী-তীর-নিবাসী কম্বনের প্রসঙ্গ মনে না আসিয়া পারে না। ত্যাগরাজও জন্মিলেন কাবেরী নদীর তীরে—তাঞ্জোরের তিরুবারূর্ গ্রামে। প্রসিদ্ধ শৈব কবি সুন্দরমূর্তির স্মৃতি-বিজড়িত এই ভূমির স্থানমাহাত্ম্য সম্পর্কে ত্যাগরাজ যে খুবই সচেতন ছিলেন তাহা বোঝা যায় তাঁহার রচনা হইতে। "মুরি পেমুগলিগেগদা" পদটিতে কবি কাবেরী-ধৌত শিব-কাঙ্ক্ষিত মলয়-মারুত-সেবিত সাম-গান-মুখরিত চোল দেশের জয়গান করিয়াছেন। আর একটি পদে (সারি বেডলিন ঈ

[১] V. Raghavan—The Spiritual Heritage of Tyagaraja pp. 128-129

কাবেরিনি জূডরে) কবি সাবেরি-রাগে কাবেরী-বন্দনা করিয়াছেন এই ভাবে—ঐ দেখ, কাবেরী চলিয়াছে তাহার পতিগৃহে (সমুদ্রাভিমুখে), কখনো দ্রুতগামিনী, কখনো শান্তবাহিনী ; দুই তীরে কোকিলের গান শুনিতে শুনিতে মন্দিরে মন্দিরে দেব-প্রণাম করিয়া চলিয়াছে—কখনো পঞ্চনদেশ্বর, কখনো রঙ্গনাথের পায়ে। ব্রাহ্মণগণ দুই তীরে দাঁড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। ঐ দেখ, বিপ্র-বন্দিতা রাজরাজেশ্বরী চলিয়াছে তাহার পতিগৃহে।

এই পুণ্য ভূমিতে পুণ্য ঐতিহ্যের অধিকারী ত্যাগরাজ একটি পুণ্য পরিবেশে বর্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঈষৎ অগ্রবর্তী তেলুগু কবি ভদ্রাচল রামদাসের জীবন ও বাণী তাঁহার চিত্তে জাগরূক ছিল। একটি পদে (কলিগিয়ুন্টেগদা) ত্যাগরাজ বলিয়াছেন—তিনি যদি নারদ, প্রহ্লাদ, পরাশর ও রামদাসের ন্যায় রামপদ ভজনা করিতেন তবে তাঁহার করুণা-লাভ সম্ভব হইত। অন্য একটি পদে (ক্ষীরসাগর শয়ন) কবি রামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"আমি শুনিয়াছি, ধীর রামদাসকে তুমি বন্ধন-মুক্ত করিয়াছ" (ধীরুডৌ রামদাসুনি বন্ধমু-দীর্চিনদি বিন্নামুরা)। আর একটি পদে (এমি দোব বলুকুমা) আছে—"আমি যদি রামদাস হইতাম সীতাদেবী তোমাকে আমার সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন" (রামদাসু বলেনৈতে সীতা ভাম মন্দলিঞ্চুনু নীতো)।

ত্যাগরাজের যুগে অনেক সন্ন্যাসী ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য বেদান্ত-জ্ঞানের সঙ্গে নাদোপাসনাকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনি একজন গায়ক সন্ন্যাসী ছিলেন সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র যাঁহার "মানস সঞ্চর রে" গানখানির প্রতিধ্বনি শোনা যায় ত্যাগরাজের অনুরূপ একটি পদে।[১] ইহা ছাড়া মাতামহ, রামভক্ত পিতা রামব্রহ্মম্

১ V. Raghavan—The Spiritual Heritage of Tyagaraja. p. 6

এবং পিতৃবন্ধু উপনিষদ্ ব্রহ্মেন্দ্র (কাঞ্চীপুরের রামভক্ত সন্ন্যাসী) ত্যাগরাজের মানস-গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।[১] "রাম নী সমান মেবরু" এই পদের শেষে কবি রামকে সম্বোধন করিয়াছেন 'ত্যাগরাজের কুলদেবতা' বলিয়া—'ত্যাগরাজ-কুলবিভূষ'। 'পলুকবেমি নাদৈবমা' পদের একস্থানে বলিয়াছেন—"পিতামাতা ভক্তি দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন" (তল্লি তণ্ড্রি ভক্তিনোসগি রক্ষিঞ্চিরি)। আর একটি পদে "(ইন্নালু দয়রাকুন্ন) বলা হইয়াছে—"হে রাম, বাল্যকাল হইতে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করি নাই" (চিন্ননাট মুণ্ডি নিন্নে গানি নেনন্ন্যুল নম্মিতিনা ও রাম)। রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদের মন্ত্র হইতে লালন ফকিরের বাউলগান পর্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া বাংলাভাষার মধ্য দিয়া কাব্যে নবরূপ সঞ্চার করিয়াছেন, ত্যাগরাজ তেমনি বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে ভদ্রাচল রামদাসের গান পর্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া তেলুগু ভাষার মধ্য দিয়া ভক্তিসাহিত্যকে নবরসে গরীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছেন।

১৬৬. ভক্ত-কবি রূপে ত্যাগরাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই যে কথা মনে জাগে তাহা তাঁহার গীতি-শক্তি। গায়ক ও সুরকার হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত।[২] ত্যাগরাজের প্রত্যেকটি পদের সূচনায় রাগ ও তালের নির্দেশ দেওয়া আছে। ইহা হইতে তাঁহার সংগীত-প্রীতি কতকটা বুঝা যাইবে। অবশ্য

১ Upanishad Brahmendra, the well-known recluse of Kanchipuram, seems to have exerted the greatest influence on Tyagaraja in music as well as adoration of Rama's name.—The Spiritual Heritage of Tyagaraja. p. 7

২ Tyagaraja is the prince amongst composers...... Tyagaraja occupies the same position in Indian music as Beethoven in European music—P. Sambamoorthy—Great Composers (Book II).

রাগ-তালের উল্লেখ থাকিলেই কোনো রচনা গান হইয়া উঠে না, সুর-সংযোগে গাহিলেও না। আবার এমন সব কবিতা আছে যেখানে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ না থাকিলেও এবং সুরে গীত না হইলেও তাহার মধ্য দিয়া যথার্থ গীতরসের আস্বাদন পাওয়া যায়। ত্যাগরাজের রচনা সেই জাতীয়। তাঁহার পূর্বে দাক্ষিণাত্যে যে ভক্তি-সংগীত রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সাহিত্যভাবই প্রবল অর্থাৎ সেখানে কথার সাহায্যেই সকল কথা বলা হইয়াছে। ফলে সেই সকল ভক্তি-সংগীত ভক্তি-অংশে উৎকৃষ্ট হইলেও সংগীতাংশে তাহাদের উৎকর্ষ তত নয়। ত্যাগরাজের রচনায় সংগীত সেই মর্যাদা পাইয়াছে। কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানী সংগীতের সগোত্র নয় যে, সুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে গানের কথা তুচ্ছ হইয়া পড়িবে। বঙ্গদেশের কীর্তনের ন্যায় ত্যাগরাজের পদাবলীতে "কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন এক আশ্চর্য আকার ধারণ করিয়াছে। তাহাতে কাব্যও পরিপূর্ণ এবং সংগীতও প্রবল। মনে হয় যেন ভাবের বোঝাই-পূর্ণ সোনার কবিতা ভরা সুরের সংগীতে নদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে।"

১৬৭. ত্যাগরাজ যে কেবল ভালো গান রচনা করিয়াছেন তাহাই নয়, গানই তাঁহার প্রাণ। রবীন্দ্র-জীবন-সাধনায় গানের যে স্থান, ত্যাগরাজের ভক্তি-সাধনায় সংগীতের গুরুত্ব ততখানি। একটি পদে তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন : হে, দেব, আমি কোনো উদ্দেশ্য না লইয়া জন্মিয়াছি এরূপ মনে করিও না। আমার সেই সাধনার কথা তুমি কি জান না? সত্য বটে বাল্মীকি আদি মুনিরা তোমার গুণ কীর্তন করিয়াছেন ("তোমার সভায় কত যে গান কতই আছে গুণী") কিন্তু তাহাতে কি আমার আশা মেটে?[১] জীবন সায়াহ্নে উপনীত হইয়া তিনি আবার সেই

১ এপ্যানিকো জন্মিঞ্চিতিননি নন্নেঞ্চবলদু শ্রীরাম।

কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন : আমি সমস্ত অন্তর দিয়া সযত্নে তোমার আদেশ পালন করিয়াছি ("তোমার যন্ত্রে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি")। এখন তুমি দয়া করিয়া আমাকে আশীর্বাদ কর।[১] আর একটি পদে কবি বলিয়াছেন : প্রভু, তুমি রামরূপে অবতীর্ণ হইলে কেন ? সে কি অযোধ্যা-শাসনের জন্য না যুদ্ধ করিবার জন্য ? সে কি ভবরোগ হইতে মানুষকে মুক্তি দানের জন্য না যোগীদের সম্মুখে দর্শন-দানের জন্য ? আসলে ইহার কোনোটাই সত্য নয়। তুমি আসিয়াছিলে অন্য কারণে। যে ত্যাগরাজ শতরাগে তোমার জন্য গীতরত্ন মালিকা রচনা করিবে তুমি আসিয়াছিলে তাহাকে বর দিতে[২] ("পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা, সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা")। অন্য একটি পদে আছে : ভক্তিহীন কবিরা তোমার স্বরূপ মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারায় তুমি মোক্ষদায়ক দিব্য সংগীত রচনার প্রেরণা ও ক্ষমতা ত্যাগরাজকে দিয়াছ ? হে দাশরথি, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য[৩] ("চিরজীবন বইব গানের ডালা, এই কি তোমার খুশি ? আমায় তাই পরালে মালা সুরের গন্ধঢালা ?")

ত্যাগরাজ দেবর্ষি নারদকে গুরু পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কারণ নারদ ছিলেন প্রথম ভক্ত গায়ক। কখনও কখনও সেই সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ বোধ হইয়াছিল যে, কবি নারদকে 'ত্যাগরাজ-সখ' বলিতেও কুন্ঠিত হন নাই। নারদের প্রশংসায় কয়েকটি পদ রচিত হইয়াছে। তাহার একটি এইরূপ : হে গুরু রায়! পূর্বজন্মকৃত তপস্যার ফলে আজ আমি তোমার দর্শন পাইয়া ধন্য হইলাম। আমি তোমাকে সমস্ত অন্তর দিয়া খুঁজিয়াছি ; আজ আমার নয়ন সার্থক

১ দয়জুচুট কিঁদি বেলরা।............

২ এলাবতার মেত্তু কোণ্টিবি এমি কারণমু রামুডৈ ?

৩ দাশরথী নী ঋণমু দীর্পনা
দরমা ? পরমপাবন নাথ !..

হইল। তোমাকে সেবা করিয়া আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম, প্রভু।...হে গুরু রায়! হে ত্যাগরাজরক্ষক উজ্জ্বল বীণাকর সদ্‌গুরু।[১] আর একটি পদে কবি নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "গীত পদ্মের ভ্রমর" (শ্রীনারদ নাদসরসীরুহভৃঙ্গ)।

ত্যাগরাজের কল্পনায় গান কেবল ভক্তিমার্গের সহায়ক নয়, গানই মুক্তি। "গানের সুরে মুক্তি আমার ঊর্ধ্বে ভাসে"—এই মর্মে রচিত ত্যাগরাজের পদসংখ্যা কম নয়। একটি পদে বলা হইয়াছেঃ হে মন! স্বর-রাগ-সুধা-যুক্ত যে ভক্তি তাহাই স্বর্গ, তাহাই মোক্ষ।...জ্ঞানী মুক্তি পায় বহু জন্মের পরে। কিন্তু সহজ ভক্তির সহিত যাঁহার রাগ-জ্ঞান রহিয়াছে তিনি তো জীবন্মুক্ত।[২] অপর একটি পদে আছেঃ সংসারী হইলেও মানুষের আশঙ্কার কোনো কারণ নাই যদি সে বীণা বাদনের সহিত রাগ-তাল সমন্বিত হরি গুণ গান করিতে পারে (সংসারুলৈতে নেমৈয়্যা ইত্যাদি)। "নামোরলন্নু বিনি" পদটিতে ভগবানকে বলা হইয়াছে —"রাগস্বরযুত প্রেমভক্তজনরক্ষক।" অন্যত্র কবি বলিয়াছেনঃ সদ্‌ভক্তি ও সংগীতজ্ঞান যাহার নাই সে কি কখনও মোক্ষ লাভ করিতে পারে (মোক্ষমু গলদা...সাক্ষাৎকার নী সদ্‌ভক্তি সংগীত জ্ঞান-বিহীনলকু)? সংগীতজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ সাগরে যাহারা ভাসিতে পারে না, এই পৃথিবীতে তাহাদের দেহ ভার-স্বরূপ (আনন্দ-সাগর মীদনি দেহমু ভূমি ভারমু ইত্যাদি পদ)। সুতরাং হে মন, যে রাগসুধারস যাগ-যোগ-ত্যাগ-ভোগ সকলের ফল দান করিতে পারে তুমি তাহা পান করিয়া মত্ত হও। ত্যাগরাজ জানে, নাদ-ওঙ্কার-স্বর জ্ঞান যাঁহার আছে তিনি জীবন্মুক্ত।[৩] সংগীতের স্তুতি-বন্দনায় ত্যাগরাজ এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের

১ শ্রীনারদমুনী গুরুরায়! গ ণ্টিমেনাটি তপমো গুরুরায়!

২ স্বর-রাগ-সুধারসযুত ভক্তি স্বর্গাপবর্গমুরা ও মনসা......

৩ রাগসুধারস পানমু জেসি রাজিল্লবে মনসা!

অনন্ত গুণরাশির মধ্যে একটি গুণ এই যে, তিনি 'গীত-প্রিয়', সংগীতলোল', 'সামগানলোল', 'রাগ-রসিক', 'সপ্তস্বরচারী' ইত্যাদি। অবশেষে কবি সংগীতের মধ্যেই ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন: বেদ-পুরাণ-আগম-শাস্ত্রাদির আধার যে নাদসুধারস তাহা (রামের মধ্যে) সাকার হইয়া উঠিয়াছে। রাগ তাঁহার ধনু; সপ্ত স্বর সেই ধনু-র সপ্ত ঘণ্টা; দুর-নয়-দেশ্য তাহার ত্রি-গুণ; গানের গতি তাহার শর; আর সরস পদাবলী তাহার কথা। এইরূপে নাদসুধারস নরমূর্তি ধারণ করিল।[১]

১৬৮. বলা বাহুল্য, ত্যাগরাজ যে সংগীতের স্তুতি-বন্দনা করিয়াছেন তাহা সাধারণ সংগীত নয়। ভক্তিবিহীন যে সংগীত তাহা তো মানুষকে উন্মার্গগামী করিবে (সংগীতজ্ঞানমু ভক্তিবিনা সন্মার্গমু গলদে মনসা)। "সময়মু দেলিসি" এই পদে কবি বলিয়াছেন: যে পদে রাম গুণ কীর্তন নাই সেই পদ গীত না হইলে কিছু যায় আসে না। যে ব্যক্তির হৃদয়ে রাম ভক্তির উদ্রেক হইবে না, তাহার নরজন্ম গ্রহণ অনাবশ্যক।[২] হে রাম, তোমার গানই গান, তোমার পথই পথ—রাম নী পাটে পাট, রাম নী বাটে বাট ('রাম কোদণ্ড রাম' পদটি দ্রষ্টব্য)। এইভাবে ত্যাগরাজ যত গান গাহিয়াছেন, তাহার সর্বত্র রামভক্তি পরিব্যাপ্ত।[৩]

১৬৯. একদিকে সমস্ত জগৎ, উহার বিলাস, ঐশ্বর্য, নানাবিধ ভোগ্য পদার্থ; অন্যদিকে কবির আরাধ্য দেবতা। কবি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিতেছেন: হে মন, কোন্‌টি তোমার গ্রহণীয়? সত্য

---

১ নাদসুধারসম্বিলনু নরাকৃতিয়ায়ে মনসা

২ পদমু ত্যাগরাজনুতিনিপৈ গানিদি পাডিয়েমি পাডকুণ্ডিন নেমি॥
এদনু শ্রীরামভক্তিয়ু লেনি নরজন্ম মেত্তিয়েমি য়েত্তকুণ্ডিন নেমি॥

৩ ত্যাগরাজের গীতসংখ্যা প্রায় আটশত। The Spiritual Heritge of Tyagaraja গ্রন্থে সাড়ে পাঁচ শ' গীত সংকলিত হইয়াছে।

করিয়া বল, তোমার কী চাই—নিধি (সম্পদ্) না প্রভুর সন্নিধি (উপস্থিতি)? ইহাদের কোন্‌টি তোমার উপাদেয়? দধি-ক্ষীর-ননী-মাখনে তোমার রুচি, না দাশরথির সাধন-ভজন-রূপ সুধারসে? ইন্দ্রিয়-জয় গঙ্গা স্নানের তুল্য, বিষয়াসক্তি যেন কূপের কর্দম স্নান, ইহাদের কোনটি তোমার পক্ষে আনন্দদায়ক? তুমি কি মমতাবন্ধন-যুক্ত মানুষের স্তুতিরচনা করিবে, না প্রভুর মহিমা কীর্তন করিবে।[১] ইহার উত্তরও কবি দিয়াছেন: 'প্রভুই যখন আমার ধন-ধান্য-দেবতা, তখন দুর্মার্গগামী অধম মানুষের স্তুতি বন্দনার কোনো প্রয়োজন নাই।' এই পদটির ভাব ও প্রথম পঙ্‌ক্তি (দুর্মার্গচরাধমুলনু) ত্যাগরাজের পূর্বসূরি ভাগবতকার পোতানা-র "ইম্মনুজেশ্বরাধমুল-কিচ্চি" ইত্যাদি পদটির কথা স্মরণ করায় (দ্র° ১৩৫)। আরও পূর্ববর্তী তামিল বৈষ্ণব কবি নম্মালোয়ার্‌ও এই সুরে অনেক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ভক্তিসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ নামমাহাত্ম্য ও গুরু-মাহাত্ম্য বর্ণনা। বাহুল্য ভয়ে ত্যাগরাজের এই প্রসঙ্গ এখানে বর্জিত হইল। প্রকৃত ভক্তের পক্ষে বাহ্য পূজা-অর্চনার প্রয়োজন নাই, প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা একান্তই নিষ্ফল—এই মর্মে ত্যাগরাজের দু' একটি পদের কথা বলা হইতেছে। একটি পদে আছে: মনকে জয় করিতে না পারিলে কেবল ঘণ্টা বাজাইয়া ও ফুল ছড়াইয়া কী হইবে? দুর্মদ ব্যক্তির পক্ষে কাবেরী বা মন্দাকিনী-স্নানে লাভ কী? পত্নীর যদি উপপতি থাকে, তবে কি সোমযাজী স্বর্গ লাভের আশা করিতে পারে? (সোমযজ্ঞ পত্নীসহ আচরণীয়)। কামক্রোধের বশীভূত ব্যক্তিকে তপস্যাও রক্ষা করিতে পারে না।[২] বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান দিয়া যদি বিচার করিতে হয়, তবে তো মনুষ্যেতর বহু জীবজন্তুকে উচ্চতর আসন না দিয়া উপায় নাই।

---

২ নিধি চাল সুখমা? রামুনি সন্নিধি সেব সুখমা?

২ মনসু নিল্প শক্তি লেক বোতে মধুর ঘণ্ট বিরুল পূজয়েমি জেয়ুহু?

"বলমু কুলমু য়েল" এই পদে কবি ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন : কাক ও মাছ জলে ডুব দেয়, ইহা কি পবিত্র প্রাতঃস্নান? বক চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকে, ইহা কি দিব্য ধ্যান? ছাগল কেবল পত্রাদি ভক্ষণ করে, ইহা কি পুণ্য উপবাস? পাখীরা আকাশে বিচরণ করে, ইহারা কি চন্দ্র সূর্যের তুল্য? সাধারণ মানুষ সাধুর বেশে গুহায় থাকিলেই কি তপস্বী হইয়া যায়? অরণ্যবাসী বানর কি বানপ্রস্থ যাপন করে? জঙ্গম অর্থাৎ বীরশৈবের বেশ ধরিয়া মৌন থাকিলেই কি ভিখারী 'মৌনী' হয়? উলঙ্গ শিশু কি দিগম্বর সাধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে?[1]

প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রতন্ত্র জপতপ পূজাঅর্চনার কোনো আবশ্যকতা নাই। কারণ যে ব্যক্তি মনকে জয় করিতে পারে নাই, সে এই সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠানের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। আবার যিনি সংযতমনা, তাঁহার পক্ষেও মন্ত্রতন্ত্র নিরর্থক (মনসু স্বাধীনমৈন য়াখন্নুনিকি মরিমন্ত্র তন্ত্র মুলেল)। তবে কি দেবপূজায় গঙ্গাজল আসন শুদ্ধবস্ত্র গন্ধপুষ্প ধূপদীপ প্রভৃতি উপচারের কোনোই প্রয়োজন নাই? কবি তাহার উত্তর দিয়াছেন "পরিপালয় রঘুনাথ" পদটিতে : আমার দেহই তোমার পূজার মন্দির, আমার স্থিরচিত্ত তোমার স্বর্ণপীঠ। তোমার চরণধ্যানই গঙ্গাজল, তোমার প্রতি ভালোবাসাই শুভ বস্ত্র। তোমার গুণ-কীর্তনই চন্দন-গন্ধ, তোমার নাম-স্মরণই প্রস্ফুটিত পদ্ম। আমার অতীত জীবনের দুষ্কৃতি তোমার সম্মুখে ধূপ হইয়া পুড়িবে, আমার ভক্তি তোমার পূজার প্রদীপ হইয়া জ্বলিবে। আমার এই পূজার ফল তোমার নৈবেদ্য, এই পূজা-প্রসূত স্থায়ী আনন্দ তোমার তাম্বুল এবং তোমার দর্শনই তোমার আরতি।[2]

ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি যখন স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন কবি

১ নীটু কাকি মীমু মুনুগ নিরত মুদয় স্নানমা

২ তনুবে নীকন্নুবৈন সদনমৌরা রঘুনাথ

অনায়াসে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারেনঃ হে রাজীবলোচন, হে রাজরাজশিরোমণি, হে জীবনাশ্রয়, হে আমার তপস্যাজাত ফল, হে নয়নজ্যোতি! ইত্যাদি। এই জাতীয় অন্য একটি পদে (পাহি কল্যাণরাম পাবন গুণধাম) কবি বলিয়াছেনঃ তুমি আমার জীবনাশ্রয়, তুমি তপস্যার ফল; তুমি আমার মঙ্গলময়, তুমি দেহের বল; তুমি কুলসম্পদ্, তুমি চিদানন্দ; তুমি মনোহর, তুমি সন্তোষ; তুমি আমার জীবন-যৌবন-ভালোবাসা, তুমি ভাগ্য, তুমি বৈরাগ্য ইত্যাদি [১]

দিব্যশক্তির উপর যদি আমাদের এইরূপ বিশ্বাস থাকে তবে জীবন-সংগ্রামে উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই—এই মর্মে একটি পদে কবি বলিয়াছেনঃ হে অযোধ্যারাজপুত্র রামচন্দ্র, তুমি থাকিতে আমার চিন্তা কিসের? জগৎ জুড়িয়া একটি নাট্যাভিনয় চলিতেছে, আর সেই নাটকের সূত্রধার তুমি। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত।[২] রবীন্দ্রনাথের গানেও অনুরূপ আত্মসমর্পণ দেখিতে পাই ঃ

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।

ভক্তি এক ও অখণ্ড হইলেও তাহার লক্ষণ নানাবিধ। ভাগবতে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে নব-লক্ষণা ভক্তির কথা শুনাইয়াছিলেন।[৩] শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পদসেবা-অর্চনা-বন্দনা-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন—ত্যাগরাজের সংগীতে এই সমস্ত লক্ষণের পরিচয় থাকিলেও তাহার সর্বাঙ্গীন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভক্তি-

১ না জীবাধারমু না শুভাকারমু

২ মা কেলয়া বিচারমু মরুগন্ন শ্রীরামচন্দ্র!

৩ শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ৭।৫।২৩-২৪

সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ মাধুর্যভাব। ত্যাগরাজের পদাবলীতে ইহার কিছু অসদ্‌ভাব নাই। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত কবিরা যেমন যশোদা-কৃষ্ণ অবলম্বনে বাৎসল্য-রস এবং গোপীদের কাহিনী লইয়া শৃঙ্গার বা মধুর রস সৃষ্টির সুযোগ লাভ করেন, শিব-ভক্ত বা রাম-ভক্ত কবিদের সেই সুবিধা অল্প। ফলে কৃষ্ণসাহিত্যের তুলনায় রাম-সাহিত্য ও শিব-সাহিত্যে বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের আয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। হিন্দী সাহিত্যের সূরদাস যে বাৎসল্য-ধারার পরিচয় দিয়াছেন অথবা তেলুগু সাহিত্যের ক্ষেত্রয়্য যে শৃঙ্গার রসের প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছেন রামভক্ত কবি ত্যাগরাজে তাহা আশা করা যায় না। ত্যাগরাজের রচনায় বাৎসল্যের প্রচলিত রূপ (কবি=পিতা বা মাতা ; দেবতা =পুত্র) অপেক্ষা ইহার বিপরীত রূপের (দেবতা=পিতা ; কবি =শিশুপুত্র) পরিচয় বেশি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় পদকে বাৎসল্য রসের অন্তর্ভু ক্ত করিতে গেলে আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা। রসের দৃষ্টিতে ত্যাগরাজ মুখ্যত দাস্য রসের কবি। একটি পদে তিনি বলিয়াছেন : হে রাম, তুমি হনুমান্‌ ও ভরতকে যেমন নিকটে থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলে, আমাকেও সেইরূপ থাকিতে দিও। আমি প্রাণ মন দিয়া তোমার আদেশ পালন করিব, প্রভু। তোমাকে মুখে কিছু বলিতে হইবে না, তোমার মনে কোনো ইচ্ছা জন্মিবামাত্র আমি তাহা বুঝিতে পারিব। ভরতের ন্যায় আমাকে কেবল নিকটে রাখিয়া দিও।[১] আর একটি তেলুগু-মিশ্র সংস্কৃত পদে কবি বলিয়াছেন : আমি তোমার দাস। তোমাকে খুঁজিতেছিলাম। আমাকে তুমি রক্ষা কর ; আমার নিবেদন শোন! আমাকে তুমি ভুলিও না। পৃথিবীতে তোমার ন্যায় দেবতা আর নাই, ইহা বুঝিয়াই আমি তোমার শরণ লইয়াছি।—

---

১ চেন্তনে সদা য়ুঞ্চুকোবয়্য…

তবদাসোঽহং তবদাসোঽহং তবদাসোঽহং দাশরথে।
বরমৃদুভাষ বিরহিতদোষ নরবরবেষ দাশরথে।
সরসিজনেত্র পরম পবিত্র সুরপতি মিত্র দাশরথে?
নিন্নু কোরিতিরা নিরুপমশূর নন্নেলু কোরা দাশরথে!
মনবিনি বিন্নুমা মরব সময়মা ইনকুল ধনমা দাশরথে।
ঘনসমনীল মুনিজনপাল কনকদুকূল দাশরথে।
ধরনীবন্টি দেবমুলেদন্টি শরণন্নু কোন্টি দাশরথে।

ভক্তের জীবন-পথ বড়ো সহজ নয়; তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এক দিকে সে মানুষ, এই মর্ত্যের ধূলি-ধূসর জীব; আর এক দিকে সে দেবতা, দিব্য জ্যোতির প্রতিচ্ছায়া। ভূলোক হইতে দ্যুলোকের পথে মানবাত্মার যে অভিসার তাহা জয়-পরাজয়-আনন্দ-বিষাদের আলো আঁধারে বিচিত্র। যতক্ষণ না এই দ্বন্দ্বের অবসান, ততক্ষণ ভক্তের হৃদয়াকাশে ঔৎসুক্য-দৈন্য-হর্ষ-অমর্ষের মনোরম বর্ণ-সুষমা। ত্যাগরাজের কয়েকটি পদের সাহায্যে আমরা সেই বর্ণ-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাইব। একটি দৈন্য মূলক পদে কবি এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন: চপলচিত্ত আমি তোমার মনের কথা না জানিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর। তুমি তো বিশ্বের সকল জীবের পরিত্রাতা; সকলের দোষগুণও তোমার ভালো করিয়া জানা আছে। তৎসত্ত্বেও যে আমি তোমার গীতাঞ্জলি (কীর্তন শতক) রচনা করিয়া তোমার বিশেষ অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়াছি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।[১]

সর্বজ্ঞ ভগবানের কাছে আবেদন-পত্র পাঠাইবার কোনো প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু নীরবে অপেক্ষা করিলেই কি তাঁহার অনুগ্রহ পাওয়া যাইবে? এ সম্পর্কে কবিরও সংশয় ছিল। ভক্ত ভগবানের কাছে

১ অপরাধমুলন্নু নোর্ব সময়মু

যাইবে, না ভগবান্ আসিয়া ভক্তকে উদ্ধার করিবেন যেমন তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন গজেন্দ্রকে? কবি প্রশ্ন করিয়াছেন: মা কি পুত্রের কাছে যাইবে, না পুত্র মায়ের কাছে আগাইয়া আসিবে? বৎস কি ধেনুর কাছে যায়, না ধেনু বৎসের কাছে? শস্যক্ষেত্র কি মেঘের কাছে যায় জলপ্রার্থনার জন্য? প্রেমিক কি প্রেমিকার কাছে যায় ভালোবাসা জানাইতে? ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য আমি জানি না। তুমি আসিয়া আমার সংশয় নিরসন করিয়া তোমার সুন্দর মূর্তিখানি দেখাও।[১] ভক্তচিত্তে সর্বদা এই দৈন্য-ভাব দেখা যায় না। দেবতার কৃপা বর্ষণে বিলম্ব দেখিয়া কবি রুষ্ট হইয়া অভিযোগ করেন: আমি এতদিন তোমার দাসানুদাস হইয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার ফল হইল কী? বস্তুত গরীব ধার্মিকের জন্য তোমার ভালোবাসা নাই (নী দাসানুদাসুড ননি পেরেয়েমি ফলমু ইত্যাদি)। সত্যই যদি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা থাকিত তবে আমার এই পুনঃ পুনঃ ক্রন্দনে তোমার হৃদয় অবশ্যই বিগলিত হইত। হে সর্বান্তর্যামী, গজেন্দ্রের প্রার্থনা শুনিয়া তুমি ছুটিয়া গিয়াছিলে কেন? করুণাপরবশ হইয়া তুমি যে ধ্রুবের নিকটে গিয়াছিলে সে গল্প আমি শুনিয়াছি। প্রহ্লাদের জন্য তুমি যে নরসিংহ মূর্তি ধারণ করিলে তাহার কারণ কী? যে বনচর সুগ্রীব তাহার প্রতিশ্রুতি ভুলিয়াছিল, তুমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মহিমা অর্জন করিলে। আর সেই তুমি আমাকে উপেক্ষা করিতেছ। অতঃপর আমি আর কোনো কথা শুনিব না।[২]

দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাসের কথাও আছে। তিরুপতি পর্বতে যিনি বেঙ্কটেশ্বর, শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপে যিনি রঙ্গনাথ, যমুনাকূলে যিনি গোপীজনবল্লভ, তাঁহারা কিছু ভিন্ন নন। রাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে প্রকটিত। কবি পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন ('সীতানায়ক

---

১ তনয়ুনি ব্রোব জননি বচ্চুনো তল্লি বদ্দ বালুড়ু বোনো?....

২ মরি মরি নিন্নে মোরলিড নী মনসুন দয়রাহু

শ্রিতজন পোষক' পদটিতে): 'হে রাম, তুমি কি দরিদ্র ভক্তদের জ্বালাতনে অস্থির হইয়া পর্বতারূঢ় হইয়াছ? ভক্তজন সহজে তোমার কাছে যাইতে না পারে তাই কি তুমি কি শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপে বাসা বাঁধিলে? তোমার বানর-বেষ্টিত হইয়া থাকার কারণও বোধ করি তাহাই। কুচেল (কৃষ্ণের দরিদ্র সহপাঠী; কু চেল অর্থাৎ বসন যাহার) তোমার কাছে একদিন মথুরায় ভিক্ষা করিতে আসিবে এই কথা বুঝিতে পারিয়াই কি তুমি গোপীদের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলে?" এই জাতীয় প্রশ্নগুলি অসঙ্গত হইলেও নিতান্তই পরিহাস। অপর একটি পদে ("অডিগি সুখমু লেব্বরন্নু ভবিঞ্চিরিরা" ইত্যাদি পদে) পরিহাস-মিশ্র উক্তিগুলি বেশ একটু বেদনার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। কবি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন: হে প্রভু তোমার কাছে সুখের প্রার্থনা করিয়া কে কবে সুখ পাইয়াছে? তোমার অনুগতা সীতাকে বনবাসের কষ্ট ভোগ করিতে হইল। শূর্পনখা তোমাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার নাসিকা ছিন্ন হইল। নারদ তোমার মায়া বুঝিতে গিয়া স্ত্রীরূপে পরিণত হইল। দেবকী পুত্রলাভের আনন্দ পাইতে চাহিলে তুমি তাহা যশোদাকে অর্পণ করিলে। গোপীরা তোমাকে পতিরূপে পাইতে চাহিলে তুমি তাহাদের পতি ত্যাগ করাইলে। তোমার রহস্যের কথা আর কী বলিব?

ভক্তিসাহিত্যের শেষ কথা বিরহ-মিলন। এই পর্যায়ে নায়িকা পরকীয়া, কোথাও স্বকীয়া। ত্যাগরাজের পূর্বসূরি ক্ষেত্রয়্য পরকীয়া নায়িকা প্রসঙ্গে মধুর রসের চূড়ান্ত রূপ দেখাইয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি মধুরভাব ভক্ত ত্যাগরাজের মুখ্য ভাব নয়। "পিতৃ মাতৃহীনা বিবাহিতা বালিকা যেরূপ তাহার স্বামীকেই জানে, আমিও সেইরূপ তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তুমি কেন আসিতেছ না?"[১] কবির এই উক্তি হইতে বোঝা যায়, তিনি

১ চের রাবদেমির রাময়্য !......
তল্লি তণ্ড্রি লেনি বাল তন স্বধু গোরুরীতি ইত্যাদি

স্বকীয়া নায়িকারূপে প্রভুকে বরণ করিয়াছেন। সেই ভাবেই তিনি রঘুবরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন: আমাকে ভুলিয়া যাওয়া কি তোমার উচিত? নারীর পক্ষে কি পতির সঙ্গে পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা এবং অন্য স্বজনের তুলনা চলে? নারীর পরিধেয় মঙ্গল সূত্রের সঙ্গে কি অন্য অলঙ্কারের সমতা হয়? আমার পূর্ব জন্মের পুণ্যের ফলে তুমি আমার মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছ, আমি সেই আকাঙ্ক্ষা জনিত প্রেম বহন করিতেছি।[১]

পতির সঙ্গে মিলিত না হইতে পারার বেদনা একটি পদে প্রকাশ পাইয়াছে এইরূপে: হে রামাভিরাম, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি চঞ্চল। কিন্তু আমার প্রতি তোমার করুণা নাই। আমাকে এই দুঃখ দিয়া তোমার কী লাভ? আমার হৃদয়বাসিনী নারী তোমাকে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহার পাণি গ্রহণ করিতেছ না। আমি প্রেমভরে তোমার সেবা করিতেছি, কিন্তু তোমার আচরণ অন্যরূপ। আমার অদৃষ্টে কী আছে জানি না। হৃদয়ে তোমার শয্যা রচনা করিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহাতে উদাসীন থাকিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ। তোমাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তোমার উপর নির্ভর করিয়া আছি, আর তুমি আমার দোষগুণ বিচারে ব্যাপৃত। তোমার এইরূপ আচরণের সার্থকতা কী?[২]

অবশেষ মিলন। কবি সেই আনন্দের কথা বলিতেছেন: হে রাম, আমি তোমাকে কিরূপে পাইয়াছি জান? মানুষ যেমন একটা তুচ্ছ হারানো পয়সা খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ অমূল্য রত্ন পাইয়া যায়, সেইরূপ। অম্বলের প্রত্যাশা করিয়া যেমন অমৃত পাওয়া যায়, সেইরূপ। ক্লান্ত সাঁতারু হঠাৎ নৌকা পাইলে যে অবস্থা হয়, সেই-রূপ। তীর্থযাত্রী যেরূপ তীর্থে উপনীত হয়, সেইরূপ…ইত্যাদি।[৩]

১ রঘুবর! নন্নু মরব ভগুনা?……

২ রামাভিরাম রমণীয়নাম সমাজরিপু ভীম সাকেতধাম

৩ নন্নু ব্রোবকন্নু বিডবন্নুরা রাম!

আর একটি পদে ("রাম সীতারাম রাম রাজ") মিলনের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি দুইটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন এইভাবে —সতী নারী যেরূপ পতি সেবায় আনন্দ পায়, আমার মনও সেইরূপ তোমার উৎসবে উৎফুল্ল হয়। লতা যেভাবে কল্পতরুকে জড়াইয়া ধরে, আমার মনও সেইরূপ যুগ যুগ ধরিয়া তোমাতে সংলগ্ন রহিবে।[১] নিম্নলিখিত অংশটি ত্যাগরাজের মিলন পর্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ পদ। ইহার মধ্যে কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধুর পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে: তোমার প্রসাদবারি আমার দিকে প্রবাহিত হউক। আমার যে আনন্দ তাহা বর্ণনাতীত। যখন তোমার কথা ভাবি আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যখন তোমার দর্শন পাই, নয়ন বাহিয়া আনন্দাশ্রু নামিয়া আসে। তোমার চরণ আলিঙ্গন কালে আমি দেহ-সত্তা ভুলিয়া যাই। তুমি যখন কাছে থাক, আমি সমস্ত চিন্তামুক্ত। যখন তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, সমস্ত জগৎ আমার কাছে তৃণবৎ তুচ্ছ হইয়া যায়।[২]

ভক্ত কবি ত্যাগরাজের কাব্যকৃতির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, তাঁহার সৃজনী-শক্তির তুলনায় তাহা নিতান্তই অপর্যাপ্ত। সংগীতে ও কবিতায় যাহার পূর্ণতা, এমন একটি পদের অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ফেলিয়া আমরা তাহার নিরাভরণ রূপের সুরের সৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছি মাত্র, তাহাও আবার গদ্য ভাষান্তরে। এমন অবস্থায় কবির প্রতি সুবিচার হইতে পারে না।

১৭০. ভক্তিসাহিত্যের দিক হইতে দাক্ষিণাত্যকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা চলে—দক্ষিণ ও উত্তর অর্থাৎ দ্রাবিড় ও কর্ণাটক। আজ আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, 'ভক্তিসাহিত্য দ্রাবিড়ে উৎপন্ন

১ সৎসতি পতিসেব জেয়ুচন্দমুন না মনসু

২ দয়রাণী দয়রাণী দাশরথী রাম।

হইয়া কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা। এখানে কর্ণাটক বলিতে মধ্য-যুগীয় কর্ণাটক সাম্রাজ্যের কথা বলা হইতেছে, বর্তমানে যেখানে কন্নড ও তেলুগু ভাষার প্রচলন। ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেমন তামিল ভক্তিসাহিত্যের যুগ, দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তেমনি কর্ণাটকী ভক্তিসাহিত্যের যুগ। তামিল ভক্তিসাহিত্যের শৈব ও বৈষ্ণব শাখা যেমন প্রায় সমান্তরাল-ভাবে বহিয়া চলিয়াছিল, কর্ণাটকী ভক্তিসাহিত্যে কিন্তু তাহার অনুবৃত্তি ঘটে নাই। কর্ণাটকের কন্নড ও তেলুগু উভয় ভাষাতেই শৈবসাহিত্যের যুগ দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত প্রসারিত। অতঃপর বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাব। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাহার পূর্ণ প্রভাব।

১৭১. সংগীতের দিক হইতেও দ্রাবিড় ও কর্ণাটক এই দুই অঞ্চলের ভক্তিসাহিত্যের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তামিল সাহিত্যের শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধারার পদাবলী সমভাবে গীত হইত। কর্ণাটকী সাহিত্যের বৈষ্ণব-সাহিত্য যেমন গীতরূপ পাইয়াছে, শৈবসাহিত্যের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ শৈবসাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি। বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটা মুখ্য অংশ যেমন ভক্তচিত্তের বিচিত্র ভাবানুভূতি অবলম্বনে পদাকারে রচিত, শৈবসাহিত্যে আমরা তাহার আপেক্ষিক অভাব দেখিতে পাই। তেলুগু শৈবসাহিত্যের প্রধান গৌরব তাহার প্রবন্ধ কাব্যগুলি, যাহার গীতরূপ কল্পনা করা সুকঠিন। কন্নড শৈবসাহিত্যে ভক্তচিত্তের হর্ষ-বেদনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রকাশমান হইয়া গীতি-কবিতার সগোত্র রূপ লইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে তাহা গীতসাহিত্যের উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে নাই তাহার কারণ শৈবসাহিত্যের উৎকৃষ্ট রচনাগুলি বচন-সাহিত্য অর্থাৎ গদ্যবন্ধে রচিত।

১৭২. দাক্ষিণাত্যের যে নিজস্ব সংগীত-ধারা কর্ণাটকী সংগীত

নামে পরিচিত, আধুনিক কালে তাহাতে দক্ষিণের সব ক'টি ভাষার প্রবেশ ঘটিলেও ঐ সংগীতের নামকরণ হইতেই উহার তাৎপর্যটি বোঝা যাইবে। এই গীত-পদ্ধতির যাঁহারা প্রথম প্রবর্তক, যাঁহারা প্রথম পৃষ্ঠপোষক এবং যাঁহারা প্রথম বৈয়াকরণ, তাঁহারা সকলেই কর্ণাটকের অধিবাসী বলিয়া কালক্রমে ইহা কর্ণাটকী সংগীত নামে পরিচিত হইতে থাকে।

কর্ণাটকী সংগীতের সহিত কর্ণাটকী বৈষ্ণব-সাহিত্যের যোগ অবিচ্ছেদ্য। এই সংগীতের উদ্ভব ও বিকাশের সহিত আন্ধ্র (তেলুগু-ভাষী) ও কন্নডিগ (কন্নডভাষী) উভয় সম্প্রদায়ের সাধনা যুক্ত থাকিলেও, ইহা প্রধানত আন্ধ্র বৈষ্ণব কবিদের হাতেই অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। উদ্ভবের যুগে অবশ্য কন্নডিগ বৈষ্ণব কবি পুরন্দর দাসের দান সর্বাধিক স্মরণীয়। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, পুরন্দর দাস তাঁহার প্রথম যৌবনে বর্ষীয়ান্ তেলুগু বৈষ্ণব কবি অন্নমাচার্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।[১] কর্ণাটকী সংগীতের ক্ষেত্রে যে পল্লবি, অনুপল্লবি এবং চরণ (অস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারীর ন্যায়)[২]—এই ত্রিবিধ অংশকে 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস'কার শাম্বমূর্তি একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার সূচনা হয় পঞ্চদশ শতকের তেলুগু বৈষ্ণব কবি অন্নমাচার্যের হাতে।[৩]

১ অন্নমাচার্যের মৃত্যুকালে পুরন্দর ছিলেন ২৩ বৎসরের যুবক।

২ পল্লবি অনেকটা সূত্রের ন্যায়। এক পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট পল্লবিতে মূল কথার উপস্থাপনা। অনুপল্লবি হইল বৃত্তি—তাহাতে মূল কথার পরিবর্ধন। চরণ হইল ভাষ্য—তাহাতে বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ। দুই বা চার ছত্র লইয়া এক একটি চরণ। এক একটি পদে চরণ সংখ্যা এক হইতে ছয়-সাত পর্যন্ত হইতে পারে।

৩ P. Sambamoorthy—History of Indian Music (1960) p. 30

-ন্নমাচার্য যে 'তাল্লপাক' বংশের সন্তান, সেই বংশের আরও অনেক কবি তেলুগু কীর্তন রচনা করিয়া কর্ণাটকী সংগীতের বিকাশ-সাধনে সহায়তা করেন।

পুরন্দরদাস ব্যতীত কনকদাস, জগন্নাথদাস প্রভৃতি অন্যান্য কন্নডিগ বৈষ্ণব কবিগণ কর্ণাটকী সংগীতের সমৃদ্ধিকল্পে যে সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহার গুরুত্ব ও মূল্যের কথা স্মরণে রাখিয়াও আমরা বলিতে পারি আন্ধ্রের সাংগীতিক ঐতিহ্য মহত্তর। কর্ণাটকী সংগীতের উৎকর্ষ ও পরিমাণের আভাস পাইতে হইলে আমাদের তেলুগু ভাষার শরণাপন্ন হইতে হইবে। দাক্ষিণাত্যের ভক্তিসংগীতের একটা বৃহৎ অংশ হইল তেলুগু কীর্তন। কেবল তাহাই নয়, তেলুগু সংগীত যেমন ভাষার বন্ধন অতিক্রম করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাহার আসন পাতিয়াছে, এমন সৌভাগ্য উত্তর ভারতে হিন্দী বা হিন্দুস্তানী সংগীতও অর্জন করিয়াছে কিনা সন্দেহ। হিন্দী আর্যাবর্তের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তাহার সংগীতকে যে মহৎ মর্যাদা দিতে পারে নাই, তেলুগু দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক ভাষা হইয়াও তাহার সংগীতকে সেই গৌরব অর্পণ করিয়াছে। তেলুগুর সাংগীতিক ঐতিহ্য আজ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের সাংগীতিক ঐতিহ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এমন এক সময় ছিল যখন তেলুগু সংগীতের আদর্শ আন্ধ্রপ্রদেশের বাহিরে অন্যান্য ভাষা-ভাষীর মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের তেলুগু কবি ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রয়্যর সমকালেই আমরা ইহার পরিচয় পাই। তামিলনাডে তেলুগু সংগীত ও নৃত্যের যে বিশেষ চর্চা হইত ইহা একটি স্বীকৃত সত্য। ক্ষেত্রয়্য-র পদের অনুসরণে তামিল কবিরা পদ-রচনার সূত্রপাত্র করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু তাহা

১ (অধ্যাপক রাঘবনের মন্তব্য) In the Tamil country, where the Telugu dance ane music heritage was most carefully preserved, Tamil versions and Tamil padas also,

তেলুগু পদের ন্যায় স্থায়ী হইতে পারে নাই। তেলুগু পদের গীত মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া তামিল, কন্নড ও মরাঠী কবিরাও তেলুগু শিক্ষা করিয়া উহাতে পদরচনার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে নাই। একশত বৎসর আগে পর্যন্ত কাহাকেও দক্ষিণের গীত বিদ্যায় অধিকার অর্জন করিতে হইলে যত্ন করিয়া তেলুগু শিখিতে হইত।[১] ইহা বিশেষ করিয়া সম্ভব হইয়াছিল অষ্টাদশ শতকে তামিলনাড়ের মৃত্তিকায় সেই বিশিষ্ট তিন আন্ধ্র সন্তানের আবির্ভাবে—সংগীতের ইতিহাসে যাঁহারা 'ত্রিমূর্তি' বলিয়া পরিচিত এবং যাঁহাদের রচনা ও সুর-সাধনা আন্ধ্র তথা তেলুগু ঐতিহ্যকে অসামান্য গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে। সেই প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তির শ্রেষ্ঠ কবি ভক্তিরসরাজ ত্যাগরাজ।

১৭৩. তামিল বৈষ্ণব কবি নম্মালোয়ার সুদূর অতীতে একদিন হরিনামামৃতমত্ত ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"পোলিক পোলিক পোলিক"—জয় হোক জয় হোক জয় হোক; জীবনের অভিশাপ দূর হইয়াছে, নরকযন্ত্রণা আর থাকিবে না, মর্ত্যলোকে যমরাজের কোনো কাজ নাই। ঠিক অনুরূপ সুরে ত্যাগরাজও গাহিলেন—চিন্তিস্তুন্নাডে যমুডু—যমরাজ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ "সন্ততমু সুজনুলেল্ল সদ্‌ভজন জেয়ুট জুচি" —সমস্ত সজ্জন সর্বদা ভজন কীর্তনে রত। এমন কি, জ্ঞানহীন যাহারা সহজেই যমদূতের শিকার হইত, তাহারাও আজ ত্যাগরাজের মঙ্গলকীর্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—সারমণি ত্যাগরাজু সংকীর্তনমু বাডেরনুচু। তাম্রপর্ণীর তীরে তামিল সন্তানের গানে যে আশার বাণী উদ্‌গীত হইয়াছিল, তাহাই যে আবার হাজার বছর পরে কাবেরী নদীর তীরে তেলুগু সন্তানের কণ্ঠে এমন করিয়া প্রতিধ্বনিত হইবে কে জানিত।

---

on the model of Kshetrajna's compositions, arose. Andhra Sahitya Parishad, First Anniversary Souvenir (1961), Calcutta. p. 60

১ ঐ

ষষ্ঠ অধ্যায়

কেরলীয় ভক্তিসাহিত্য

১৭৪. যে দ্রাবিড় দেশ ভক্তিধর্মের উৎস-ভূমি বলিয়া ভাগবতে তথা পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই 'দ্রাবিড়' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং দ্রাবিড় দেশের বিস্তার ও পরিধি লইয়া ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অমীমাংসেয় তর্ক থাকিলেও আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে ইহার একটা চলনসই মীমাংসা করিয়া লইতে পারি। ভাষাতত্ত্বের বিচারে দ্রাবিড়-ভূমি বলিতে আন্ধ্র (তেলুগু), কর্ণাটক (কন্নড), তামিলনাড (তামিল) ও কেরল (মলয়ালম্)—বর্তমানের এই চারিটি রাজ্যকে বুঝাইলেও কার্যত অন্যরূপ প্রয়োগেরও প্রচলন রহিয়াছে। আন্ধ্র ও কর্ণাটকের রচনাদিতে কখনও কখনও তামিলনাড ও তাহার ভাষাকে বুঝাইবার জন্য 'দ্রাবিড়' কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দের এই জাতীয় অর্থ-সংকোচ অশাস্ত্রীয় হইলেও লৌকিক ব্যবহার-সিদ্ধ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ভাগবত ও পদ্মপুরাণের যে অংশের কথা বলা হইতেছে, সেখানেও এই সংকুচিত অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে (দ্র° ৩১-৩২)। ভাগবতে দ্রাবিড়-প্রসঙ্গে কাবেরী-তাম্রপর্ণী-কৃতমালা-পয়স্বিনী-মহানদী এই নদী পঞ্চকের উল্লেখ এবং পদ্মপুরাণে দ্রাবিড়-প্রসঙ্গে কর্ণাটকের স্বতন্ত্র উল্লেখ হইতে বোঝা যায়, এক সময়ে দাক্ষিণাত্যকে দ্রাবিড় ও কর্ণাটক এই দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়া লওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্তমান আন্ধ্র ও কর্ণাটক (মহিষুর বা মাইসোর) লইয়া কর্ণাটক; এবং বর্তমান তামিলনাড ও কেরল লইয়া দ্রাবিড়। আমাদের আলোচনার ধারায় 'দ্রাবিড়' শব্দটিকে আরও একটু সংকুচিত করিয়া কেবল যে তামিলনাডের সমার্থকরূপে

ধরিয়া লইয়াছি, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য কেরল এবং কেরলীয় ভাষা ও সাহিত্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান।[১]

১৭৫. সম্প্রতি রাজ্য হিসাবে কেরল এবং ভাষা হিসাবে মলয়ালম্ একটা স্বতন্ত্র ও অখণ্ড মর্যাদার অধিকারী হইলেও ইংরেজদের শাসনকাল পর্যন্ত কেরলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এইরূপ অখণ্ড স্বাতন্ত্র্য খুব কদাচিৎ দেখা গিয়াছিল।[২] খ্রী° পূ°: তৃতীয় শতাব্দীতে ভৃগু-বংশীয় পরশুরামের নেতৃত্বে কেরল-ভূখণ্ডে নম্বূতিরি ব্রাহ্মণদের[৩] আগমনের পর হইতে কেরলীয় ইতিহাসের সূচনা। (সেই হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নম্বূতিরি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কেরলীয় হিন্দু-সমাজে শীর্ষ-স্থানীয় হইয়া আছে।) কিন্তু তাহার আগেই বর্তমান কেরলের অন্যতম শক্তিশালী সম্প্রদায় নায়র্-গোষ্ঠী[৪] বাহির হইতে আসিয়া স্থানীয় দুর্বল অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় নায়র্-নম্বূতিরি-র সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিলেও উভয়পক্ষ একটা সম্মানজনক আপোস-রফা করিয়া সামাজিক সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়। যুদ্ধপ্রিয় নায়র্-গোষ্ঠী পায় রাজনৈতিক ক্ষমতা, এবং বিচক্ষণ

---

১ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কেরলেও তামিল বুঝাইতে 'দ্রাবিড়' কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়।

২ A singular feature of Kerala history....is its lack of political unity. There was no central point from which the evolution of Kerala could be viewed. K. M. Panikkar—A History of Kerala (1960)—Introduction.

৩ নম্ (বেদম্) পূর্‌য়তি ইতি নম্বূতিরি, কেরলীয় অভিধানে নম্বূতিরি শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত। নম্বূতিরি-কে কথ্য ভাষায় নম্বূরি-ও বলা হয়।

৪ ইহারা নাগ-পূজা করিত বলিয়া নাগর্>নায়র্ নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারিকার পথে একটি স্থানের নাম নাগর্ কোয়েল্=সর্পমন্দির।

নম্বুতিরি সমাজ উচ্চবংশীয় নায়র্-দের সহিত একপ্রকার অনুলোম বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিয়া সামাজিক, ধার্মিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের সমর্থ হয়।

১৭৬. ইতিহাসের প্রথম দিকে তামিলনাডের সহিত কেরল প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। আজ আমরা চের-চোল-পাণ্ড্য রাজবংশের কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া থাকি। নায়র্ বা নম্বুতিরি-গোষ্ঠী আঞ্চলিক শাসন-ক্ষমতা বা অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হইলেও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত কেরলের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ছিল তামিলনাডের রাজবংশের হাতে। যে চের-বংশের নামানুযায়ী 'কেরল' নামের উৎপত্তি[১], খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাহাদের রাজ্য-শাসনের সূত্রপাত। ইহাদের পরে পাওয়া যায় পেরুমাল্ বংশের[২] নাম। চের বা পেরুমাল বংশের রাজ্যকাল সুদীর্ঘ আট শতাব্দী ধরিয়া চলিলেও এই যুগের বিস্তৃত বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। কেবল এইটুকু বলা যায়, এই সময়ে কেরলের একটা বৃহৎ অংশ (দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চল) একটি প্রবল শাসনশক্তির অধীনে আসিয়াছিল। তাহাতে কেরলের অখণ্ডতা কিছু থাকিলেও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ-সাধনে কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। ধর্মে ও ভাষায়, অন্তত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, তামিলনাডের বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এবং তামিল ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও চর্চা হইয়াছিল। অবশ্য এই সঙ্গে, নম্বুতিরি ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃতের যে বিশেষ চর্চা হইত, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন।

১৭৭. কেরলের ইতিহাসে সাধারণভাবে নবম শতাব্দী এবং

---

১ চের-দের রাজ্য বা দেশ অর্থে চেরমণ্ডলম্ বা চেরতলম্ হইতে চেরলম্>কেরলম্ শব্দের সৃষ্টি।

২ মনে হয় চের বা পাণ্ড্যবংশের একটি শাখা পেরুমাল বংশ নামে পরিচিত হইয়াছে। পেরু (বড়) মাল (শাসক) অর্থাৎ বড় শাসক 'বড় হিস্সা' 'বড় গদি' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

বিশেষভাবে ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় কাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। প্রথমত, কেরলে প্রচলিত বর্ষ-গণনার আরম্ভ এই সময়ে। কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মারক হিসাবে কেরলীয় অব্দ-গণনার সূত্রপাত হয় বলা কঠিন।[১] নবম শতাব্দীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নম্বূতিরি ব্রাহ্মণসমাজের মধ্য হইতে ভারতের দিগ্‌বিজয়ী ধর্মপুরুষ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব (৭৮৮-৮২০), বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব-হ্রাস, কেরলের জাতীয় উৎসব 'ওণম্'এর সৃষ্টি, তামিল রাজবংশের আধিপত্য লোপ এবং সেই সঙ্গে তামিলনাড ও কেরলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অবসান। কেরলীয় পণ্ডিতগণের মতে কেরলের নিজস্ব ভাষা মলয়ালম্-এর[২] উদ্‌ভব ঘটে এই নবম শতাব্দীতে। উল্লিখিত কারণগুলি হইতে আমরা বলিতে পারি নবম শতাব্দী নব কেরল বা স্বতন্ত্র কেরলের স্রষ্টা।

কেরল স্বতন্ত্র হইল বটে, কিন্তু তাহার অখণ্ডতা রহিল না। তামিল রাজবংশের শাসনকালে ধীরে ধীরে যে সংহতি গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গেল। বিভিন্ন অঞ্চলের নায়র্‌গোষ্ঠী ক্ষমতালাভের জন্য আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে মত্ত হইয়া উঠিল। বহুকাল হইতে কেরলে তিনটি আঞ্চলিক বিভাগের অস্তিত্বের কথা জানা যায় (যাহা আজও লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না)—উত্তর, মধ্য ও

---

১ ত্রিবাঙ্কুরের নরপতি রবি বর্মা কুলশেখর সুশাসনের জন্য প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকেই জাতীয় উৎসব 'ওণম্'-এর প্রবর্তক বলিয়া মনে করা হয়। খুব সম্ভব রবি বর্মার কাল হইতে কেরলীয় বর্ষগণনা আরম্ভ হইয়াছে।

২ Malaylam had an independent existence at least as early as the 9th century A. D. K. M. George—Ramacoritam p. 55.

মলয়ম্=পর্বত, চন্দনগিরি। আলম্=সমুদ্র (বা ভূমি) এইরূপে গিরি-সমুদ্রের মধ্যবর্তী ভূমির (বা গিরি-সন্নিহিত অঞ্চলের) নাম মলয়ালম্; সেই হইতে ভাষার নাম মলয়ালম্ এবং অধিবাসীর নাম মলয়ালী।

দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ মলাবার, কোচ্চি (কোচীন) এবং তিরুবিতাঙ্কুর (ত্রিবাঙ্কুর)। এই ত্রিধা-বিভক্ত কেরল নবম শতাব্দীর অরাজকতায় শতচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম করে। এই সময়ে উত্তর কেরলে অর্থাৎ মলাবারে ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে নায়র্-গোষ্ঠীর 'সামূতিরি'[১] রাজবংশ—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাহারা 'কালিকটের জামোরিন' (Zamorin of Calicut) বলিয়া পরিচিত। এই রাজশক্তি ক্রমশ একচ্ছত্র হইয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ছোট ছোট অঞ্চলপতিরা সামূতিরি-র অধীনতা স্বীকার করে। এমন কি, কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীন রাজশক্তিও 'সামূতিরি'র নিকটে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এইরূপে যখন মলয়ালম বা কেরল রাজ্যের একটা ঐক্য-বিধায়ক শক্তির সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন—পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে—১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটের বন্দরে আসিয়া উপনীত হইল পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সুযোগে কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুর জামোরিনের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়া উঠিলে কেরলের অখণ্ডতা-লাভের সম্ভাবনা কয়েক শতাব্দীর জন্য প্রতিহত হইয়া রহিল।[২]

১ 'সামূতিরি' কথাটির অর্থ হইল 'সমুদ্রের অধিপতি'।

২ আলোচ্য বিষয়ে দুইজন ঐতিহাসিকের মন্তব্য এইরূপ :—

(ক) Undoubtedly, the course of Kerala history during the two centuries previous to the arrival of the Portuguese was in the direction of an increase of the Zamorin's power and the establishment of Kerala Confederation under his authority. K. M. Panikkar—A History of Kerala. p 27.

(খ) His (Zamorin's) almost unchecked advance south wards towards Cochin and Travancore in the 15th century would have led to the practical unification of Kerala had not his progress been suddenly and unexpectedly checked by arrival of the Portuguese. P. K. S. S. Raja—Mediaeval Kerala (Introduction). এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অষ্টাদশ

১৭৮. উল্লিখিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় আমরা এবার কেরলের ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রের উপর দৃষ্টিপাত করিব। নবম শতকে কেরলের নিজস্ব ভাষা মলয়ালম্-এর উদ্ভব ঘটিলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে 'হরিজন' হইয়া রহিল। প্রত্যেক দেশেই নবোদ্ভূত ভাষা সম্পর্কে অবশ্য এই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। একটা প্রতিষ্ঠিত ভাষা বর্তমান থাকিতে সহসা কেহ ঐতিহ্যবিহীন ভাষা গ্রহণ করিতে চায় না, নিজের মাতৃভাষা হইলেও নয়। মলয়ালম্-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো ও বিলম্বিত হইয়াছিল কেরলের রাজনৈতিক কারণে। নবম শতকে পেরুমাল রাজবংশের শাসন-ক্ষমতা বিনষ্ট হইলেও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহাদের প্রবর্তিত ধারা অব্যাহত রহিল। আমরা কল্পনা করিতে পারি, সুদীর্ঘ আট শতাব্দীব্যাপী তামিল শাসনের কালে বহু পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত তামিলভাষী কেরলের অধিবাসী বনিয়া গিয়াছে। কেরলের অধিবাসী হইয়াও তাহারা কিন্তু জাত্যভিমান হারায় নাই।[১] তাহাদের উচ্চতর শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে কেরলের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যেও একটা 'তামিল' মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে যে তামিল ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকিয়া অগ্রগামী মলয়ালীরা তাঁহাদের মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিলেন। বস্তুত সুপ্রাচীন কাল হইতে ত্রিবাঙ্কুরে তামিল সাহিত্যের লক্ষণীয় চর্চা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইজন কবির সৃষ্টি তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর মধ্যে গণনীয়। একজন

শতকের মধ্যভাগে ত্রিবাঙ্কুর নরপতি মার্তণ্ড বর্মা কেরলের ঐক্যসাধনের জন্য উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে মৈসূরপতি হায়দার আলি তাঁহাকে প্রতিহত করেন।

১ কেরলের তামিল ব্রাহ্মণেরা বহির্জীবনে মলয়ালম্ ভাষা গ্রহণ করিলেও এখনও তাহাদের পারিবারিক জীবনে তামিলের ব্যবহার রহিয়াছে, অবশ্য কিঞ্চিৎ বিকৃত তামিল।

দ্বিতীয় শতাব্দীর চের-সম্রাট চেঙ্গুত্তুবন্-এর ভ্রাতা 'চিলপ্পধিকারম্' (নূপুর কাব্য)-এর স্রষ্টা ইলঙ্গো অডিগল্। অপরজন অগ্রণী বৈষ্ণব কবি নবম শতাব্দীর ত্রিবাঙ্কুর-রাজ কুলশেখর আলোয়ার।

১৭৯. কথ্য ভাষারূপে মলয়ালম্-এর উদ্ভবের পর কেরলীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি মিশ্ররীতি প্রবর্তিত হইল—যাহা সাধারণত 'পাট্টুভাষা' নামে পরিচিত। ইহাকে সহজ কথায় বলা যায় তামিল-মিশ্র মলয়ালম্। পূর্বোল্লিখিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ ছাড়াও এইরূপ মিশ্ররীতি উদ্ভবের একটি প্রধান কারণ তামিল ও মলয়ালম্ ভাষার সাদৃশ্য।[১] আমরা কল্পনা করিতে পারি, সেই যুগের মলয়ালী সম্প্রদায় এইরূপ মিশ্রভাষায় গ্রন্থরচনায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বাদশ শতকে রচিত 'রামচরিতম্' এই মিশ্রভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।[২]

১৮০. নম্বূতিরি ব্রাহ্মণদের গভীর সংস্কৃত চর্চা এবং সেই সম্প্রদায়ে উদ্ভূত শঙ্করাচার্যের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। মলয়ালম্ ভাষার উদ্ভবের পরে ইহাদের হাতে অপর একটি মিশ্রভাষার প্রবর্তন হইল যাহা 'মণিপ্রবালম্' নামে পরিচিত। সহজ কথায় ইহাকে

১ Gundert, Caldwell, Grierson প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতগণ মলয়ালম্-কে তামিল ভাষার একটি শাখা বলিয়া বর্ণনা করেন। পক্ষান্তরে K. M. George, C. A. Menon প্রমুখ কেরলীয় পণ্ডিতগণ 'মূল দ্রাবিড় ভাষা' হইতে মলয়ালম্-এর স্বতন্ত্র উদ্ভবের কথা বলিয়াছেন। সে যাহাই হউক, তামিল ও মলয়ালম্-এর ভাষাগত সাদৃশ্য অনস্বীকার্য।

২ বিদেশী পণ্ডিতগণ রামচরিতম্-কে মলয়ালম্ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করিতেন। সম্প্রতি এই মত খণ্ডিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য K. M. George—Ramacartiam)। K. M. George এর বক্তব্য—রামচরিতম্ 'পাট্টুভাষা' অর্থাৎ তামিল-মিশ্র মলয়ালম্-এর প্রাচীনতম গ্রন্থ, মলয়ালম্-এর নয়।

বলা যায় সংস্কৃত-মিশ্র মলয়ালম্।[১] স্থানীয় ভাষার সহিত সংস্কৃতের মিশ্রণ ঘটাইয়া সাহিত্য-রচনার পদ্ধতি ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই অল্পবিস্তর পরিচিত হইলেও এবং 'মণিপ্রবালম্' কথাটি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও কেরলে ইহার একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। ইহা কেবল সংস্কৃতশব্দবহুল দেশীয় ভাষা নয়, সংস্কৃত বিভক্তি ও প্রত্যয়াদি লইয়া ইহা একটি বিশিষ্ট ভাষারীতি। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া (উদ্ভবের কাল হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত) নম্বুতিরিদের হাতে 'মণিপ্রবালম্' ভাষার বিশেষ চর্চা হইয়াছে। এই ভাষায় রচিত সন্দেশকাব্য, চম্পুকাব্য ও খণ্ডকাব্য মলয়ালী পণ্ডিত-গণের বিশেষ উপভোগ্য। কালিদাসের মেঘদূতের অনুসরণে রচিত চতুর্দশ শতকের 'উন্নিনীলি সন্দেশম্' সব চেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়।[২]

১ মণি=মলয়ালম্; প্রবালম্=সংস্কৃত। পঞ্চদশ শতকের সংস্কৃতে লিখিত মলয়ালম্ ভাষার ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'লীলাতিলকম্'-এ (লেখক অজ্ঞাত) মণিপ্রবালম্-এর সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—'ভাষা-সংস্কৃত-যোগম্'। মলয়ালম্ ও সংস্কৃতের মিশ্রণের রীতি ও পরিমাণের কথা বিচার করিয়া 'লীলাতিকম্' গ্রন্থে চারিপ্রকার 'মণিপ্রবালম্' রীতির কথা হইয়াছে—উত্তম, মধ্যম, মধ্যমকর্তা ও অধম।

২ কথিত আছে, নম্বুতিরি ব্রাহ্মণগণ কেরলীয় জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সহজ প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া 'মণি-প্রবালম্' রীতির প্রবর্তন করেন। মাতৃভাষায় কাব্যরস আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণের নিয়ম তাহারা প্রায় অজ্ঞাতসারেই শিখিয়া ফেলিবে এবং পরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সহজ প্রবেশাধিকার ঘটিবে। সুদূর দক্ষিণে যেখানে তামিল ভাষা সংস্কৃত হইতে 'শত হস্ত' দূরে রহিয়াছে, সেখানে দুর্গম কেরল অঞ্চলের মলয়ালম্ তামিলের সগোত্র হইয়াও যে 'সংস্কৃতান্বিত' হইল, তাহার মূলে আছে নম্বুতিরি-দের মণিপ্রবালম্। আজ হইতে ২৫ বছর আগেও কেরলের স্কুল-কলেজে মণিপ্রবালে রচিত পুস্তকাদি পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল।

১৮১. যে মলয়ালম্-কে অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত মিশ্র ভাষার উদ্ভব, পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তাহার শুদ্ধ রূপটি লিখিত সাহিত্যে অনুপস্থিত। ভদ্র সাহিত্যে অনুপস্থিত থাকিলেও লোকসাহিত্যে যে তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, দক্ষিণ ও মধ্য কেরলে অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীন অঞ্চলে তামিল রাজশক্তি এবং তামিল ও সংস্কৃত শিক্ষার যতটা প্রসার ঘটিয়াছিল, উত্তর কেরল অর্থাৎ মলাবার অঞ্চলে ততটা প্রচার হয় নাই। ফলে, তামিল ও সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া মলাবারের অপণ্ডিত কবিরা 'পচ্চা (অর্থাৎ খাঁটি) মলয়ালম্'এ তাঁহাদের মনের কথা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। পচ্চা মলয়ালম্-এ রচিত এই শ্রেণীর অধিকাংশ গাথা-সাহিত্য পাওয়া গিয়াছে উত্তর মলাবার হইতে। ইহাদের কোনো কোনো অংশ দশম শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনুমতি হয়।[১] দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই সাহিত্য রচনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

১৮২. উল্লিখিত ভাষা-বিষয়ক আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম প্রাচীন কেরলের সাহিত্যক্ষেত্রে বিভিন্ন কালে পাঁচটি ভাষা-রীতির প্রচলন ছিল—বিশুদ্ধ তামিল, বিশুদ্ধ সংস্কৃত, পাট্টু (তামিল-মিশ্র মলয়ালম্), মণিপ্রবালম্ (সংস্কৃত-মিশ্র মলয়ালম্) এবং বিশুদ্ধ বা পচ্চা মলয়ালম্। নবম শতাব্দীর পরে বিশুদ্ধ তামিল রচনার নিদর্শন কিছু পাওয়া যায় না বলিয়া কেরলীয় সাহিত্যের ইতিহাসে উহার স্থান উপক্রমণিকায়। বাকি চারিটি রীতি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পাশাপাশি চলিয়াছিল। পঞ্চদশ শতকে

---

১ Some of these songs are at least as old as the 10th century......The form must have changed while being handed down through several centuries, but still they reflect in a large measure the old colloquial Malayalam. K. M. George—Ramacaritam p. 13.

আসিয়া 'পাট্টু' ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ষোড়শ-সপ্তদশ পর্যন্ত সংস্কৃত ও মণিপ্রবালম্ বেশ সতেজ ছিল। অপর দিকে পঞ্চদশ-ষোড়শ হইতে মলয়ালম্ উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া সাহিত্য-সাধনার প্রধান বাহন হইয়া রহিল।

১৮৩. কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত পাঁচটি ভাষারই কিছু না কিছু অবদান রহিয়াছে। তিরুবিতাঙ্কূরের (ত্রিবাঙ্কুরের) নরপতি আড়বার্ কবি কুলশেখরের (নবম শতক) তামিল রচনার কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে (দ্র° ৫৯)। তাঁহার 'মুকুন্দ-মালা' সংস্কৃতে রচিত একখানি ভক্তিগ্রন্থ। কেহ কেহ দাবি করেন, সংস্কৃত ভাষার ভক্তিমূলক গেয় কাব্যের (lyrics) মধ্যে মুকুন্দমালাই প্রাচীনতম।[১] তামিল কবিদের ভক্তিসাহিত্য প্রত্যন্ততম আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাহা ঠিক প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যকে ততটা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। সেই প্রভাব আসিয়াছিল দক্ষিণের সংস্কৃত রচনাবলীর মধ্য দিয়া—ভাগবত যাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং মুকুন্দমালা প্রাচীনতম। পরবর্তী কালের প্রাদেশিক ভক্তিসাহিত্যসমূহে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ব্যাকুল হৃদয়-ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার অন্যতম উৎস এই মুকুন্দমালা। কাব্য-গুণের দিক হইতেও মুকুন্দমালা ভক্তিগীত-পুষ্পমাল্যে গ্রথিত হইবার যোগ্য।

১ This well-known poem is considered to the earliest religious lyric in Sanskrit and is believed to have been composed in South India towards the end of the seventh century. S. E. Ranghanadhan—Mukundamala (Annamalai University series), Foreword. উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক K. Rama Pisharotiও মুকুন্দমালার রচনাকাল সম্পর্কে বলিয়াছেন—Kulasekhara, the author of the Mukundamala, may be assigned to the close of the seventh and the beginning of the eighth century. (Introduction)

৩১টি স্তবক-বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে[১] মুকুন্দ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, কেশব, নারায়ণ, হরি প্রভৃতি নানা অভিধানে ভক্ত-কবি তাঁহার আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। আমরা কয়েকটি শ্লোকের সাহায্যে কবির রচনাশৈলী ও ভক্তি-স্বরূপের পরিচয় গ্রহণ করিব। প্রথম শ্লোকে কবি বলিয়াছেন : হে মুকুন্দ, আমি মাথা নত করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তোমার কাছে এই একটুকু প্রার্থনা জানাইতেছি, তোমার প্রসাদে জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণারবিন্দে আমার মতি স্থির থাকে (আমি যেন সেই পদযুগল বিস্মৃত না হই)।[২] যে উদ্দেশ্য লইয়া কবির এই প্রার্থনা, পরবর্তী শ্লোকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—আমি যে তোমার চরণ-যুগল বন্দনা করিতেছি, তাহা ধর্মাধর্ম, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য নহে, নরকের কুম্ভীপাক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য নহে, নন্দন-কাননের সুন্দরী মৃদুসুখস্পর্শ রমণীদের সঙ্গলাভের জন্য নহে; আমি যেন জন্মে জন্মে আমার হৃদয় মন্দিরে তোমাকেই চিন্তা করিতে পারি।[৩]

আর একটি পদে কবি এই সংসার-সমুদ্রে প্রার্থনা করিতেছেন

১ বি. বি. কে রঙ্গচারী সম্পাদিত সংস্করণে (১৯৫৪) শ্লোকসংখ্যা ৪০। আমরা এখানে অন্নামলৈ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের কথা বলিতেছি।

২ মুকুন্দ! মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু ভবৎ-প্রসাদাৎ॥

৩ নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

ভগবদ্‌ভক্তির নৌকা। তৃষ্ণা হইতেছে এই সমুদ্রের জল, মোহরূপ তরঙ্গমালা আলোড়িত হইতেছে মদনরূপী পবনের দ্বারা, স্ত্রী ইহার আবর্ত, পুত্র-কন্যা ও ভাই বন্ধু যেন জলজন্তু। সংসার নামধারী এই মহাসমুদ্রে যখন আমরা নিমজ্জিত হই, তখন হে বরদ,হে ত্রিধামেশ্বর, তোমার পাদপদ্মে অবিচলিত ভক্তিই যেন নৌকা হইয়া নিরাপদে আমাদের বহন করিয়া লইয়া যায়—এইরূপ অনুগ্রহ বর্ষণ কর।[১]

কবি ইহা বুঝিয়াছেন, সংসারে অন্য কোনো আশ্রয় নাই। সেই প্রভু নারায়ণ সর্বোপরি বিরাজমান। বেদাধ্যয়নই বলো আর ব্রতাদি পুণ্যকর্মই বলো, তাঁহার চরণযুগল স্মরণ না করিলে সমস্তই নিষ্ফল। বেদপাঠ সে তো অরণ্যে রোদন মাত্র; বেদবিহিত নিত্যব্রতকর্ম সে তো কেবল দেহক্ষয়কারী; কূপ-দীর্ঘিকা খননাদি পূর্তকার্য সমস্তই ভস্মে আহুতির তুল্য; পুণ্যতীর্থে স্নান গজস্নানের সমান।[২]

অবশেষে কবির পরম উপলব্ধি—ভূমানন্দের কথা। আধুনিক বাঙালি কবি যেমন 'পরশাতীতের হরষ' লাভ করিয়া সমস্ত বিশ্ব-ভুবনব্যাপী আনন্দের বিপুল তরঙ্গ অনুভব করেন(রবীন্দ্রনাথের 'বিপুল তরঙ্গ রে বিপুল তরঙ্গ' গানখানি স্মরণীয়) অথবা সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি-আঘাত-নৈরাশ্যকে মরীচিকা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া সত্যের আনন্দরূপ লাভ করেন (রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে' গানখানি স্মরণীয়), প্রাচীন কেরলীয় কবি কুলশেখরের দৃষ্টিতেও তেমনি

১ তৃষ্ণা তোয়ে মদনপবনোদ্‌ভূতমোহোর্মিমালে
দারাবর্তে তনয়সহগ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারোখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্‌!
পাদাম্ভোজে বরদ! ভবতো ভক্তিনাবং প্রসীদ॥ ১০॥

২ আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং বেদব্রতান্যন্বহং
মেদাচ্ছেদফলানি পূর্তবিধয়ঃ সর্বে হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎ পদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ॥ ২৮॥

বিশাল পৃথিবী পরিণত হয় ক্ষুদ্র ধূলিকণায়, মহাসমুদ্র সঙ্কুচিত হয় জলবিন্দুতে, তেজস্বী সূর্য যেন একটি খদ্যোত, মহাবায়ু যেন একটি নিশ্বাস, অনন্ত আকাশ একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র, রুদ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি অতি সামান্য, সমস্ত দেবতা কীটসদৃশ।[১]

১৮৪. কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের (৭৮৮-৮২০খ্রী°) অনুল্লেখ সমীচীন হইবে না। তাঁহার নামে প্রচলিত 'আনন্দলহরী' সমেত 'সৌন্দর্যলহরী'[২] যদিও শক্তিবন্দনামূলক তান্ত্রিক রচনা-রূপে পরিচিত, তথাপি উহার দু' একটি শ্লোক প্রসঙ্গ বহির্ভূত করিয়া পাঠ করিলে অবিকল 'মুকুন্দমালা'র ভক্তিরস আস্বাদন করা যাইবে। একটি শ্লোক এইরূপ: আমার সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া তোমারই পূজা অনুষ্ঠিত হউক। আমার কথা হউক তোমার মন্ত্রজপ, আমার সকল শিল্পকর্ম হউক তোমার মুদ্রা-বিরচন, আমার গতি হউক তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, আমার ভোজন হউক তোমার হোম; আমার শয়ন হউক তোমার প্রণাম, আমার সমস্ত সুখ হউক তোমাতে আত্মসমর্পণ।—

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা
সপর্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্॥ ২৮॥

১৮৫. কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যের মধ্যে কেরলের বাহিরে

১ পৃথ্বী রেণুঃ রেণুঃ পয়াংসি কণিকা ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘু-
স্তেজো নিশ্বসনঃ মরুত্তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরা
দৃষ্টে যত্র স তাবকো বিজয়তে ভূমাবধূতাবধিঃ॥ ১৯॥

২ শিখরিণী ছন্দে রচিত শত স্তবক বিশিষ্ট 'সৌন্দর্য লহরী'র প্রথম অংশ (৪১সং স্তবক পর্যন্ত) 'আনন্দ লহরী' নামে পরিচিত। দেবী স্তুতি বিষয়ক দ্বিতীয় অংশই প্রকৃতপক্ষে 'সৌন্দর্য লহরী'।

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ভক্তিকাব্য হইল—লীলাশুক বিল্বমঙ্গল রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্। বাংলা দেশে বোধ করি ইহার প্রথম প্রচার হয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে কৃষ্ণকর্ণামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার নিত্যসঙ্গী ছিল এই গ্রন্থখানি। স্বরূপ দামোদরের সুকণ্ঠে যখন কৃষ্ণকর্ণামৃতের মধুক্ষরা শ্লোকগুলি সুমধুর গীতরূপ লাভ করিত, তখন মহাপ্রভু যে কতটা আবেগবিহ্বল হইয়া পড়িতেন তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা হইতে (দ্র° মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদ ও অন্ত্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে আরও জানা যায়, মহাপ্রভু মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ পঁঢরপুর তীর্থে বিট্ঠল দর্শন করিয়া কৃষ্ণবেণ্ব নদীর তীরে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের কণ্ঠে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পাঠ শুনিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের পরবর্তী অংশ এইরূপ—

> কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
> আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥
> কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
> যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥
> সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
> সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

(মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদ)

মহাপ্রভু কর্তৃক আনীত গ্রন্থের উপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃতে যে 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকা রচনা করেন, সেই টীকা অবলম্বনে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রসিদ্ধ কবি যদুনন্দন কৃষ্ণকর্ণামৃতের কাব্যানুবাদ করিলেন। বাংলা দেশের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটা বড়ো পার্থক্য এই যে, দাক্ষিণাত্যের

১ মধ্যলীলার ১ম, ২য় ও ৯ম পরিচ্ছেদ; অন্ত্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সংস্করণে তিনটি আশ্বাস বা অধ্যায়ে মোট ৩১৯টি শ্লোক আছে (১০৭ + ১১০ + ১০২)। কিন্তু বাংলাদেশের সংস্করণে দেখা যায় কেবল উহার প্রথম অধ্যায়টি (শ্লোকসংখ্যা—১১২)।[১] আমরা এখানে প্রথম অধ্যায় ধরিয়াই আলোচনা করিব।

বিল্বমঙ্গলের জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্পর্কে কোনো নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। ফার্কুহর সাহেব কবিকে কালিকটের অধিবাসী এবং তিরুঅনন্তপুরম্-এ পদ্মনাভ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মলয়ালী পণ্ডিত উল্লূর্ এম্. পরমেশ্বরের মতে লীলাশুক বিল্বমঙ্গল উত্তর ত্রিবাঙ্কুরের পরবূর্ পরগণার অন্তর্গত পুত্তঞ্চিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২] সে যাহাই হউক, বিল্বমঙ্গল যে কেরলের অধিবাসী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকর্ণামৃতে রাধার উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ কবিকে চতুর্দশ শতকের রাধাবাদী আচার্য বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে কবির আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দী।[৩] কিন্তু কেরলীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বিল্বমঙ্গল নবম শতকের কবি বলিয়া পরিচিত। ছয় শত বৎসরের ব্যবধান বড়ো কম নয়। তা ছাড়া ভগবতেরও পূর্বে দাক্ষিণাত্যের কবি রাধাকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহা সহজে বিশ্বাসযোগ্য হইবে না।[৪]

১ কেহ কেহ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়কে পরবর্তী কালের সংযোজন বলিয়া মনে করেন। এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য S. K. De—Krishnakarnamritam (1938), Inttoduction (xviii).

২ কেরল সাহিত্য চরিত্রম্ (প্রথম খণ্ড) পৃ ১৫২—১৫৫

৩ J. N. Farquhar—An outline of the religious Literature of India p. 304

৪ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে কৃষ্ণর্ণামৃতের রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নয় (দ্র° শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পৃ ১২১)।

মুকুন্দমালার ভক্তিরস মাধুর্যভাব-মণ্ডিত নয়। কৃষ্ণকর্ণামৃত মধুররসের কাব্য। একই অঞ্চলের দুইখানি সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক কাব্যে দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য কিছুটা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। চচ্চরী ছন্দে লিখিত নবম শ্লোকে কবি যে প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন তিনি কিরূপ ?—পল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ তাঁহার হাত দুখানি পদ্মের ন্যায় মনোহর, সেই হাতের নিত্যসঙ্গী বেণুর মধুর ধ্বনিতে তিনি গোপীদের আকুল করিয়া তোলেন, তাঁহার পাদ-পদ্মযুগল এতই রক্তিমাভ যে পাটলবর্ণের বিকশিত পাটলীপুষ্পকেও হার মানায়। তাঁহার মধুর অধরে দ্যুতি বিলসিত হইলে মুখখানি রসপূর্ণ হইয়া উঠে। গোপীগণের কুম্ভসদৃশ কুচসংলগ্ন কুঙ্কুমে তাঁহার দেহ আলিম্পিত[১]।

'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যে কোনো ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনার চেষ্টা নাই। এমন কি আপাতদৃষ্টিতে শ্লোকগুলির মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে কাব্যখানির মধ্য দিয়া ভগবদ্‌ভক্তির ক্রমবিকাশের ধারাটি চমৎকার রসরূপ লাভ করিয়াছে। প্রভুর লীলাকীর্তন, তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা, তাঁহার মুরলীশ্রবণ, দূর হইতে সেই মোহন মূর্তির আভাস, কাছে থাকিয়া সেই অনির্বচনীয় দিব্য কান্তি আস্বাদনের চেষ্টা—এইরূপ নানা বর্ণনার মধ্যে দিয়া ভক্ত কবিচিত্তের আশা ও বিশ্বাস, বিস্ময় ও উল্লাস সমগ্র গ্রন্থখানিকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে।

১৮৬. কৃষ্ণকর্ণামৃত গীতগোবিন্দের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। কিন্তু গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে রচনাভঙ্গির

---

১ পল্লবারুণপাণিপঙ্কজসঙ্গিবেণুরবাকুলং
ফুল্লপাটলপাটলীপরিবাদিপাদসরোরুহম্।
উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং
বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ॥৯॥

দিক দিয়া যে একটা গভীর মিল রহিয়াছে তাহা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গীতসৌন্দর্য, চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি ও ছন্দের মনোহারিতা উভয়ত্র এক। কৃষ্ণকর্ণামৃত সম্পর্কেও আমরা বলিতে পারি, মধুর কোমলকান্ত পদাবলী সংযোজনে ইহা একখানি "মঙ্গল-মুজ্জ্বলগীতি", ভক্তিরস ও কাব্যরসের দুর্লভ সমন্বয়। 'ললিতগতি' ছন্দে রচিত ১৮ সংখ্যক শ্লোকের মর্মকথা হইল: মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্—আমার প্রেমমত্ত চিত্তে তাঁহার মধুরাধর-নিঃসৃত অমৃত খেলা করুক। তাঁহার সেই যে তরুণ অরুণ করুণাময় আয়ত নয়ন, কমলার কুচকুম্ভস্পর্শে তাঁহার বর্ধিত আনন্দ, তাঁহার সেই মধুর বংশীধ্বনি যাহা মুনির মানসপদ্মকেও বিচলিত করে—আমার প্রেমমত্ত হৃদয়ে খেলা করুক—

তরুণারুণকরুণাময়বিপুলায়তনয়নং
কমলাকুচকলশীভরবিপুলীকৃতপুলকম্।
মুরলীরবতরলীকৃতমুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্॥ ১৮॥

১৮৭. কৃষ্ণদর্শনের আনন্দ ব্যক্ত হইয়াছে এইরূপে: প্রভু আসিয়া আমার দৃষ্টি-গোচর হইলেন যেন আমার সমস্ত পুণ্যের পরিমাণ সাকার হইয়া দেখা দিল। তাঁহার মুখখানি এমনিতেই চন্দ্রের ন্যায় শীতল, মাধুর্যগুণে উহা আরও শীতল বলিয়া বোধ হইল। আমার সৌভাগ্যশালিকা বাণীর যিনি অবলম্বন (বিহরণস্থল), মুরলীধ্বনির অমৃত-ধারায় চারিদিক অভিষিক্ত করিয়া তিনি আমার নয়ন-সন্নিহিত হইলেন—

মাধুর্যেণ দ্বিগুণ-শিশিরং বক্তচন্দ্রং বহন্তী
বংশীবীথীবিগলদমৃতস্রোতসা সেচয়ন্তী।
মদ্বাণীনাং বিহরণপদং মত্তসৌভাগ্যভাজাং
মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সন্নিবর্ত্তে॥ ৭৫॥

যাঁহার দর্শনলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, যাঁহার

রূপাস্বাদনের জন্য ছিল গভীর উৎকণ্ঠা, তিনি যখন সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখা গেল সেই সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের আস্বাদনযোগ্য নহে, তাহা অনির্বচনীয়।[১] —হে কেশব, তোমার মুখচন্দ্রের এ কী কান্তি! তোমার এ কী বেশ! ইহা যে বাক্যেরও অতীত। সেই কান্তি, সেই বেশ আমার আস্বাদনের অতীত; উহারা স্বয়ং আস্বাদিত হউক। আমি অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া তোমার সেই সৌন্দর্যের সম্মুখে বারংবার প্রণত হইতেছি।—

কেয়ং কান্তিঃ কেশব ত্বন্মুখেন্দোঃ
কোঽয়ং বেষঃ কাপি বাচামভূমিঃ
সেয়ং সোঽয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে
ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি ॥৯৫॥

দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে। এখন কবির একমাত্র প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর বিচিত্র লীলা তাঁহার হৃদয়ে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত হউক। কবি বলিয়াছেন, ধন্য ব্যক্তিরা তোমার যে চরিতামৃত রসনায় লেহন করিয়া থাকেন, তোমার সেই সব শৈশব চাপল্য যাহা তোমাকে রাধা-গ্রহণে উন্মুখ করিয়াছে, তোমার মুখপদ্মের লীলা, তোমার ভাবযুক্ত বেণুর গীতধারা—সেই সমস্তই আমার হৃদয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া চলুক।—

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপল্যব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ

১ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি স্মরণীয়: যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু, এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত: কেবল চক্ষুকর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।

—ছিন্নপত্র (১৩০২ কার্তিক) পত্র সং ৫৩

যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥১০৬॥

উল্লিখিত পরিচয়াংশ হইতে একথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, মধ্যযুগের ভক্তি-সাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকর্ণামৃত যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী। দাক্ষিণাত্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, লীলাশুক বিল্বমঙ্গল জয়দেব রূপে, জয়দেব নারায়ণতীর্থরূপে, নারায়ণ তীর্থ ক্ষেত্রয়্য-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কবিপরম্পরা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষা সমূহে রচিত মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ভাগবতের ন্যায় কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতেও যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছে। ভাগবতের ন্যায় কৃষ্ণকর্ণামৃতও প্রাচীন তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাবধারা পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে সঞ্চারিত করিয়া উহাকে বিস্তৃত ও বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

১৮৮. তেলুগু বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, পঞ্চদশ শতক হইতে তিরুপতির তাল্লপাক পরিবারের বিভিন্ন কবি কিভাবে আন্ধ্র ভক্তি সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে বিশিষ্ট দান রাখিয়া গিয়াছেন। কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যের ইতিহাসেও আমরা অনুরূপ একটি পরিবারের সন্ধান পাই। পণিক্করবংশীয় সন্তান হইলেও সাধারণত ইঁহারা 'কন্নশ্‌শন্‌' নামে পরিচিত।[1] মধ্য তিরুবিতাঙ্কূরে (ত্রিবাঙ্কুরে) অবস্থিত 'নিরণম্‌' নামক একটি স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া ইহাদিগকে 'নিরণংকবি' বলিয়াও অভিহিত করা হয়। এই কবি-গোষ্ঠীতে তিনজনের নাম পাওয়া যায়—মাধবন, শঙ্করন্‌ ও রামন্‌। এই কবিত্রয়ের আবির্ভাব-কালে (১৩৭৫—

১ 'কন্নশ্‌শন্‌' নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়—এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন করুনেশন্‌। সেই হইতে তদ্ভব রূপ কন্নশ্‌শন। আবার এমনও হইতে পারে, কন্নন্‌ (কৃষ্ণ) অচ্ছন্‌ (পিতা) এই সংযোগের ফলে উৎপন্ন কন্নচ্ছন্‌ বা কন্নশ্‌শনের সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছে করুনেশন্‌।

১৪৭৫ খ্রী°) সম্পর্কে কোনো মতভেদ নাই। ইঁহাদের সংগৃহীত রচনা কেরলীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 'কণ্ণশ্শন্ পাট্টুকল্' (কণ্ণশ্শন পরিবারের গীতাবলী) নামে প্রসিদ্ধ।

১৮৯. কবিত্রয়ের মধ্যে প্রথম মাধব পণিক্কর পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় ভগবদ্-গীতার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। মূল গীতার সাতশত শ্লোক অবলম্বনে তিনি রচনা করেন ৩২৮টি স্তবক। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় গীতা-অনুবাদের ইহাই বোধ করি প্রথম প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় কবি শঙ্কর পণিক্কর মহাভারত অবলম্বনে রচনা করেন 'ভারত-মালা'। ইঁহাদের 'সংগৃহীত গীতাবলী'তে ভাগবতেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তবে কণ্ণশ্শন পাট্টুকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা হইল কনিষ্ঠ রাম পণিক্করের রামায়ণ।

১৯০. কেরলের পঞ্চ ভাষারীতির মধ্যে একটি হইল—তামিল-মিশ্র মলয়ালম্। 'কণ্ণশ্শন্ গীতাবলী' এই মিশ্র ভাষায় রচিত। কেরলে এইরূপ মিশ্রভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থের নাম দ্বাদশ শতাব্দীর 'রামচরিতম্'—যাহা নানা কারণে কেরলীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অবশ্য ভক্তিরসের দিক হইতে কণ্ণশ্শ-রামায়ণ-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, তামিলনাড়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে নবম শতাব্দীর পূর্বেই রাম-ভক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে; কুলশেখর প্রভৃতি আলোয়ার কবিদের রচনা তাহার নিদর্শন। কিন্তু কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতকের পূর্বে আমরা রামভক্তির কোন নিদর্শন পাই না। লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজ কুলশেখরের 'মুকুন্দমালা' নারায়ণ-বিষ্ণু-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।[১] তামিল-

১ এই কারণে মুকুন্দমালা'র সম্পাদক মহাশয় আলোয়ার কুলশেখর এবং 'মুকুন্দমালা'র ত্রিবাঙ্কুররাজ কুলশেখরকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। আমরা কিন্তু মুকুন্দমালা ও কুলশেখরের তামিল পদাবলীর মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্যের কথা চিন্তা করিয়া উভয় রচনা একই

নাড ও কেরলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগ থাকা সত্ত্বেও কেরলের মাটিতে যে রামভক্তির আবির্ভাবে বিলম্ব ঘটিল, তাহা কি পরশুরামের দেশ বলিয়া? এ সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কঠিন।

কণ্ণশ শ-রামায়ণ তথা অন্য রচনাবলী মিশ্রভাষায় রচিত বলিয়া সাধারণ মলয়ালী সমাজে বর্তমানে ইহাদের কোন সমাদর নাই। তথাপি কেরলীয় পণ্ডিতগণ ভক্তি-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের দান বিস্মৃত হইতে পারেন না। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চেলনাট অচ্যুত মেনোন্ বলিয়াছেন: Kannassan's works reveal traces of the later Vaishnavic revival in Mediaeval times when poets could not look upon Rama as a mere epic hero, but only as an incarnation of Visnu, the supreme deity of the Visistadvaita school······We notice here the small beginnings of the Bhakti movement, which reached the height of its fervour under Ezuttaccan's championship.[১]

১৯১. কেরলীয় অথবা ঠিক ঠিক বলিতে গেলে মলয়ালম্ ভক্তিসাহিত্যের প্রকৃত সূচনা পঞ্চদশ শতকের সুপ্রসিদ্ধ কবি চেরুশ্শেরি-র সময় হইতে। ইতিপূর্বে সংস্কৃত, তামিল, অথবা তামিল-মিশ্র মলয়ালম্-এ যে ভক্তিসাহিত্য রচিত হইয়াছে, কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট হইলেও সাধারণ মলয়ালীর পক্ষে উহার রসগ্রহণে অসুবিধা ছিল। সংস্কৃত, তামিল ও মলয়ালম্—এই ত্রিধারার একটা আদর্শ ও লোকরুচিকর সমন্বয় ঘটিল চেরুশ শেরির প্রসিদ্ধ কাব্য 'কৃষ্ণপ্পাট্টু' অথবা কৃষ্ণগাথা গ্রন্থে (রচনাকাল ১৪৫৪ খ্রী°)। ভাগবত অবলম্বনে রচিত প্রায় আঠার হাজার ছত্রে সম্পূর্ণ

হাতের বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। তামিলনাডের প্রচলিত বিশ্বাসও তাহাই।

১ Ezuttaccan and his age. p. 38

এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া মলয়ালী জনসাধারণ কৃষ্ণলীলার অনন্ত মাধুরীর মধ্যে সর্বপ্রথম ভক্তিরসের আস্বাদনলাভের সুযোগ পাইল।

১৯২. ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আন্ধ্রদেশের কবি বম্মেরা পোতানা যখন তেলুগু ভাষায় ভাগবত রচনা করেন, কেরলীয় কবি চেরুশ্‌শেরি-র ভাগবতও রচিত হয় সেই সময়ে। রচনার বহিরঙ্গে উভয় কবির মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায় যে, পোতানার কাব্য সংস্কৃতের অনুসরণে শ্লোকাকারে গ্রথিত। কিন্তু চেরুশ্‌শেরির কাব্য বাংলা পয়ারের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া চলিয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে পোতানা ছিলেন দাস্যভক্তির উপাসক ইহা আমরা তেলুগু-ভাগবতের আলোচনা-প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি এবং দেখিয়াছি গজেন্দ্রমোক্ষণ জাতীয় অংশই পোতানার সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। চেরুশ্‌শেরি ছিলেন শৃঙ্গার রসের কবি। তাই তাঁহার কৃষ্ণগাথায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কাহিনীর বিবরণ থাকিলেও উহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বেণুগানং, গোপিকাদুঃখং ও রাসক্রীড়া। এই 'বংশীখণ্ড-বিরহখণ্ড' জাতীয় রচনাতেই তিন সহস্রাধিক পংক্তির প্রয়োজন হইয়াছে।

১৯৩. রাসক্রীড়ার উদ্দেশ্যে যে রজনীতে কৃষ্ণ গোপীদের লক্ষ্য করিয়া বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা এইরূপ: রাত্রি আসিল, আসিল পুষ্পমধুভাষিণী (সুন্দরী) রমণীর ন্যায় ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি ছড়াইয়া। মন্মথ তাহার সন্ধ্যাকালীন রক্তদিগন্তচ্ছটারূপী সোনালি লাঙ্গল দিয়া সমস্ত আকাশ-প্রান্তর কর্ষণ করিয়া চন্দ্ররূপী বীজ বুনিয়া দিলে উহাতে নক্ষত্র-রূপী অসংখ্য অঙ্কুরের আবির্ভাব হইল।[১]

অতঃপর কৃষ্ণের বংশীধ্বনি। কবি এই অংশ বেশ সবিস্তারেই

১ বেণুগানবর্ণনম্ (৬১-৭২ পংক্তি)

বর্ণনা করিয়াছেন : গোকুলনায়ক তাঁহার বাঁশিতে এমন মধুর-রাগ বাজাইতে লাগিলেন যে বৃন্দাবনের প্রাণিসমূহ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিল। ভ্রমর-সমূহ মধুপান ভুলিয়া গিয়া গীতামৃত পানের জন্য বালকৃষ্ণের মুখপদ্মের দিকে উড়িয়া গেল।...পুণ্যবান্ বনবৃক্ষসমূহ কৃষ্ণের মুরলী শুনিয়া মধুময় পুষ্প ছড়াইয়া শাখাগুলিকে সসম্মানে নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।...দ্রুতগামিনী কালিন্দী সেই রাগধ্বনি শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তরঙ্গ শান্ত হইল, চঞ্চল জল স্থির হইল।...রাজহংস মৃণাল হইয়া রাজহংসীর চঞ্চুপুটে দিতে যাইবে এমন সময়ে সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল এবং উভয়েই সেই অবস্থায় স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।...ব্রহ্মার কাছে সেই সংগীত বোধ হইল সামগানের ন্যায়। জীবন্মুক্ত পুরুষদের কাছে মনে হইল যেন নিত্য পরম তত্ত্বের আস্বাদন। ভক্তের কাছে মনে হইল চিত্তমাদক মধুসার সর্বস্ব।[1]

'গোপিকাদুঃখম্' অধ্যায়ে গোপীদের বিরহ বর্ণনার একাংশ এইরূপ : হে পুষ্পশর কামদেব, তুমি বলো, তোমার বাণগুলি পূর্বেও কি এইরূপ তীক্ষ্ণ ছিল অথবা আমাদের বধের জন্যই তুমি এইরূপ বাণ তৈরী করিয়াছ? লোকে তোমাকে 'তারম্ব' অর্থাৎ পুষ্পশর বলিয়া সম্বোধন করে, কিন্তু আমরা তো দেখিতেছি তুমি 'কূরম্ব' অর্থাৎ তীক্ষ্ণশর। তোমার বাণ বজ্রনির্মিত না হইয়া যদি ফুলের তৈরী হয়, তবে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি সেই ফুল এমন গাছের, যে গাছ সর্বদা বিষ উদ্গীরণ করে। কারণ তা না হইলে আমাদের প্রাণ এইরূপ নষ্ট হইত না।[2] গোপীরা যখন এইভাবে মদনকে লক্ষ্য করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছিল তখন অকস্মাৎ তরুশাখে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। গোপীরা কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—একদা যখন কৃষ্ণ

১ রাগঙ্গলোরোম্নে গোকুলনায়কন্ (২৬৭-৩৫০ পংক্তি)

২ নিন্নুটে বাণজল্ মুন্নমেন্নিজনে (১১২৯-১১৪২ পংক্তি)

আমাদের লইয়া খেলা করিতেছিল তখন তুমি আম্রমঞ্জরী চিবাইয়া বেশ মধুর কণ্ঠে পঞ্চম রাগে গান গাহিয়াছিলে। হে কোকিল, এখন তোমার গান আমাদের কানে বিষ ঢালিতেছে কেন?[১]

অতঃপর সেই রাসক্রীড়া। চেরুশ্‌শেরি যে শৃঙ্গাররসের কবি সুদীর্ঘ "রাসক্রীড়া" অধ্যায় তাহার নিদর্শন। বেণুগানম্ ও গোপিকাদুঃখম্ অধ্যায় দু'টিকে উহার প্রস্তুতি-পর্ব বলা যাইতে পারে। রাসক্রীড়ারত কৃষ্ণকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন—'আমি সহস্র-নয়ন। কিন্তু সহস্র নয়ন দিয়াও আমি কৃষ্ণরূপের যথার্থ আস্বাদন করিতে পারিতেছি না।' ইন্দ্রপ্রিয়া শচী এবং অন্যান্য দেবাঙ্গনাগণ মাধবের অনিন্দ্যকান্তি দর্শনে মন্মথ-বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। গোপিকারা কৃষ্ণকে অনুরাগভরে আলিঙ্গন করিতেছে দেখিয়া তাঁহাদের সেই বেদনা বাড়িয়া চলিল এবং এইরূপে তাঁহারা মন্মথ-হস্তের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন, 'গোপীরা ভাগ্যবতী। আমরা সেই ভাগ্যলাভের পুণ্য অর্জন করিতে পারি নাই। গোপীদের আনন্দ দেখিয়া আমরা আমাদের ঈর্ষা প্রশমিত করিব। দেখিয়াছ কি, পঙ্কজনয়ন কৃষ্ণ তাঁহার হাত দিয়া ধীরে ধীরে জনৈকা গোপীর মুখমণ্ডলে স্বেদ-কণা মুছাইয়া দিতেছে?' অপর কেহ উত্তর করিলেন—দেখিয়াছি, দেখিয়াছি। নয়নাভিরাম কৃষ্ণের আচরণ দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে।[২]

অবশেষে এক সময়ে গোপীদের সুখনিশি ভোর হইয়া আসিল। বনের মোরগ ডাকিয়া উঠিল। সেই ডাক শুনিয়া গোপীরা একে অন্যকে বলিতেছে—'সখি, সময় না হইতেই মোরগ ডাকিল কেন? বন্য পাখিদের কোন ন্যায়-অন্যায় বোধ নাই। তা না হইলে এই

১ ১১৭৩-১১৭৮ পংক্তি

২ ৭৩৫-৭৭৬ পংক্তি

গম্ভীর নিশীথে কখনো ডাকিয়া উঠে? এমন কি কেহ নাই যে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া ঐ মোরগটার মুখে গুঁজিয়া দিতে পারে?"[১]

১৯৪. কৃষ্ণলীলার পুণ্যভূমি বৃন্দাবন উত্তরভারতে অবস্থিত হইলেও দক্ষিণভারতের কবি-কল্পনায় তাহা দূরবর্তী নয়। তামিল কবি আণ্ডাল-রচিত 'তিরুপ্‌পাবৈ' কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, শ্রীবিল্লিপুত্তুর-এর পল্লী-বালিকারা কিভাবে অতি প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া তুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে প্রভুর নিদ্রা ভাঙাইতে। কোথায় কালিন্দী, কোথায় কৃতমালা! আণ্ডালের ভাব-কল্পনায় দুই নদীর জলস্রোত একধারায় মিলিয়া গেল। শ্রীবিলিপুত্তুরে রচিত হইল নব-বৃন্দাবন। কেরলীয় কবি চেরুশ্‌শেরি-র কৃষ্ণগাথা যে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ভূখণ্ডে এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, তাহা কি কেবল কৃষ্ণ-কাহিনীর জন্য? মার্গলি (মার্গশীর্ষ) মাসে তামিল রমণীদের কণ্ঠে 'তিরুপ্‌পাবৈ' সংগীতের ন্যায়, সিংহম্‌ অর্থাৎ ভাদ্র মাসে কেরল-রমণীদের কণ্ঠে যে কৃষ্ণগাথা গীত হইয়া থাকে তাহা কি কেবল ধর্মাচরণের জন্য? চেরুশ্‌শেরি তাঁহার সুমধুর কাব্যভাষায় ঋতুসৌন্দর্যের রঙ্গভূমি কেরলের পল্লীপ্রকৃতির পটভূমিকায় অম্বাডি-র[২] যে প্রেমগাথা রচনা করিয়াছেন, কেরলবাসীর পক্ষে তাহার একটা বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে।

কৃষ্ণগাথার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হইল ঋতুবর্ণনা। বেণুগান, গোপিকাদুঃখ, রাসক্রীড়া প্রভৃতি অধ্যায় ছাড়াও কবি স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি অংশে ঋতু-বর্ণনার সঙ্গে গোপীপ্রেমের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন।

১ ১১৮৩-১১৯০ পংক্তি।

২ মলয়ালম্‌-এ গোকুল বুঝাইতে অম্বাডি (অর্থাৎ গোপপল্লী) শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়।

বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ঋতু বর্ণনার অধ্যায়গুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। চেরুশ্‌শেরি-র একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ঋতুবর্ণনা উপলক্ষ্যে তাঁহার চিত্রকল্পগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন কৃষ্ণকাহিনী হইতে। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—বর্ষা আসিয়াছে, মেঘগুলি ধীরে ধীরে কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণতর হইতে লাগিল, মনে হইল যেন তাহারা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসুষমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত। অথবা, শরতের অবির্ভাবে আকাশে যে কৃষ্ণ মেঘের পরিবর্তে শুভ্রমেঘ দেখা দিল তাহা যেন রোহিণীনন্দন বলরামকে এই কথা বুঝাইবার জন্য যে তাহাদের আকর্ষণ কেবল কৃষ্ণ-কান্তির প্রতি নয়।

ভাগবতের কাহিনী-অবলম্বনে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ও সংস্কৃতে যে সমস্ত কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, মথুরা হইতে ভক্ত অক্রুরের গোকুলযাত্রা বর্ণনায় ভক্ত-কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস কি ভাবে অক্রুরের মধ্য দিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে। চেরুশ্‌শেরি-র কৃষ্ণগাথার অক্রুরাগমনম্ নামক অধ্যায়ে আমরা এই সত্যের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। ভক্ত অক্রুর বলিতেছেন—আমি যে পুণ্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ আমি কৃষ্ণকে দেখিতে চলিয়াছি।[১] গোপালকৃষ্ণের অমৃতময় কান্তির অপার শীতলতায় আমি আমার দৃষ্টিকে অভিষিক্ত করিয়া লইতে পারিব কি? ভ্রমর যেরূপ পুষ্পের সহিত ক্রীড়া করে, জলধরশ্যাম কৃষ্ণের নয়ন-যুগল কি সেইরূপ এই দীন-হীনের সহিত খেলা করিয়া তাহাকে আনন্দদান করিবে না?[২]

---

১ ষোড়শ শতাব্দীর কেরলীয় কবি মেল্‌পত্তূর নারায়ণ ভট্টতিরিও তাঁহার 'নারায়ণীয়ম্' নামক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

দ্রক্ষ্যামি বেদশতগীতগতিং পুমাংসং··· ॥৪॥

২ কণ্ণনেক্কান্ নতিয়ায়ল্লো পোকুম্

পুণ্যবানেন্নতু নির্ণয় ঞান্।···—অক্রূরাগমনম্ (৪৫–৫৪ পংক্তি)

১৯৫. আধুনিক মলয়ালম্ সাহিত্যে যেমন বল্লত্তোল্, প্রাচীন সাহিত্যে তেমনি এড়ুত্তচ্ছন্ (আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতক)। কেরলীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিকবৃন্দ প্রায় সমস্বরে এড়ুত্তচ্ছন্‌কে নবযুগের পুরোহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, শঙ্করাচার্যের পরে কেরল প্রদেশে এত বড়ো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব নাই।[১] সাহিত্যের কথা বাদ দিয়া ভাষার দিক হইতে বলিতে পারি, সংস্কৃত, তামিল ও মলয়ালম্—এই ত্রিধারায় যে উৎকৃষ্ট সমন্বয়ের সূচনা হইয়াছে চেরুশ্‌শেরি-র রচনায়, ষোড়শ শতকের এড়ুত্তচ্ছনে আসিয়া তাহা পূর্ণতা লাভ করে।[২] মধ্য কেরলের এই নায়র্ সন্তান তাঁহার রামায়ণ ও মহাভারত রচনার মধ্য দিয়া মলয়ালীদের জন্য সেই সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, হিন্দী-ভাষীরা যে সম্পদ্ খুঁজিয়া পায় তুলসীদাসের রামচরিতমানসে, তামিল-ভাষীরা যে সম্পদের সন্ধান পায় কম্ব-রামায়ণে। মলয়ালম্ ভক্তিসাহিত্যে এড়ুত্তচ্ছন্ শীর্ষস্থানীয়।

১৯৬. কবির ছোটখাটো রচনাগুলির মধ্য শক্তির পরিচয়

১ C. A. Menon তাঁহার Ezuttaccan and his age গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন: Since the days of the Great Sankara, the Adwaitist philosopher, Malabar had to wait for several centuries to welcome a similar outstanding personality who commanded universal admiration and reverence. In the esteem and regard which are associated with his name he is equalled only by Sankara. p. 45.

২ কবির পুরা নাম তুঞ্চত্তু রামানুজন্ এড়ুত্তচ্ছন্। শেষ অংশটি উপাধি, অনেকটা বিদ্যাসাগরের ন্যায়। এড়ুত্তু=অক্ষর+অচ্ছন্=পিতা। এই প্রসঙ্গে K. M. George-এর মন্তব্য: The tendency to accept and fuse what was best in the other schools reached its climax in the hands of Eluttaccan who made classical Malayalam at once popular and profound. Ramacaritam p. 26.

থাকিলেও রামায়ণ মহাভারতই তাঁহার প্রধান কীর্তি। বৈষ্ণব কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে ভাগবত রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাহা বোধ করি পূর্বসূরি ভাগবত-কার চেরুশ্শেরির রচনাগৌরবের কথা চিন্তা করিয়া। রামায়ণের ক্ষেত্রেও তুলসীদাস বা কম্বনের ন্যায় বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ না করিয়া তিনি বৈষ্ণবদের প্রিয় গ্রন্থ অধ্যাত্ম রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে অবশ্য বাল্মীকি, কণ্নশ্শন্ রাম পণিক্কর এবং পূর্বগামী অন্যান্য রামায়ণ-কারদেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১] এড়ুত্তচ্ছনের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার ভক্তিবাদ। রামায়ণের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন: "যে মনুষ্য ভক্তিহীন, শত-সহস্র বর্ষেও তাহার জ্ঞান বা মোক্ষলাভ হয় না।"[২] মর্ত্যবাসী-দের পক্ষে মুক্তি-সিদ্ধি-লাভের প্রধান উপায় অধ্যাত্মরামায়ণ মনে করিয়া তিনি যে এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন, সে কথা কাব্যের মধ্যেই আছে:

অধ্যাত্মপ্রদীপকমত্যন্তং রহস্যমি-
ত্যধ্যাত্মরামায়ণং মৃত্যুশাসনপ্রোক্তিং
অধ্যয়নং চেয়্তিটুং মর্ত্যজন্মিকল্কেল্লাং
মুক্তিসিদ্ধিকুমসন্দিগ্ধমিজন্মং কোণ্ডে॥[৩]

এড়ুত্তচ্ছনের সমালোচক চেলনাট অচ্যুত মেনোন্ দেখাইয়াছেন, কিভাবে নম্বূতিরি ব্রাহ্মণদের নৈতিক শৈথিল্যের জন্য তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'শান্তিদ্বিজ'

১ C. A. Menon—Ezuttaccan and his age.

২ ভক্তিহীনন্মার্কু নূরায়িরং জন্মং কোণ্ডু
সিদ্ধিক্কয়িল্ল তত্ত্বজ্ঞানবুং কৈবল্যবুম্॥

৩ মৃত্যুশাসন অর্থাৎ শিব যে অধ্যাত্ম রামায়ণের কথা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত রহস্যময়, কারণ ইহাতে অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সকল মানুষ ইহা অধ্যয়ন করেন, ইহজন্মে তাহারা নিঃসংশয়ে মুক্তিসিদ্ধি লাভ করিবেন।

অর্থাৎ পূজারী ব্রাহ্মণ দেব-শান্তির পরিবর্তে আত্মশান্তিকেই যে চরম লক্ষ্য মনে করিতেন, একটি শ্লোকে তাহার সুন্দর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :

শান্তিদ্বিজঃ প্রকুরুতে বহুদীপশান্তিং
পক্বাজ্যপায়সগুলৈর্জঠরাগ্নিশান্তিং
তত্রত্যবালবণিতা মদনাগ্নিশান্তিং
কালক্রমেণ পরমেশ্বরশক্তিশান্তিম্ ॥

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পর্তুগীজদের আবির্ভাবের পরে বিভিন্ন আঞ্চলিক নায়ক ও শাসকবৃন্দ সম্মিলিতভাবে দেশরক্ষার চেষ্টা না করিয়া ঘৃণ্য স্বার্থবুদ্ধির বশে সর্বনাশা আত্মকলহে মাতিয়া উঠিয়াছিল। কেরলের এই চরম দুর্যোগের দিনে রাম-ভক্তি ও কৃষ্ণ-ভক্তির প্রচারক এড়ুত্তচ্ছনের মধ্যে সাধারণ মলয়ালী যেন পরিত্রাতার আবির্ভাব দেখিতে পাইল। রাম অথবা কৃষ্ণের জীবন-চরিত বর্ণনায় কোথাও তিনি শৃঙ্গার-রসের অবতারণা করেন নাই। হয়তো তাঁহার এই মনোভাবই তাঁহাকে ভাগবত-রচনায় বিমুখ করিয়া থাকিবে।

১৯৭. আমরা প্রধানত "এড়ুত্তচ্ছণ্ডে রত্নঙ্গল্" (এড়ুত্তচ্ছনের রত্নসমূহ) নামক সংগ্রহ হইতে কবির ভক্তিমূলক রচনার কিছু কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি। এইগুলি হইতে দেখা যাইবে সাধারণভাবে মলয়ালম্ ভাষা কতটা সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মলয়ালম্ কিভাবে সংস্কৃতের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছে।

রামের দর্শন পাইয়া সঞ্জীবিত অহল্যা এইরূপে তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন : হে জগন্নাথ, আজ আমি কৃতার্থ যে আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম। কেবল তাহাই নয়, বহু যুগ আরাধনা করিয়াও যাহা পাওয়া যায় না, আজ তোমার অপরিসীম অনুগ্রহে ব্রহ্মা-রুদ্র

প্রভৃতি সেবিত তোমার সেই পাদপদ্মসংলগ্ন ধূলিকণা লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।[১] জটায়ুর রামবন্দনা এইরূপ :

অগণ্যগুণমাদ্যমব্যয়মপ্রমেয়
মখিলজগৎসৃষ্টিস্থিতিসংহারমূলং
পরমং পরাপরমানন্দং পরাত্মানং
বরদমহং প্রণতোঽস্মি সন্ততং রামম্। ইত্যাদি

নারদ কর্তৃক রামস্তুতি-র প্রথম চার পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

সীতাপতে রাম রাজেন্দ্র রাঘব।
শ্রীধর শ্রীনিধে শ্রীপুরুষোত্তম।
শ্রীরামদেব দেবেশ জগন্নাথ।
নারায়ণাখিলাধার নমোঽস্তুতে।

মোটকথা তুলসীদাসের ন্যায় এড়ুত্তচ্ছন্ যখনই সুযোগ পাইয়াছেন রামমাহাত্ম্য বর্ণনায় অকৃপণ কল্পনা-শক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ও বাল-ক্রীড়া ভক্ত কবিদের পক্ষে একটি মনোরম প্রসঙ্গ সন্দেহ নাই। রামের জন্মলীলা প্রসঙ্গে এড়ুত্তচ্ছন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এইরূপ : ভগবান বিষ্ণু যখন তাঁহার চিহ্নাদি লইয়া অবতীর্ণ হইলেন, তখন কৌশল্যার দৃষ্টিগোচর হইল সহস্রকিরণের আবির্ভাব। সহস্র মুনিসুর-বন্দিত ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তগণের নয়নানন্দ বিধানের জন্য প্রকট করিলেন তাঁহার সুন্দর চিকুর, করুণামৃতপূর্ণ নয়ন, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভিত ভুজযুগল। কুণ্ডল-মুক্তাহার-কাঞ্চি-নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কার, ইন্দুসদৃশ বদন, অনিন্দ্য সুন্দর পাদপদ্মের প্রতি পরমানন্দে বার বার তাকাইয়া সুন্দরগাত্রী কৌশল্যা যখন বুঝিতে পারিলেন ইনিই সেই মোক্ষদায়ী জগৎসাক্ষী পরমাত্মা সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ পুত্রের স্তুতি-

[১] জ্ঞানহো কৃতার্থয়ায়েন্ জগন্নাথ নিন্নে ইত্যাদি

বন্দনা করিতে লাগিলেন।[১] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় তুলসীদাসের 'ভএ প্রগট কৃপালা দীনদয়ালা কৌসল্যা হিতকারী' অথবা 'কহ দুই কর জোরী অস্তুতি তোরী কেহি বিধি করৌঁ অনন্তা' প্রভৃতি স্তবকগুলি।

রামচন্দ্রের বালক্রীড়া প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন যে প্রভু নানারূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়া ছোট ভাইদের সঙ্গে মাটিতে খেলা করিতেছেন। তাঁহার ললাটে অশ্বত্থপত্রাকৃতি সোনার টিক্‌লি, অঞ্জন-লেপনে কঞ্জনেত্র অধিকতর মঞ্জুল, কর্ণে উজ্জ্বল মণিকুণ্ডল, স্বর্ণদর্পণের ন্যায় তাঁহার গণ্ডদেশ, বনমালার সঙ্গে গলদেশে মুক্তার মালা শোভিত, বিস্তৃত বক্ষে তুলসীমাল্য, কাঞ্চন-সদৃশ পীতাম্বরের উপর কাঞ্চী ও নূপুর; এইরূপ নানাবিধ অলঙ্কার পরিয়া তিনি যখন মাটিতে খেলা করিতে লাগিলেন মনে হইল পৃথিবী একখানি অপূর্ব অলঙ্কারে শোভিত হইল।[২]

সুন্দরকাণ্ডে "রাবণের ইচ্ছাভঙ্গ" (রাবণণ্ডে ইচ্ছাভঙ্গম্) নামক অধ্যায়ে কবি সীতার সম্মুখে রাবণ কর্তৃক রামের নিন্দাপ্রসঙ্গে পরোক্ষরূপে তাঁহার ঈশ্বরত্বের কথা বলিয়াছেন। রাবণ আসিয়া বলিল—হে সুমুখি, শোন, আমি তোমার চরণপদ্মের দাস। হে শোভনশীলে, আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। আমি নিখিল জগতের অধিনায়ক অসুররাজ; আমাকে দেখিয়া তুমি নিজেকে এইরূপ লুকাইতেছ কেন?...তোমার পতি দশরথপুত্রকে তো সকলে দেখিতে পায় না, কেহ কেহ দেখিতে পায়; তাহাও সর্বদা

---

১ ভগবান্ পরমাত্মা মুকুন্দন্ নারায়ণন্
জগদীশ্বরন্ জন্মরহিতন্ পদ্মেক্ষণন্
ভুবনেশ্বরন্ বিষ্ণু তন্মুটে চিহ্নত্তোটু
মবতারং চেয়্তুপ্পোল্ কাণায়ি কৌশল্যয়্ক্কুং
সহস্রকিরণন্ মারোরুমিচ্ছোরুনেরং...

২ কালদেশাত্তে স্বর্ণাশ্বত্থপর্ণাকারমায়্...

নয়, কখনো কখনো। বহু অন্বেষণের পর কেবল ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে। হে সুমুখি, এইরূপ দশরথ-পুত্রের সহিত তোমার কী কাজ থাকিতে পারে? কোনো সময়ে কোনো বস্তুতেই তাহার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। সে গুণহীন। সুদৃঢ় ও নিরন্তর আলিঙ্গন করিলেও সে তোমাকে ভালোবাসিবে না। তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই, কখনই সে 'শক্তি' বিহীন নয়, তাহার সম্পর্কে তোমার করণীয় কিছুই নাই। সে কীর্তিহীন, কৃতঘ্ন ও নির্মম। হে প্রিয়ে, সে মানহীন, পণ্ডিত, বনচর-সহবাসী; তুচ্ছ বস্তুর প্রতি তাহার আকর্ষণ, ভালো মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার নাই। নীচজাতি ও ব্রাহ্মণ, কুকুর ও ধেনু—সবই তাহার কাছে সমান। তোমাকেই দেখুক অথবা কোনো শবরী তরুণীকেই দেখুক, তাহার কাছে কোনো ভেদাভেদ নাই।[১]

এড়ুত্তচ্ছনের রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতই শ্রেষ্ঠতর রচনা বলিয়া বিবেচিত হয়।[২] এই বৈষ্ণব কবি যে ভাগবতের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে মহাভারতে। দুইটি কারণ কবিকে মহাভারত-রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রথমত মূল মহাভারতের মধ্য দিয়া কৃষ্ণচরিত্রের এক অপূর্ব আস্বাদন লাভ;

১ শৃণু সুমুখি, তব চরণনলিনদাসোস্ম্যহং
শোভনশীলে, প্রসীদ প্রসীদ মে।
নিখিলজগদধিপমসুরেশমালোক্য মাং
নিম্নিলেনীমরঞ্জ্রন্তিরুন্নীটুবান্?.......
—শ্রীরামবিলাসম্ প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ

২ The change from Ezuttaccan's Adhyatma Ramayana to his Mahabharatam is like the one from flower to fruit. In the one we enjoy the fragrance and the promise of a flower and in the other the real sweetness in its finished manifestation....C. A. Menon—Ezuttaccan and his age p. 127

দ্বিতীয়ত কেরলের অতি প্রসিদ্ধ গুরুবায়ূর্[১] মন্দিরে কৃষ্ণবিগ্রহের সান্নিধ্য। কুরু-পাণ্ডব-কাহিনী মহাভারতের মূল প্রসঙ্গ হইলেও উহার প্রতি কবির বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডব-গৌরব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু। কবির দৃষ্টিতে পঞ্চ-পাণ্ডব যে গৌরবান্বিত তাহা কেবল তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণতার জন্য।

এই সংক্ষিপ্ত কাব্যখানিতে কৃষ্ণ যখনই আসিয়াছেন, কবি তাঁহার স্তুতিবন্দনায় কার্পণ্য করেন নাই। এখানেও আমাদের মনে আসে তুলসীদাসের রামচরিত্রের কথা। অজস্র কৃষ্ণ-স্তুতি হইতে আমরা দু'একটি নিদর্শন তুলিয়া দিতেছি। ভক্তকর্তৃক কৃষ্ণস্তুতির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

কৃষ্ণগোবিন্দ শিবরাম রামাত্মারাম !
লোকাভিরাম রমারমণ যদুপতে।
গোকুলপতে জগন্নায়ক ধরাপতে !
বিশ্বমায়য়ুং নীয়ে বিশ্বকারণং নীয়ে
বিশ্বকার্যবুং নীয়ে বিশ্বপালনুং নীয়ে
বিশ্বতাতনুং নীয়ে বিশ্বমাতাবুং নীয়ে…

তুমিই বিশ্বমায়া, তুমিই বিশ্বকারণ, তুমিই বিশ্বকার্য, তুমিই বিশ্বপালন, তুমিই বিশ্বপিতা, তুমিই বিশ্বমাতা ইত্যাদি। ভীষ্মকর্তৃক কৃষ্ণস্তুতি :

কমলদলনয়ন মধুমথন করুণানিধে !
কালমেঘাভিরামাকৃত শ্রীপতে !
জনিমরণভয়হরণনিপুণকরচরণযুগ !
জন্তুকল্ জীবনমায়্ জগৎপতে।…

১ পরে আমরা গুরুবায়ুর-প্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগ পাইব (দ্র° ২০০, ২০২, ২০৫)।

হে জগৎপতি, তুমি সমস্ত প্রাণীর জীবন-স্বরূপ ইত্যাদি। এইরূপ ইন্দ্র, জরাসন্ধ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কণ্ঠেও কৃষ্ণবন্দনা শোনা যায়।

১৯৮. সমগ্রভাবে দেখিল মনে হয় এড়ুত্তচ্ছন্ রাম-বন্দনার তুলনায় কৃষ্ণ-বন্দনায় সমধিক আনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার রাম পূজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পূজ্য দেবতার মহত্ত্বে দূরত্ব রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণ কবির হৃদয়বর্তী হইয়া সহজেই তাঁহার ভক্তি-ভালোবাসাকে আকর্ষণ করিয়াছেন। ভক্তকবির চোখে দেবত্ব ও মানবত্বের সমন্বিত রূপ—কৃষ্ণ; এবং সেই সমন্বয় চমৎকার রূপ লাভ করিয়াছে পার্থসারথির মধ্যে—যেখানে তিনি ভক্ত-সেবক রূপে বিশ্বজনীন বেদনার প্রতিমূর্তি। পার্থসারথির বর্ণনায় কবি-কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত। রণক্ষেত্রে কর্ণ অর্জুনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার সারথি শল্য কৃষ্ণচালিত রথের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। কবি শল্যের মুখ দিয়া আমাদের কৃষ্ণরূপের বর্ণনা শুনাইতেছেন। নয়নের বর্ণনা এইরূপ—ভক্তজনের অভিমুখিনী যে করুণা, দুষ্কৃতি-নাশন যে ক্রোধ, রমণী-মনোমোহন যে ভালোবাসা, যুদ্ধাবলোকনে যে বিস্ময়, শত্রুসূদনে যে সন্ত্রাস এবং অযোগ্যাধিকারে যে পরিহাস—এই সমস্ত মিলিত সৌন্দর্য তাঁহার নয়নে উদ্ভাসিত।[১]

১৯৯. এড়ুত্তচ্ছনের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে আমরা পূর্বগামী ভক্ত কবি চেরুশ্‌শরির সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটা বুঝিয়া লইতে চাই। তুলনা দিয়া বলা যায়, হিন্দী সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ কবি সূরদাস ও তুলসীদাসের মধ্যে যে ব্যবধান, মলয়ালম্

১ (ক) C. A. Menon—Ezuttaccan and his age p. 145
(খ) K. M. Panikkar এড়ুত্তচ্ছনের মহাভারত সম্পর্কে বলিয়াছেন—His *abridged rendering of Mahabharata is perhaps the most* widely read book in Malayalam, both as a literary work of great beauty and popular encyclopaedia of ethics and morals. A History of Kerala p. 427

সাহিত্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সূরদাসের আদর্শ ভাগবতের কৃষ্ণ, চেরুশ্‌শরিরও তাই। সূরদাসের কাব্যের মতো চেরুশ্‌শরির কাব্যেও শৃঙ্গার (এবং তৎসহ বাৎসল্য) রসের প্রাধান্য। সূরদাসের রচনামাধুর্যে যেমন হিন্দী-জগৎ মুগ্ধ, কেরলীয় জনসাধারণও অনুরূপ মুগ্ধতা লইয়া চেরুশ্‌শরির কাব্যের রসাস্বাদন করে। অবশ্য দুজনের কাব্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র—সূরদাস গীতকাব্যের স্রষ্টা; চেরুশ্‌শরি লিখিয়াছেন প্রবন্ধকাব্য। সূরদাসের ন্যায় কেবল জীবনের এক পক্ষে (শৃঙ্গার রসে) নিমগ্ন না থাকিয়া তুলসীদাস জন-মানস গঠনের জন্য রামভক্তির মধ্য দিয়া জীবনের বিচিত্র রূপের সন্ধান দিয়াছেন; এড়ুত্তচ্ছন্‌ও কেরলে বসিয়া ঠিক সেই কাজ করিয়াছেন রামভক্তি ও মহাভারতীয় কৃষ্ণভক্তিকে আশ্রয় করিয়া।[১] তুলসীদাস ও এড়ুত্তচ্ছনের রামায়ণ নিজ নিজ অঞ্চলে সম-মর্যাদার অধিকারী।

২০০. এড়ুত্তচ্ছনের যুগে আমরা আরও কয়েকজন ভক্ত কবির সন্ধান পাই। তাঁহাদের মধ্যে অন্তত দুইজন—মেল্‌পত্তূর নারায়ণ ভট্টতিরি এবং পূন্তানম্ নম্পূতিরি—বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সমসাময়িক কবি হওয়া সত্ত্বেও ইঁহাদের রচনার ভাষা হইয়াছে স্বতন্ত্র। পূন্তানম্ লিখিয়াছেন মলয়ালম্-এ আর ভট্টতিরি লিখিয়াছেন সংস্কৃতে। মলয়ালম্ দ্রাবিড়গোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হওয়া সত্ত্বেও উহার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা ইতিপূর্বে একবার বলা হইয়াছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে সামূতিরি-র রাজসভা সংস্কৃত চর্চার জন্য সমগ্র দক্ষিণভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে।[২]

---

১ কেহ কেহ এড়ুত্তচ্ছনের অন্যতম রচনা রূপে একখানি ভাগবতের উল্লেখ করিলেও প্রবীণ মলয়ালী পণ্ডিত চেলনাট অচ্যুত মেনোন্ এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এড়ুত্তচ্ছন্-সম্পর্কিত তাঁহার আলোচনায় ভাগবতের উল্লেখ নাই।

২ সামূতিরি রাজসভায় এক সময়ে কবির সংখ্যা ছিল সাড়ে

নারায়ণ ভট্টতিরিও (১৫৬০-১৬৪৮) ছিলেন এই রাজসভার কবি। কেরলের সুপ্রসিদ্ধ গুরুবায়ুর্[1] কৃষ্ণমন্দিরে থাকিয়া তিনি সহস্রাধিক স্তবকে যে সংক্ষিপ্ত ভাগবত রচনা করেন তাহা 'নারায়ণীয়ম্' নামে পরিচিত। সমগ্র ভাগবতের বিষয়সমূহকে একশত বিভাগে বিন্যস্ত করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের উপর এক একটি 'দশক' (দশটি শ্লোকের সমষ্টি) রচনা করিয়াছেন। কোনো কোনো বিষয়ে ১১টি শ্লোকও রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে এক কথায় 'ভাগবতসার' নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে।

আমরা তিন চারিটি শ্লোকের সাহায্যে কবির রচনাশৈলীর কিছু পরিচয় লইব। বালক্রীড়া প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

মৃদু মৃদু বিহসন্তাবুন্মিষদ্দন্তবন্তৌ
বদনপতিতকেশৌ দৃশ্যপাদারজনেশৌ।
ভুজগলিতকরান্তব্যালগৎ কঙ্কণাঙ্কৌ
মতিমহরতমুচ্চৈঃ পশ্যতাম্ বিশ্বনৃণাম্॥ ২ ॥

অক্রূরের মথুরা হইতে গোকুলযাত্রা প্রসঙ্গে—

দ্রক্ষ্যামি বেদশতগীতগতিং পুমাংসং
স্প্রক্ষ্যামি কিংস্বিদপি নাম পরিষ্বজেয়ম্।
কিং বক্ষ্যতে স খলু মাং ক্বনু বীক্ষিতঃ স্যা-
দিত্থং নিনায় স ভবন্ময়মেব মার্গম্॥ ৪ ॥

শততম দশকে কৃষ্ণের কেশাদিপাদান্ত বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় পাঠক বুঝি সত্যই ভগবান্ শ্রীগুরুবায়ুর্ মন্দিরেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রারম্ভিক শ্লোকটি এইরূপ—

আঠারো। অর্থাৎ আঠারো জন সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পূর্ণ কবি; আর একজন (রামায়ণচম্পুপ্রণেতা পুনম্ নম্বূতিরি) ভাষা-কবি বলিয়া অর্ধ কবি। ইহা হইতে তৎকালীন কেরলে সংস্কৃতের মহিমার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে।

১ মধ্য কেরলে ত্রিচুর জিলার অন্তর্ভুক্ত।

অগ্রে পশ্যামি তেজো নিবিড়তরকলয়াবলীলোভনীয়ং
পীয়ূষাপ্লাবিতোঽহং তদনু তদুদরে দিব্যকৈশোরবেষম্।
তারুণ্যারম্ভরম্যং পরমসুখরসাস্বাদরোমাঞ্চিতাঙ্গৈ-
রাবীতং নারদাদ্যৈর্বিলসদুপনিষৎ সুন্দরীমণ্ডলৈশ্চ॥

২০১. মেল্‌পত্তুর নারায়ণ ভট্টতিরি সংস্কৃতে রচনা করিলেও আধুনিক শিক্ষিত কেরলবাসীর কণ্ঠে তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃত সাধারণের দুরধিগম্য বলিয়া নম্বূতিরি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় যে সংস্কৃত-মিশ্র মলয়ালম্ বা মণিপ্রবালম্ রীতির প্রবর্তন করেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (দ্র° ১৮০)। ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই রীতির জোর প্রচলন ছিল। 'পচ্চা (খাঁটি) মলয়ালম্'-এর কবি এড়ুত্তচ্ছন্ প্রসঙ্গেও আমরা দেখিয়াছি কিভাবে মাঝে মাঝে মলয়ালম্-এর সহিত সংস্কৃতের মণি-প্রবাল-যোগ ঘটানো হইয়াছে। জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণচরিতম্" হইতে একটি নিদর্শন তুলিয়া দিতেছি। বর্ণনায় বলা হইয়াছে: মুচুকুন্দও চিৎ-স্বরূপ কৃষ্ণকে দেখিয়া এই প্রকার স্তব করিতে লাগিল—হে লৌকিক বীজভূত বৈকুণ্ঠপতি, তোমাকে নমস্কার। হে কমলাপতি, আমি ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত রাজা। আমি জানি রক্ষাশিক্ষাদি দুঃখসমূহ (অতিক্রম করা) সহজ নয়। হে বিভো, আমি এখানে আসিয়া এত কাল যাবৎ শয়ন করিয়া আছি। পুত্রমিত্র-কলত্রাদি বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নাই। সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভক্তি-ভাবিতচিত্তে আমি শঙ্করাদিসেবিত তোমার চরণ সেবা করিতেছি। তোমার প্রতি ভক্তি থাকিলেই আমার মুক্তি আসিবে—

ইতি চিদ্রূপমালোক্য স্তুতিচ্চু মুচুকুন্দনুম্।
লৌকিকবীজভূতায় বৈকুণ্ঠায় নমোঽস্তুতে॥
ইক্ষ্বাকুকুলজাতন্ ঞান্ ভূপালন্ কমলাপতে।
রক্ষাশিক্ষাদিদুঃখঙ্গলক্কেলুতল্লেন্নুরচ্চু ঞান্॥

অত্রবন্ন্ শয়িকুন্নেনেত্রকালুগুমং বিভো।
পুত্রমিত্রকলত্রাদিবিষয়াগ্রহমিল্ল মে ॥
নিঙ্গল্ ভক্তিভবিক্কেণং সঙ্কটং মম তিরুবান্।
নিঙ্গলক্কু বণঙ্গুন্নেন্ শঙ্করাদিনিষেবিতং।
ভক্তি নিঙ্গল্ ভবিক্কুম্বোল্ মুক্তিমার্গং বরুন্নতো ॥

(শ্লোক ৩০-৪০)

কেরলে মলয়ালম্ ও মণিপ্রবালম্—পাশাপাশি এই দুইটি ভাষারীতির এমন প্রবল চর্চা হইয়াছে যে, অনেক সময়ে একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করা কঠিন। মনে হয় যেন কিছু কিছু সংস্কৃত তৎসম শব্দ এবং বিভক্তি-প্রত্যয়াদির হেরফের ঘটাইলেই এক রীতিকে অপর রীতিতে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে।

২০২. এই পরিবেশের মধ্যে এড়ুত্তচ্ছনের সমসাময়িক অপর এক ভক্ত কবির আবির্ভাব ঘটিল যিনি নারায়ণ ভট্টতিরির ন্যায় গুরুবায়ূর্ মন্দিরের দেবতার অনুগ্রহ-লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম পূন্তানম্ নম্বূতিরি (জন্ম ১৫৫৫ খ্রী°)। চেরুশ্শরি, এড়ুত্তচ্ছন্ ও পূন্তানম্—কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যের ইতিহাস এই তিনটি নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য।

পূন্তানম্-এর রচনার পরিমাণ বেশি নয়। রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবতের ন্যায় কোনো বৃহৎ গ্রন্থ তিনি রচনা করেন নাই। যে তিনখানি গ্রন্থের জন্য তিনি কবিরূপে স্মরণীয় হইয়া আছেন, উহারা ক্ষুদ্রাকৃতি। সন্তানগোপালম্, জ্ঞানপ্পান এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ —তিনখানিই ভক্ত মলয়ালীদের পক্ষে অতি সমাদরের বস্তু।

২০৩. ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮৯তম অধ্যায়ের ২২-৬৪ শ্লোক সমূহের মধ্যে পুত্রশোকাতুর এক ব্রাহ্মণের বিবরণ রহিয়াছে, তাহাই 'সন্তান গোপালম্'-এর বিষয়বস্তু। চারিটি পাদে সম্পূর্ণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অনেকাংশে বর্ণনাত্মক। দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন তাঁহার প্রতিটি সন্তানের

অকালমৃত্যুর কথা নিবেদন করেন, তখন চিন্তান্বিত কৃষ্ণ নীরব থাকিলেও অর্জুন সহসা অভয়বাক্যদানে ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করিল—এই পর্যন্ত প্রথম পাদের বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় পাদে গর্ভবতী ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্রলাভ এবং অর্জুনের চেষ্টা সত্ত্বেও উহার মৃত্যু। তৃতীয়পাদে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ-কুমারকে রক্ষা করিতে না পারিয়া ব্যর্থ ক্ষুব্ধ অর্জুন অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে ভক্তানুগ্রহপরতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া অর্জুনকে লইয়া বৈকুণ্ঠে যাত্রা করিলেন। চতুর্থপাদে বৈকুণ্ঠ যাত্রাবর্ণনা, বৈকুণ্ঠের বর্ণনা এবং ভগবৎপ্রসাদে ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রদের পুনর্জীবনলাভ।

২০৪. ৩৫৬ ছত্রে সম্পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতেছে 'জ্ঞানপ্লান' অর্থাৎ জ্ঞান-সংগীত। ভাগবতের অজামিল উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায়ের তত্ত্বগুলি এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। কলি যুগে ভগবৎ নাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ উপায় এবং 'জনন-মরণ'-রূপী সংসারের দুঃখ-কর্ম-বিপাকাদির মধ্যে বিবেক বৈরাগ্যই প্রশস্ত পথ—ইহাই মোটামুটিরূপে জ্ঞানপ্লানের সংক্ষিপ্তসার। একটি অংশে বলা হইয়াছে ঃ এই মুহূর্তে যাহাদের দেখা যাইতেছে পরমুহূর্তে আর তাহাদের দেখা যাইবে না—ইহাই তোমার লীলা। দুই চারিদিনের মধ্যে তুমি দরিদ্র ব্যক্তিকে পাল্‌কি-তে চড়াইতে পার, আবার দুই চারিদিনের মধ্যে তুমি উচ্চ প্রাসাদবাসী-কে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাইতে পার। (৯-১৪ পঙ্‌ক্তি)

একটি স্থলে মাত্র দুইটি পঙ্‌ক্তির মধ্য দিয়া কবির যে প্রগাঢ় ভগবদ্‌ভক্তির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার উল্লেখ অবশ্যই কর্তব্য। আরাধ্য দেবতার কাছে মানুষের প্রকাশ্য কাম্যবস্তুর মধ্যে অন্যতম হইতেছে পুত্র—'পুত্রং দেহি ধনং দেহি সর্বান্‌ কামাংশ্চ দেহি মে'। কিন্তু কবি বলিতেছেন অন্যরূপ—"বাল-কৃষ্ণ যতক্ষণ আমার হৃদয়-মন্দিরে খেলা করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পুত্ররূপে আমার অঙ্ক

বালকের প্রয়োজন কী?"[১] বাৎসল্য-রসের মধুরতর অনুভূতি ইহা অপেক্ষা আর কী হইতে পারে?

২০৫. সন্তান গোপালম্ নয়, জ্ঞানপ্পান-ও নয়, মলয়ালী ভক্তজনের নিত্য সহচর হইল পূন্তানম্ নম্বূতিরি-র ১৬৯টি স্তবকে সম্পূর্ণ স্তোত্র গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্'। 'গুরুবায়ুর্ অপ্পা' অর্থাৎ গুরুবায়ুর্ মন্দিরের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের সংস্কৃত-কাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃতম্-এর পরে কেরলের একাধিক কবি ভাষায় অর্থাৎ মলয়ালম্-এ উক্তনামাঙ্কিত গ্রন্থ রচনা করিলেও পূন্তানম্ নম্বূতিরি-র রচনাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম স্তবকে কবি তাঁহার দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—হে উদারকীর্তি, তুমি আমাকে আদেশ দিয়াছিলে তোমার গুণকীর্তি রচনা করিতে। সামান্য ভাষায় আমি আমার শক্তি অনুযায়ী যাহা বলিব, আশা করি তাহা তোমার প্রীতিকর হইবে।[২]

বিল্বমঙ্গলের গ্রন্থে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, পূন্তানম্-এর গ্রন্থে সেরূপ হয় নাই। ইহাতে কৃষ্ণাবতারের বিবিধ লীলার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সবকিছুর মধ্য দিয়া তাঁহার নাম মাহাত্ম্যকীর্তনই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। ২৪ সং স্তবকে কবির বক্তব্য এইরূপ: তুমি গোকুলের অলঙ্কার, শত্রুকুলের পক্ষে ভয়ঙ্কর; দধি-দুগ্ধ-মাখনের অপহারক, দুরাত্মাদের দণ্ড-দাতা; তুমি মহাপাপের শোষণকারী, রমণীকুলের আনন্দবর্ধনকারী; হে প্রভু, তোমার চরণের নূপুরধ্বনি আমার হৃদয়-মালিন্য দূর করুক।

---

১ উন্নীকৃষ্ণন্ মনসসিল্ কলিক্কুম্বোল্
উন্নীকল্ মট্টু বেণমো মক্কলায়্? (পংক্তি ২৯৫-২৯৬)

২ কর্ণামৃতং রামপুরাধিবাসিন্!
নিন্মাল্ মতং কিঞ্চন ভাষয়ায়্ ঞান্
এন্মাল্ বন্নং বন্নমুদারকীর্তে!
চোন্নালতুং প্রীণনমায়্ পরেণম্।

কথিত আছে, পূন্তানম্ তাঁহার কৃষ্ণকর্ণামৃত রচনার পরে গুরুবায়ুর্ মন্দিরের অন্যতম উপাসক পাণ্ডিত্যাভিমানী কবি 'নারায়ণীয়ম্' গ্রন্থের রচয়িতা মেল্পত্তূর নারায়ণ ভট্টতিরি-কে দেখাইতে গিয়াছিলেন। সংস্কৃতের পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় রচনা দেখিয়া ভট্টতিরি পূন্তানম্-এর গ্রন্থ অবজ্ঞাভরে ছুঁড়িয়া ফেলিলে সেইদিন রাত্রিতে গুরুবায়ুর-দেবতা ভট্টতিরি-কে স্বপ্নে বলিয়া গেলেন, ভট্টতিরি অপেক্ষা পূন্তানম্-এর ভক্তি-সাধনায় তিনি অধিকতর তৃপ্ত। এই লোক-পরম্পরাগত কাহিনী লইয়া আধুনিক কেরলের শ্রেষ্ঠ কবি বল্লত্তোল্ 'ভক্তিয়ুং বিভক্তিয়ুং' (ভক্তি ও জ্ঞান) নামে একটি মধুর মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি স্তবকে আলিঙ্গনাবদ্ধ কৃষ্ণমূর্তি বর্ণনায় বলা হইয়াছে : এক স্থলে তুমি মেঘ-শ্যাম, অন্যস্থলে তুমি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র। যখন তোমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া অপূর্ব দ্যুতি ধারণ কর, আকাশবাসী দেবগণ সেই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হন। হে প্রভু, তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর (পদ সং ৩৯)। আর একটি স্তবকে দেখিতে পাই বৃন্দাবনচারী কৃষ্ণমূর্তির বর্ণনা : কালিন্দী তীরবর্তী পথে ও বনভূমিতে গোপীজন সঙ্গে লইয়া তুমি যখন গোচারণ কর, তখন হে কৃষ্ণ, করুণা-সিন্ধু, ভুবনপতি, তোমার শ্রীপাদযুগলকে স্পর্শ করিতে চাহিলেও আমি তোমার কাছে অগ্রসর হইতে পারি না। বল, আমি কী করিব? তোমার প্রতি আমার মোহ এইরূপ। হে প্রভু, তুমি আমাকে পথ দাও (পদ সং ৮)।

তামিল ভক্তকবি অরুণগিরিনাথর্ (ষোড়শ শতক) "তিরুপ্পুকল্" গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে মৃত্যু বর্ণনা প্রসঙ্গে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—বৃথা মৃত্যুই কি আমার পরিণাম (অবত্তিনিলে ইরত্তল্ কোলো?), যমদূতের হাতে ধৃত হইয়া আমি যেন না মরি (কালরূকৈপ্ পড়িন্দু মডিয়াদে), মাহষের পিঠে চড়িয়া পাশ ও গদা হস্তে যমদূত যখন প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে আসিবে তখন হে

ময়ুর-বাহন, তুমি আসিয়া আমাকে রক্ষা করিও (কনৈত্তু এলুম্ পকডত্তু পিডর্ নিচৈ বরু ইত্যাদি)। অরুণগিরির সমসাময়িক কেরল-কবি পূন্তানম্‌ও তাঁহার দেবতার কাছে অনুরূপ প্রার্থনা-ভঙ্গীতে বলিয়াছেন : হে নারায়ণ, কণ্ঠনালীর পথে বায়ুর প্রবেশ যখন রুদ্ধ হইয়া আসে, শ্বাস ক্রমেই ক্ষীণতর হইতে থাকে, মনের ভাবনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, যমরাজ তাহার দীর্ঘরজ্জু লইয়া সম্মুখে দাঁড়ায় এবং আত্মীয়স্বজনগণ চোখের জল ফেলিতে থাকে···হে প্রভু তুমি আমাকে এই দুর্দৈব হইতে বাঁচাও, বাঁচাও ; আমার অদৃষ্টে যেন এইরূপ না ঘটে (পদ সং ১৫২)।

২০৬. মহাপ্রভু তাঁহার অন্ত্যলীলায় লীলাশুকের কৃষ্ণকর্ণামৃত যে কিরূপ আস্বাদন করিতেন তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তথাপি চৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হইতেছে। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-প্রলাপ ॥

(অন্ত্যলীলা চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)

এইরূপ অবস্থায় একদিন স্বরূপ গোস্বামী অন্যান্য শ্লোকের মধ্যে "কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া" কৃষ্ণকর্ণামৃতের এই শ্লোকটিও (৪২ সং) গান করিয়া শুনাইলেন। কবিরাজ এই শ্লোকের বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে এক জায়গায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেশ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন হা হা পদ্মলোচন
হা হা দিব্যসদ্‌গুণসাগর
হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বরধর
হা হা রাসবিলাসনাগর ॥ (অন্ত্য—১৭)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় পূন্তানম্ নম্বূতিরি-ও ঠিক একই ভাবে লীলাশুকের শ্লোকে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রায় একই সময়ে একই ভঙ্গীতে গাহিয়া উঠিলেন—

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ কৃপাম্বুরাশে !
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ শৃণুষ্ব বিষ্ণো !
হী কৃষ্ণ হী কৃষ্ণ মহত্যুপেক্ষা
মা কৃষ্ণ মা কৃষ্ণ পরিত্যজাস্মান্ ॥ ১৫৯ ॥

২০৭. কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যধারার এই শেষ প্রতিনিধি-কবি সম্পর্কে আধুনিক কেরলের মহাকবি বল্লত্তোলের একটি কাব্যাংশ দিয়া আমরা আলোচনার উপসংহার করিতেছি। পূন্তানম্ নম্বূতিরির জীবন-চরিত হইতে গৃহীত একটি কাহিনী অবলম্বনে বল্লত্তোল্ যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন (কবিতাটির নাম "আ মোদিরং" অর্থাৎ "সেই আংটি"), তাহার একাংশ এইরূপ : ইনি একজন সামান্য নম্বূরি নন, কেরল ভাষা-রূপিণী গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বর্ণমুরলীর মধুরধ্বনি শুনিয়াছে এই নম্বূরির কণ্ঠ হইতে—

কেবলনোরু নম্বূরিয়ল্লিহু,
কেরলভাষয়াকিয় গোপিয়াল্
কেশবণ্ডে পোন্নোটক্কুলল্‌বিলি
কেট্টতিত্তিরু বক্ত্রত্তিল্ নিন্নল্লো।

সপ্তম অধ্যায়

মরাঠী ভক্তিসাহিত্য

২০৮. ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে উত্তরাপথের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ভৌগোলিক দৃষ্টিতে মহারাষ্ট্র দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। ঐতিহাসিকবৃন্দ মহারাষ্ট্রকে দাক্ষিণাত্যের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই ডেকান্ বা দক্ষিণাপথের ইতিহাসে সকলের আগে বলা হয় মহারাষ্ট্রের কথা। এই প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গতি-অসঙ্গতি বিচার না করিয়া আমরা বলিতে পারি, মহারাষ্ট্র উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ভারতের সংযোজক, উভয় সংস্কৃতির মিলন-ভূমি। আমাদের আলোচ্য ভক্তিসাহিত্যের ধারা হইতেও সেই কথা প্রমাণিত হয়।

২০৯. বিট্‌ঠলনাথের লীলানিকেতন "ভূ-বৈকুণ্ঠ" পঁঢরপুর[১] মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত হইলেও কর্ণাটকের দাস-সম্প্রদায়ের ভক্তি-সাধনাও এই দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ভক্তিধর্মের বিকাশ ও প্রসারের ধারা চিন্তা করিলে কর্ণাটকী ভক্তদের সঙ্গেই পঁঢরপুর ও বিঠলের যোগ প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। বিঠলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পূজারী পুণ্ডলীক ছিলেন কর্ণাটকী সাধু। পরে অল্পদিনের মধ্যেই কর্ণাটকের ভক্তি-আন্দোলন মহারাষ্ট্রে প্রসার লাভ করে।[২] যতদূর জানা যায়, পঁঢরপুর

১ শোলাপুর জিলার ভীমানদী এবং উহার শাখানদী চন্দ্রভাগার তীরে পঁঢরপুর অবস্থিত।

২ The saints of Karnataka were the first to develop the cult of devotion to Viththala........Their example was subsequently taken up and carried further by the saints of the neighbouring region of Maharashtra. Madhva's teachings p. 166

১৯৬০ সালে প্রকাশিত The cult of Vithoba গ্রন্থের লেখক G.

এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে[১] (দ্র° ১০৭)।

২১০. কর্ণাটকী দাসসাহিত্যের মূল প্রবর্তক মধ্বাচার্যের (১১৯৭-১২৭৬ খ্রী°) তিরোভাবের অব্যবহিত পূর্বে মহারাষ্ট্রে আবির্ভূত হন প্রসিদ্ধ মরাঠী সাধক-কবি জ্ঞানেশ্বর (১২৭১-১২৯৬ খ্রী°)। তাঁহার জীবন-চরিত হইতে জানা যায় তাঁহাব মানসলোকে ছিল দুইটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারার প্রবাহ—একটি উত্তরাপথের নাথধর্ম, অপরটি দক্ষিণা-পথের ভক্তিধর্ম। দ্বাদশ শতকে মহারাষ্ট্রে নাথপন্থের যে খুবই প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল তাহা বোঝা যায় মহারাষ্ট্রের মচ্ছিন্দ্রগড়, গোরক্ষগুহা, গহিনীনাথের মঠ প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নামগুলি

A. Deleury পুণ্ডলীককে মরাঠী ভক্ত বলিয়া অনুমান করিলেও তাঁহার উপর কর্ণাটকী হরিদাস সম্প্রদায়ের প্রভাব তিনিও স্বীকার করিয়াছেন—he may have been influenced by the Haridasa Panth of Karnataka p. 202.

১ মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে গল্পটি প্রচলিত তাহা সংক্ষেপে এইরূপ: একদিন দ্বারকায় বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে স্মরণ করিলেন। হিমালয়ে অবস্থিতা বিরহিণী তপস্বিনী রাধিকা দ্বারকায় আসিয়া কৃষ্ণের সেবা-পরায়ণ হইলে অভিমান-ক্ষুব্ধ রুক্মিণী গৃহত্যাগ করেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে পঁঢরপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুণ্ডলীকের গৃহে আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করেন। বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবায় ব্যস্ত পুণ্ডলীক তাড়াতাড়ি আঙিনায় একখানি ইট ফেলিয়া দিয়া অতিথিকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কৃষ্ণ সেই ইষ্টক-খণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইলে কোথা হইতে রুক্মিণী আসিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পরবর্তী কালে পুণ্ডলীক ও বিঠোবা উভয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে এই কাহিনীর একটু সঙ্গত রূপ দেওয়া হয় এই ভাবে: পুণ্ডলীকের হরি-ভক্তি দেখিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং পঁঢরপুরের ভক্ত-সন্নিধানে উপনীত হন। অতঃপর তাঁহার পত্নী আসিলেন নিখোঁজ স্বামীর সন্ধানে। কটিদেশে হাত রাখিয়া ইটের উপর দণ্ডায়মান—পঁঢরপুরের এই কৃষ্ণমূর্তি সম্পর্কে মরাঠীভাষায় একটি প্রচলিত কথা আছে: 'বিটেবরী উভা কটেবরী হাত।' নামদেব, তুকারাম প্রভৃতি মরাঠী সাধক পুণ্ডলীককেই বিট্‌ঠলভক্তির প্রবর্তক বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে নামদেবের কয়েকটি

হইতে।[১] জ্ঞানেশ্বর এবং তাঁহার পরবর্তী মরাঠী ভক্তকবি নামদেব (১২৭০-১৩৫০ খ্রীº) উভয়েই নাথ-সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। গোরক্ষনাথ, গৈনীনাথ, নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানেশ্বর, বিসোবা খেচর ও নামদেব—এই শিষ্যপরম্পরা হইতে দেখা যায় গোরক্ষনাথ হইতে জ্ঞানেশ্বর চতুর্থ এবং নামদেব ষষ্ঠস্থানভুক্ত।

মহারাষ্ট্রে নাথপন্থের এই প্রাধান্যের যুগেই কাবেরী-তাম্রপর্ণী-কৃতমালা-পয়স্বিনীর তীরে উদ্‌ভূত দক্ষিণের ভক্তিধর্ম কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করিয়া মহারাষ্ট্রে আসিয়া উপনীত হয়। এবং সেই সঙ্গে আসে আলোয়ার-প্রবর্তিত নাম-সংকীর্তনের ধারা। জ্ঞানেশ্বর-নামদেবের নেতৃত্বে নাথপন্থী মরাঠী জনসাধারণও সেই নাম-সংকীর্তনে প্রভাবিত হইয়া পঁঢরপুরের বিট্‌ঠল বা বিঠোবার মধ্যেই সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শনলাভ করে।

একদিকে নাথধর্ম, অন্যদিকে ভক্তিধর্ম—এই দু'য়ের যুগপৎ প্রভাবে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের ধর্মসাধনা একটু মিশ্ররূপ লাভ করে। নাথপন্থী জ্ঞানী জ্ঞানেশ্বর চাহিয়াছিলেন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে যোগমার্গের মধ্যে দিয়া অনুভব করিতে। এইরূপ অদ্বৈততত্ত্ব ও যোগসাধনার সহিত ভক্তির সমাবেশ করিয়া জ্ঞানেশ্বর মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবধর্মের সূচনা করিয়া যান।[২]

পংক্তি এইরূপঃ যুগে অঠ্‌ঠাবীস বিটেবীর উভা। বামাঙ্গী রখুমাঈ (রুক্মিণী) দিসে দিব্যশোভা॥ পুণ্ডলীকাচে ভেটীপর ব্রহ্ম আলেগা। চরনী বাহে ভীমা উদ্ধরীজগা॥ (আটাশ যুগ ধরিয়া ইটের উপর দণ্ডায়মান, দিব্য সৌন্দর্য শোভা পায় রখুমাঈ-এর বাঁ দিকে। জগতের উদ্ধারের জন্য ভীমা প্রবাহিত সেই পরব্রহ্মের চরণতলে—যিনি আসিয়াছেন পুণ্ডলীকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে।) মহারাষ্ট্রে রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা বিঠোবা-রখমাঈ অর্থাৎ কৃষ্ণরুক্মিণী অধিকতর প্রচলিত। মরাঠীভাষায় তাই যোগ্য বর-বধূ বুঝাইতে সাধারণ কথায় বলা হয়—বিঠোবা-রখমাঈ।

১ কার্বে সম্পাদিত 'মহারাষ্ট্র পরিচয়' পৃ ৫৭৬

২ কার্বে সম্পাদিত 'মহারাষ্ট্র পরিচয়' পৃ ৫৭৬

২১১. এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন স্বয়ং জ্ঞানেশ্বর। পঁচিশ বৎসরেরও পরমায়ুলাভ যাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, সেই ক্ষণজীবী মানুষটি মরাঠী সাহিত্যের ইতিহাসে চিরজীবী হইয়া রহিলেন। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে (১২৯০ খ্রী°) তিনি রচনা করেন তাঁহার অমরকীর্তি —মরাঠী ছন্দে ভগবদ্‌গীতার সুপ্রসিদ্ধ টীকা—লেখকের নামানুসারে যাহা 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে সুপরিচিত। দ্বাদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (১১১৪-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)—মরাঠী সাহিত্যের ইতিহাসে এই দীর্ঘ আড়াইশত বৎসর 'জ্ঞানেশ্বরযুগ' বলিয়া অভিহিত। 'বিবেকসিন্ধু' ও 'পরমামৃত'-এর রচয়িতা কবি মুকুন্দরাজ (জন্ম ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞানেশ্বর তথা মরাঠী সন্ত-সাহিত্যের আগমনী গাহিয়া গেলেন। অদ্বৈতবাদী মুকুন্দরাজ ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ দুই রূপেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, নির্গুণ ব্রহ্ম ভক্তের অনন্য ভক্তি ও অপ্রতিম অনুরাগের ফলেই প্রসন্ন হইয়া সগুণ স্বরূপ ধারণ করেন।

মরাঠী সাহিত্যের এই ঐতিহ্যের মধ্যে ত্রয়োদশ শতকের চতুর্থ-পাদে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের সমকালীন আবির্ভাবের ফলে মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বারকরী সম্প্রদায়[১] জন্মলাভ করে। যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বারকরী সম্প্রদায়ের ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তিনি পঁঢরপুরের দেবতা বিট্‌ঠল, বিঠোবা বা পাণ্ডুরঙ্গ[২]।

---

১ "বারকরী" শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ : বারী (বারবার যাত্রা) করী (করে যে) অর্থাৎ নিয়মিত যাত্রী। দেশের চারিদিক হইতে ভক্ত বৈষ্ণব দলে দলে পঁঢরপুরস্থিত বিট্‌ঠলকে দেখিবার জন্য বৎসরে একাধিকবার যাত্রা করিত বলিয়াই তাহাদের নাম হইয়াছে "বারকরী"। আষাঢ়ী একাদশী ও কার্তিকী একাদশীতে পঁঢরপুরে যাওয়া বারকরীর অবশ্য কর্তব্য।

২ বিট্‌ঠল শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—কন্নড়

এই নবজাত ভক্তবৃন্দ নাথপন্থের আভ্যন্তরীণ ধারাকে স্বীকার করিয়া লইয়া গৃহস্থ-আশ্রমেই ভক্তির সহজ সাধনা প্রচার করেন। নাথপন্থে পূর্ব হইতেই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর আধিপত্য চলিয়া আসিতেছিল। বারকরী সম্প্রদায়ের ভক্তি-সাধনায় সেই ধারাই অনুসৃত হইল। ইহার একদিকে যেমন ব্রাহ্মণের ছেলে জ্ঞানেশ্বর, অপরদিকে দরজির ছেলে নামদেব। ইহা ছাড়া মরাঠী সন্ত-কবিদের মধ্যে কামার-কুমার-নাপিত-মালি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর এবং মুক্তাবাঈ, জনাবাঈ, নির্মলাবাঈ প্রভৃতি মহিলা-কবিরও সন্ধান পাওয়া যায়। মোটকথা, উচ্চ-নীচ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের নেতৃত্বে বারকরী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে।

২১২. বারকরী সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বিট্‌ঠলকে সম্বোধন করিয়া জ্ঞানেশ্বর গাহিলেন—আমার নয়ন যখন তোমার রূপদর্শন করে, তখন কতই আনন্দ পাই। তুমি অনুপম বিট্‌ঠল, তুমি

ভাষায় বিষ্ণু শব্দের অপভ্রংশে প্রচলিত ছিল বিট্‌ঠু। উহার সহিত আদরার্থে 'ল' এবং 'বা' প্রত্যয় যোগ করিয়া 'বিট্‌ঠল' এবং 'বিঠোবা' শব্দ গঠিত হয়। কর্ণাটকী কবিদের রচনাতে 'বিঠল' শব্দের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। বিট্‌ঠলের দ্বিতীয় প্রকৃতিপ্রত্যয় এইরূপ: সংস্কৃত বিৎ (জ্ঞান) + ঠ (শূন্য) + ল (পরিপালক) অর্থাৎ জ্ঞানহীনের রক্ষক। পাণ্ডুরঙ্গ শব্দের অর্থ হইতে শ্বেতবর্ণ মহাদেবকে বুঝাইলেও আসলে কথাটি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হয় (দ্র° ১০৭) G. A. Deleury তাঁহার The cult of Vithoba গ্রন্থে বিট্‌ঠল-এর উদ্ভব সম্পর্কে বলিয়াছেন—Vithala was really a hero who fought some cattle thieves and died in the struggle (p. 197). পশ্চিম বিহারের আহীর দেবতা 'বীর কুঅর'-মূর্তির সহিত বিঠোবা-মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করেন যে, বীর কুঅরের মতো বিঠলও আভীর জাতির দেবতা। কালক্রমে বৃন্দাবনের আহীর দেবতা কৃষ্ণের সহিত বিঠোবার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুপম মাধব। বহু সুকৃতি সঞ্চিত হইয়াছে, তাই বিট্ঠল আমার প্রিয়। হে পিতা রুক্মিণীপতি, তুমি সর্বসুখের আগার।[১]

জ্ঞানেশ্বরের "অমৃতানুভব" গ্রন্থে দেখা যায় অদ্বৈতভক্তির কথা। ভক্ত-ভগবান যখন এক হইয়া যায়, তখন না থাকে আরাধ্য, না থাকে আরাধক। ভগবানের যখন আকাঙ্ক্ষা জাগে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ আস্বাদনের, তখন তিনি নিজেই দুই রূপ ধারণ করিয়া এই সম্বন্ধ প্রদর্শন করেন। চূড়ান্ত ভক্তির ক্ষেত্রে ভগবান্ ছাড়া ভগবানকে পূজা করিবার অন্য কোনো উপাদান থাকে না। তখন ভগবানই ভগবানকে দিয়া ভগবানকে পূজা করে। জ্ঞানেশ্বরের দৃষ্টিতে ইহা কিছু অসম্ভব নয়, কারণ একই পাথর দিয়া দেবতা, তাঁহার মন্দির এবং পরিচরগণকে প্রস্তুত করা হয়। তাহারা পৃথক হইয়াও এক; ভক্তির ব্যাপারও সেইরূপ।[২]

জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থে ভগবদ্গীতার বিশদ টীকা রচিত হইয়াছে। গীতার সাত শত শ্লোক অবলম্বনে তৈরি হইয়াছে দশ হাজার শ্লোক। দ্বাদশ অধ্যায়ের একস্থলে ভগবান-ভক্তের সম্বন্ধকে বলা হইয়াছে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ: 'তুমি বল্লভা, আমি কান্ত'—এই কথা বলিতেও একটা মধুর মত্ততা জন্মে। এই কথা আমি বলিতাম না, কেবল ভালোবাসাই আমাকে বলাইয়াছে। আমি আনন্দিত যে এই কথা আমি বলিতে পারিয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে ভগবান্ (কৃষ্ণ) আনন্দে আবিষ্ট হইলেন।[৩]

একটি অভঙ্গ[৪] উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞানেশ্বরের প্রসঙ্গ শেষ

১ রূপ পাহাতাঁ লোচনী। সুখ ঝালেঁ বো সাজনী॥…

২ শ্রীঅমৃতানুভব—নবম প্রকরণ ৩৯-৪২ শ্লোক

৩ তো বল্লভা মী কান্ত। ঐসা পঢ়িয়ে॥…

—জ্ঞানেশ্বরী (দ্বাদশ অধ্যায়) ১৫৬, ১৫৮, ১৬৩ শ্লোক

৪ পংঢরপুরের বিট্ঠলনাথের মরাঠী ভক্ত-কবিরা যে অজস্র পদ রচনা করিয়াছেন, মরাঠী ভাষায় তাহা অভঙ্গসাহিত্য নামে পরিচিত।

করিতেছি। বিরহিণী নায়িকার রূপকে কবি স্বীয় বিচ্ছেদব্যথা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: মেঘগর্জন করিতেছে। বাতাস বহিতেছে। ভবতারক কৃষ্ণের অদর্শনে চন্দ্র ও চম্পক মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে না। দেবকী-নন্দন বিনা চন্দনের প্রলেপ আমার সর্বাঙ্গ পীড়িত করিতেছে। ফুলের শয্যা খুব শীতল ও উত্তম বলিয়া বলা হয়; কিন্তু ইহা আমাকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতেছে। কোকিল, তুমি নাকি মধুর স্বরে গান গাও, কিন্তু তাহা আমার বিচ্ছেদ-বেদনা বাড়াইয়া তুলিতেছে। যখন আমি দর্পণের দিকে তাকাই, নিজের রূপ নিজেই দেখিতে পাই না। রুক্মিণীপতি বিট্ঠল আমাকে এইরূপ অবস্থায় ফেলিয়াছেন।[১]

২১৩. ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে জ্ঞানেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এই ভক্তি-আন্দোলন সন্ত-পরম্পরায় সপ্তদশ শতকের তুকারাম (১৫৯৮-১৬৫০ খ্রী°) ও রামদাস (১৬০৮-১৬৮১ খ্রী°) পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। জ্ঞানেশ্বর তাঁহার অতি স্বল্পায়ু জীবনে বারকরী পন্থকে মহারাষ্ট্রের বাহিরে প্রচারিত করার সুযোগ পান নাই। তাঁহার সেই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেন তাঁহার সমকালীন দীর্ঘজীবী

একটি প্রচলিত মত এই যে, ভক্ত কবিদের গানে ব্যবহৃত 'অভঙ্গ' ছন্দ হইতে কবিতা ও দেবতা দুই-ই 'অভঙ্গ' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মরাঠী ভক্তিমূলক পদাবলীর ছন্দে মাত্রা, অক্ষর, পদ প্রভৃতির দিক হইতে এমন কোনো নিয়মবন্ধন পাওয়া যায় না যাহাতে অভঙ্গ ছন্দের বিশেষত্বটি বোঝা যাইতে পারে। সুতরাং মনে হয়, পঁঢরপুরের কৃষ্ণমূর্তির 'অভঙ্গ' (যাহা ভঙ্গ বা বাঁকা নয়। তুলনীয়: ত্রিভঙ্গ মুরারি) আকার হইতেই দেবতা এবং সেই দেবতার ভক্তি-বিষয়ক কবিতা 'অভঙ্গ' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

কর্ণাটকদ হরিদাস সাহিত্য পৃ ৬৭

১ ঘন্থ বাজে ঘুনঘুনা। বারা বাজে রুণঝুণা।...

—"ওলীচে অভঙ্গাচী শ্রীসকল সন্তগাথা" হইতে গৃহীত

সাধক নামদেব (১২৭০-১৩৫০ খ্রী°)। জ্ঞানেশ্বরের ন্যায় নামদেবও একাধারে নাথপন্থী ও ভাগবতপন্থী। বিট্‌ঠলের ভক্ত হইয়াও তিনি অদ্বৈতবাদী।

হিন্দী ভক্তিসাহিত্যের পটভূমিতে সাতারা জিলার এই মহারাষ্ট্রী সাধককবির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের হিন্দী-সাহিত্যে একদিকে যেমন বিষ্ণুর অবতার রাম ও কৃষ্ণকে লইয়া সগুণ ভক্তিকাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি দেখা যায় কবীরদাস প্রভৃতির নির্গুণ ধারার রচনা। হিন্দী-ভক্তিসাহিত্যের এই দ্বৈতরূপ প্রথম স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধের কবি নামদেবের রচনায়। তাঁহার মধ্যে যে এই উভয় প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায় তাহার কারণ একদিকে তিনি যেমন প্রভাবিত হইয়াছিলেন দক্ষিণাগত ভক্তিধর্মের দ্বারা, অন্যদিকে উত্তরাপথের সুপ্রচলিত নাথপন্থের প্রভাবকেও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। নামদেবের নাথপন্থী গুরু ছিলেন বিসোবা খেচর বা খেচরনাথ নামক এক কানফাটা যোগী—যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নামদেব বলিয়াছেন:

মন মেরী সূঈ তন মেরা ধাগা।
খেচরজীকে চরণ পর নামা সিঁপী লাগা॥

নাথপন্থীদের মতো তিনিও বলিয়াছেন—জপ-তপ-তীর্থযাত্রা-উপবাসের কোনোই সার্থকতা নাই হৃদয় যদি পবিত্র না হয়। জটা-মালা-তিলক-ভস্ম পরিয়া কী হইবে? (পূর্বে গোরক্ষনাথ এবং পরে কবীরপন্থীদের রচনায় এই সুর খুবই শোনা যায়।)

আবার পাঁঢরপুরের বিট্‌ঠলনাথের উদ্দেশ্যে করুণ আকুতির মধ্য দিয়া তাঁহার ভক্তহৃদয়ের পরিচয়টি বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে—

ন লগে বৈকুণ্ঠ না বাঞ্ছু কৈলাস।
সর্বস্বাচী আস দেব পায়ী॥

ন লগে সন্ততি ন লগে ধনমান।
পুরেঁ এক ধ্যান বিঠোবা চেঁ॥

আমি বৈকুণ্ঠ চাই না, কৈলাস চাই না; আরাধ্য দেবতার চরণে আমার সকল আশা। আমি সন্তান চাই না, ধনমান চাই না, বিঠোবার ধ্যানই আমার সব কিছু। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—হে প্রভু আমি তোমার নাম-কীর্তনেই মগ্ন থাকিব। হাতে বীণা, মুখে হরি-নাম। সমস্ত অন্ন-জল ত্যাগ করিয়া দেবতার ধ্যানে লাগিয়া থাকিব। স্ত্রীপুত্র পিতা-মাতা ইহাদের কথা আমার মনে হইবে না। দেহভাব বিস্মৃত হইয়া আমি হরির কীর্তনে রত থাকিব।[১]

আবার পাণ্ডুরঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি আমার মা, আমি তোমার তনয়। আমাকে প্রেমামৃত পান করাও। তুমি আমার গাই, আমি তোমার বাছুর। তোমার দুগ্ধ বন্ধ করিও না। তুমি আমার মাতা-হরিণী, আমি তোমার হরিণ-শিশু, আমার ভব-পাশ ছিঁড়িয়া দাও। তুমি আমার পক্ষী-মা, আমি তোমার পক্ষি-শাবক, আমার খাদ্য আনিয়া দাও। নামদেব বলিতেছে, হে ভক্ত-বল্লভ, তুমি আমার সকল দিকে বেড়া দাও।[২]

২১৪. মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং মরাঠী তাঁহার মাতৃভাষা হইলেও নামদেব কিন্তু মহারাষ্ট্রে এবং মরাঠী ভাষার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি উত্তর ভারতবর্ষে ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়াছেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন তিনি উত্তর ভারতের সন্ত-সমাজের প্রচলিত ভাষা 'সধুক্কড়ী খড়ীবোলী' (এক শত বৎসর পরে কবীরদাস যে ভাষায় পদরচনা করেন) এবং ব্রজভাষা আয়ত্ত করেন, অন্যদিকে তেমনি মহারাষ্ট্রের

১ হাতী বিনা মুখীঁ হরী। গায়েঁ রাউলা ভিতরীঁ

২ তুঁ মাঝী মাউলী মী বো তুঝা তান্হা।
পাজী প্রেমপান্হা পাণ্ডুরঙ্গে॥....

ভক্তিধর্ম ধীরে ধীরে উত্তরাপথের মনোভূমিকে প্রস্তুত করিতে থাকে।

নামদেব 'সধুক্কড়ী খড়ীবোলী' এবং 'ব্রজভাষা' হিন্দীর এই উভয় রীতিতেই প্রচুর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। লক্ষণীয় এই যে, নির্গুণ ভক্তির পদ লিখিয়াছেন সধুক্কড়ী খড়ীবোলীতে (এই ভাষা হিন্দুমুসলমান উভয়সম্প্রদায়ের সমভাবে বোধ্য বলিয়া নির্গুণবাদী কবীরদাসও এই ভাষা গ্রহণ করেন) এবং সগুণ ভক্তির পদ লিখিয়াছেন ব্রজভাষায়। একসময়ে তিনি বলিতেছেন—

মাই ন হোতী বাপ ন হোতে কর্ম ন হোতা কায়া
হম নহি হোতে তুম নহিঁ হোতে কৌন কহাঁতে আয়া।
চন্দ্ ন হোতা সূর ন হোতা পানী পবন মিলায়া।
শাস্ত্র ন হোতা বেদ ন হোতা করম কহাঁতে আয়া॥

আবার পরক্ষণেই বৃন্দাবনের দেবকীপুত্রের বন্দনা গাহিতেছেন ঃ

ধনি ধনি মেঘা রোমাবলী ধনি ধনি কৃষ্ণ ওঢ়ে কাঁবলী।
ধনি ধনি তূ মাতা দেবকী জিহ গৃহ রমৈয়া কঁবলাপতি॥
ধনি ধনি বনখণ্ড বৃন্দাবনা জহঁ খেলৈ শ্রীনারায়ণা।।
বেনু বজাবৈ গোধন চারৈ নামেকা স্বামী আনন্দ করৈ॥

ভাষা ও চিন্তাধারা ও উভয় দিক হইতেই মরাঠী সাধক-কবি নামদেব হিন্দী ভক্তিসাহিত্যের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। কবীরদাস, সুন্দরদাস, রজ্জব, দাদূ, রৈদাস প্রমুখ সন্ত-কবিরা সকলেই যেরূপ শ্রদ্ধাভরে নামদেবকে স্মরণ করিয়াছেন তাহা হইতেও হিন্দী সন্ত্‌সাহিত্যে তথা ভক্তিসাহিত্যে নামদেবের প্রভাব বোঝা যাইবে।[১] ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকের মরাঠী সাধকদের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যের যে ভক্তি-সাধনা উত্তরাপথে ছড়াইয়া পড়িল, উত্তরকালের মরাঠী সাহিত্যেও তাহার প্রভাব কম ফলপ্রসূ হয় নাই। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে "ভক্তিনারদ-সমাগম" নামক অধ্যায়ে ভক্তি যে নারদের

---

[১] বিনয়মোহন শর্মা—হিন্দী কো মরাঠী সন্তোঁ কী দেন পৃ ১৩০

প্রশ্নোত্তরে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'মহারাষ্ট্রে আমি কিঞ্চিৎ অবস্থান করিয়াছিলাম' (স্থিত্বা কিঞ্চিন্মহারাষ্ট্রে), ভক্তিসাহিত্যের ব্যাপ্তিকালের কথা স্মরণ করিলে তাহাকে ঠিক 'কিঞ্চিৎ' বলা চলে না। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের শেষভাগ—অন্তত এই চারশত বৎসর ধরিয়া মরাঠীভাষায় ভক্তিসাহিত্যের জোয়ার বহিয়াছিল।

২১৫. খিলজী ও তুগ্‌লুক শাসনের অত্যাচার-উৎপীড়নে সাময়িক ভাবে স্তিমিত হইলেও তাহা বন্ধ হয় নাই। স্বধর্মনিষ্ঠ মুহম্মদ-বিন্-তুগ্‌লুক (রাজ্যকাল ১৩২৫-১৩৫১ খ্রী°) নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে দেবমন্দিরের ধ্বংস-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। মরাঠী ভক্তি-সাহিত্যের কেন্দ্র পঁঢরপুরের মন্দির বিধ্বস্ত হইল। দেবতা ভক্তের কোলে চড়িয়া নিভৃতে কোথাও আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। তথাপি বারকরী সম্প্রদায় এই অসহায় দেবতার উপর বিশ্বাস হারাইল না। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটক অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে মহারাষ্ট্রের নিদারুণ দুর্দিনেও মরাঠী ভক্তবৃন্দ সুদিনের আশায় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। নামদেব (মৃত্যু ১৩৫০ খ্রী°) হইতে তুকারাম (জন্ম ১৫৯৮ খ্রী°) পর্যন্ত আড়াই শত বৎসরের মধ্যে মরাঠী ভক্তিসাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম মাত্র একটি—তিনি ষোড়শ শতাব্দীর একনাথ (১৫৩৩-১৫৯৯ খ্রী°)।

পঞ্চদশ শতাব্দী দক্ষিণাপথের হিন্দুদের পক্ষে দুর্দিনের ইতিহাস। মুস্‌লিম বাহ্‌মনী রাজ্য স্থাপিত হয় ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই রাজ্যের রাজধানী বিদরের অতি-সন্নিধানে অবস্থিতির জন্য পঁঢরপুরের দুর্গতি স্বভাবতই অধিক হইয়াছিল।[১] ভক্তিধর্মের দিক হইতে ষোড়শ

১ The fifteenth century was a period of gloom for the Hindus of the Deccan. The inhabitants of Pandharpur had to suffer from the foreign domination (and perhaps more than some other cities) because of their close proximity to Bidar which was then the Muslim capital. The cult of Vithoba p. 40

শতাব্দীর মহারাষ্ট্রে বিশেষ কোনো আশার আলো দেখা গেল না। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে বাহ্‌মনী রাজ্যের ইতিহাস আভ্যন্তরীণ নানা গোলযোগে জটিল হইয়া উঠে, এবং পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে বিশাল বাহ্‌মনী রাজ্য একে একে পাঁচটি খণ্ড রাজ্যে (বেরার-বিজাপুর-আহ্‌মদনগর-গোলকুণ্ডা-বিদর) বিভক্ত হইয়া যায়। গোটা ষোড়শ শতাব্দী ধরিয়া পঁঢরপুর তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বার বার আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। স্বভাবতই মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পঁঢরপুর কিছুকালের জন্য প্রভাবশূন্য হইয়া পড়ে। এই সময়ে পঁঢরপুর ও বিঠলের মহিমা জাগ্রত রহিল পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য কর্ণাটকে। কর্ণাটকী বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী উজ্জ্বলতম যুগ।

২১৬. মহারাষ্ট্রের এই ধর্মীয় তথা জাতীয় দুর্দিনে তাহার কিছু সংখ্যক নরনারী বিদরের দরবারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়াও পঁঢরপুরে বিঠোবার মাহাত্ম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যে দুর্জয় মনোবলের পরিচয় দিয়াছিল তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষ প্রয়োজন এই কারণে যে, মহারাষ্ট্রের যাদব-বংশীর রাজন্য-বৃন্দ যখন স্বদেশ ও স্বধর্মের মঙ্গল অপেক্ষা স্বার্থ-সিদ্ধিকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া ভীরুতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার পঙ্কে নিমগ্ন তখনও সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে দেশানুরাগ ও স্বধর্ম-নিষ্ঠার মহৎ আদর্শ জাগরূক ছিল। দরবারী ক্ষৌরকার সেনা সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বারকরী সম্প্রদায়ে যোগদান করে। নর্তকী কন্‌হোপাত্রা বারকরীদলভুক্ত হইলে সুলতান তাহাকে দরবারে ফিরিয়া আসার হুকুম দেয়। কিন্তু 'পতিতা' রমণী পঁঢরপুরের পবিত্র মাটিতে আত্মহত্যা করিয়া ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ধর্মরক্ষার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল। রাজকীয় শস্যাগারের তত্ত্বাবধায়ক দামাজিপন্ত্‌ পঁঢরপুরের অনশনক্লিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করিয়া সুলতানের কোপভাজন হয়।[১] মোটকথা, এই সরকারী

১ The cult of Vithoba p. 50

স্বৈরাচারের যুগেও বারকরী ভক্তদল নিরাশ হইল না। উৎপীড়ন বৃদ্ধির সঙ্গে ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকার সংকল্প তাহাদের দৃঢ়তর হইতে থাকে। এই সময়ে মরাঠী ভক্তিধর্মের আকাশে দুইটি নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে—এক, মুসলিম শাসনাধীনে দৌলতাবাদ (দেবগিরি) দুর্গের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জনার্দন স্বামী; দুই, তাঁহার সুযোগ্য ভক্ত কবি একনাথ। যে দেবতা মানুষকে বাঁচাইতে পারে না, যে ভক্তিধর্ম বিপদের দিনে কার্যকরী হয় না, স্বভাবতই তাহা উপেক্ষিত হইল। ভক্তিধর্ম-বিরোধী দলের দৃষ্টিতে একনাথ ও তাঁহার গুরু জনার্দন স্বামী নিন্দা-বিদ্রূপ-উপহাসের পাত্র হইলেন।

২১৭. নামদেবের পরে মরাঠী সাহিত্যের অগ্রণী ভক্ত কবি একনাথ (১৫৩৩-১৫৯৯ খ্রী°)। বহু গ্রন্থের রচয়িতা এই কবি বিশেষ-ভাবে তাঁহার অভঙ্গ-গাথা এবং ভাগবত-পুরাণের একাদশ স্কন্ধের পদ্যাত্মক টীকারচনার জন্যই স্মরণীয়। জ্ঞানেশ্বর-কৃত ভগবদ্গীতার টীকা "জ্ঞানেশ্বরী" যেমন স্বতন্ত্র মৌলিক গ্রন্থরূপে সম্মানিত, একনাথী ভাগবতও মরাঠী সাহিত্যে প্রায় অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী।

মহারাষ্ট্রে গুরুভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রহিয়াছে একনাথের রচনায়। কবি তাঁহার প্রত্যেকটি অভঙ্গের ভণিতায় নিজের নামের সহিত গুরু জনার্দন স্বামীর নামোল্লেখ করিয়া অশেষ গুরুকৃত্য সাধন করিয়াছেন। ভাগবতের ৩১সং অধ্যায়ে একনাথ তাঁহার গ্রন্থরচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে যেমন বারাণসী, নদীর মধ্যে যেমন পবিত্র গঙ্গা, তেমনি জীবোদ্ধারকল্পে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের মহিমা অনির্বচনীয়। সেই একাদশ স্কন্ধের টীকা একনাথ রচনা করিয়াছেন জনার্দন স্বামীর কৃপায়। বাবা যেরূপ ছেলের হাত ধরিয়া নিজেই বর্ণমালা লিখিয়া দেন, ঠিক তেমনি গুরু জনার্দন স্বামী লিখিয়া দিলেন একাদশ স্কন্ধের অর্থ। কিরূপে গ্রন্থরচনা করিতে হয়, শব্দের অর্থসাধনই বা কিরূপে করিতে হয়—একনাথ তাহা কিছুই জানিত না। জনার্দন স্বামী একটি অদ্ভুত কাজ

করিয়াছেন, আমার ন্যায় মুর্খের হাত দিয়া জ্ঞানবিতরণ করিলেন। একাদশ স্কন্ধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থমধ্যে আনয়ন করিলেন পরমার্থ'।[১]

সমসাময়িক ভক্তিধর্ম-বিরোধীর দল যখন একনাথ ও তাঁহার গুরুর নিন্দা করিত, তখন ক্রুদ্ধ একনাথ ধৈর্যহারা হইয়া সমুচিত উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইত কোথা হইতে গুরু আসিয়া তাঁহার মধ্য দিয়া কথা বলিতেন, তাহাতে উষ্মা বা অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকিত না—"আমি যখন উত্তর দিতে যাই, তখন জনার্দনই বলিতে থাকেন। যুক্তি-প্রযুক্তির কণামাত্রও আমার মধ্যে থাকে না। এইভাবে আমার অহঙ্কার সমূলে গ্রাস করেন জনার্দন। আমি যে সামান্য অঙ্গুলি-চালনা করি তাহাও সম্পন্ন করেন গুরু জনার্দন।"[২]

জীবনের কোন্ পর্যায়ে মানুষ পরমার্থের চিন্তা করিবে? এই প্রসঙ্গে কবি একনাথ ভাগবতের নবম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ: জীবনের যাবতীয় সুখভোগ করিয়া পরিশেষে পরমার্থ-চিন্তা করার কোনো নিশ্চয়তা নাই। কারণ মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু দোষগুণ বিচার করে না, দেশ-বিদেশ গ্রাহ্য করে না। তাহার কাছে দিনে ও রাত্রিতে পার্থক্য নাই। যে কোনো মুহূর্তে সে নাশ করিতে পারে। সুতরাং রণক্ষেত্রে বীর ক্ষত্রিয় যেরূপ শত্রু-আক্রমণে কখনও বিশ্রাম গ্রহণ করে না, মানুষকেও সেইরূপ পরমার্থ চিন্তা করিতে হইবে। বিপত্নীক পুরুষের মন যেরূপ বিবাহের জন্য সর্বদাই আগ্রহশীল থাকে, তদ্রূপ ভগবৎচিন্তা করিতে হইবে।[৩]

---

১ তীর্থক্ষেত্র বারাণসী। পাবনত্বেঁ গঙ্গা জৈশী ॥···(৪৯৪-৪৯৮)

২ মী জেথ ঋাড়া দেউঁ জায়েঁ। তেঁ বোলণেঁ জনার্দনচি হোয়ে ॥ ··
(৫০৯-৫১০)

৩ ঋালিয়া মনুষ্যদেহ প্রাপ্তী। পরমার্থ সাধু ভোগা অন্তী ॥····
(৩৩৪-৩৩৫, ৩৪১-৩৪২)

২১৮. ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নানাদিক হইতে পঁঢরপুরের সুদিন ফিরিয়া আসে। পূর্বের ন্যায় ধর্মের উপর উৎপীড়ন আর আর রহিল না, বিঠোবার মন্দির পুনর্নির্মিত হইল, এবং এই সময়ে আবির্ভূত হইলেন মরাঠী ভক্তিসাহিত্যের প্রসিদ্ধ পুরুষ তুকারাম (১৫৯৮-১৬৫০ খ্রী°)। তুকারামের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের বারকরী সম্প্রদায় পুনর্জীবন লাভ করে।

মরাঠী ভক্তিসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তুকারামে। মহারাষ্ট্রের ছোট-বড় অনেক কবিই অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু 'অভঙ্গ' বলিতে আমরা সাধারণত তুকারামের 'অভঙ্গ'ই বুঝিয়া থাকি। জ্ঞানেশ্বরের পরিচয় যেমন ভগবদ্গীতার টীকা 'জ্ঞানেশ্বরী'তে, একনাথের পরিচয় যেমন ভাগবতের টীকা 'একনাথী ভাগবত'-গ্রন্থে, তেমনি তুকারামের পরিচয় তাঁহার পাঁচ হাজার পদাবলীর মধ্যে।[১] ভক্তিরস ও কাব্যরসের উৎকর্ষে তুকারাম সর্বাগ্রগণ্য।[২] মরাঠী ভক্তিসাহিত্যের মহিমা 'জ্ঞানেশ্বরী', মধুরিমা তুকারামের পদ। 'জ্ঞানেশ্বরী' ঠিক সাধারণ লোকের জন্য নয়, তুকারামের রচনা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের জন্য। তাঁহার মানস-গঠনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে গীতা ও ভাগবত, 'জ্ঞানেশ্বরী' ও একনাথী ভাগবত এবং নামদেবের অভঙ্গ।[৩] এইরূপে পূর্বসূরীদের সাধনার ফল আত্মসাৎ করিয়া মহারাষ্ট্রের এই শূদ্র সন্তান যে অনুপম ভক্তি-

১ ১৯৫৫ সালে বোম্বাই সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত "শ্রী তুকারামাচে অভংগ" গ্রন্থে মোট পদসংখ্যা ৪৬৪৪।

২ Nicol Macnicol তাঁহার Psalms of Maratha Saints (১৯১৯) গ্রন্থে যে ১০৮টি মরাঠী কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বিবরণ এইরূপ: জ্ঞানেশ্বর—৮, মুক্তাবাঈ—২, নামদেব—১২, জনাবাঈ—৩, একনাথ—৭, আর বাকি ৭৬টি পদ তুকারামের।

৩ R. D. Ranade, Mysticsm in Maharashtra p. 266

এই প্রসঙ্গে তুকারামের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের কথাও আমরা

রসধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমগ্র মরাঠী-চিত্তকে সুদীর্ঘকাল অভিষিক্ত করিয়া রাখিবে।

মহারাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থ পঁঢরপুরের মহিমা-বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেনঃ ভীমানদীর তীরে একটি নগরী আছে, নাম তার পঁঢরপুর। চলো আমরা সেই গ্রামে খেলা করিবার জন্য নাচিতে নাচিতে যাই। পঁঢরপুরের দেবতা বিঠল আমাদের সুখ ও বিশ্রাম দিবে। সে বড়ো হইতেও বড়ো, নৃপতির নৃপতি। কলিকাল তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। গ্রামের মোড়ল (পাটীল) পুণ্ডলীক সেখানে একটি কার্যালয় খুলিয়াছে, ভবদুঃখের যন্ত্রণা হইতে সে মুক্তি পাইল। সন্ত ও সজ্জনেরা সেখানে দোকান করিয়াছে, যাহার যাহা চাই তাহা সেখানে আছে। বিনামূল্যে মুক্তি পাওয়া যায়, কারণ কেহই সেখানে তাহা চায় না। সেখানকার তুটি হাটই ভর্তি; বারকরী বা তীর্থযাত্রীর কোনো শেষ নাই। তাহারা বলে—'আমরা বৈকুণ্ঠ চাহি না, কারণ আমরা পঁঢরপুর দেখিয়াছি।' অনেক দিন হইতেই আমার আশা ছিল, আজ অনেক কষ্টে পাইলাম। তুকা বলিতেছে, হে সন্ত, তোমাদের পুণ্যবলে আজ আমি তাঁহার চরণ পাইলাম।[১]

২১৯. ভগবানের প্রতি ভক্তের ব্যাকুলতা বুঝাইতে গিয়া তুকারাম একাধিক পদে পিত্রালয়ের জন্য পতিগৃহগামিনী নববধূর ব্যাকুলতার কথা বলিয়াছেন—"কন্যা যেরূপ শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার

উল্লেখনীয় বলিয়া মনে করি। Tukaram came at some time under the influence of teachers belonging to the Vaishnavite sect founded by Caitanya in Bengal at the beginning of the sixteenth century. (Psalms of Maratha Saints—Introduction)

১ ভীমা তীরীं এক বসলে নগর। ত্যাচেं নাঁব পঁঢ়রপুর রে॥

সময়ে সতৃষ্ণনয়নে তাহার 'মায়ের বাড়ি'র দিকে তাকায়,[১] তেমনি হে কেশব, তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য আমার প্রাণ উৎসুক।

১ তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ :

পথ চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়। (দিঘি—খেয়া)

উল্লিখিত চিত্রকল্প ব্যবহারে তুকারামের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য কিছু আকস্মিক নয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তুকারামের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মূল মরাঠীভাষায় তুকারামের অভঙ্গের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিশোর ও যুবক রবীন্দ্রনাথের সহিত তিনি মাঝে মাঝে তুকারামের রচনার রসাস্বাদন করিতেন। কেবল তাহাই নয়, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই মরাঠী ভক্ত-কবির কিছু-সংখ্যক পদ বাংলায় অনুবাদ করেন। বহু বৎসর পরে সেই অনূদিত পদগুলি সত্যেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত "নবরত্নমালা" নামক গ্রন্থে স্থান পায়। (দ্রষ্টব্য শ্রীপাদ জোশী সম্পাদিত "রবীন্দ্রনাথ আণি মহারাষ্ট্র" পৃ ১৪৪)। আমাদের মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ তুকারামের অভঙ্গের যে সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী সম্পাদিত "তুকারাম বাবাচ্যা অভংগাচী গাথা"—যাহা সাধারণত ইন্দুপ্রকাশ সংস্করণ নামে পরিচিত। নবরত্নমালায় প্রদত্ত সংখ্যাগুলি এই সংস্করণের অনুরূপ।

তুকারামের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কবি যে একদল সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত গৃহে ও মন্দিরে দিবারাত্রি প্রভুর নামকীর্তনে মত্ত থাকিতেন, ইহা কবিপত্নীর পক্ষে অসহ্য ছিল। রবীন্দ্র-অনূদিত কয়েকটি পদে ইহার স্পষ্ট পরিচয় আছে—

আমারি বেলায় উনি যোগী
নিজের ত বাকি নাই সুখ।....৫৬৬
বোধ হয় এ পাষণ্ড
পূর্ব জন্মে ছিল মোর অরি।....৫৬৭
খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে।....৫৬৯
হেথা কেন আসে লোকগুলো,
তাদের কি কাজ নাই হাতে?....৫৭২

মাকে না দেখিয়া বালক যেমন কাঁদিয়া উঠে, জলহীন মৎস্যের যেরূপ অবস্থা, আমার অবস্থাও তদ্রূপ।"[১]

তুকারাম তাই প্রভুর প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন: হে করুণাময়, তোমার কাছে এই অনুরোধ, সত্বর আসিয়া তুমি আমাকে মুক্ত কর।......আমি তোমার পথের দিকে তাকাইয়া তোমার চরণ-পাতের অপেক্ষায় আছি। হে বিঠল, হে আমার মা-বাবা, আমার কাতর আহ্বানে সাড়া দিতে তুমি বিলম্ব করিও না। যখন বিচার করিয়া দেখি, আমার সবই শূন্য হইয়া যায়, তখন কেবল তুমিই থাক। তুকা বলিতেছে, তুমি আসিয়া কৃপাদান কর, আমার নয়ন কেবল তোমার চরণ দর্শন করুক।[২]

২২০. মরাঠী সাহিত্যে ভক্ত কবিরূপে তুকারামের যে শ্রেষ্ঠত্ব তাহার একটি প্রধান কারণ তাঁহার রচনায় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ। এক্ষেত্রে একমাত্র নামদেব ব্যতীত বোধ হয় কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। জ্ঞানেশ্বর অবশ্যই মহান্ সাধক, কিন্তু সে সাধনা অতন্দ্র, কোথাও যেন তাহার স্খলন-পতন-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় না। জ্ঞানেশ্বরকে পাওয়া যায় সিদ্ধপুরুষরূপে। তাঁহার সিদ্ধির পূর্ণরূপটিই আমরা দেখিতে পাই, সাধনার বিঘ্নবহুল রূপটি দেখিতে পাই না। সেই রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তুকারামের রচনায়। ভক্তের জীবনপথে যে নানা সংশয়, অবিশ্বাস,

ভক্ত-কবির আকৃতিও কয়েকটি পদে লক্ষ্য করা যায়:

হে দেব যা কিছু মোর আছিল বিভব
আমার ভালরি তরে নিয়াছ সে সব।...১৩৩৫
সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান।
কেবলি মঙ্গল যবে কেবলি কল্যাণ॥ ইত্যাদি

১ কন্ধা লাসুচ্যাসি জায়ে। মার্গে পরতোনী পাহে।...

২ অগা করুণাকরা করিত সে ধাঁবা। য়া মজ সোডবা লবকরি।

দুঃখদৈন্য, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তুকারামের পদাবলী তাহারই ঐশ্বর্যে পূর্ণ। মানবিকতাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণ।

ভক্তজীবনে পাপচেতনার অকপট স্বীকারোক্তি সেই মানবিকতার অন্যতম লক্ষণ। কবি বলিতেছেন: "আমি তোমার মুখদর্শন করিতে বাসনা করি। কিন্তু আমার ভিতরে পবিত্র আচরণের কোনো স্থান নাই। হে শক্তিমান্, তুমি শক্তি দিয়া আমাকে সাহায্য কর, আমি যেন তোমার চরণদর্শন করিতে পারি। যদিও বাহিরে আমি সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছি, ভিতরে আমি অপবিত্র। তুকা বলিতেছে, হে দেব, যদি তুমি সাহায্য না করো তবে আমার উদ্ধার নাই"।[১]

কবির চিত্তে গভীর দৈন্যবোধ। মনে তাঁহার ষড়রিপুর প্রবল উৎপীড়ন, অথচ বহির্জগতে তিনি পরম ভক্তরূপে পরিচিত—ইহাই তাঁহার প্রধান আক্ষেপ। লোকে তাঁহাকে প্রশংসা করে তাঁহার গান শুনিয়া, তাঁহার ভক্তি দেখিয়া। কিন্তু কবির মনে তাহাতে শান্তি নাই। ভগবানের কাছে তাঁহার জিজ্ঞাসা এই যে, কেন তিনি তুকারামের মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে কীর্তিমান্ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবি কতগুলি দৃষ্টান্তের ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন—"পেটের ভিতরে উঠিয়াছে শূলবেদনা, আর উপরে মাখানো হয় চন্দন। সেই চন্দনের প্রলেপে সুখ কী? জ্বরে মুখ হইয়াছে বিস্বাদ, আর তাহার সামনে রাখা হইয়াছে মিষ্টান্ন। কিন্তু সে তাহার স্বাদ লইবে কিরূপে? যদি মৃতদেহ অলঙ্কৃত করা হয়, তবে সেই অলঙ্কারে মৃতব্যক্তির কী প্রয়োজন? সেইরূপ, হে পাঁঢরিনাথ, লোকের মধ্যে তুমি আমার প্রতিষ্ঠা খুবই বাড়াইয়াছ, কিন্তু যে পর্যন্ত আমার হৃদয় শুদ্ধ না হয়, ততদিন এই সবের প্রয়োজন কী?"[২]

কবি নিজের চেষ্টায় চিত্ত-শুদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে এই বলিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন—"হে নারায়ণ, আমি আমার

---

১ তুজ পাহাবেঁ হে ধরিতোঁ বাসনা। পরি আচরণা নাহীঁ ঠাব ॥····

২ পোটীঁ শূল অংগী উটী চন্দনাচী! আবডী সুখাচী কোণ তয়া ॥···

সমস্ত অবগুণ ভালো করিয়াই জানি। কিন্তু কী করিব, চঞ্চল মনকে নিবারণ করা যায় না। তুমি আসিয়া আমার ও আমার মনের মাঝখানে দাঁড়াও এবং তোমার দয়া প্রদর্শন কর। আমি তো ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়াছি। কিন্তু হে দেব, হে মা-বাপ, তুমি আমার প্রতি উদাসীন হইও না।"[১]

নিজের অসংখ্য অবগুণ সত্ত্বেও কবি যে প্রভুর প্রসাদ-প্রার্থনায় সাহসী হইয়াছেন তাহার কারণ প্রভুর প্রেম অপরিসীম। বালক মাতার প্রতি নিষ্ঠুর হইতে পারে কিন্তু মায়ের স্নেহের বিরাম নাই। হে পুরুষোত্তম, তোমার প্রেমও তো সেইরূপ। এক মুহূর্তের জন্যও তুমি আমাকে বিস্মৃত হইও না।[২] কবির অপরিশুদ্ধ মন বিষয়-বাসনার জন্য যতই লালায়িত হউক না কেন, তাঁহার ধ্রুব আকাঙ্ক্ষা ধাবিত হয় ঈশ্বরের উদ্দেশে। একটি পদে কবি তাঁহার ঈশ্বরানুরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবে: "মাকে ছাড়িয়া মেলাও যেমন শিশুর ভালো লাগে না, হে পঁঢরিনাথ, তোমাকে বিনা আমার চিত্তের অবস্থাও সেইরূপ। নদী ও সমুদ্রের প্রতি বিমুখ হইয়া চাতক যেরূপ মেঘবিন্দুর আশায় চাহিয়া থাকে; সারা রাত্রি ধরিয়া পদ্ম যেরূপ ধ্যান করে সূর্যের কিরণকে; জল ব্যতীত মৎস্য এবং ধেনু-হারা বৎস যেরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে; পতিব্রতা নারী যেরূপ স্বামীর খবরের জন্যে উদ্বিগ্ন থাকে; কৃপণের মন যেরূপ ধনের জন্য লুব্ধ হয়, তুকা বলিতেছে, তোমার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষাও সেইরূপ। তোমাকে ছাড়া আমি কিরূপে প্রাণধারণ করিব?"[৩]

পঁঢরপুরের দেবতার জন্য ভক্ত কবি যে প্রতীক্ষমাণা নায়িকার ন্যায় কালাতিপাত করিতেছেন, একটি পদে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এইরূপ: "ঘরের দুয়ারে মাথার উপরে হাত রাখিয়া আমি

---

১ মাঝে মজ কলোঁ। য়েতী অবগুণ। কায় করূঁ মন অনাবর॥…

২ বাল মাতে নিষ্ঠুর হোয়ে। পরী তে স্নেহ করীত আহে॥…

৩ মাতে বিণ বালা। আণিক ন মানে সোহলা॥

বৃথাই পঁঢরপুরের পথের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছি। কবে আমি দেখিতে পাইব আমার প্রভুকে? ঘণ্টা ও দিবসগুলির জন্য আমি যথেষ্ট মূল্য দিতেছি। চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষু ব্যথিত, দেহ পীড়িত। কিন্তু আমার উতলা মন দেহের ক্লান্তি ভুলিয়া যায়। সুখশয্যায় নিদ্রা আমার ভালো লাগে না; ঘর দুয়ারের কথা ভুলিয়া গিয়াছি; ক্ষুধা-তৃষ্ণা পলায়িত। তুকা বলিতেছে, আমার সেই শুভ দিবস কবে আসিবে, যেদিন পঁঢরপুর হইতে কেহ আসিয়া এই নববধূকে লইয়া যাইবে?"[১]

২২১. ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভক্তের ব্যাকুল মনোভাবটি বুঝাইবার জন্য তুকারাম যে সমস্ত চিত্রকল্প ব্যবহার করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।—

(ক) স্বামীর চিতাগ্নি দেখিয়া সতী যেমন তাহাতে আত্মসমর্পণের আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, ভক্তও সেইরূপ নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণের জন্য রোমাঞ্চিত হইবে।[২]

(খ) অগ্নিশিখায় ঝাঁপাইয়া-পড়া পতঙ্গের ন্যায় আমাদের সাহসী হইতে হইবে।[৩]

(গ) ফোয়ারা যেমন ঊর্ধ্বমুখে উচ্ছ্রিত হয় ভগবানের প্রতি ভক্তের চিত্তও সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।[৪]

(ঘ) পুত্রের শুভসংবাদ শুনিলে মাতার যেরূপ আনন্দ হয়, ঈশ্বর-স্তুতি শ্রবণে আমাদের সেইরূপ আনন্দবোধ জন্মিবে। সঙ্গীত-লুব্ধ হরিণের ন্যায় আমরা দৈহিক চেতনা বিস্মৃত হইব। কচ্ছপ-

১ বাট পাহেঁ বাহে নিডলীঁ ঠেবুনিয়াঁ হাত…

২ আগী দেখোনি সতী। অংগীঁ রোমাঞ্চ উঠতী॥

—তুকারামবচনামৃত পৃ ১০৪

৩ তুকা ম্হণে বহাবেঁ তয়াপরী ধীট। পতঙ্গ হা নীট দীপাবরী॥ ঐ

৪ বৈনী কারংজ্যাচী কলা। তো জিবহালা বহিতাচা॥ ঐ

শিশুরা যেমন তাহাদের মায়ের জন্য ব্যাকুল হয়, আমরাও সেইরূপ ব্যাকুল হইব।[১]

ভক্তের চরম অবস্থা কিরূপ তাহার বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—জলের মধ্য পদ্মপত্র যেমন, ভক্তও তেমনি এই জীবনে অনাসক্ত হইয়া বাস করিবে। উন্মনা যোগিশ্রেষ্ঠের ন্যায় নিন্দা বা স্তুতির প্রতি তাহার কান থাকিবে না। এই জগৎপ্রপঞ্চের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকিবে স্বপ্নের সৃষ্টির ন্যায়, ইহাকে সে দেখিয়াও দেখিবে না।[২]

২২২. তুকারামের পদাবলী মরাঠী ভক্তি-সাহিত্যের শীর্ষবিন্দু, কিন্তু শেষবিন্দু নয়। নিকল্ ম্যাক্‌নিকল্ তাঁহার "মরাঠী সন্তকাব্য-সংগ্রহ"[৩] গ্রন্থ তুকারামে আসিয়া শেষ করিলেও আমরা তাঁহার কনিষ্ঠ সম-সাময়িক সন্ত-কবি রামদাসের (১৬০৮-১৬৮১ খ্রী°) প্রসঙ্গ উল্লেখনীয় বলিয়া মনে করি। মহারাষ্ট্রের বাহিরে রামদাস শিবাজীর গুরুরূপেই সমধিক পরিচিত, তাঁহার কবিপরিচয় একপ্রকার অজ্ঞাত বলিলেই চলে।

রামদাসের ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে "করুণাষ্টকেঁ", "মনাচে শ্লোক" (মনকে সম্বোধন করিয়া রচিত) এবং "জনস্বভাবগোসাঁবী" (ভণ্ড গোস্বামী)—এই তিনখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা "দাসবোধ"। উচ্চতম অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসী ব্যবহারিক

১ পুত্রাচী বারতা। শুভ ঐ কে জেরীঁ মাতা॥
ভৈসেঁ ব্লাহোঁ মাঝেঁ মন। গাতাঁ একতাঁ হরিগুণ॥
নাদেঁ লুব্ধ জালা মৃগা। দেহ বিসরলা অংগ॥
তুকা ম্হণে পাহে। কাসবীচেঁ পিলেঁ মায়ে॥ (ঐ পৃ ১০৫)

২ মগ মী ব্যবহারীঁ অসেন বর্তত। জেরীঁ জলাআঁত পদ্মপত্র॥
এেকোনি নাইকেঁ নিন্দাস্তুতি কানীঁ। জৈসা কা উন্মনীঁ যোগিরাজ॥
দেখোনি ন দেখেঁ প্রপঞ্চ হা দৃষ্টি। স্বপ্নীঁচিয়া সৃষ্টি চেইল্যা জেবীঁ॥
(ঐ পৃ ১০৫)

৩ Nicol Macnicol—Psalms of Maratha Saints (1919)

জগৎ সম্পর্কেও পূর্ণ অভিজ্ঞতার অধিকারী হইলে দাসবোধের ন্যায় গ্রন্থরচনা সম্ভব। "করুণাষ্টকে" কবির আবেগমূলক ভক্তির পরিচয় বহন করিলেও রামদাস প্রকৃতপক্ষে ছিলেন বুদ্ধিনিষ্ঠ সন্ন্যাসী। এক্ষেত্রে তাঁহাকে তুকারাম হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ভক্ত বলিয়া অভিহিত করা যায়। তুকারামের বৈশিষ্ট্য আবেগে ও অনুভবে, রামদাসের বৈশিষ্ট্য চিন্তায় ও কর্মে। তাই তুকারামের রচনা যতটা কাব্যরস-মণ্ডিত, রামদাসের রচনা ততটা নয়। তথাপি কর্মযোগীর কাব্য বলিয়া "দাসবোধ" বিশেষ সমাদরের বস্তু, ইহার শক্তি অনুপেক্ষণীয়।[১] এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে শিবাজী তুকারামের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলে তুকারাম তাঁহাকে রামদাসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। "দাসবোধ"-এর রচয়িতা হইলেন ছত্রপতির গুরু।

রামদাস মূলত ছিলেন রামভক্তির উপাসক। এ সম্পর্কে কবির নিজের উক্তি এইরূপ: রঘুনাথই আমাদের কুলদেবতা··· আমাদের পরমার্থ। যিনি সমর্থকুলের মধ্যে সমর্থ এবং যিনি দেবতাগণকেও দুঃখ হইতে ত্রাণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সেবক এবং তাঁহার সেবা করিয়াই আমরা জ্ঞানলাভ করিয়াছি।[২]

২২৩. রামদাস তাঁহার সমকালীন মহারাষ্ট্রের অধঃপতিত সাধারণ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করিয়া বদ্ধজীবের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বোধ করি এখনও সমান জীবন্ত। কবির বর্ণনায় বলা হইয়াছে—মানুষ বদ্ধজীব, ভক্তিহীন, উপাসনাহীন; তাহাদের

১ "দাসবোধ" সম্পর্কে Ranade তাঁহার Mysticism in Maharashtra গ্রন্থে বলিয়াছেন: It is prose both in style and sentiment; but it is most highly trenchant in its estimate of worldly affairs. (p. 370)

২ আমুচে কুলীঁ রঘুনাথ। রঘুনাথেঁ আমুচা পরমার্থ॥···

—রামদাসবচনামৃত পৃ ৫

আত্মজ্ঞান নাই, সৎসঙ্গে রুচি নাই। পরমার্থের প্রতি অনাদর, পার্থিব জীবনের অতিসমাদর। হাতে অর্থের জপমালা, অন্তরে সর্বদা স্ত্রীলোকের ধ্যান। তাহাদের চোখ দেখে কেবল কামিনী-কাঞ্চন, কানও শ্রবণ করে সেই কথা, চিন্তাও সেই একই বিষয়ে। ইহারই নাম বদ্ধজীব। কায়মনোবাক্যে তাহারা কামিনী-কাঞ্চনের ভজনা করে। উহাই তাহাদের তীর্থ, তাহাদের পরমার্থ। তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করে না, সর্বদাই তাহাদের সংসারচিন্তা এবং তাহাদের কথাবার্তাও সেই একই বিষয়ে। ইহারই নাম বদ্ধজীব।[১]

ইহার পাশাপাশি আমরা রামদাস-অঙ্কিত ভক্ত-চিত্রটির কিয়দংশ তুলিয়া ধরিতে চাই। কবি বলিয়াছেন, ভক্ত বৈভব ও কামিনী-কাঞ্চনকে বমির ন্যায় জ্ঞান করেন। তাঁহার অন্তরে সর্বদা সর্বোত্তম ভগবানের ধ্যান। ক্ষণে ক্ষণেই তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি বাড়িয়া চলে। ঈশ্বর-চিন্তা ব্যতীত একটি মুহূর্তও তাঁহার অতিবাহিত হয় না। সর্বদাই তাঁহার চিত্ত ভক্তির রঙে রঞ্জিত থাকে। তখন আর তাঁহার দৈহিক চেতনা থাকে না। লজ্জা ভয় পলায়ন করে। যখন তিনি প্রেমের রঙে রঞ্জিত এবং ভক্তিমদে মাতাল হন, তখন আর তাঁহার অহংভাব থাকে না। নিঃশঙ্ক চিত্তে নৃত্যগীত করেন। তখন আর তিনি মানুষ দেখিতে পান না, তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বত্র ত্রৈলোক্যপতি বিরাজিত।[২]

২২৪. প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চলে যে ভক্তি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রধান পাঁচজন কবির রচনা অবলম্বনে সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাসদানের চেষ্টা করা হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, মহারাষ্ট্র উত্তর-দক্ষিণ দুই ভারতের সংযোজক। ইহা

---

১ পরমার্থাচা অনাদর। প্রপঞ্চাচা অত্যাদর॥
হাতীं দ্রব্যাচী জপমাল। কান্তাধ্যান সর্বকাল॥...ঐ পৃ ৫০

২ বৈভব কান্তা কাঞ্চন। ত্রয়াস বাটে হেং বমন।
অন্তরীं লাগলেং ধ্যান। সর্বোত্তমাচেং॥...ঐ পৃ ৯১

কেবল ভৌগোলিক অর্থেই নহে, সাংস্কৃতিক অর্থেও কিছুটা সত্য। তামিলনাড়ে উদ্ভূত ভক্তিধর্ম কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রে যে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিয়াছিল, মরাঠী সাহিত্যের পক্ষে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভক্তিসাধনা যে কেবল মরাঠী ভাষায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মরাঠী কবি নামদেবের মধ্য দিয়া হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহারও আভাস আমরা পাইয়াছি।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় একটি এই যে, তামিলনাড়ে (এবং পরবর্তী কালে কর্ণাটকে) যে ভক্তিসাহিত্যের উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাহাতে শৈব ও বৈষ্ণব এই দুইটি ধারা প্রায় সমভাবে চলিয়াছে দেখিতে পাই। পরিমাণে ও উৎকর্ষে ইহার কোনটিই অপরটির তুলনায় নগণ্য নহে। উত্তর ভারতের ভক্তিসাহিত্যে আমরা বৈষ্ণব ধারাটির প্রাধান্য দেখিতে পাই। মহারাষ্ট্র উত্তর-দক্ষিণের মধ্যবর্তী হইলেও তাহার ভক্তিসাধনায় উত্তরীয় লক্ষণটিই পরিস্ফুট। কর্ণাটকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়াও মহারাষ্ট্র তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বীরশৈব ধর্মকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। মধ্যযুগে যখনই কোনো অনার্য-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্থানীয় দেবতাকে হিন্দুধর্মের সর্ব-দেব-মন্দিরে (Pantheon) স্থান দিতে হইয়াছে, তখনই সেই চেষ্টা চলিয়াছে দুই পক্ষ হইতে—শৈব ও বৈষ্ণব পক্ষ। দাক্ষিণাত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইয়াছে শৈবপ্রভাব, কিন্তু উত্তরাপথের দিকে আসিয়া তাহা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে। মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ পাঁঢরপুর ও তাহার দেবতা বিঠোবার ক্ষেত্রে এই সত্যটি দেখা যায়। পাঁঢরপুরে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বসতিবিস্তারের পূর্ব হইতেই স্থানীয় দেবতা-রূপে বিঠোবার মহিমা পরিচিত ছিল। ব্রাহ্মণদের আগমনের পরে এই দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিঠোবা বিষ্ণু-কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হওয়াতে বৈষ্ণবপক্ষেরই জয় হইল। কিন্তু সহজে

নয়। পাঁঢরপুরে বিঠোবা-মন্দিরের পাশেই আছে ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির। তথাকার শৈবদের মধ্যে এই কাহিনী প্রচলিত যে পাঁঢরপুরে বিষ্ণু একবার দৈত্যনিধনে উদ্যত হইলে তাঁহার পরাভব যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন শিব আসিয়া বৈকুণ্ঠপতিকে উদ্ধার করেন। মনে হয়, পরাজিত শৈবদল ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা স্বরূপ এই কাহিনীটি উদ্ভাবিত করে। তৎসত্ত্বেও পাঁঢরপুরে শিব বিষ্ণুর (বিঠোবার) কাছে নিষ্প্রভ হইয়া রহিলেন। জ্ঞানেশ্বরের জীবন চরিত হইতে জানা যায় যে, শৈবযোগী বিসোবা খেচর তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতন করিতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞানেশ্বরের কাছেই তিনি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। নানা ঘটনা হইতেই বোঝা যায়, মহারাষ্ট্রের মাটিতে শৈবধর্ম শক্তিহীন হইয়া পড়ে। বিঠোবার বিভিন্ন নামের মধ্যেও শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য উঁকি দিতেছে। বস্তুত তামিল, তেলুগু ও কন্নড ভাষায় যে শৈব-সাহিত্যের নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই, মরাঠী ভাষায় তাহার আত্যন্তিক অভাব লক্ষণীয়। মরাঠী ভক্তিসাহিত্য প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবতার সাহিত্য। ইহার পাঁচটি স্মরণীয় নাম—পাঁঢরপুর, বিঠলনাথ, জ্ঞানেশ্বর, নামদেব ও তুকারাম। পাঁঢরপুর তীর্থক্ষেত্র, বিঠলনাথ দেবতা, আর বাকি তিন জন ভক্তকবি।

অষ্টম অধ্যায়

গুজরাতী ভক্তিসাহিত্য

২২৫. পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে 'ভাগবত-মাহাত্ম্য' অংশটুকু কাহার রচনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি যে গুজরাতের অধিবাসী ছিলেন না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। কারণ, সেখানে বলা হইয়াছে, ভক্তি-দেবীর জন্ম দ্রাবিড় দেশে, বৃদ্ধি কর্ণাটকে, অতঃপর কিছুকাল মহারাষ্ট্রে অবস্থান করিয়া গুজরাতে আসিয়া তিনি একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে—গুর্জর (গুর্জরে জীর্ণতাং গতা), গুজরাত নয়।[১] শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম লীলাভূমি দ্বারকা-প্রভাসের পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত গুজরাত ভক্তিধর্মের ইতিহাসে যে এতটা নিন্দিত হইয়া থাকিবে সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ।

২২৬. ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুর্জরদেশ বা গুজরাতের প্রথম আবির্ভাব হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনায়। আমাদের বর্তমান

১ গূর্জর (গুর্জর) শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য লইয়া কিঞ্চিৎ বিবাদ আছে। গুর্জর মূলত জাতিবাচক শব্দ, না দেশবাচক? জাতিবাচক হইলে গুর্জরজাতি কি ভারতীয় অথবা বহিরাগত? এই বিষয়ে সাধারণভাবে ঐতিহাসিকদের অভিমত এই যে, গুর্জর জাতি মধ্য এশিয়ার হূণদের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অন্যান্য বৈদেশিক জাতির ন্যায় ভারতীয় জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পরে হয়ত জাতিবাচক গুর্জর হইতে গুর্জর-মণ্ডল, গুর্জরভূমি বা গুর্জরদেশ বুঝাইতে গুজরাত শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান গুজরাতের ধুরন্ধর পণ্ডিত সাহিত্যিক কে. এম. মুন্‌শি এই মত প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়া তাঁহার Glory that was Gurjara Desa নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—It is evident that Gurjara denoted a country and not a race. p. 5.

আলোচনায় গুর্জর বলিতে একটি বৃহৎ জনপদকে বুঝাইতেছে। তখনও 'গুজরাত' নামটির প্রচলন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।[১] সেই হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ মুস্‌লিম শক্তির আক্রমণের পূর্ব-পর্যন্ত (১২৯৯ খ্রী°) গুর্জর দেশের উপর প্রতীহার, পরমার এবং চৌলুক্য রাজবংশ পর পর শাসনকার্য চালাইয়া গিয়াছেন। এই সময়ে বর্তমান গুজরাতের সহিত যোধপুর-জয়পুর-মারবাড়-মালব প্রভৃতি রাজপুত-অধ্যুষিত অঞ্চলের যে খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল ভাষা ও সংস্কৃতির আলোচনায় তাহা স্পষ্টরূপেই বোঝা যায়। বস্তুত দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত 'গুজরাত' বলিতে যোধপুর-জয়পুর অঞ্চল সমূহকেও বুঝাইত।[২]

২২৭. 'গুজরাত' নামটির উদ্ভব-কাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা সম্ভব না হইলেও ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ এই ত্রি-শতাব্দীব্যাপী চৌলুক্য রাজবংশের শাসনকালের মধ্যেই গুজরাত রাজ্য, গুজরাতী ভাষা এবং গুজরাতী চেতনা লইয়া আধুনিক গুজরাতের জন্ম হইয়াছে। দশম শতকের শেষভাগে অণহিলবাড় অর্থাৎ বর্তমান পাটণ শহরকে কেন্দ্র করিয়া মূলরাজের হস্তে চৌলুক্যরাজশক্তি ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে থাকে। কিন্তু মালবের পরমারবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ভোজরাজের কাল পর্যন্ত (মৃত্যু ১০৫৪ খ্রী°) গুজরাতের চৌলুক্য রাজবংশ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয় নাই। মূলরাজের প্রপৌত্র ভীম (রাজ্যকাল ১০৫৪—১০৬৪) অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহায়তায় ভোজরাজকে পরাভূত করিলে একাদশ শতকের মধ্যভাগে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গুজরাতের

১ Gurjara Desa or rather Gurjara as it was first called stepped into history in about 500 A. D. K. M. Munshi—Glory that was Gurjara Desa, p. 7.

২ K. M. Munshi—Gujarat and its Literature p. 121

প্রতিষ্ঠা হইল।[১] ভীমের পুত্র কর্ণ (রাজ্যকাল ১০৬৪-১০৯৪) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় কর্ণাবতী যাহা বর্তমানে আমেদাবাদ নামে সুপরিচিত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কর্ণপুত্র জয়সিংহ সিদ্ধরাজ (রাজ্যকাল ১০৯৪-১১৪৪)—যিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল রাজ্যশাসন করিয়া যোদ্ধা, শাসক ও কলানুরাগী রাজারূপে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রাজ্যকালে গুজরাত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে এবং ইহার একাংশ সুরাষ্ট্র বা সৌরাষ্ট্র (অর্থাৎ উত্তম দেশ) নামে পরিচিত হয়।[২]

২২৮. গুজরাতের রাজনৈতিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মোটামুটি দেওয়া হইল। ইহার সঙ্গে আমাদের মিলাইয়া দেখিতে হইবে, ধর্মবিশ্বাসের দিক হইতে গুজরাত তখন কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছিল। মহাভারতে গুর্জর সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করিতে পারি যে, আর্যসভ্যতার কেন্দ্রভূমি মধ্যদেশ হইতে গুজরাত বহু দূরবর্তী ছিল বলিয়া আর্যশিক্ষা ও সংস্কৃতি সেখানে পৌঁছিবার পথে তাহার শুদ্ধি ও শক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে গুজরাতী ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায় আর্য-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ধর্মানুষ্ঠানাদি করিতে না পারায় মর্যাদাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।[৩] ইহার একটা সুফল এই দেখিতে

১ Thus was laid the foundation of Gujarat as a separate kingdom under the Chaulukyas of Anahilavada. K. M. Munshi—Gujarat and its literature, p. 69.

২ মুসলমানি যুগে সৌরাষ্ট্র হয় সোরঠ। অতঃপর অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মরাঠী দস্যুরা গুজরাতে লুণ্ঠনকার্যে অগ্রসর হইলে সৌরাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ কাঠিসম্প্রদায়ের কাছে তাহারা প্রবল বাধা পায়। সেই হইতে মহারাষ্ট্রে সৌরাষ্ট্রের নতুন নাম হয় কাঠিয়াবাড় (কাঠিদের বাসভূমি)।

৩ ততস্তু ক্ষত্রিয়াঃ কেচিজ্জামদগ্ন্যভয়ার্দিতাঃ।
বিবিশুর্গিরিদুর্গাণি মৃগাঃ সিংহার্দিতা ইব॥

পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের ন্যায় প্রাচীন গুজরাতী সমাজে জাতি বৈষম্যের তিক্ততা কখনো উগ্র হইয়া উঠে নাই।

২২৯. ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব ক্ষীণ ছিল বলিয়া গুজরাত প্রাচীন-কালেই জৈনধর্মের একটা বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। উত্তর ভারতের মৌর্যবংশ জৈনধর্মের প্রতি বিশেষ একটা আকর্ষণ বোধ করেন নাই। পরবর্তী গুপ্তবংশ ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। সুতরাং জৈন-সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের ধর্ম-প্রচারের আশায় ক্রমশ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকে ও পাণ্ড্যরাজ্যে রাজশক্তির সহায়তায় জৈনধর্ম অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে, কন্নড ও তামিল ভক্তিসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। প্রবলতর ভক্তিধর্মের আবির্ভাবে দাক্ষিণাত্য হইতে জৈনধর্ম নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও কন্নড ও তামিল সাহিত্য তাহার স্থায়ী চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে নব্য হিন্দু-সংস্কৃতির বিরোধিতায় জৈনসম্প্রদায় চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলেও গুজরাতের ভিন্ন পরিবেশে তাহাদের প্রচার ও পুষ্টির সুযোগ জুটিয়াছিল। সাহিত্যিক ঐতিহ্য-বিহীন উদার গুজরাত জৈনধর্মকে সাদরে বরণ করিয়া লয়। জৈনরাও জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য একপ্রকার মনোরঞ্জনমূলক ধর্ম-সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বলা বাহুল্য, তখনও গুজরাতী ভাষার উদ্ভব ঘটে নাই। প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত গুর্জর-মণ্ডলের এই প্রাচীন জৈন-সাহিত্য এখনও গুজরাত ও রাজপুতানার জৈন-

---

তেষাং স্ববিহিতং কর্ম তদ্‌ভয়ান্নানুতিষ্ঠতাম্‌
প্রজা বৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ ॥
এবং তে দ্রাবিড়াভীরাঃ পুণ্ড্রাশ্চ শবরৈঃ সহ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্যুত্থানাৎ ক্ষত্রধর্মিণঃ ॥

—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, অশ্বমেধিক পর্ব, ৩৪শ অধ্যায়—১৪-১৬।

মন্দিরগুলিতে কিছু কিছু রক্ষিত আছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতার জন্য উহার অনেক অংশ মুদ্রাযন্ত্র দেখিবার সুযোগ লাভ করে নাই।

সে যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে গুজরাতী জনজীবনের ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জৈনসম্প্রদায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ সৌরাষ্ট্রের সন্তান। দশম শতাব্দী হইতে জৈনধর্মের প্রভাব আরও ব্যাপক হইয়া পড়ে। চৌলুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ স্বয়ং জৈন-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই রাজবংশের সহিত জৈনধর্মের ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ জৈন সাধু দ্বাদশ শতাব্দীর হেমচন্দ্র (১০৮৯-১১৭৩) কেবল সাম্প্রদায়িক ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নয়, সমগ্রভাবে গুজরাতের জাতীয় চেতনার প্রধান পুরোহিত।[১] সাহিত্যের দিক হইতে বলা যায়, গুজরাতী জৈন সাধুরা 'ভাষা'র ক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছেন। গুজরাতী ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হইতেছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর জৈন সাধু সোমসুন্দর (১৩৭৪-১৪৪৬)।

২৩০. উল্লিখিত বিবরণ হইতে বোঝা যায়, জৈনধর্ম দ্রাবিড়ে ও কর্ণাটকে যে যুগে ক্ষয়িষ্ণু হইয়া অবশেষে তিরোহিত হইয়া গেল, গুজরাতে তখন উহার জয়জয়কার। বিত্তশালী জৈনগণের বদান্যতায় গুজরাত ও রাজস্থান অসংখ্য জৈনমন্দিরে সুশোভিত হইল। রামানুজ নিম্বার্ক, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, রামানন্দ প্রভৃতির শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায় ভারত পরিক্রমাকালে গুজরাতের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেন সন্দেহ নাই, এবং সেই সঙ্গে বিষ্ণুভক্তির কিছু প্রচারও এখানে হইয়া থাকিবে; কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত গুজরাতে কোনো শক্তিশালী

১ If Siddharaja was the political creator of Gujarat, Hemchandra was the creator of the Gujarati consciousness. K. M. Munshi—Gujarat and its literature, p. 80.

ভক্তি-আন্দোলন অথবা স্থায়ী ভক্তি-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। দ্রাবিড়ে-কর্ণাটকে-মহারাষ্ট্রে সর্বত্রই যেমন ভক্তি-সাহিত্য সৃষ্টির পূর্ব হইতেই দেশের জনসমাজের মধ্য দিয়া একটা ভক্তি-উন্মাদনার স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল গুজরাতে তাহারও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই প্রদেশের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বাংলার জয়দেব ও চৈতন্যের ন্যায়, দ্রাবিড়ের রামানুজের ন্যায়, কর্ণাটকের মধ্বাচার্যের ন্যায়, মহারাষ্ট্রের জ্ঞানেশ্বরের ন্যায় এবং বৃন্দাবনের নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্যের ন্যায় গুজরাত কোনো সর্বভারতীয় ভক্তের জন্মস্থান অথবা কর্মস্থানরূপে নির্বাচিত হয় নাই। এ হেন জৈন-প্রধান গুজরাতের কথা ভাবিয়াই বোধকরি ভাগবত-মাহাত্ম্যকার ভক্তিদেবীকে দিয়া বলাইয়াছিলেন—গুর্জরে জীর্ণতাং গতা—আমি গুর্জরে আসিয়া জীর্ণ হইয়া পড়িলাম।

২৩১. ইহা গুজরাতের যথার্থ চিত্র হইলেও চিরকালের চিত্র নয়—এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। গুজরাতকে এই দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছেন ষোড়শ শতকে আবির্ভূত গুজরাতী সাহিত্যের আদিকবি, ভক্তকবি ও শ্রেষ্ঠ কবিরূপে পরিচিত নরসিংহ মহেতা (১৫০০-১৫৮০ খ্রী°)। তাঁহাকে আমরা গুজরাতী সাহিত্যের ভক্তি-গঙ্গার ভগীরথ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সমাজ ও পরিবারের বাধা অতিক্রম করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিয়া তিনি একাকী যেভাবে কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গীতসুধা বিলাইয়া গিয়াছেন তাহাতে ভগীরথের সহিত তুলনাটা খুব অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবে না আশা করি।

২৩২. গুজরাতের মৃত্তিকায় নরসিংহ মহেতার ন্যায় ভক্ত কবির আবির্ভাব বিস্ময়কর হইলেও কিছু আকস্মিক নয়। এই প্রদেশের মধ্য দিয়া তীর্থপরিক্রমারত ভক্ত পুরুষগণের যাতায়াত পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। খুব মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মধ্যে বিষ্ণু-উপাসনা সীমাবদ্ধ থাকিলেও জনসাধারণের চোখে তাঁহা একান্ত অজ্ঞাত বস্তু ছিল না।

যতদূর জানা যায়, গুজরাতী ভাষার প্রথম বৈষ্ণবগ্রন্থ রচিত হয় ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে। রচয়িতা নরসিংহারণ্যমুনি এবং গ্রন্থের নাম 'বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়'। কিন্তু প্রথম ভক্তকবিরূপে যাঁহার ব্যাপক পরিচিতি, তিনি গুজরাতের 'গরবী'[১] নামক বিশিষ্ট কাব্যধারার স্রষ্টা ভালণ (১৪২৫-১৫০০ খ্রী°)। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ ছাড়া কবি নানা ধরণের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতি হইল বাণভট্টের কাদম্বরীর পদাকারে পদ্যানুবাদ।

নরসিংহ মহেতার ন্যায় ভালণকে আমরা ষোল-আনা ভক্তকবি রূপে গ্রহণ না করিতে পারি, কিন্তু গুর্জরের অনুর্বর হৃদয়-মরুতে কিঞ্চিৎ ভক্তিরসবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া তিনি যে নরসিংহের পথ কিছুটা সহজ করিয়া দিয়াছেন এই মর্যাদা তাঁহাকে অবশ্যই দিতে হইবে। কবির দু'একটি পদরচনার নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত হইল। একটি পদে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গোপীদের উক্তি এইরূপ: হে নন্দ-নন্দন, তুমি আমাদের কাছে এস। মধুর তোমার বংশীধ্বনি, তুমি আমাদের চিত্ত-চোর। আমরা যখন কাত্যায়ণী ব্রত করিলাম,

১ গরবী স্ত্রীলোকদের গেয় এক প্রকার কবিতা। প্রাচীনকাল হইতেই গুর্জর-রমণীরা উৎসবাদিতে, বিশেষ করিয়া নবরাত্রি উৎসবে, একপ্রকার গীতসহ নৃত্য করিয়া থাকে—উহা 'গরবো' (বহুবচনে 'গরবা') নৃত্য নামে পরিচিত। একটি মাটির পাত্রের মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া উহার চারিদিকে তাহারা হাত-তালি দিতে দিতে চক্রাকারে নৃত্য করে। সেই সঙ্গে গানও চলিতে থাকে। ঐ মাটির পাত্রকে বলা হয় 'গরবো', এবং সেই হইতে নৃত্যের নাম 'গরবো' (গরবা) এবং গানের নাম 'গরবী' হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমে ইহা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইলেও পরে প্রেম-সঙ্গীত, বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতিও, 'গরবা' নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'গরবী' নামে পরিচিত হয়। ভালণ এই পূর্বাগত লোক-সঙ্গীতের রীতিকে তাঁহার পদরচনার আদর্শ করিয়া ইহাকে মার্জিত রূপদান করেন এবং পরবর্তী কবিরা সকলেই ভালণের অনুসরণে 'গরবা' নৃত্যের জন্ত 'গরবী' গানে নতুন নতুন মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছেন।

তুমি আমাদের বস্ত্র হরণ করিলে। মান-মর্যাদা নষ্ট করিয়া তুমি আমাদের সূর্য প্রণাম করাইয়াছ। গুটিকয়েক মধুর বাণী শুনাইয়া তুমি যখন আমাদের চিত্ত চুরি করিলে, আমরা তখন গৃহে পতি ও রোরুদ্যমান শিশুদের ফেলিয়া রাখিয়া বনের মধ্যে আসিয়া প্রিয়ের সহিত মিলিত হইলাম। তুমি শরৎকালের রজনীতে যে চূড়ান্ত রাসক্রীড়া করিলে, তাহা দেখিবার জন্য মুনি ও দেবতারা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, গন্ধর্বদের আর কী দোষ? একটি রাতকে ছয় মাসের ন্যায় দীর্ঘ করিলে। যমুনার জলপ্রবাহ তখন স্থির হইয়াছিল। প্রভাত হইলে আমরা গৃহে ফিরিলাম। বলো, অবলা কিরূপে ধৈর্য ধারণ করিতে পারে?[১]

আর একটি পদে মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন-বাসিনী যশোদা যে স্বগতোক্তি করিয়াছেন, বাৎসল্যরসের দিক হইতে তাহা বিশেষ আস্বাদনীয়। যশোদা বলিতেছেন: হে মধুর মাধবজী (কৃষ্ণ), তুমি আমার ঘরে এস। স্নেহের হাতে আমি তোমাকে দুধ-ভাত খাওয়াইব। মথুরা যাওয়া অবধি তুমি খুব শক্তি ও সম্পদ্ লাভ করিয়াছ। কিন্তু সত্যই জানিও, আমার মতো ভালো কেহ তোমাকে বাসে না। তোমাকে যেরূপ আমি আমার দুই বাহুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিতাম, দেবকী তাহা অপেক্ষা অধিক স্নেহের সহিত জড়াইয়া ধরিবে না। আমার শরীর তখন যেরূপ রোমাঞ্চিত হইত, দেবকীর শরীর সেইরূপ রোমাঞ্চিত হইবে না। তুমি এখন জানিতে পারিয়াছ, আমি তোমার মা নই, ধাই। তুমি মাখন চুরি করিয়া খাইলে আমি তোমাকে বাঁধিতাম। সেইজন্য তুমি আমার উপর রুষ্ট হইয়াছ। কালিন্দীতে আমি তোমার পশ্চাতে ঝাঁপাইয়া পড়ি নাই, সেই কথা তুমি মনে রাখিয়া এখনও আমার

---

১ ওরো আব নন্দনা ছৈয়া রে, মারা কালজডানী কোর;
মীঠী মোরলীবালা রে, মারা চিত্তডা কেরো চোর।....
—নবীন কাব্য দোহন পৃ ৪৫৭

প্রতি কুপিত হইয়া আছ। অন্য কেহ তোমার মতো স্নেহ-ভালোবাসা আদায় করিয়া এত সহজে তাহা ভুলিতে পারে না। হে ভালণ-প্রভু কৃষ্ণ, আমার প্রতি তোমার সেই স্বল্পকালীন ভালোবাসার কথা স্মরণ করিও।[১]

ভালণের রচনায় যে ভক্তি-রসের স্ফুরণ, নরসিংহ মহেতার মধ্যে আসিয়া তাহা প্রাচুর্যে ও প্লাবনে গুজরাতকে মাতাইয়া তুলিল। এই দুই কবির মধ্যে যে কালগত ব্যবধান, উত্তরভারতে (এবং দাক্ষিণাত্যেও) সেই সময়টা ভক্তিধর্মের ব্যাপক প্রচারের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের সূচনাতেই গুজরাতের একাংশে ভক্তকবিরূপে নরসিংহের নাম ছড়াইয়া পড়ে। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, রামানন্দ প্রভৃতির শিষ্য-প্রশিষ্যগণ নানা সময়ে গুজরাতের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিলেও এই প্রদেশে তাঁহারা কোনো স্থায়ী কেন্দ্র বা ভক্তি-আন্দোলন সংগঠন করিতে পারেন নাই। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত গুজরাতে তাই জৈনধর্ম ও জৈন-সাহিত্যের প্রাধান্য।

২৩৩. ষোড়শ শতকের গোড়াতেই ব্রজভূমিকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরভারতে একটা প্রবল ভক্তি-আন্দোলন গড়িয়া উঠে। এবং ইহার অব্যবহিত প্রেরণা আসে দুই সমকালীন মহাপ্রভুর লোকোত্তর সাধনা হইতে—তেলুগু-সন্তান মহাপ্রভু বল্লভাচার্য (১৪৭৮-১৫৩০) এবং বঙ্গসন্তান মহাপ্রভু চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা এবং পুষ্টিমার্গের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য স্বীয় মত প্রচারের জন্য বার বার দেশ-পর্যটন করেন এবং এই পর্যটনকালেই তিনি রাজস্থান-গুজরাত অঞ্চলে কিছু প্রভাব-বিস্তারে সক্ষম হন। ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদেই গুজরাতীতে বল্লভাচার্যের জীবনচরিত রচনা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

---

১ মীঠডা মারজীরে মারে মন্দির আবো।
প্রেমে পীরঁসু পরমানন্দ কুরনে দুধ পীরাবো॥...

গুজরাতে বল্লভ-সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের একটা বিশেষ কারণ কুম্ভনদাস (জন্ম ১৪৬৮), সুরদাস (জন্ম ১৪৭৮) প্রমুখ ব্রজভাষার বৈষ্ণব কবিদের সহজ সরল পদাবলীর অনুপম মাধুর্য। রাজস্থানী-গুজরাতী ভাষাসমূহ ব্রজভাষার সহিত নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ বলিয়া ব্রজভূমির অষ্টছাপ কবি-সম্প্রদায়ের রচনা সহজেই গুজরাতের জন-মানসকে আকৃষ্ট করিল। বল্লভাচার্যের পুত্র বিট্‌ঠলনাথ (১৫১৫-১৫৮৫ খ্রী°) গুজরাতে বৈষ্ণব মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিলেন। জৈনধর্মের দেশ ধীরে ধীরে ভক্তিধর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।[১]

২৩৪. ভক্তিধর্মের এই ব্যাপক অভ্যুত্থানের মুখেই নিন্দিত গুজরাতের মৃত্তিকায় আবির্ভূত হইলেন মহান্ ভক্তকবি নরসিংহ মহেতা (১৫০০-১৫৮০)। জুনাগড়ের এই নাগর ব্রাহ্মণসন্তান শৈশবে পিতাকে হারাইয়া দাদার সংসারে মানুষ হইতে থাকেন। ভ্রাম্যমাণ বৈষ্ণব মহাজনদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি এমনভাবে কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে নৃত্যগীতপরায়ণা কৃষ্ণবল্লভা গোপীদেরই একজন বলিয়া মনে হইত। ইহার ফলে কবির বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায় এবং শিবোপাসক আত্মীয়স্বজনবৃন্দ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন।[২]

১ (ক) The enthusiastic worshipper looked upon the Goswami (Vallabhacharya) as God and described his appearance with admiration. This sect became very popular in Gujarat, attracting many castes which followed Saivism or Jainism. K. M. Munshi—Gujarat and its Literature, p. 1·5.

(খ) The Bania Community is divided into a majority of Vaishnavas and a minority of Jains. G. M. Tripathi—The classical poets of Gujarat, p. 56

২ কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝবেরী-লিখিত "গুজরাতী সাহিত্য না মার্গ-সূচক অনে বধু মার্গসূচক স্তম্ভো" পৃ ৩৯।

পারিবারিক জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া এবং বিশেষত ভ্রাতৃবধূর দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া কবি একদিন শিবপূজায় বসিলেন। সাতদিন পূজার পর প্রসন্ন দেবতা তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলে সেখানে কবি একদিন দেখিতে পাইলেন গোপীদের সহিত রাসক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি। এইভাবে কৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগের মধ্য দিয়া কবির হৃদয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। তিনি জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন—যে আনন্দ আমি পাইলাম নিত্য সেই আনন্দের গান গাহিব; যে আমার হৃদয়পুরবাসী জগৎ-সমক্ষে তাহারই কথা ঘোষণা করিব। প্রভুর প্রতি ভালোবাসার আবেগে পরিপূর্ণ অন্তর লইয়া কবির তাঁহার ভ্রাতৃবধূর উদ্দেশে বলিলেন—তুমিই ধন্য, ধন্য তোমার মাতাপিতা। তুমি আমাকে কত-না কঠিন বচন বলিয়াছিলে; কিন্তু তাহাতেই আমার ভাগ্যোদয় হইল, তোমার কৃপায় আমি হরিহরের সাক্ষাৎ পাইলাম এবং কৃষ্ণজী আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।[১]

২৩৫. কুল-সংসার পরিত্যাগ করিয়া কবি জুনাগড়ে একটি গৃহনির্মাণ করিয়া ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া ভজনকীর্তনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছেন, যে কুলত্যাগ করিয়া সংসারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করিয়া হরিভজন করিবে, সে-ই তাঁহাকে পাইবে। অন্য সকলের জীবন বৃথা।[২] কুলত্যাগ করিলেও নাগর-ব্রাহ্মণদের অত্যাচার কিছু কমিল না। কারণ তাহাদেরই একজন অস্পৃশ্য হরিজনদের লইয়া নৃত্যগীতে মত্ত হইবে ইহা সহ্য করা কঠিন বৈ কি! এইরূপ 'ভুঁডো' বা দুর্জন ব্যক্তিকে সমাজে রাখা যায় না। এই উপলক্ষ্যে কবি নিজের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন: আমি এইরূপই

১ ধন্ত ভাভী তমে, ধন্ত মাতা পিতা…

২ কুলনে তজশে হরিনে ভজশে সহেশে সংসারহুঁ মহেহুঁরে,
ভণে নরসৈঁয়ো, হরি তেনে মলশে, বীজী বাতে খোহহুঁ রে।

বটে, তোমরা আমাকে যাহা বল আমি তাহাই বটে। সকল সমাজের মধ্যে আমিই একমাত্র দুর্জন, দুর্জন অপেক্ষাও দুর্জন। তোমরা আমাকে যাহা খুশী বলিতে পার, কিন্তু আমার ভালোবাসা গভীর। আমি দুষ্কৃতিকারী 'নরসৈঁয়ো' (নরসিংহ), বৈষ্ণবগণ আমার অতিশয় প্রিয়। হরিজন হইতে যে নিজেকে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তাহার জীবন বৃথাই অতিবাহিত হইল।[১]

২৩৬. ব্রাহ্মণ-সমাজ অত সহজে ভুলিবার নয়। তাহারা কবিকে জাতিচ্যুত করিল। যে কবি বলিতে পারিয়াছিলেন, সংসারের সমস্ত সুখ মিথ্যা বলিয়া মনে করিও, কারণ কৃষ্ণ বিনা আর সমস্তই ক্ষণস্থায়ী (সুখ সংসারী মিথ্যা করী মানজো, কৃষ্ণ বিনা বীজুঁ সর্ব কাচুঁ), তিনি একসময়ে ক্ষোভে দুঃখে বলিয়া উঠিলেন—হে প্রভু, তুমি আর আমাকে দারিদ্র্য দিও না, নাগর ব্রাহ্মণসমাজে জন্ম দিও না।[২] ইহা অবশ্যই কবির ক্ষণিক দুর্বলতা এবং সেই দুর্বলতাজনিত অভিমান। কিন্তু এই সামাজিক উৎপীড়ন যে কবির সমস্ত মোহ-অহমিকার বন্ধন ভাঙিয়া চুরিয়া তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডীমুক্ত একটা উদার প্রীতির ক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল সে কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এই প্রীতির বশে বাঙালী কবি যেমন সবার উপরে মানুষের সত্যরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, নরসিংহের বাণী ততটা উদাত্ত না হইলেও তাহার কাছাকাছি আসিয়াছে যখন তিনি বলিলেন—যেখানে পক্ষাপক্ষী অর্থাৎ ভেদভাব, সেখানে পরমেশ্বর নাই ; সমদৃষ্টির কাছে সকল সমান—পক্ষাপক্ষী ত্যাঁ নহি পরমেশ্বর, সমদৃষ্টিনে সর্বসমান।

১ এবারে অমো এবারে এবা, তমে কহো ছো বলী তে বারে…
সঘলা সাথমাঁ হুঁ এক ভুঁডো, ভুঁডাথী বলী ভুঁডো রে …..
—ভক্তিজ্ঞাননাঁ পদো, পদ সং ৫

২ নির্ধন নে বলী নাত নাগরী মা দেইশ প্রভু অবতার রে।

কবি একটি কবিতায় বলিয়াছেন, বৈষ্ণব তাঁহার খুব প্রিয় (মুজনে তো বৈষ্ণব বহালা রে)। নরসিংহ মহেতার এই গানখানি গান্ধীজীর খুব প্রিয় ছিল, যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের সেই গান—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'। মহেতার উক্ত প্রসিদ্ধ সংগীতে বৈষ্ণবতার কয়েকটি লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুর উপাসকমাত্রই বৈষ্ণব? কবির উত্তর এই: বৈষ্ণবজন তো তাঁহাকেই বলি যিনি অপরের দুঃখ নিজের বলিয়া জানেন, পরদুঃখে তিনি উপকার করিবেন, নিজের মনে কোনরূপ অভিমান থাকিবে না। বিশ্বজগতে সকলকে তিনি বন্দনা করেন, কাহারও নিন্দা করেন না। কায়মনোবাক্যে দৃঢ় নিশ্চল। তাঁহার জননী ধন্য। তিনি সমদৃষ্টি এবং তৃষ্ণা-বিরহিত, পরস্ত্রী তাঁহার কাছে মাতৃতুল্য; কখনও তিনি মিথ্যাভাষণ করেন না, কাহারও সম্পদ স্পর্শ করেন না। মোহ-মায়া তাঁহাকে বশীভূত করে না, অন্তরে তাঁহার দৃঢ় বৈরাগ্য। সকল তীর্থ তাঁহার দেহের মধ্যে, রামনামে তাঁহার মহোল্লাস এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-কপটতা সকল তিনি জয় করিয়াছেন।[১]

এই কবি যে সকল বাহ্যানুষ্ঠানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। নরসিংহ মহেতার কণ্ঠে আমরা হিন্দী সন্ত কবিদের এবং বেমনা ও রামপ্রসাদের বাণী শুনিতে পাই যখন তিনি বলিলেন—স্নানে ও পূজা-অর্চনায় ফল কী? ঘরে বসিয়া দানধ্যান করিলে কী হইবে? জটাধারণ ও ভস্মলেপনে কোনো লাভ নাই। তপস্যা, তীর্থ, তিলক, তুলসী, মালা, গঙ্গাজল ইত্যাদির প্রয়োজন নাই। বেদ-ব্যাকরণ-ষড়দর্শন অধ্যয়নেই বা কী ফল যদি তোমার বর্ণভেদ থাকে? প্রকৃতপক্ষে এই সকল হইল পেট ভরাইবার কৌশল মাত্র। হৃদয়বাসী পরব্রহ্মকে যিনি দেখেন নাই,

১ বৈষ্ণবজন তো তেনে কহীএ জে পীড় পরাই জাণে রে :···

—হারমালা, পদ সং ১৪৮

যাঁহার তত্বজ্ঞান হয় নাই, তিনি চিন্তামণিরত্নতুল্য জন্ম বৃথাই ব্যয় করিলেন।[১]

২৩৭. ইচ্ছারাম সূর্যরাম দেশাই সংগৃহীত নরসিংহ মহেতার কাব্যসংগ্রহ হইতে দেখা যায় কবি ছোটবড়ো অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'দানলীলা' ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থগুলি পদাকারে রচিত। পরিশিষ্টে সংগৃহীত পদগুলিকে ধরা না হইলে কবি-রচিত মোট পদের সংখ্যা ১৩৫৫।

৭২টি পদবিশিষ্ট রচনা 'সুরত সংগ্রাম' কিছুটা অভিনব। ইহার বর্ণনীয় বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-যুদ্ধ। বসন্তের প্রভাত, পাখীরা মনের আনন্দে গান গাহিতেছে, শ্রীরাধিকা তাঁহার ভুবন-মোহিনী রূপ লইয়া সালঙ্কার দেহে চলিয়াছেন মথুরার পথে দধি বিক্রয় করিতে। সঙ্গে তাঁহার দশজন সখী—

বসন্ত না ভোরমঁা, বিহঙ্গম সোরমঁা
স্বামিনী চালী মধুপুর বাটে ;
ত্রিভুবন মোহিনী, আভ্রণ সোহিনী,
দস সখী রাখীছে দাণ মাটে। (পদ সং ৩)

এদিকে কৃষ্ণও দশজন বন্ধু লইয়া আসিয়াছেন তাঁহার মাশুল আদায় করিতে। কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ভর্ৎসনা করেন ; রাধাও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ কর্তৃক রাধা-আক্রমণ। সখা-সখীরাও নিষ্ক্রিয় দাঁড়াইয়া রহিল না—উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অকস্মাৎ নন্দের আবির্ভাবে উভয়পক্ষ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করে। নন্দ চলিয়া গেলে পুনরায় তাহারা মিলিত হয় এবং স্থির করে, পরবর্তী চৈত্রপূর্ণিমায় সংগ্রাম শুরু হইবে। রাধিকা মনোরম দেহভঙ্গী করিয়া বলিলেন—এই যুদ্ধে যে হারিবে সে অপরের দাস হইয়া থাকিবে—

---

১ শু থয়ুঁ স্নান সেবানে পূজাথকী, শু থয়ুঁ ঘের রহী দান দীধে
—ভক্তিজ্ঞান নাঁ পদো, পদ সং ৪৩

রাধিকা বোলতী মনমানে ডোলতী,
জে হারে তে তেহ্নু দাস থাএ—(পদ সং ৬)

পূর্ণিমা উপস্থিত। রাধা তাঁহার দশজন সখীসহ বাহির হইয়া আসিলেন। শত্রুপক্ষকে আত্মসমর্পণের জন্য রাধা পত্র লিখিলে ভাগ্যক্রমে সেখানে কবি নরসিংহ মহেতা উপস্থিত হইলেন। রাধা তাঁহাকে পত্রবাহক করিয়া পাঠাইলেন। ওদিকে কৃষ্ণ-শিবিরে পরামর্শ হইতেছে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা লইয়া। একজন সখা যুদ্ধের পরিবর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়া বসিল। তাহার যুক্তি এইরূপ : রমণীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিলে পুরুষের কিছু গৌরব বাড়ে না, কিন্তু হারিলে অগৌরব হয়—ঝীতীএ জশ নহীঁ, হারে অপজশ সহী—(পদ ১৪) সুতরাং যুদ্ধ না করাই ভালো। কিন্তু নারীর কাছে কৃষ্ণ হার মানিতে নারাজ।

ইতিমধ্যে নরসিংহ রাধার পত্র লইয়া উপস্থিত। কবির অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ছিল। তাই কৃষ্ণ-সখারা তাঁহাকে চোর মনে করিয়া বেদম প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় কবি সে যাত্রা রক্ষা পান। নিজেকে দূত বলিয়া পরিচয় দিয়া কবি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শ্রীরাধার পত্র অর্পণ করিলেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণকে কিছু উপদেশ দিতেও ভুলিলেন না। নরসিংহের উক্তি : ভাবিয়া কাজ করিও—পা ফেলার আগে তাকাইয়া দেখিও। এইরূপ লোকের কার্য সিদ্ধ হয়। বাছা, বুঝিয়া লও, হরিণী কতবার সিংহ-রাজকে পরাভূত করিয়াছে। পাগল, অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। সিংহ অপেক্ষা সিংহী শক্তিশালী, সর্প অপেক্ষা সর্পিণী, সেইরূপ বলশালী গোয়ালিনী। বারণ করিলে তুমি শুনিবে না, কিন্তু হার মানিলে বুঝিবে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার মান নষ্ট হইবে। অনেক অনুরোধ জানাইলাম; এখন আমি চলি। তোমার হার হইবে সন্দেহ নাই।[১]

১ পগ ডগলু জোঈ ভরে, কার্জ তেহ্নু সরে·····—পদ সং ১৯

কিন্তু নরসিংহের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণ তাঁহার সখাদের লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া রাধাকে পত্র পাঠাইলেন। এই পত্রের বাহক হইলেন জয়দেব। জয়দেব চলিলেন, মনে তাঁহার আনন্দ। যেখানে গোপিনীরা দাঁড়াইয়া, পত্র লইয়া সেখানে আসিলেন—

জয়দেব চালিয়ো, মন মাঁহি মালিয়ো,
আবিয়ো জ্যাঁ উভী গোপনবরী—(পদ ২৫)

রাধা তো কৃষ্ণের প্রস্তাব শুনিয়া আগুন। অবজ্ঞাভরে সেকথা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন—আমাদের জানো না? আমরা হইলাম আদ্যাশক্তি; তোমরা সব ভবঘুরে। মাটি ব্যতীত কি বীজ বপন হয়? দানব-মানব-দেবতা—সকলেরই মূলে নারীকে দেখিতে পাইবে।[১]

যাহা হউক দৌত্য ব্যর্থ হইলে উভয়পক্ষের সংগ্রাম শুরু হইল—বলা বাহুল্য সুরত সংগ্রাম। অনেক জয়-পরাজয় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া চরম জয় হইল রাধিকার। তিনি গোকুলনগরীর অধিরাণী হইয়া বসিলেন। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার একরূপ, ভবানন্দের হরিবংশ তাঁহার দ্বিতীয়রূপ, এবং নরসিংহ মহেতার কাব্যে তাঁহার তৃতীয়রূপের সন্ধান পাইলাম। এই শেষোক্ত রাধিকা অনেকাংশে অপূর্ণ হইলেও কতকাংশে অভিনব সন্দেহ নাই।

'রাসসহস্রপদী' প্রকরণে মাত্র ১৮৯টি পদ পাওয়া যায়। প্রথম পদের প্রথম ছত্রেই কবি বলিলেন—'সকল রমণী দলবদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে রাসক্রীড়া আরম্ভ করিল' (কামনী সর্বটোলে মলী, মাঁড়য়ো বম্রাবন রাস)। গোবিন্দের গুণকীর্তন করিতে করিতে তাহারা যখন রাস-ক্রীড়ায় রত, তখন কোকিল পঞ্চমস্বরে ডাকিয়া উঠিল; রাস-লীলা দর্শনের জন্য চন্দ্র এক জায়গায় স্থির হইয়া রহিল। নাচিতে নাচিতে যাহাতে পড়িয়া না যায় তজ্জন্য রমণীবৃন্দ কাছা দিয়া শাড়ী পরিধান

১ অল্যা আদি দেবী অমো, ভামটা সৌ তমো—পদ সং ২৭

করিল। সকলেই উপযুক্ত শৃঙ্গারে সজ্জিত। বুকে দুলিতেছে হার, পায়ে বাজিতেছে ঝাঁঝরের ঝঙ্কার।[১] নাচ একসময়ে বেশ উদ্দাম হইয়া উঠিল; নাচিতে নাচিতে গোপীগণ কৃষ্ণকে বাহু-বেষ্টিত করিয়া তাঁহার বক্ষ-লগ্ন হইয়া রহিল। এইরূপ নৃত্যবর্ণনায় কবি যে বিশেষ আনন্দ পাইতেন, 'রাসসহস্রপদী' হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়। এক জায়গায় বলিতেছেন: অগণিত অঙ্গনাগণ থেই থেই করিয়া নাচিতে লাগিল, কৃষ্ণ যে একই সময়ে প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। প্রত্যেকের চরণে ঝাঁঝরের ঝঙ্কার, নূপুরের রুনুঝুনু; কটিদেশে মেখলার মধুর ধ্বনি, আর সেই সঙ্গে সরস ঐকতান সৃষ্টি করিল মৃদঙ্গের তাল। নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল; সপ্তম স্বরের ধ্বনি গগনে পৌঁছিল। গোপীরা প্রভুর কণ্ঠে বাহু রাখিয়া তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মনোরম ভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল।[২]

নরসিংহ মহেতার বর্ণনা পাঠে মনে হয়, কবি যেন স্বচক্ষে কৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত অপূর্ব কল্পনাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আরও কয়েকটি পদ হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ তুলিয়া দেওয়া হইতেছে:

বৃন্দাবন মাঁ রমত মাঁড়ী, গোপী গোবিন্দ সাথে রে;
হাস্যবিনোদ পরস্পর করতাঁ, তালী দেছে হাথে রে। (পদ সং ৭৬)
রমঝম রমঝম নেপুর বাজে তালীনে বাজী তাল রে;
নাচতোঁ শামলিয়ো শামা, বাধ্যো রঙ্গ রসাল রে। (পদ সং ১৩৪)
জুবতী জীবন রসমাঁ রাতা দেতাঁ পরস্পর তালী রে;
বাহে বেণা মহুঅরনী ধুনী, থনথন করে বনমালীরে। (পদ সং ১৬৪)

নরসিংহ যেমন 'রাসহস্রপদী'তে শারদ রাসের বর্ণনা করিয়াছেন,

১ রাসক্রীড়া রমে মাননী, গুণ গাএ গোবিন্দ....পদ সং ১
২ থেই থেই করে অগণিত অজনা.....—পদ সং ৭২

তেমনি ১১৬টি পদ বিশিষ্ট "বসন্তনাঁ পদো" গ্রন্থে রহিয়াছে বাসন্ত রাসের বর্ণনা। প্রকৃতপক্ষে ইহা শ্রীকৃষ্ণের হোলী উৎসব। সখীরা পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—চলো চলো সখী, আমরা বৃন্দাবনে যাই, গোবিন্দ সেখানে হোলী খেলিতেছেন। এস, আমরা নটবর-বেশধারী নন্দনন্দনের সহিত দলে দলে গিয়া মিলিত হই—

চালো চালো সখী বৃন্দাবন জৈয়ে, গোবিন্দ খেলে হোলী ;

নটবর বেশ ধর্যো নন্দ নন্দন, মলীনে মহাবন টোলা। (পদ সং ৩৮)

গোপীরা সীঁথায় সিঁদুর ও নয়নে কাজল পরিয়া আসিয়াছে। কুঙ্কুমে কেশরে সজ্জিত তাহারা। চন্দন-চর্চিত বদন। কেহ নাচে, কেহ বা তালি দেয় ; কেহ হাসে, কেহ বা গান গায়। কেহ বা দুষ্টুমি করিয়া অপরকে চিমটি কাটিয়া লুকায়। এইরূপে বসন্ত ঋতুতে প্রফুল্ল ফাল্গুন মাসে মনোহর বৃন্দাবনে গোপীদের লইয়া কৃষ্ণ যে হোলী খেলিতেছেন নরসিংহ দাস তাহা দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন—

এক নাচে এক তাল বগাড়ে, ছাঁটে চন্দন ঘোলী…

সেঁথে সিঁদুর নে নেণে সমার্যাঁ, কুঙ্কুম কেশর ঘোলী। (পদ সং ৩৮)

এই পর্যায়ের আর একটি পদ হইতে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা হইতেছে কেবল এইটুকু দেখাইবার জন্য যে কবি নরসিংহ মহেতা কৃষ্ণলীলার চিন্তায় নিজেকে কতটা ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। যমুনার তীরে যুবতীগণের মধ্যে শ্যামলকৃষ্ণ মহারসের আস্বাদন করিতেছেন, প্রিয় কৃষ্ণের মুখে বংশীধ্বনি, সেই সঙ্গে বাজে মৃদঙ্গ, আর তাহারই তালে তালে ঝাঁঝর নূপুরের ঝঙ্কার তুলিয়া নাচিতেছে গোপীবৃন্দ। আবীরে চুআ-চন্দনে চারিদিক আন্দোলিত ; রং ভরিয়া তাহারা পরস্পরকে পিকচারী মারিতেছে। কেহ হার মানিতে চাহে না দেখিয়া নন্দকুমারের আনন্দের সীমা নাই (পদ সং ১৪)।

শারদ-রাস ও বাসন্ত-রাসের ন্যায় কবি কৃষ্ণের ঝুলন-লীলা লইয়াও কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন—দ্রষ্টব্য ৪৫টি পদ-বিশিষ্ট

"হিণ্ডেলনা পদো"। বাহুল্যভয়ে আমরা ইহার পরিচয়-গ্রহণে নিরস্ত হইলাম। কবি স্থানে স্থানে একই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন, কোথাও হয়তো তাঁহার বর্ণনা সন্তোষজনক হয় নাই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুচিমান্ পাঠকের নাসিকা-কুঞ্চন হইতে পারে। কিন্তু গুজরাতের জনজীবনে এই পদগুলি যে কী অপরূপ মাধুর্যের আস্বাদন যোগাইয়াছে গুজরাতী লেখক কে. এম. মুন্শীর একটি বচন হইতে তাহা বুঝিতে পারি : These padas have given to men and women in Gujarat a glimmer of romance, of love, of of the joy of the life.[১]

২৩৮. নরসিংহের রচনায় সম্ভোগ-শৃঙ্গার যতটা স্থান পাইয়াছে, সে তুলনায় বিপ্রলম্ভের অংশ খুবই সামান্য। মিলনের উল্লাস বর্ণনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, বিরহের গভীরতা প্রদর্শনে তাহার ভগ্নাংশও অনুপস্থিত। অক্রুরের রথ আসিয়া কৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গেল—এই প্রসঙ্গে হরু ঠাকুর প্রভৃতি বাঙালি কবিওয়ালারা গোপীদের দুঃখ-বর্ণনায় যে নিবিড় আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, নরসিংহ মহেতার ঐ একই বিষয়ে রচিত "গোবিন্দ গমন" অংশে (পদসংখ্যা ৩৩) তাহার আভাস মাত্র নাই।

অন্যত্র কোথাও কোথাও (যেমন 'রাসসহস্রপদী'-তে) কৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় রাধার বিরহ-ব্যাকুলতার কিছু প্রকাশ দেখা যায়। আমরা বিভিন্ন পদ হইতে এই জাতীয় কয়েকটি শ্লোক একসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি : প্রেমিক আমার বাঁশি বাজাইয়াছে ; আমার পক্ষে আর ঘরে থাকা সম্ভব হইতেছে না। আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি ; প্রিয়তমকে দেখিবার কী উপায় করি ?... যমুনায় কিরূপে জল ভরিতে যাই ? তাহার বাঁশরী যে আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে। প্রেমিকের নয়ন নাচিতেছে, তাহার সৌন্দর্যে আমি জড়াইয়া পড়িয়াছি।...তাহার নয়নে যাদু আছে, তাই তাহা

১ K. M. Munshi—Gujarat and its Literature p. 193

আমাকে ভালোবাসায় বাঁধিয়াছে। আমি কী করিয়া ঘরে যাই? সে আমার মন হরণ করিয়াছে, সখী!

কৃষ্ণকে একান্তে পাইয়া রাধিকার যে রসোদ্গার, নরসিংহ মহেতার দু'একটি পদে তাহার সুন্দর পরিচয় পাই। এইরূপ একটি পদে নারী-চিত্তের প্রীতির সহিত বাৎসল্যের মনোরম সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।—সখি, আজিকার রজনী আমার ধন্য হইল, কারণ কৃষ্ণ কী মধুর খেলাই না খেলিতেছে। হে সখি, তোমরা আনন্দে মঙ্গলগীত গাও; আমি মোতী দিয়া আলপনা আঁকিব। তারপরে নন্দকুমারকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার যাহা ভালো লাগে তাহাই ভোজন করাইব। দই, মাখন, শর্করা এবং তৎসহ ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া দুধ পান করাইব। নরসিংহ বলিতেছে, আমি কৃষ্ণের মুখ দেখিয়া হাত দিয়া তাহাকে আদর করিব (রাসসহস্রপদী, পদ সং ৭৬)।

অপর পদটিতে পাই প্রগাঢ় সম্ভোগেচ্ছা এবং তজ্জনিত শৃঙ্গার।—সজনি, আমার কথা শোন। আজ আমার রাত ধন্য হইল। আমার প্রভু হেলিয়া দুলিয়া হাসিতে হাসিতে আজ আমার গৃহে আসিয়া পদার্পণ করিল। অবলা নারীকে আনন্দ-দানের জন্যই যে সে আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কী। কোটি কন্দর্প-রূপী প্রেমিক আমার বশীভূত হইল। পুষ্পের নতুন সজ্জা, সমস্ত ভুবন মনোরম বোধ হইতেছে, চতুর্দশ দীপক জ্বলিতেছে, মনে খুবই হর্ষ জন্মিয়াছে।...প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মানুষের মধ্যে যিনি শূর বলিয়া পরিচিত, আমার কাছে থাকিয়া তিনি কাঁপিতেছেন।[১]

২৩৯. নরসিংহের কাব্যকলার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল তাহা হইতে তাঁহাকে সূরদাস বা তুলসীদাসের সমকক্ষ মনে না হইতে পারে। সূরদাসের সুগভীর আন্তরিকতা ও তুলসীদাসের

---

[১] সজনী সাঁভল মারী বাতজী, ধন ধন আজনী রাতজী,....

—চাতুরী ষোড়শী, পদ সং ১৪

মহনীয় মর্যাদা তাঁহার নাই। তথাপি দু'একটি পদে তিনি যে গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। গুরু নানক যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া গাহিয়াছিলেন "গগনমৈ থালু রবিচন্দু দীপক বনে", নরসিংহ মহেতার নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে আমরা সেই একই অনুভূতির প্রকাশ দেখি: আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, 'সে-ই আমি, সে-ই আমি' বলিয়া কে উহা ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে? সেই শ্যামের চরণে আমি মরিতে চাই, কারণ এখানে কৃষ্ণতুল্য আর কেহ নাই। অনন্ত উৎসবের মাঝে পথভোলা আমি; আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই মহৎ শ্যামসৌন্দর্যকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জড় ও চেতনকে একই বলিয়া জানিও; পরম প্রেমে সংলগ্ন থাকিও সেই মূল সঞ্জীবনে। ঐ দেখ, যেখানে উদীয়মান কোটি সূর্যের জ্যোতি জ্বলিতেছে, যেখানে স্বর্ণ আবরণে ত্রিদিব দ্যুতিময়, সেখানে সোনার দোলনায় আনন্দ ক্রীড়া করিতেছেন সচ্চিদানন্দ। সেখানে সলিতা নাই, তেল নাই, সুতো নাই; তবু সেখানে নিরন্তর অনির্বাণ দীপ জ্বলিতেছে। সেই অরূপের রূপ আমরা দেখিব, কিন্তু এই চোখে নয়। সেই রসময়ের রস পান করিব, কিন্তু জিহ্বায় নয়। তিনি যে অজ্ঞেয়, অবিনাশী, উচ্চাবচে বিরাজমান; কেবল সন্ত ব্যক্তিরা প্রেমের জালে সেই সর্বব্যাপীকে ধরিতে পারেন—

নীরখনে গগনমাঁ কোন ঘুমী রহো
'তে-জ হুঁ তে-জ হু' শব্দ বোলে,
শ্যামনা চরণ মাঁ ইচ্ছুঁ ছুঁ মরণ রে,
অঁহিয়া কোইনথী কৃষ্ণ তোলে।...

২৪০. গুজরাতী ভক্তিসাহিত্যের প্রথম যুগে নরসিংহ মহেতার সঙ্গে অপর যে ভক্তকবির নাম সম-সুরে উচ্চারিত হয়, তাঁহার জীবনকাহিনী সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। তিনি মীরাঁ। এই যোধপুর-কন্যা ও উদয়পুর-বধূর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মতভেদ

থাকিলেও আমরা ১৫০০-১৫৪৭ খ্রী° এই সময়কে তাঁহার জীবৎকাল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

মীরাঁর রচনা বলিয়া যে সমস্ত পদ প্রচলিত, ভাষার দিক হইতে সেগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—শুদ্ধ সাহিত্যিক ব্রজভাষা, রাজস্থানী মিশ্র ব্রজভাষা এবং গুজরাতী। মীরার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় রাজস্থানে। উত্তর-ভারতের তৎকালীন সাহিত্যিক ভাষা ব্রজভাষায় তিনি লিখিবার চেষ্টা করিলেও প্রথম প্রথম রাজস্থানীর (মারবাড়ী-মেবাড়ী) প্রভাব সর্বতোভাবে অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মিশ্র বজ্রভাষার পদগুলি এই যুগের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। অনতিকাল পরে শ্বশুরকুলের উৎপীড়নে তাঁহাকে উদয়পুর ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া আসিতে হয়। মীরা ব্রজভূমিতে কতকাল অবস্থান করিয়াছিলেন বলা কঠিন। সে যাহাই হউক, ব্রজধামে অবস্থানকালেই যে তাঁহার বিশুদ্ধ ব্রজভাষার পদগুলি রচিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমানে কোনো বাধা নাই। কবির শেষজীবন অতিবাহিত হয় গুজরাতে—দ্বারকায়। রাজস্থানী ভাষাগুলির সহিত গুজরাতীর অধিকতর সাম্য থাকায় এবং দীর্ঘকাল গুজরাতে অবস্থানের ফলে মীরার পক্ষে গুজরাতীতে পদরচনা ব্রজভাষায় পদরচনা অপেক্ষা সহজ হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দী ভক্তিসাহিত্যে মীরার উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার খ্যাতির তুলনায় হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান নগণ্য।[১] পক্ষান্তরে গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ

১ হিন্দীর ভক্তিসাহিত্যে অষ্টছাপ সম্প্রদায় শীর্ষস্থানীয়। এই আটজন কবির মধ্যে সুরদাস, নন্দদাস, পরমানন্দদাসের কথা স্বতন্ত্র। অষ্টছাপের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সকলেই যে কবিত্বের ছাপ লইয়া আসিয়াছিলেন একথা বলা যায় না। ইঁহারা সকলেই বল্লভ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মীরাঁ বৃন্দাবনে আসিয়াও, যে কোন কারণেই হউক, বল্লভাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। বরং তাঁহার রচনায় সন্ত রবিদাসের

শতাব্দীর সাহিত্য-কালকে 'নরসী-মীরা'র যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১]

বর্তমান আলোচনায় মীরার হিন্দী পদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কবি হিন্দীই লিখুন আর গুজরাতীই লিখুন, তাঁহার কাব্যের নায়ক সেই এক শ্যামসুন্দর নন্দনন্দন—শৈশবের গিরিধর গোপাল। ব্রজধামে কিংবা দ্বারকায় গিরিধর তাঁহার নিত্যসঙ্গী। কথিত আছে, দ্বারকায় তিনি রণছোড়জীর সম্মুখে নৃত্য-গীত করিতেন এবং অবশেষে একদিন সেই দেবতার আলিঙ্গনের মধ্যেই তাঁহার দেহ মিলাইয়া যায়।[২] কিন্তু তাঁহার গুজরাতী পদেও যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, গিরিধরের নাম আসিয়াছে।

(রুইদাস) নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে—সন্ত রৈদাস মিলে মোহিঁ সদ্‌গুরু। জীব গোস্বামীর সহিত মীরাঁর সাক্ষাৎকারের কাহিনী সুপরিচিত। গোসাঁইজীর মধ্য দিয়া মীরাঁ যে গৌরহরি চৈতন্যের সাধনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন ইহা তাঁহার রচনা হইতে সহজেই বোঝা যায়—স্যামকিসোর ভয়ো নব-গোরা চৈতন্ন জাকো নাঁব...গৌর কৃষ্ণকী দাসী মীরা ইত্যাদি। মীরাঁর এইরূপ আচরণ বল্লভ-সম্প্রদায় ক্ষমার চোখে দেখিতে পারে নাই। তাই 'চৌরাসী বৈষ্ণবোঁকী বার্তা'-য় অশ্রদ্ধার সহিত মীরাঁর নামোল্লেখ হইয়াছে। বল্লভাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে মীরাঁ অনায়াসে অষ্টছাপের অন্যতম হইতে পারিতেন।

১ কিঞ্চিৎ বিষয়ান্তর হইলেও একটি কথা বলিতেছি। কলিকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষের প্রতিটি ভাষার প্রতিনিধি-স্থানীয় এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম অঙ্কিত করা হইয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস-শঙ্কর-পাণিনি, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্জাবীতে গুরু নানক, হিন্দীতে তুলসীদাস, মলয়ালমে বল্লত্তোল্, তামিলে তিরুবল্লুবর্, মরাঠীতে জ্ঞানেশ্বর ইত্যাদি। গুজরাতীতে আছে—নরসিংহ মীরাবাঈ।

২ এই প্রসঙ্গে শ্রীরঙ্গম্-এর দেবতা রঙ্গনাথের আলিঙ্গনের মধ্যে তামিল ভক্তকবি আণ্ডালের মিলাইয়া যাওয়ার কাহিনী স্মরণীয়।

মীরাকে বলা হয় 'অভিনব রাধা'। নিম্নলিখিত গুজরাতী পদ হইতে বোঝা যাইবে কবি কত গভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম পতিরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের স্পর্শটুকু লক্ষণীয়।—হে সুন্দর প্রিয় আমার, তোমার মুখখানি দেখিবার জন্য মায়া (ইচ্ছা) জাগিল। তোমার মুখ যখন দেখিলাম, তখন এই জগৎ কেমন 'ক্ষার' (লবণাক্ত) হইয়া গেল। মনে, মনে আমি সংসার হইতে আলাদাই রহিয়াছি। সংসারের সুখ কেমন, না মরীচিকার জল যেমন! সুতরাং সেই সুখ যেন তুচ্ছ করিতে পারি। হে প্রিয় সুন্দর! সংসারের সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী ; এখানে বিবাহের পরে বিধবা হইতে হয়। সুতরাং তাহার ঘরে (মানুষের ঘরে) বধূরূপে কেন যাইব বল। বিবাহ করিতে হয় তো সেই পরম প্রিয়তমকে ; উহাতে বিধবা হওয়ার ভয় থাকে না। আমার হৃদয়ে সেই একই আশা, হে প্রিয় সুন্দর! আমি বড়ই ভাগ্যবতী।[১]

পার্থিব পতি-গৃহ ত্যাগ করিয়া মীরা যখন তাঁহার অলৌকিক প্রিয়তমের দেশ ব্রজভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন সেখানকার রীতি-নীতি সবই আলাদা। দই বিক্রি করে যে গোয়ালিনী, সে 'দই চাই' না বলিয়া বলিতেছে 'শ্যাম সলোনা' অর্থাৎ সুস্বাদু শ্যামের কথা। ঘোল বিক্রয় করিতে গিয়া তাহারা "মাধব"-কে বিক্রয় করিতেছে। দ্বারকায় অবস্থান কালে কবির মনে জাগিল সেই সুমধুর স্মৃতি, নিম্নলিখিত পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে : কোনো ব্রজনারী ডাকিয়া ডাকিয়া বেচিতেছে—'মাধব নাও গো মাধব নাও'। মটুকের মধ্যে 'মাধব'কে (ঘোল) ঢালিয়া লইয়া গোপী বেশ মনোরম ভঙ্গিতে চলিয়াছে। গোপী কী বলিতেছে শোন। বলিতেছে—'মটুকে আমার কুলাইতেছে না। বিশ্বাস না

১ মুখড়ানী মায়া লাগী রে মোহন প্যারা ! (সাহিত্যরত্ন ২য় ভাগ)

হয় নামাইয়া দেখো। ভিতরে তাকাইলে দেখিতে পাইবে কুঞ্জবিহারীকে—যিনি বালকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে গোরু চরায়'। এইরূপে গোপী চলিয়াছে বৃন্দাবনের পথে, সঙ্গে চলিয়াছে শত ব্রজনারী।[১]

কুবজা-গৃহগামী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করুণ আকূতি জানাইয়া রাধা বলিতেছে—আমার প্রিয় পতি কৃষ্ণ কুবজার কাছে যাইতেছে। হে সখি, গোকুলবাসীদের পাগল করিয়া এবং আমার প্রাণ হরণ করিয়া সে মথুরায় যাইতেছে। ওগো দীননাথ, সুন্দর পতি আমার, মথুরার পথে চলিতে চলিতে একবার তুমি ফিরিয়া এস। যদি তুমি না আস, হরি, আমার প্রাণ চলিয়া যাইবে। হে মহারাজ কৃষ্ণ, আমি নিশ্চয়ই মরিব এবং তোমাকে সেই আত্মহত্যার দায়িত্ব দিয়া যাইব। গিরিধরের সেবিকা মীরা বলে, হে প্রভু তুমি অবশ্যই সঙ্গে থাকিও।[২]

জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া কবি বুঝিলেন, তাঁহার এই জীর্ণদেহ আর প্রভুর পূজার উপযুক্ত মন্দির নয়। কেবল কি দেহ, যে হৃদয় দিয়া ভগবানের পূজা হইত, সেই হৃদয় বা কোথায়? হৃদয়-স্পর্শ-বিহীন এই জীর্ণ দেহ-মন্দিরে বসিয়া কবি যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা, কেন জানি না, বর্তমান লেখকের মনে রবীন্দ্র-নাথের "এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ" এই স্তবকটির কথা জাগাইয়া তোলে—দেবালয় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ওগো, দেবালয় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়স্থিত ক্ষুদ্র দেবালয় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শরীর কাঁপিতেছে, তাহাতে বলি-রেখা পড়িয়াছে, দাঁত শিথিল। হংস (হৃদয়) উড়িয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে এই

---

১ হাঁরে কোঈ 'মাধব ল্যো মাধব ল্যো' বেচন্তী ব্রজনারীরে,
মাধবনে মটুকী মাঁ ঘালী গোপী লটকে লটকে চালীরে।....
—বৃহৎকাব্য দোহন পৃ ৮৪২

২ কহান বর তো কুবজানে জায় রে...
—নবীন কাব্যদোহন পৃ ৬৫৫

পিঞ্জরখানি।...তথাপি গিরিধর-সেবিকা মীরা বলিতেছে—প্রভু, প্রেমের পেয়ালা তোমাকে পান করাইয়া তবে আমি পান করিব[১]।

এইরূপ ভক্তকবির শেষ জীবনে কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কী আশ্রয় থাকিতে পারে? কিন্তু বিষয়-বাসনার জড় সহজে উন্মূল হইবার নয়। কবি তাই হয়ত স্বীয় বিষয়মুখী চিত্তকে (অথবা এমনও হইতে পারে, সংসারের কৃমিকীট মানুষকে) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— "বোলো না, বোলো না, বোলো না, রাধাকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু বোলো না। ইক্ষু ও শর্করার স্বাদ ছাড়িয়া কটু নিমের জল পান করিও না। চন্দ্র-সূর্যের কিরণ ছাড়িয়া জোনাকির সঙ্গে প্রীতি করিও না। হীরা-মাণিক্যের অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া মণির সঙ্গে সীসার ওজন করিও না। রাধাকৃষ্ণের নাম ছাড়িয়া অন্য কিছু বলিও না"—

> বোল মা বোল মা বোল মা রে,
> রাধাকৃষ্ণ বিনা বীজু বোল মা রে...[২]

২৪১. নরসিংহ মহেতা এবং মীরাবাঈ ভক্তি-সাধনায় ও সাহিত্য-রচনায় যে পূত পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, পরবর্তীকালের গুজরাতী ভক্তিসাহিত্য তাহারই অনুবর্তী[৩]। নরসিংহ (১৫০০-১৫৮০ খ্রী°) হইতে দয়ারাম (১৭৬৭-১৮৫২ খ্রী°)—এই দীর্ঘ কালের মধ্যে গুজরাতী সাহিত্যে ছোট বড়ো অনেক ভক্তকবির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমরা এখানে কেবল প্রেমানন্দ ও দয়ারাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতেছি। কারণ গুজরাতী সাহিত্যের

১ জনূঁ থয়ু রে দেবল জনূঁ থয়ু...(নবীন কাব্যদোহন পৃ ৬৬০)

২ বৃহৎকাব্যদোহন পৃ ৮৪২

৩ The poems of Narasinha Mehta and Mira may be said to be the nucleus of all subsequent literature on the subject.—G. M. Tripathi. The Classical poets of Gujrat. p.22

ইতিহাসে এই দুইজন কবিকে দুই ভিন্ন যুগের প্রতিনিধি কবিরূপে গণ্য করা হয়।

২৪২. প্রেমানন্দ (১৬৩৬-১৭৩৪) ও দয়ারামের (১৭৬৭-১৮৫২) মধ্যে কালগত ব্যবধান থাকিলেও তাঁহাদের রচনায় যুগ-ধর্মের যে বিশেষ কোনো পার্থক্য রহিয়াছে এরূপ আমাদের মনে হয় না। আসলে উভয় কবিই রাধা-কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদরচনার মধ্য দিয়া গুজরাতী জনসাধারণকে সহজ আনন্দ দানের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। নরসিংহ ও মীরাবাঈর মধ্যে যে ভক্তির আবেগ পাওয়া যায়, পরবর্তী গুজরাতী সাহিত্যে তাহা অনুপস্থিত। আমাদের মনে হয়, গুজরাতের জনমানস ঠিক বিশুদ্ধ ভক্তিরসের অনুকূল ছিল না বলিয়াই হয়ত গুজরাতী ভক্তিসাহিত্যের এইরূপ পথ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গুজরাতের একটি প্রভাবশালী অংশ হইতেছে বণিক-সম্প্রদায়। ইহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি কেবল আজ নয়, বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের কর্মনৈপুণ্য কেবল স্ব-ভূমিতে নয়, ভারতের অন্যত্র, এমন কি, ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কর্ম-জীবনে এই কৃতী সম্প্রদায়ের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত ভদ্র ও কোমলপ্রকৃতি-সম্পন্ন। ফলে, বৃন্দাবনস্থ বল্লভসম্প্রদায়ের মোহন্ত ও গোস্বামীবৃন্দ গুজরাতে প্রচারকার্যে ব্রতী হইলে বৈষ্ণবতার রসমাধুর্য সহজেই ইহাদিগকে আকৃষ্ট করে।[১] দলে দলে তাহারা জৈনধর্ম হইতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। মনে রাখা প্রয়োজন, এই ধর্ম

১ এই প্রসঙ্গে G. M. Tripathi-র মন্তব্য লক্ষণীয়: These children of industry and enterprise are soft and gentle at home, and the poetry of the Vaishnava religion had special charm for them.. the apostles of Vallabha poured into the country, and men and women, mostly Banias accepted this new dispensation of madness.—The Classical poets of Gujrat, p. 56.

পরিবর্তনের মূলে আর যাহাই থাক, বিশুদ্ধ ধর্মীয় চেতনা বিশেষ গভীর ছিল না। সুতরাং তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রেমানন্দ, দয়ারাম প্রমুখ ভক্তকবি যাহা রচনা করিলেন তাহার মধ্যে ভক্তির পবিত্র মাহাত্ম্য অপেক্ষা মনোরঞ্জনের বিলাস অধিকতর পরিস্ফুট।

২৪৩. গুজরাতী সাহিত্যের এই অধ্যায় অনেকাংশে অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ধর্মের আবরণ আছে, কিন্তু চেতনা নাই। একদিকে নবাবী বিলাসিতার অনুকরণে গঠিত হিন্দু রাজসভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিরা মঙ্গলকাব্যের ভৃঙ্গারে শৃঙ্গার-রস পরিবেশন করিতে থাকিলেন, অন্যদিকে ইংরেজদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে হঠাৎ-গজাইয়া-উঠা ধনী-সম্প্রদায়ের মজলিসে দাঁড়াইয়া কবিওয়ালাদের কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণ-লীলার বিলাস-ব্যসন চলিতে লাগিল। এই যুগের কবি বা কবিওয়ালারা পূর্বসূরিদের কাছ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের উত্তর-সাধক রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়। কবিগানে বৈষ্ণব-লীলা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবতা নাই। ভারতচন্দ্রের রচনায় অন্নদা আছে, মঙ্গলও আছে, কিন্তু তাহা মঙ্গলকাব্য নয়।

গুজরাতী সাহিত্যের আলোচ্য অধ্যায়ে ঠিক অনুরূপ ব্যাপার দেখিতে পাই। ভালণে যে ভক্তিচেতনার উন্মেষ, নরসিংহ ও মীরা-তে যাহার পরিপূর্ণ বিকাশ, প্রেমানন্দের যুগে আসিয়া তাহা ক্ষয়িষ্ণু রূপ গ্রহণ করিল। এই সময়ে যাঁহারা জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের তত্ত্ব-কথা শুনাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহ কেহ গুজরাতী সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিলেও সমকালীন জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা বিশেষভাবে অখো বা অখা ভগতের কথা বলিতেছি।[১] সপ্তদশ শতকের (জীবৎকাল ১৬১৫-১৬৭৪) এই গুজরাতী কবিকে অনায়াসে পশ্চিম ভারতের

১ মূল নাম অক্ষয়রাম। তাহা হইতে অখারাম, অখা, অখো হইয়াছে।

'[illegible]' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সেই বিষয়বস্তু, সেই রীতি-পদ্ধতি, সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পঞ্চদশ শতকে কবীরদাসের আবির্ভাব উত্তর ভারতের পক্ষে বিশেষ যুগোপযোগী হইলেও সপ্তদশ শতকে অখো-র আবির্ভাব গুজরাতের পক্ষে কালাতিক্রমণ দোষ ছাড়া আর কিছু নয়। অখো তাই বহু-আলোচিত, কিন্তু জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন কবি।

২৪৪. এইখানেই আখোর উপরে প্রেমানন্দের জিৎ। দ্বিতীয় কবি প্রথম কবির ন্যায় দার্শনিকতার মোহে আচ্ছন্ন না হইয়া 'ওখাহরণ' (উষা-হরণ), 'অভিমন্যু আখ্যান', 'নলাখ্যান' প্রভৃতি ছোটবড়ো কাহিনী-কাব্যের মধ্য দিয়া রসের যোগান দিয়া গিয়াছেন। প্রেমানন্দের নামে পঞ্চাশের অধিক রচনা প্রচলিত থাকিলেও ভক্তির সহিত উহাদের সুদূরতম সম্পর্কও নাই। তাঁহার 'সুদামা চরিত্র', 'দশম স্কন্ধ' প্রভৃতি গুটিকয়েক রচনামাত্র ভক্তি বিষয়ক। সুতরাং 'বড়োদরা'-র (বড়োদা-র) এই ব্রাহ্মণসন্তান গুজরাতী ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও এবং ভক্তকবিরূপে তাঁহার পরিচিতি থাকিলেও আমরা তাঁহাকে নরসিংহ-মীরাঁর উত্তরসূরী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। রচনার নিদর্শনস্বরূপ আমরা তাঁহার একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। পদটি দানলীলাপ্রসঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি লইয়া রচিত—

শ্রীকৃষ্ণ : ধুতারী ঘুমটাবালীরে,
আঁজ্যা বিনা আঁখড়ী কালীরে…

রাধিকা : নানড়ী বয়মাঁ নাম জ কাঢ়য়ুঁ
লোক করে বখান…

কৃষ্ণ বলিল—'ওগো ধূর্ত অবগুণ্ঠনবতী, কাজল ছাড়াই দেখিতেছি তোমার চোখ দুটি ঘন-কৃষ্ণ; তোমার সুন্দর উন্নত শরীর; মুখে বেশ অহঙ্কারের ছাপ; যৌবনের প্রভাবও যথেষ্ট; কিন্তু মাশুল না দিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ? আমি তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিব'।

এই বলিয়া কৃষ্ণ রাধাকে আটকাইল। তখন রাধা 'অল্প বয়সেই বেশ নাম করিয়াছ তুমি, তোমার গুণের কথা সকলেই বলে'—কৃষ্ণকে এইরূপ ব্যঙ্গবচন শুনাইয়া সখীগণকে বলিল—'চল, আমরা সোজা গিয়া নন্দগোপের কাছে নালিশ করিয়া আসি।'

কৃষ্ণ বলিল—'এই গোকুলে বহু আহীরের বসবাস; তোমার দেখিতেছি লজ্জাশরমের বালাই নাই; বেশ কলহ করিতেছ'। রাধা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিল—'রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে-ই কলহ করে যাহার দুই বাপ (বসুদেব ও নন্দ)। আমার কাছে তুমি মাশুল চাহিবার কে? কংস কি তোমাকে ছাপ-মোহর (অধিকার) দিয়াছে?' কৃষ্ণের উত্তর—'ছাপ-মোহর তো দিবে তোমার ভালোমানুষ বাপ বৃষভানু। আমি নন্দের পুত্র কাহারও হুকুমের অপেক্ষা রাখি না'।

রাধা বলিল—'শামলা (কৃষ্ণ), বুঝিয়া-সুঝিয়া কথা বলিও। সাধারণ লোককে উপদ্রব না করিয়া ভিক্ষা দ্বারা পেট ভরাইবার চেষ্টা করো গিয়া'। কৃষ্ণের উত্তর—'গোপী, তুমি আমাকে অনেক গাল দিয়াছ। আমি ভিক্ষার পদ্ধতির কথা বলিতেছি, তুমি আমার কাছে কান লইয়া এস'। 'কান আনিবার প্রয়োজন কী? তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিও, আমাকে যে স্পর্শ করিতে পারে এমন লোক দেখা যায় না।'

কৃষ্ণ বেশ সগর্বে উত্তর দিল—'রানী ইন্দ্রাণীও আমার কাছে আসিয়া তাহার মান রাখিয়া যায়। হে সুন্দরী রাধা, আমি তোমার সর্বস্ব লইব, তবে আমার নাম কৃষ্ণ'। 'তুমি ছয় বৎসরের বালক মাত্র, এখনও চুরি করিয়া ঘোল খাও'। 'তুমি মদমত্তা গোয়ালিনী, আমি ছোট্ট বালক; সন্ধ্যা আসিতে দাও, আমি তোমাকে আমার বালকত্ব দেখাইব।' এইভাবে বিতর্ক করিতে করিতে দিবস কাটিয়া গেল। একাকিনী অবলাকে তাড়াতাড়ি

যাইতে হইবে। প্রেমানন্দ বলিতেছে, প্রভু, গোপী তোমার পায়ে পড়িয়াছে ; তাহাকে তুমি যাইতে দাও।[১]

২৪৫. প্রাচীন ধারার শেষ প্রতিনিধি কবি দয়ারাম (১৭৬৭-১৮৫২)। নরসিংহের ন্যায় ইনিও ছিলেন নাগর ব্রাহ্মণ। 'সোনী' অর্থাৎ সোনার বেনের বিধবা রমণী রতনবাঈকে ভালোবাসিয়া কবি তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমাজ-গর্হিত আচরণ সত্ত্বেও গুজরাতে তাঁহার অনুরাগী ও অনুগামীর সংখ্যা যথেষ্ট। কবি দেশভ্রমণ করিয়াছেন বিস্তর ; হরিদ্বারের গঙ্গাজল কাঁধে বহিয়া রামেশ্বরে আসিয়া তিনি সেই জলে স্নান করেন। গুজরাতী ছাড়া হিন্দী, মরাঠী, পঞ্জাবী, উর্দু ও সংস্কৃতেও তাঁহার রচনা আছে। মাতৃভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিলেও ভক্তিসাহিত্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য তাঁহার "গরবী সংগ্রহ"। গরবা-নৃত্যের সহযোগী এই গীত-ধারা লোক-সংগীত-রূপে বহুকাল হইতে গুজরাতে প্রচলিত (দ্র° ২৩২)। পঞ্চদশ শতকের ভক্তকবি ভালণ প্রথমে এই গীত-পদ্ধতিকে রাধা-কৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় ব্যবহার করেন। গুজরাতে গরবী-রচনার ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই। দয়ারামের অনুরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা গুজরাতী ভক্তিসাহিত্যের উপসংহার করিতেছি। আলোচ্য পদে গোপীরা উদ্ধবকে দিয়া মথুরবাসী কৃষ্ণের কাছে তাহাদের দুঃখের সংবাদ পাঠাইতেছে—হে উদ্ধব, আমরা যাহা বলিতেছি, সেই মোহন সুন্দরকে তুমি সেইরূপ বলিও। বলিও—"সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তুমি গোকুলে ফিরিয়া এস। একটি পল আমাদের কাছে কোটিযুগের ন্যায় মনে হইতেছে, দিন যে কত বড়ো সে আর কী বলিব ? এইরূপে মাস কাটিতেছে, বর্ষ কাটিতেছে, কত দুঃখ সহিব বল। মিনতি করিয়া বলিতেছি, আর দুঃখ সহা যায় না। হে প্রাণ-জীবন, তোমার পায়ে পড়ি, শাড়ির আঁচল বিছাইয়া প্রার্থনা করি। তনু ব্যাকুল হইয়াছে, মন তোমাতেই বিচরণ করে। অন্য

১ বৃহৎকাব্যদোহন পৃ ১১১-১১২

কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে ভালো লাগিতেছে না। আহারের কোনো ঠিকানা নাই, নিদ্রাও আসে না। অষ্টপ্রহর তোমারই চিন্তায় হৃদয় পুড়িয়া যায়। প্রিয়তমকে ছাড়া আমরা বিহ্বল; মুহূর্তের জন্য শান্তি নাই। এ দুঃখ কাহাকেও বলা যায় না, কেবল ভিতরে ভিতরে সন্তপ্ত হইতেছি। যদি এই মুহূর্তে মৃত্যু আসে, এই দুঃখ অপেক্ষা তাহাও অনেক ভালো। প্রাণ যায় যাক্, তোমার আসার আশা (বৃথা প্রতীক্ষা) তো শেষ হইবে"। এত কথা বলিবার পরে গোপীদের হঠাৎ খেয়াল হইল—আমরা তোমাকে এত সব বলিবার কে? হে দয়ারামের প্রিয়তম কৃষ্ণ, তুমি এখনই আসিয়া উপস্থিত হও, আর দেরি করিও না।[১]

১ নবীনকাব্যদোহন পৃ ১৮৫-১৮৬

নবম অধ্যায়

পঞ্জাবের ভক্তিসাহিত্য

২৪৬. দক্ষিণ-ভারত হইতে ভক্তিধর্মের তরঙ্গ উত্তরাভিমুখী হইয়া সুদূর পঞ্জাবে পৌঁছিবার পূর্বেই পশ্চিম হইতে আগত অন্য একটি ভাবতরঙ্গ পঞ্জাবের মনোভূমিকে সিঞ্চিত করিয়া দিল, এবং তাহা হইতেছে সূফী[১]-ধর্ম। মধ্যযুগে ভারতবর্ষ সূফীধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইলেও এই ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল নবম শতকের আরব দেশে[২]।

২৪৭. কুরান-শরীফের সঙ্গে সূফীদের চিন্তাধারার পূর্ণ সংগতি ছিল না বলিয়া সূফীরা বরাবর গোঁড়া মুসলমানদের অপ্রীতিভাজন ছিল। প্রথম যুগের আরবীয় সূফীরা যথাসম্ভব কুরানের অনুগামী হইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সূফীধর্ম যতই আরবের বাহিরে প্রচারিত হয় ততই বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ধর্মচিন্তা ও সংস্কৃতির নিকট সংস্পর্শে আসিয়া সূফীবাদে পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। যে সূফী সাধকেরা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল হজরৎ মুহম্মদ-প্রবর্তিত পন্থায় ঈশ্বরতত্ত্বে শিক্ষাদান। কিন্তু ক্রমশই ভারতীয় চিন্তার প্রভাবে সূফীবাদ রূপান্তরিত হইতে থাকে—হিন্দুদের বেদান্তদর্শন ও ব্রহ্মচিন্তা সূফীদের

১ সূফ (আরবী শব্দ)=পশম। পশমী কম্বলে দেহ আবৃত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া আরবে একশ্রেণীর মুসলমান সাধক 'সূফী' নামে পরিচিত হন। সূফী শব্দের মূল অর্থ 'পশমী বস্ত্র পরিধানকারী' হইলেও পরবর্তীকালে যোগরূঢ় শব্দরূপে বিশিষ্ট সাধক-সম্প্রদায় বুঝাইতে ইহার প্রচলন হয়।

২ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. XII, p. 10.

নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে। পঞ্জাবী সূফীদের মধ্যে অনেকে আবার কর্মফল জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়[১]। এইভাবে ভারতীয় সূফীধর্ম আরবীয় সূফীধর্মের একান্ত অনুবৃত্তি না হইয়া হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সাধনার একটা মিশ্ররূপ গ্রহণ করে[২]।

২৪৮. ভারতে সূফীসাধনার প্রথম প্রবেশ ঘটে একাদশ শতকে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ ভক্ত-দার্শনিক রামানুজাচার্যের সমকালে। গজনী প্রদেশের মখদুম সৈয়দ আলি অল্ হুজবেরীকেই ভারতের আদি সূফীসাধকরূপে গণ্য করা হয়[৩]। কিন্তু এ দেশে সূফীধর্ম শক্তিশালী হইয়া উঠে ইরানের প্রসিদ্ধ সূফীসাধক খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তীর (১১৪২-১২৩৩ খ্রী°) ভারত-আগমনের পরে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের পঞ্জাব, আজমের প্রভৃতি অঞ্চলেই সূফীধর্ম-সাধনার প্রথম প্রচার ঘটে।

২৪৯. জনসাধারণের কাছে সূফীদের ধর্মমত আকর্ষণীয় করিয়া তোলার একটি প্রধান উপায় ছিল গান ও কবিতা। প্রথম যুগের ভারতীয় সূফী কবিরা তাঁহাদের রচনার জন্য ফারসী ভাষাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুই হউক মুসলমানই হউক, ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ফারসী অপেক্ষা তাহাদের নিজস্ব ভাষা অধিকতর হৃদয়স্পর্শী হইবে অনুভব করিয়া সূফীকাব্যরচনার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দেশীয় ভাষার ব্যবহার হইতে থাকে।

২৫০. পঞ্জাবী ভাষায় সূফীদের কাব্যরচনার ইতিহাস কবে

১ Lajwanti Rama Krishna, *Panjabi Sufi Poets*, p. XVIII.

২ 'Indian Sufism is a mixture of Muslim-Hindu thinking —A. M. A. Shushtery, *Outlines of Islamic Cutture*, p. 413.

৩ ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি, পৃ ৫৪।

হইতে আরম্ভ হয় তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে একটি প্রবল মতভেদ আছে। কিন্তু বিবদমান উভয়পক্ষই স্বীকার করেন যে পঞ্জাবী সাহিত্যের প্রথম সূফী কবি শেখ ফরীদ—যাঁহার কিছু রচনা সংকলিত হইয়াছে শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থসাহিব'-এ। এই ফরীদের কাল ও পরিচয় লইয়া পণ্ডিতগণের মতানৈক্য[১]। আমরা যে দুইজন ফরীদের পরিচয় পাই, তাঁহাদের প্রথম জন হইলেন পূর্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ সূফীসাধক খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তীর শিষ্য শেখ ফরীদুদ্দীন মসউদ শকরগঞ্জ (১১৭৩-১২৬৬ খ্রী°); সংক্ষেপে ইনি 'বাবা ফরীদ' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় ফরীদ হইলেন বাবা ফরীদের অধস্তন একাদশ পুরুষ শেখ ইব্রাহিম ফরীদ (১৪৫০-১৫৫২ খ্রী°)। গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রী°) তাঁহার এই সমসাময়িক সূফীসাধকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং দুইবার তিনি শেখ ইব্রাহিম ফরীদের সাধনাস্থল অজোধন (পরবর্তী নাম পাকপটন) পরিদর্শন করিয়া শেখ ফরীদের সহিত নানারূপ ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

গ্রন্থসাহেব প্রথমবার সংকলিত হয় গুরু অর্জুনদেবের কালে (১৫৬৩-১৬০৬ খ্রী°)। সুতরাং এই গ্রন্থে সংকলিত ও ফরীদ-নামাঙ্কিত রচনা সময়ের দিক হইতে দ্বিতীয় ফরীদেরও হইতে পারে। এমনকি

---

১ "সটীক শলোক ফরীদ"-এর রচয়িতা সাহিব সিং, 'বাবা ফরীদ দরশন'-এর রচয়িতা দীবান সিং প্রভৃতির মতে গ্রন্থসাহেবে ফরীদ-নামাঙ্কিত যে সকল বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শকরগঞ্জ শেখ ফরীদের, শেখ ইব্রাহিম বা দ্বিতীয় ফরীদের নয়। শিক্ষিত পঞ্জাবীদের ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। অপর পক্ষে দ্বিতীয় ফরীদকে উল্লিখিত বাণীসমূহের রচয়িতা বলিয়া যে সমস্ত আলোচনা করা হইয়াছে তাহার জন্য দ্রষ্টব্য বিয়োগী হরি সম্পাদিত 'সন্ত সুধাকর' (১৯৫৩) পৃ. ৪০৫; *Panjabi Sufi Poets.* p. 7; *The Sikh Religion* (1909) Vol VI p. 357.

যাঁহারা গ্রন্থসাহেবের উক্ত পদগুলিকে প্রথম ফরীদের রচনা বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, গুরু নানক শেখ ইব্রাহিম ফরীদের কাছ হইতেই বাবা ফরীদের বাণীসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[১] আমার নানা কারণে বাবা ফরীদের বংশধর শেখ ইব্রাহীম ফরীদকেই প্রথম পঞ্জাবী সূফী কবি বলিয়া বিবেচনা করি। তাহা হইলে পঞ্জাবী ভাষায় সূফী কাব্যসাধনার সূত্রপাত হইয়াছে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে, এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

২৫১. ইসলামই মানুষের মুক্তিসাধনার একমাত্র পন্থা—পরবর্তী সূফীসাধকগণ এ কথা অকুন্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিতে পারেন নাই। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও যে তাঁহাদের চিত্তে সংশয় দেখা দিয়াছিল, ফরীদের রচনাতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—ভগবান এক, শিক্ষক দুইজন (মুহম্মদ এবং হিন্দুর অবতার)। কাহাকে সেবা করিব আর কাহাকেই বা ভর্ৎসনা করিয়া পরিত্যাগ করিব ?[২]

ফরীদ নরনারীর প্রেমের রূপকে ঈশ্বরের সহিত মানুষের প্রেম ও বিরহমিলনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, ফরীদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু ভারতীয় কবির রচনায় আমরা সেই চিত্রটি দেখিতে পাই। অভারতীয় সূফী কবিদের কাব্যে ভগবান প্রায়শ স্ত্রীরূপে কল্পিত। জীবাত্মা-রূপী কবি 'আশিক' (প্রেমিক) এবং পরমাত্মা তাহার 'মাশূক' (প্রেয়সী)। ফারসী কাব্যের এই আশিক-মাশূক-কল্পনা ও বর্ণনা উর্দু কাব্যের আসরকে পঙ্কিল করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্জাবী সূফী কাব্যের গোড়া হইতেই দেখা যায় ভগবান প্রেমিক এবং সূফী জীবাত্মা বিরহিণী নায়িকা। ফরীদের একটি পদে বিচ্ছেদ-

---

১ সাহিব সিং—সটীক শলোক ফরীদ পৃ. ১১।

২ ইক খুদাঈ দুঈ হাদী কেহ্‌ রা সেবী কেহ্‌ রা হদ্দা রদ্দী॥

—জনমসাখী (সন্তসুধাসারে প্রাপ্ত)

বেদনার বর্ণনা করা হইয়াছে এইরূপে : বিরহজ্বরে আমার সকল অঙ্গ জ্বলিতেছে আর আমি হাত মলিতেছি। প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আমি ব্যাকুল হইয়াছি। হে প্রিয়, তুমি মনে মনে আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছ। দোষ আমারই, দোষ তোমার নয়। হে স্বামী, আমি তোমার গুণ বুঝিতে পারি নাই। যৌবন হারাইয়া এখন পসতাইতেছি। কালো কোকিল, তুই কি কারণে কালো হইয়াছিস?—আপন প্রিয়ের বিরহ-জ্বালায় জ্বলিয়া? প্রিয়ের বিরহে কেহ কোনোদিন কি সুখ পাইয়াছে? যদি প্রভু কৃপালু হন তবেই প্রভুর সঙ্গে মিলন হইতে পারে। কুঁয়া (অর্থাৎ সংসার) খুব দুঃখদায়ক, আর সেই স্ত্রী (জীবাত্মা) একাকিনী (কুঁয়ার মধ্যে পড়িয়া আছি)। আমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নাই; আমার পথ বড়ই বিকট, তলোয়ার অপেক্ষাও ধারালো; উহার উপর দিয়া আমাকে যাইতে হইবে। শেখ ফরীদা, সময় হইয়াছে, পথ চলার জন্য তৈরি হও।[১]

এই জাতীয় পদ ছাড়া গ্রন্থসাহেবে ফরীদের দুই-চরণ-যুক্ত কতকগুলি শ্লোক সংকলিত হইয়াছে।[২] সেই ক্ষুদ্রকায় শ্লোক-গুলির মধ্যেও ফরীদের কবিপ্রকৃতির নিঃসংশয় পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ক. কেশ যখন কালো থাকে তখন রমণ না করিয়া কোনো নারী কি চুল পাকিয়া শাদা হইয়া গেলে রমণ করে? স্বামীর সঙ্গে তুই এখনই প্রীতি কর যাহাতে তোর চুলের রঙ্ আবার নতুন হয় (১২)।

খ. গলিতে জলকাদা এবং প্রিয়ের ঘরও অনেক দূরে। যদি

১ তপি তপি লুহি লুহি হাথ মরোরউ · —গ্রন্থসাহেব পৃ. ৭৯৪

২ গ্রন্থসাহেবে ১৩৭৭-১৩৮৪ পৃষ্ঠায় ফরীদের 'সলোক' সংগৃহীত আছে। এইরূপ শ্লোকের মোট সংখ্যা ১৩০।

আমি তাহার কাছে যাই তো কম্বল ভিজিয়া যাইবে, আর না গিয়া যদি ঘরে থাকি তো প্রেম ভাঙিয়া যাইবে (২৪)।

গ. যৌবন যদি চলিয়াও যায় তবু ভয় করি না যদি উহার সহিত প্রিয়ের ভালোবাসা না যায়। কতবার তো বিনা প্রেমেই যৌবন শুকাইয়া গিয়াছে (৩৪)।

ঘ. মানুষ সর্বদাই প্রেম-বিরহের কথা বলে। বিরহ, তুই তো সুলতান। যে তনুতে বিরহ জন্মে না সেই তনুকে শ্মশান বলিয়া জানিও (৩৬)।

ঙ. যতক্ষণ কুমারী ততক্ষণ উৎসাহ; বিবাহ হইলেই মামলা (অর্থাৎ নানাপ্রকার আপদ আসিয়া পড়ে)। এখন পরিতাপ এই যে, আর কুমারী হওয়া যায় না (৬৩)।

চ. কাক, তুই আমার অস্থি-পঞ্জর খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকল মাংস খাইয়াছিস। আমার এই চোখ দু'টি তুই স্পর্শ করিবি না, কেননা এখনও আমি প্রিয়কে দেখিবার আশা রাখি (৯১)।

একদিন ফরীদ সমাধি হইতে জাগিয়া বলিয়া উঠিলেন: যে নয়ন ঈশ্বরের দিকে তাকায় না তাহায় অন্ধ হওয়াই ভালো; যে রসনা তাঁহার নাম কীর্তন করে না তাহার মূক হওয়াই শ্রেয়; যে কান তাঁহার স্তুতি শ্রবণ করে না তাহার বধির হওয়াই উচিত; যে দেহ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয় না তাহার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।[১]

২৫২. পঞ্জাবে শেখ ইব্রাহীম ফরীদের বাণী বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া হিন্দু-শিখ-মুসলমান সকল শ্রেণীর মানুষের হৃদয় জয় করিয়াছে। ইব্রাহীম-প্রবর্তিত এই সুফী কাব্যের ধারা পঞ্জাবী সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। উত্তরকালে

১ ফরীদের আলোচ্য অংশটি *Macauliffe* রচিত *The Sikh Religion* (Vol. VI) পৃ ৩৭৯ হইতে গৃহীত। তুলনীয়: শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)—"বংশীনামমৃতধাম" ইত্যাদি অংশটি। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৫৭-৫৮।

যে সমস্ত সূফী কবির কণ্ঠ এই ধারাটিকে সতেজ ও সরস রাখিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেবল দুই জনের বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে। একজন লাল হুসৈন (১৫৩৯-১৫৯৩), অপর জন বুলেহ্ (বুল্লে) শাহ (১৬৮০-১৭৫৩)।

লাল হুসৈনের পিতামহ কুলজস সূফীধর্মে আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। উত্তরকালের সূফী কবিদের মধ্যে এইরূপ ধর্মান্তরিতের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। সূফীদের চিন্তাধারায় হিন্দু-মুসলমানধর্ম-বিশ্বাসের যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা লক্ষ করা যায় তাহার অন্যান্য কারণের সহিত এই কারণটিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। উর্দু কাব্যের ন্যায় পঞ্জাবী সূফী কাব্যেও প্রেমের ব্যাকুলতা বুঝাইবার জন্য আরবের লৈলা-মজনূঁ এবং পারস্যের শীরীঁ-ফরহাদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে পঞ্জাবের নিজস্ব তিনটি প্রেম-কাহিনীর স্থান আরও গুরুত্বপূর্ণ। হীর-রাঁঝা, সস্‌সী-পুন্নূ এবং সোহনী-মহীবাল—পঞ্জাবের লোক-সাহিত্য হইতে গৃহীত এই তিনটি প্রেমিক-যুগলের বিরহ-বেদনা পঞ্জাবী সূফী কাব্যে বিশেষ মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে। এই তিনের মধ্যে আবার হীর-রাঁঝাই সর্বধিক জনপ্রিয়।

লাল হুসৈনের একটি বিরহ-পদে আছে—বন্ধু বিনা রাত্রিগুলি বড়ো হইল, মাংস ঝরিয়া ঝরিয়া দেহ আমার কঙ্কাল হইল, হাড়গুলি পরস্পরে ঠোকাঠুকি করিতেছে, ভালোবাসাকে লুকাইয়া রাখিলেও লুকানো যায় না বিশেষত যখন বিরহ তাহার তাঁবু গাড়িয়াছে; রাঁঝা যোগী, আমি তাহার যোগিনী; ভগবানের ফকীর হুসৈন বলিতেছে, আমি তোমার আঁচল ধরিয়াছি।[১]

উল্লিখিত পদে কবি নিজেকে নায়িকা হীর-রূপে কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন—রাঁঝা যোগী, আমি যোগিনী। নিম্নোক্ত পদে আছে

১ সজ্জন বিন রাতীঁ হোইআঁ বড্‌ডীআঁ....

—মোহন সিং সম্পাদিত "শাহ হুসৈন" পৃ ২৩১।

সোহনী মহীবালের প্রসঙ্গ ঃ বিরহ-বেদনার কাহিনী আমি কাহার কাছে বর্ণনা করিব ? এই যন্ত্রণা আমাকে পাগল করিয়াছে, আমার চিন্তায় কেবল এই বিরহ। আমি কাহার কাছে সে কথা বলিব? বনে বনে আমি খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, আজও মহীবালকে পাইলাম না। হায় আমি কাহার কাছে সে কথা বলিব? ভগবানের ফকীর হুসৈন বলিতেছে, গরীবের দুর্গতি দেখ। আমি কাহার কাছে সে কথা বলিব ?[১]

২৫৩. পঞ্জাবী সূফী কবিদের মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন বুল্লেহ্ শাহ (১৬৮০-১৭৫৩)। কেহ কেহ তাঁহাকে 'পঞ্জাবের রূমী' বলিয়া অভিহিত করেন। বুল্লেশা রূমীর সমকক্ষ কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু অন্য কোনো ভারতীয় সূফী কবি যে তাঁহার ন্যায় খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই তাহা যে কেহ পঞ্জাবী 'কাওয়ালী' শোনার সুযোগ লাভ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন।

হিন্দু-মুসলমানের যে সহজ যোগসাধনার পরিচয় পাওয়া যায় বাংলাদেশের বাউলদের মধ্যে, তাহার মূলে সূফী ধর্মের প্রভাব আছে বলিলে অনুচিত হইবে না। বুল্লেশা'র রচনার একটা প্রধান সুর হইতেছে হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন। একটি পদে কবি বলিয়াছেন ঃ আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই; অভিমান ত্যাগ করিয়া আমি এই বসিলাম তিরঞ্জনে।[২] আমি সুন্নী নই, সিয়া নই; আমি পূর্ণ শক্তি ও ঐক্যের পথ লইয়াছি। আমি ক্ষুধিতও নই, রাজাও নই; আমি হাসিও না, কাঁদিও না; আমার বাড়ি নাই, আবার আমি

১ দর্দ বিছোড়ে দা হাল নীঁ মৈঁ কৈনূঁ আখাঁ॥···

২ তিরঞ্জন পঞ্জাবের গ্রাম্য জীবনের একটি প্রধান উৎসব—ইহাকে বলা যায় সুতা-কাটার উৎসব। পঞ্জাবের লোক-সংগীতে ও সূফীকাব্যে সুতা-কাটা কাপড়-বোনা প্রভৃতি প্রসঙ্গের বার বার উল্লেখ পাওয়া যায়।

গৃহহীনও নই। আমি পাপী নই, ধার্মিকও নই; পাপপুণ্যের পথ আমার জানা নাই। প্রত্যেক হৃদয়ে প্রেমিক বাস করেন, সুতরাং আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই ত্যাগ করিয়াছি।[১]

কৃষ্ণ-রাম-মুহম্মদের মধ্য দিয়া যে একই শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে সেই প্রসঙ্গে বুল্লেশা'র একটি ক্ষুদ্র 'কাফী' এইরূপঃ বৃন্দাবনে তুমি গোরু চরাইয়াছ, লঙ্কায় তুমি জয়ধ্বনি তুলিয়াছ, মক্কায় তুমি আসিয়াছ হাজীরূপে। বাঃ বিচিত্র তোমার রঙ্‌ ও রূপ! এখন তুমি নিজেকে কীভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছ?[২]

একটি কাফী-তে বুল্লেশা "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে" কতকটা এই সুরে সেই বিচিত্র-রূপীর পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ আমি পাইয়াছি কিছু পাইয়াছি। আমার সদ্‌গুরু আমাকে অলক্ষে দেখাইয়াছেন। কোথাও সে শত্রু, কোথাও বা বন্ধু। কোথাও মজনূঁ, কোথাও লায়লা। কোথাও গুরু, কোথাও শিষ্য। সমস্ত বিষয়ে সে তাহার নিজের স্বরূপ দেখাইয়াছে। কোথাও সে মসজিদ, কোথাও সে ঠাকুরের দুয়ার (মন্দির)। কোথাও জপমালা-ধারী বৈরাগী, কোথাও শেখ-বেশী মুসলমান। কোথাও সে তুরূক-রূপে নমাজ পড়ে, কোথাও জপ করে ভক্ত হিন্দু-রূপে। কোথাও ঘরে ঘরে কবর খোলে, আবার শিশু-রূপে ভালোবাসা পায়।[৩]

নায়িকা-ভাবে আবিষ্ট হইয়া বুল্লেশা যে কাফীগুলি রচনা করিয়াছেন বৈষ্ণব-রস-নিষ্ণাত বাঙালি পাঠক অবশ্যই তাহার মাধুর্য উপলব্ধি করিবেন। একটি পদ এইরূপঃ আমার হৃদয় কাঁদে

---

১ হিন্দু না, নহীঁ মুসলমান বেহীএ তিরঞ্জন তজ অভমান।...

২ বিন্দ্রাবন মেঁ গউ চরাবে, লঙ্কা চড়কে নাদ বজাবে, মক্কে দা বন্‌ হাজী আবে, বাহ বাহ রংগ বটাঈ দা! হুন্‌ কী থীঁ আপ চপাঈ দা?

৩ পাইআ হৈ কিছু পাইআ হৈ।
মেরে সতিগুরু অলখ লখাইআ হৈ॥...
—মেহর সিং এণ্ড্‌ সন্‌স্‌ প্রকাশিত "কাফীআঁ বুলহে শা:" পৃ ১০৫

প্রেমিক বন্ধুর জন্য। কোনো কোনো মেয়ে তাহার সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলে; কেহ কেহ বা তাহার সঙ্গে মিলিত হয় চোখের জলে। তাহাকে বলিও, এই প্রফুল্ল বসন্তকালে তাহার জন্য আমার হৃদয় কাঁদে। আমি স্নান করিয়া বৃথাই বসিয়া আছি, বন্ধুর হৃদয়ে কি একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমার হার ও শৃঙ্গার রচনায় আগুন লাগাইব। হৃদয় কাঁদে বন্ধুর জন্য।...ও বুল্লা, এখন বন্ধু তো ঘরে আসিয়াছে; আমি গাঢ় আলিঙ্গনে রাঁঝাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি; আমার দুঃখকষ্ট সমুদ্রের ওপারে চলিয়া গিয়াছে (দূর হইয়াছে)।[১]

উল্লিখিত পদের শেষাংশে যে মিলনের কথা বলা হইয়াছে তাহা বোধ করি ভাবসম্মিলন। 'সুন্দরী রাধা অনুক্ষণ মাধবকে স্মরণ করিতে করিতে নিজেই মাধবে পরিণত হইল'—বৈষ্ণব পদাবলীর এই সুর ফুটিয়াছে নিম্নোদ্ধৃত কাফী-তে—

'রাঁঝা রাঁঝা' বলিতে বলিতে আমি নিজেই রাঁঝা হইয়া গেলাম। সুতরাং এখন তোমরা আমাকে 'ধীদো' (মহিষ-পালক) বলিয়া ডাকিবে, কেহ আর 'হীর' বলিয়া ডাকিও না।[২] রাঁঝা আমার মধ্যে আছে, আমি রাঁঝার মধ্যে আছি। আর কোন চিন্তা নাই। আমি আর নাই, সে-ই আছে। সে নিজেকে লইয়া নিজে আনন্দ করিতেছে। 'রাঁঝা রাঁঝা' বলিতে বলিতে ইত্যাদি। হাতে আমার লাঠি, সামনে আমার গোধন, কাঁধে আমার ধূসর কম্বল। বুল্লাহ্, দেখ, শিয়ালবংশের (একটি উচ্চবংশের) মেয়ে হীর কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। 'রাঁঝা রাঁঝা' বলিতে বলিতে ইত্যাদি।[৩]

---

১ দিল লোচে মাহী ইয়ার্ নূঁ, দিল লোচে মাহী ইয়ার্ নূঁ।...

২ অভিজাত বংশের মেয়ে হীর। তাহার ভালোবাসার টানে রাঁঝা হীরের বাড়িতে মহিষ-পালক রূপে নিযুক্ত হয়। পঞ্জাবী কবি ওয়ারিস্‌-শাহ-রচিত "হীর" কাব্যখানি হিন্দু শিখ-মুসলমান-নির্বিশেষে পঞ্জাবী জনসাধারণ অতি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিয়া থাকে।

৩ রাঁঝা রাঁঝা করদী নী মৈঁ আপে রাঁঝা হোঈ।
সদ্দো নীঁ মৈনূঁ ধীদো রাঁঝা, হীর না আক্‌কো কোঈ॥...

আর একটি পদে বুল্লেশা সেই হীর-রাঁঝার রূপকে ঈশ্বরের প্রতি যে কাতর আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা একান্তই মর্মস্পর্শী—তুমি আমাকে তোমার প্রেমিকা বলিয়া মনে করো কি নাই করো, একবার আমার আঙিনায় এস। আমি তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; একবার তুমি আমার আঙিনায় এস। তোমার মতো আমার আর কেহ নাই; আমি তোমাকে সমস্ত বনে-প্রান্তরে খুঁজিয়াছি, সমস্ত পৃথিবীতে খুঁজিয়াছি। তুমি একবার আমার আঙিনায় এস। লোকে তোমাকে বলে মহিষপালক, তাহাদের মধ্যে আমি তোমাকে রাঁঝা বলিয়াই ডাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমার ধর্ম ও বিশ্বাস।[১] একবার তুমি আমার আঙিনায় এস।[২]

২৫৪. ভারতবর্ষে সূফীধর্ম পঞ্জাবে যতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আর কোনো প্রদেশে ততটা করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। পঞ্জাবই বোধ করি ভারতবর্ষে সূফী সাধনার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। ইহার পল্লীতে পল্লীতে সূফী সাধকের দরগা। মধ্যযুগ হইতে যখনই কোনো সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ দেখা দিয়াছে, এই সাধক-বৃন্দ তাঁহাদের ভাবধারা প্রচার করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানসিক উত্তেজনাকে প্রশমিত রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। সূফী কবিদের গানের মধ্য দিয়া শান্তি-প্রেম-ঐক্যের বাণী গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে।

২৫৫. পঞ্জাবের যে বিশিষ্ট ধর্ম শিখধর্ম, তাহারও মূলে রহিয়াছে সূফী ধর্মের প্রভাব। গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) একাধিকবার ভারত-পরিক্রমা করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নানা স্থান হইতে নানা

---

১ তুলনীয় চণ্ডীদাস—

তুমি হও মাতৃপিতৃ…তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।

২ ভাবেঁ জান না জনে বে বেহড়ে আবাড় মেরে।

মৈঁ তেরে কুরবান্ বে বেহড়ে আ বাড় মেরে।…

সজ্জন-সংসর্গে প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার ভক্তজীবনের মূল উৎস ছিল পঞ্জাবের সূফী সাধনা। বাবা ফরীদ (১১৭৩-১২৬৬) হইতে ইব্রাহীম ফরীদ (১৪৫০-১৫৫২) পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিনশত বৎসরের সূফীসাধনা সাধারণভাবে পঞ্জাবের জন-জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। নানক এক দিকে যেমন সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, অন্য দিকে তেমনি তিনি কবীর (১৩৯৯-১৫১৮), ফরীদ প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িকদের নিকট-সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। কবীরদাস ইব্রাহীম ফরীদের ন্যায় বিশুদ্ধ সূফী সাধক না হইলেও কবীরপন্থ রচনায় দক্ষিণের বৈষ্ণবধর্ম ও পূর্বাঞ্চলের নাথধর্মের সহিত পশ্চিমের সূফী ধর্মেরও সমাবেশ ঘটিয়াছিল। গুরু নানক কবীরদাসের মন্ত্রশিষ্য না হইলেও তাঁহার অনুগামী। বস্তুত পঞ্জাবে কবীরদাসের নির্গুণ উপাসনার ধারা প্রচার করিতে করিতে নানক শিখ-সম্প্রদায়ের আদি গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

২৫৬. নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) হইতে গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৭) পর্যন্ত প্রায় দুই শত বৎসর ব্যক্তি-গুরু পরম্পরা চলিবার পর শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব-ই তাহাদের গুরুস্থানীয় হইল। ইহাই তাহাদের 'আদিগ্রন্থ' বা 'গুরু গ্রন্থসাহেব'। পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব (১৫৬৩-১৬০৬) তাঁহার তিরোধানের দুই বৎসর পূর্বে এই মহান্ সংগ্রহ-গ্রন্থের সংকলন সম্পূর্ণ করিয়া যান। আদিগুরু বাবা নানক হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস এবং অর্জুন এই পঞ্চগুরুর রচনা ও বাণী ইহাতে সংকলিত হয়। পরবর্তীকালে নবম গুরু তেগবাহাদুরের রচনাও ইহাতে স্থান লাভ করে। মধ্যবর্তী তিনগুরু হরগোবিন্দ, হরিরায় এবং হরিকৃষণ কিছু রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাঁহাদের নামে স্বতন্ত্র পুস্তকও নাই, আবার গ্রন্থসাহেবেও কোনো রচনা সংকলিত হয় নাই। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭৭০) তাঁহার সংগ্রামপূর্ণ-স্বল্প জীবৎ-

কালের মধ্যে যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ কম নয়। যিনি বিশ্বাস করিতেন অস্ত্র-সাহায্য ব্যতীত অত্যাচারীর জুলুম বন্ধ করা যায় না, তিনিই যে আবার নানাভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও দার্শনিক, ভক্ত ও কবি ছিলেন ইহা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের কোনো রচনা গ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এইরূপে দেখা গেল, নামদেব, কবীর, রৈদাস, ফরীদ প্রভৃতি সাধকদের রচনা ছাড়া মোট ছয়জন গুরুর বাণী গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হইয়াছে।

২৫৭. গুরুবাণী সমূহের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার প্রত্যেক পদেই নানকের ভণিতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হাজার হাজার পদের মধ্যে কোন্ রচনাটি কাহার তাহা ধরিবার উপায় নাই। নানকের অনুগামীদের বিশ্বাস, পরবর্তী সমস্ত গুরুর মধ্যেই নানকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বিভিন্ন গুরুরূপে নানকই সমস্ত পদের রচয়িতা। তবে লৌকিক ব্যবহারের সুবিধার জন্য গ্রন্থসাহেবের গুরু-বাণী সমূহ মহলা ১, মহলা ২ ইত্যাকার রূপে সাজাইবার ফলে কাহার কোন রচনা চিনিয়া লওয়া যায়। সমগ্র গুরু-বাণী লইয়া যেন একটি নগরী, তাহার ছয়টি মহলা। নানকের বাণী লইয়া মহলা ১; অঙ্গদের বাণী লইয়া মহলা ২; এইরূপে অর্জুনদেব পর্যন্ত পাঁচ মহলা। নবম গুরু তেগবাহাদুরের বাণী লইয়া মহলা ৯। এইভাবে গুরুপরম্পরা অনুযায়ী মহলার সংখ্যা চিহ্নিত হইয়াছে।

মূল গ্রন্থের পদবিন্যাসে গুরুদের আবির্ভাবের কালক্রম অপেক্ষা পদের রাগের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সিরী (শ্রী) রাগ, বিহাগড়া রাগ, ধনাসরী, টোডী, বিলাবল, রামকেলী, কেদারা, ভৈরউ, মলার, কানড়া প্রভৃতি ৩১টি রাগের নামানুসারে পদগুলি সাজানো। কেবল গুরু নানক রচিত জপুজী, সোদরু, সুণিবড্ডা ও সোহিলা—এই ক'টি রচনাকে গ্রন্থের প্রথমে বসানো হইয়াছে।

গুরু-বাণীর ভাষা অনুধাবন করিলে দেখা যায় প্রথম তিন গুরু নানক-অঙ্গদ-অমরদাসের রচনা মোটামুটি পঞ্জাবী ভাষা প্রধান।

চতুর্থ ও পঞ্চম গুরু রামদাস ও অর্জুনের ভাষায় হিন্দীর (ব্রজভাষার) প্রভাব পড়িয়াছে। নবম গুরু তেগবাহাদুরের রচনায় এই প্রভাব আরও বেশি। হিন্দীর বিভিন্ন পদসংগ্রহে সাধারণত নানকের নামে যে-সকল পদের প্রচলন আছে তাহার অনেকগুলি তেগ-বাহাদুরের রচনা।

২৫৮. গ্রন্থসাহেবের সর্বপ্রথমে প্রদত্ত ৩৮টি পদবিশিষ্ট 'জপুজী'ই গুরু নানকের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্মপ্রাণ শিখের পক্ষে নিত্য প্রভাতে 'জপুজী' পাঠ একটি অবশ্যকর্তব্য কর্ম। হিন্দুর চোখে গীতা, বৌদ্ধের চোখে ধম্মপদ যেইরূপ, শিখদের চোখে জপুজীর মর্যাদা ঠিক সেইরূপ। ১৭ সংখ্যক পদে গুরুজী ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—অসংখ্য তোমার মন্ত্রজপ ও ভক্তিভাব। কত লোক কত ভাবে তোমার পূজা-অর্চনা ও তপস্যা-সাধনা করিতেছে। কত বেদাদি মুখ্য গ্রন্থ পাঠ হইতেছে। অসংখ্য যোগী তোমার দিকে উদাসমনে চাহিয়া থাকে। অসংখ্য ভক্ত তোমার জ্ঞান গুণ বিচার করে। পৃথিবীতে কত তোমার সত্য সেবক, কত দাতা। অসংখ্য শূর তোমার নাম গ্রহণ করে। অসংখ্য মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তোমার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। আমার এমনকী 'কুদরত' (শক্তি) আছে যে তোমার বিচার করি। আমি একবারও তোমার কাছে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি নাই। হে নিরাকার, তুমি যাহা করো সবই ভালোর জন্য, তোমার মধ্যে অমঙ্গল নাই।[১]

ঈশ্বরের নাম-মহিমা এবং সদ্‌গুরুর কৃপালাভ সন্তসাহিত্যের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গুরু নানকের নিম্নোদ্ধৃত পদে তাহার কিছুটা পরিচয় মিলিবে।—যজ্ঞ হোম পুণ্য তপস্যা পূজা ইত্যাদি করিয়া মানুষ নিত্য দেহকে কষ্ট দেয়। ঈশ্বরের নাম ব্যতীত মুক্তি

১ অসংখ জপ অসংখ ভাউ। অসংখ পূজা অসংখ তপ তাউ॥...
—গ্রন্থসাহেব পৃ ৩-৪

পাইবে না, গুরু-উপদেশের পথে প্রভুর নাম লইলেই মুক্তি পাওয়া যায়। যে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে না এই পৃথিবীতে বৃথাই তাহার জন্ম। বিষ (ইন্দ্রিয় বিষয়) তাহার খাওয়া, বিষ তাহার কথা বলা, নাম ব্যতীত নিষ্ফল এই মৃত্যু-ভ্রমণ (জন্ম-জন্মান্তর লাভ)। বই-পড়া, ব্যাকরণ-আলোচনা, ত্রিকালে (সকালে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়) সন্ধ্যা-বন্দনা করা বৃথা। হে প্রাণী, গুরুউপদেশ বিনা মুক্তি কোথায়? প্রভুর নাম ব্যতীত মানুষ জড়াইয়া মরে। দণ্ড-কমণ্ডলু-শিখা-সূত্র-ধুতি-তীর্থগমন-ভ্রমণেও কিছু হয় না, রামনাম ব্যতীত শান্তি আসে না। যে বার বার হরিনাম জপ করে সে পারে যায়।[১]

নায়িকাভাবে ভাবিত হইয়া গুরু নানক যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে মাত্র দুইটি পদ বাছিয়া লইয়া আমরা তাঁহার কবি-প্রকৃতির পরিচয় লইব। প্রথম পদে সেই পরিচিত সুর—"বর আসিয়াছে, সখি তোমরা মঙ্গলগীত গাও।" নানক বলিতেছেন—যখন বর কৃপা করিয়া আমার গৃহে আসিল, সখীরা মিলিয়া কাজ (বিবাহের আয়োজন) আরম্ভ করিল। সেই খেলা দেখিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইল। সে আসিয়াছে আমাকে বিবাহ করিতে। ওলো তোরা গা, বিবেক বিচার করিয়া মঙ্গলগীত গা। জগজ্জীবন আজ আমার ঘরে আসিয়াছে ভর্তারূপে। যেহেতু গুরু দ্বারা আমার বিবাহ হইয়াছে, তাই যখনই সে আসিয়া মিলিত হইল, আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। নানক বলে, সে একাই সকলের প্রিয়পতি। যাহার উপর সে সুনজর করে সে-ই সোহাগিনী হয়।[২]

---

১ জগন হোম পুংন তপ পূজা দেহ দুখী নিত দুখ সহৈ।
রাম নাম বিনু মুকতি ন পাবসি মুকতি নামি গুরমুখি লহৈ॥···
—গ্রন্থসাহেব পৃ ১১২৭ (রাগু ভৈরউ)

২ করি কিরপা অপনৈ ঘরি আইআ।
তা মিলি সখীআ কাজু রচাইআ॥···
—গ্রন্থসাহেব পৃ ৩৫১ (রাগু আসা)

আধুনিক কবি যে বেদনা বুকে লইয়া গাহিয়াছেন,

সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি।

কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি॥

নানকের নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে আমরা কতকটা সেই ভাবেরই আভাস পাই। কবির নৈরাশ্য-বেদনা-অনুতাপ এখানে মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য শৃঙ্গার রসের আতিশয্যে পদটির শেষ কয়েকটি ছত্র রুচিমান পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক বোধ হইতে পারে। কবি এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন: এই কলুষিত দেহ ধুইবার মতো কোনও গুণই আমার নাই। আমার স্বামী জাগে, আর আমি সারানিশি ঘুমাই। এইভাবে আমি কিরূপে কান্তের প্রিয় হইব? স্বামী জাগে, আমি সারা নিশি ঘুমাই। যদি পিপাসা লইয়া তাহার শয্যায় আসি তাহাকে খুশি করিতে পারিব কিনা জানি না। মা, কী হইবে কেমন করিয়া জানিব? হরিকে না দেখিয়া থাকা যায় না। প্রেম আস্বাদান করি নাই, আমার তৃষ্ণাও মিটিল না। আমার যৌবন চলিয়া গিয়াছে, এখন সেই হারানো ধনের জন্য অনুতাপ করি। আজও আমি আশাহীন অন্তরে পিপাসা লইয়া জাগি। কামিনী যদি অহঙ্কার ছাড়িয়া শৃঙ্গার করে তবেই ভর্তা থাকিবে। তখন সে স্বামীর মন খুশি করিতে পরিবে। বড়াই ছাড়িয়া নিজের পতির মধ্যে মিশিয়া যাইবে।[১]

২৫৯. বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্ববিধাতার যে মহান উপলব্ধি রবীন্দ্র-কাব্যের একাংশে অপরিমেয় গৌরব সঞ্চার করিয়াছে, গুরু নানকের এক-আধটি পদে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার সেই সুবিখ্যাত পদটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যেখানে কবি পুলকিত বিস্ময়ে বলিয়াছেন: হে ভবখণ্ডন, হে জন্ম-মরণের

---

১ এক ন ভরীআ গুণ করি ধোবা।

মেরা সহু জাগৈ হউ নিসি ভরি সোবা॥...

—গ্রন্থসাহেব পৃ ৩৫৬-৩৫৭ (রাগু আসা)

মুক্তিদাতা, এ কী তোমার অদ্ভুত আরতি! এই গগন-মণ্ডল থালা; সূর্যচন্দ্র তাহার দুইটি বাতি; তাহার সঙ্গে জড়াইয়া আছে মোতীর মালা—অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলের মালা। মলয়ানিল তোমার ধূপ; পবন তোমার চামর; হে জ্যোতি-স্বরূপ, সমগ্র বনরাজি তোমার ফুল। আর ঐ যে বাজিতেছে অনাহত শব্দের ভেরী। সহস্র তোমার নয়ন, তবু নয়নহীন; সহস্র তোমার মূর্তি, তবু তুমি মূর্তিবিহীন; সহস্র-চরণ হইয়াও তুমি চরণহীন; সহস্র নাসিকা, তবু তোমার গন্ধ-শক্তি নাই। আমি তোমার এই লীলায় মুগ্ধ। সকলেই তোমার জ্যোতি হইতে জ্যোতি পাইতেছে। তোমার প্রকাশেই সকল প্রকাশিত। গুরু-উপদেশে সেই জ্যোতি প্রকট হয়। যাহা তোমার ভালো লাগে, সেই তোমার আরতি। হরি, তোমার চরণকমলের মকরন্দ-লুব্ধ আমার মন; প্রতিদিন আমার সেই মধুপানের আকাঙ্ক্ষা। এই নানক-চাতককে তোমার কৃপাজল দাও যাহাতে সে তোমার নামেই লীন হইয়া যাইতে পারে।[১]

২৬০. দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ (১৫০৫-১৫৫২) রচনা করিয়াছেন

১ গগন মৈ থালু রবি চন্দু দীপক বনে।
তারিকামণ্ডল জনক মোতী॥

—গ্রন্থসাহেব পৃ ৬৬৩ (রাগু ধনা সরী)

নানকের উল্লিখিত পদটির কিয়দংশ রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। অনূদিত অংশটুকু এই—

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডলে চমকে মোতি রে॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে॥
কেমন আরতি হে ভব খণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥

—গীতবিতান (১৩৬০ মে) পৃ ৮২৩

সামান্যই। তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল গুরু নানকের সেবা ও তাঁহার বাণীর রসাস্বাদন। ইনিই সর্বপ্রথম নানকের বিক্ষিপ্ত রচনাসমূহ সংগ্রহ করিয়া গুরুমুখী লিপিতে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ গুরু অঙ্গদকেই গুরুমুখী লিপির আবিষ্কর্তা ও প্রচারক মনে করেন। "সন্তসুধাসার" হইতে অঙ্গদের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল—

ক. সুখে তুই যাহার নাম স্মরণ করিস, দুঃখেও তাহার নাম স্মরণ কর। হে সেয়ানা মেয়ে, এইভাবেই স্বামীর সঙ্গে তোর মিলন হইবে।[১]

খ. যে শির প্রভুর সামনে নত হয় না, তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দে। যে শরীরে বিরহের বেদনা নাই, সেই দেহকে জ্বালাইয়া দে।[২]

তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৫০৯-১৫৭৪)-রচিত পদাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা তাঁহার ৪০টি পদ-বিশিষ্ট "আনন্দু"। ইহা আজ পর্যন্ত শিখদের বিবাহ প্রভৃতি প্রতিটি আনন্দ-উৎসবে গীত হয়। "আনন্দু"র দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—হে আমার মন, তুই সর্বদা ভগবানের সঙ্গে থাক। সর্বদা ভগবানের সঙ্গে থাকিলে সে তোর দুঃখ ভুলাইয়া দিবে। সে তোমাকে অঙ্গীকার করিয়া তোমার সকল কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ভগবান সর্বশক্তিশালী। কেন, মন, তাহাকে ভুলিবি?[৩]

এই ভগবৎ-নির্ভরতা "আনন্দু" পদগুচ্ছের বিশিষ্ট সুর। দশম পদেও দেখিতে পাই কবি নিজের চঞ্চল মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন: হে চঞ্চল মন, চালাকি দ্বারা কেহ ভগবানকে পায়

১ জা সুখু তা সহু রাবিও দুখি ভী সংম্ হালিওই।...(পৃ ২৭৪)

২ জো সিরু সাঁঈ না নিবৈ সো সিরু দীজৈ ডারি।...(পৃ ২২৭)

৩ এ মন মেরিআ তূ সদা রহু হরি নালে॥....

নাই। হে আমার মন, তুই শোন। এই মায়া মোহিনী—যে মায়া মানুষকে ভুলাইয়া ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। যিনি 'ঠগডলী' অর্থাৎ এই সৃষ্টির ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই মায়াকে মোহিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি 'বিটহু' অর্থাৎ মরণশীল প্রাণীদের কাছে সাংসারিক মোহকে এত মধুর করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিলাম। হে চঞ্চল মন, চালাকি দ্বারা কেহ ভগবানকে পায় নাই।[১]

নায়িকা-রূপে ভগবৎ-আরাধনা সূফী এবং বৈষ্ণব ভক্ত কবিদের একটি অতি প্রিয় প্রসঙ্গ। একটি পদে অমরদাস দুষ্টা ও শিষ্টা নারীর রূপকে ঈশ্বরোপাসনার কথা বলিয়াছেন এইভাবে: মনমুখী মানুষ কেবল মিথ্যার বেসাতি করে, স্বামীর মহল পর্যন্ত কখনও পৌঁছয় না। জগৎ-প্রপঞ্চে লগ্ন হইয়া ভ্রমে ভুলিয়া থাকে, মমতায় বদ্ধ হইয়া আসা-যাওয়া করে। দুষ্টা নারীর শৃঙ্গার দেখ। তাহার চিত্ত লাগিয়া আছে পুত্রে, পুত্রবধূতে, ধনে ও মায়ায়; আর লাগিয়া আছে মিথ্যায়, মোহে, শঠতায় ও বিকারে। সে-ই তো সোহাগিনী রমণী যে সর্বদা প্রভুর প্রিয়। গুরুর উপদেশে সে শৃঙ্গার করে। তাহার শয্যা সুখের এবং প্রতিদিন সে প্রিয় হরির সঙ্গে মিলিত হইয়া সুখ লাভ করে। সে-ই প্রকৃত সৌভাগ্যবতী নারী, যে তাহার প্রকৃত স্বামীকে ভালোবাসে। সে নিজের প্রিয়কে সর্বদাই বক্ষে ধরিয়া রাখে। সে তাহাকে নিজের কাছে সর্বদাই দেখে। আমার প্রভু সর্ব-ব্যাপী। জাতি ও সৌন্দর্য কাহারও সঙ্গে পরলোকে যাইবে না। যে যেরূপ কাজ করে, সে সেইরূপ ফল পায়। সদ্‌গুরুর উপদেশে মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর হয় এবং সত্যরূপ পরমাত্মায় লীন হয়।[২]

১ এ মন চংচলা চতুরাঈ কি নৈ ন পাঈআ ॥…

২ মন মুখি ঝূঠো ঝূঠু কমাবৈ। খসমৈ কা মহলু কদে ন পাবৈ ॥….

—সন্তসুধাসার, পৃ ৩০৯-৩১০

চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৩৪-১৫৮১) শিখদের প্রধান তীর্থ অমৃতসরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার একটি পদে মোহাচ্ছন্ন ভক্তের যে বিলাপ ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে "দৈন্য নির্বেদ বিষাদে"র সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। গুরুজী বলিতেছেন: হৃদয় চায় কাঞ্চন ও নারী; মায়া মোহ তাহার কাছে বড়ই মধুর লাগে। গৃহ, প্রাসাদ, ঘোড়া এবং অন্যান্য রসে সে আনন্দ পায়। ভগবান্, তোমাকে আমি স্মরণ করি না, আমি কিরূপে রক্ষা পাইব? হে রাম, ইহাই আমার নীচ কর্ম। হে গুণবান দয়ালু হরি, কৃপা করিয়া আমার সকল দোষ ক্ষমা কর। আমার রূপ নাই, জাতি নাই, রীতি-নীতি কিছুই নাই। গুণহীন আমি তোমার নাম জপি নাই, কোন্ মুখে আমি তোমাকে বলিব? আমি পাপী; আমি যে আবার গুরু দ্বারা রক্ষা পাইব ইহা সদ্‌গুরুর দয়া। ভগবান মানুষকে দিয়াছেন প্রাণ, শরীর, মুখ, নাক ও ব্যবহার্য জল। আর দিয়াছেন খাইবার শস্য, পরিবার কাপড় এবং উপভোগের রস। কিন্তু যিনি দিয়াছেন, তাঁহার কথা স্মরণ করি না; ভিতরের পশুটা ভাবে সে নিজেই করে। হে অন্তর্যামী, তুমি সমস্ত সৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত ব্যাপিয়া আছ। আমরা জন্তু কী বিচার করিতে পারি? হে প্রভু, এই সব তোমারই খেলা। হাটে-কেনা নানক তোমার গোলামের গোলাম—দাসানুদাস।[১]

রামদাসের পুত্র এবং অমর দাসের দৌহিত্র পঞ্চম গুরু 'অর্জন' (অর্জুনদেব) (১৫৬৩-১৬০৬)। বাল্যকালেই তিনি এমন তীক্ষ্ণ মেধা ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া অমরদাস এইরূপ উক্তি করেন বলিয়া জানা যায়—"আমার এই দৌহিত্র বহু লোককে পার করিয়া দিবে"—ইয়ে মেরা দোহিত পানী কা বোহিত হোগা।

---

১ কংচন নারী মহি জীউ লুভতু হৈ মোহ মীঠা মাইআ॥
ঘর মন্দর ঘোড়ে খুশী মহু অন রসি লাইআ॥....

—গ্রন্থসাহেব পৃ ১৬৮

উত্তরকালে জাহাঙ্গীরের কারাগারে অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হইয়া গুরু অর্জুন বলিয়াছিলেন—"আমার ভ্রমের ডিম ভাঙিয়া গেল, মন আলোকিত হইল, গুরু আমার পায়ের বেড়ি কাটিয়া দিয়া বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন।"—

ফুটো অংডা ভরম কা, মনহি ভইউ পয়গাস।
কাটী বেড়ী পগহ তে, গুরু কী নী বন্ধ খলাস ॥

গুরু অর্জুনের প্রসিদ্ধ রচনা "সুখমনী"। ধর্ম-প্রাণ শিখগণ নিত্য প্রভাতে গুরু নানকের "জপুজী" আবৃত্তির পরে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। অর্জুনের শ্রেষ্ঠ কাজ হইল গ্রন্থসাহেবের সংকলন ও সম্পাদন। একটি পদে তিনি সাধারণ মানুষের মূঢ়তা ও সদ্‌গুরুর মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: মানুষ যদিও এই পৃথিবীতে ক্ষণকালের অতিথি, তবুও সে তাহার কাজ গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করে। কামের মধ্যে ডুবিয়া আছে, মূর্খ জানে না যে, সে ক্ষণকালের অতিথি। চলিয়া যাইবার কালে তাহার অনুতাপ জন্মে এবং তখন সে যমের কবলে পতিত হয়। ওরে অন্ধ, তুই যে বসিয়া আছিস ক্ষয়-হওয়া নদীর তীরে। ইহাই যদি তোর পূর্ব-লিখন হইয়া থাকে তবে গুরু-বচন অনুসারে কাজ কর। মালিক কাঁচা, আধ-পাকা অথবা পাকা শস্য সংগ্রহ করিতে পারে। কৃষকেরা আয়োজন করিয়া মাঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। হুকুম হইলেই তাহারা জমি মাপিয়া ফসল কাটিয়া লয়। প্রথম প্রহর কাটিল কাজেকর্মে, দ্বিতীয় প্রহর কাটিল নিদ্রায়, তৃতীয় প্রহর বাক্ বিতণ্ডায়, চতুর্থ প্রহরে ভোর। যিনি এই দেহ ও প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহার কথা কখনও মনে আসে না। যে সাধু-সংসর্গে আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং সর্বজ্ঞ পুরুষকে পাইয়াছি তাঁহাদের চরণেই আমি প্রাণ মন সমর্পণ করিলাম।[১]

ঘড়ী মুহত কা পাহুণা কাজ সবারণ হারু ॥
মাইআ কামি বিআপিআ সমঝৈ নাহী গবারু ।....

—গ্রন্থসাহেব, পৃ ৪৩

অর্জুনের পরবর্তী তিনগুরুর রচনার নিদর্শন কিছু নাই। নবম গুরু তেগবাহাদুর (১৬২২-১৬৭৫) যাহা রচনা করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হইয়া তাহা 'মহলা ৯' এইরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। যাঁহার অভাবনীয় আত্মত্যাগ শিখদের মধ্যে এক অভিনব প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল, তিনি যে ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত ভক্তের মনোভাব পোষণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। আমরা তাঁহার যে দুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহার প্রথমটিতে আছে প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ-নির্ণয়, এবং দ্বিতীয় পদটিতে দেখিতে পাই অনুতাপ-দগ্ধ ভক্তচিত্তের সকরুণ আর্তনাদ। প্রথম পদটি এইরূপ—

সাধু, তোমার মনের অহঙ্কার ত্যাগ কর। কাম, ক্রোধ এবং দুর্জনের সংসর্গ হইতে অহর্নিশি দূরে থাক। যিনি সুখ দুঃখ ও মান-অপমানকে সমান করিয়া জানেন, এবং হর্ষ শোক হইতে দূরে থাকেন, জগতে তিনিই কেবল প্রকৃত বস্তু (তত্ত্ব) জানেন। নিন্দা-স্তুতি দুই-ই পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণপদ সন্ধান করিবে। এই খেলা খুবই কঠিন, কেবল কয়েকজন গুরুমুখী (ধার্মিক ব্যক্তি) জানেন।[১]

দ্বিতীয় পদটি এই: মা, আমি কি উপায়ে প্রভুকে দেখিব? মহা মোহ এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে আমার মন ডুবিয়া আছে। ভ্রান্ত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সমস্ত জীবনটা হারাইলাম, স্থির বুদ্ধি পাইলাম না। দিবারাত্রি বিষয়াসক্ত আমি দুষ্ট অভ্যাস হইতে মুক্তি পাই নাই। কখনও সাধুসঙ্গ করি নাই, কখনও প্রভুর গুণকীর্তনও করা হয় নাই। আমার কোনও গুণই নাই, হে প্রভু, তুমি আমাকে রক্ষা কর।[২]

১ সাধো মন কা মান তিআগউ ॥
কাম ক্রোধু সংগতি দুরজন কী তাতে অহিনিস ভাগউ ॥....
—গ্রন্থসাহেব পৃ ২১৯

২ মাঈ মৈ কিহ বিধি লখউ গুসাঈ ॥
মহামোহ অগিআন তিমর মো মনু রহিও উরঝাঈ ॥....
—সন্তসুধাসার পৃ ৩৮৮

২৬১. শিখ গুরুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর পুরুষ ছিলেন অন্তিম ও দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৭)। শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায় তিনি সমান দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁহার কবিত্ব-শক্তি। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পঞ্জাবী, ব্রজভাষা ও ফার্সী—এই কয়টি ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটি ভাষাতেই তাঁহার রচনার নিদর্শন রহিয়াছে। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে গুরু গোবিন্দের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। পঞ্জাবীতেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। "জাপু সাহিব" এবং "অকাল উসততি" গ্রন্থে 'অকাল পুরখ' ঈশ্বরের পরম স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। তবে তাঁহার ভক্তিমূলক পদরচনা অপেক্ষা শক্তিমূলক কথাকাব্যই অধিকতর পরিচিত।[১] এই প্রসঙ্গে শস্ত্রনামা, চণ্ডী দী বার, চণ্ডী চরিত্র, বচিত্তর (বিচিত্র) নাটক প্রভৃতি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম গুরু অর্জুন গ্রন্থসাহেবের সংকলয়িতা হইলেও পরবর্তীকালে নবম গুরু তেগবাহাদুরের রচনাও এই মহান্ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের কোনো পদ গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হয় নাই। আমরাও তাহার আলোচনা হইতে বিরত থাকিলাম।

১ শক্তি-উপাসক গোবিন্দ সিংহের পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত 'ভারতীয় শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' পৃ ৬২।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

২৬২. ভক্তিসাহিত্যের আলোচনা শেষ হইল। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় আমরা বিশেষভাবে দুইটি জিনিস দেখিয়াছি—(১) ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী কী ভাবে ভক্তিধর্মের প্রসার, প্রচার ও অভিবৃদ্ধির পথে কখনো সহায়ক, কখনো প্রতিবন্ধক হইয়াছে; এবং (২) ভক্তিধর্ম কীভাবে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে প্রভাবিত করিয়া এই দেশের বিভিন্ন জাতি-পাঁতির বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্যস্থাপনের আনুকূল্য করিয়াছে। বস্তুত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটমোচনে ভক্তিধর্মের উপযোগিতা অসামান্য। বাহির হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি আসিয়াছে। বৈদিকধর্মে তাহাদের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ভক্তিধর্মে সকলেই সাদরে গৃহীত হইয়াছে।[১] আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম যখন এক সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং জ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব যখন অধিকাংশ জনসমাজের কাছে দুরূহ দুরধিগম্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তখন সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যাহা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে তাহা হইল প্রেমভক্তির সহজসাধনা। এখানে আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়, হিন্দু-শিখ-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র একাসনে বসিয়াছে দেখিতে পাই। কবি-কল্পিত ভারততীর্থ যদি কোথাও সত্যরূপ পাইয়া থাকে তো এইখানে। এখানে মুসলমানের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে হিন্দু (ফরীদ-নানক), ব্রাহ্মণ আলিঙ্গন করিতেছে অস্পৃশ্যকে (রামানন্দ-কবীর, ব্যসরায়-কনকদাস), শূদ্রসন্তান দীক্ষা দিতেছে সর্বশ্রেণীকে (নম্‌মাড়বার, তুকারাম

১ ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতে হিন্দুমুসলমানের যুক্তসাধনা পৃ ২

প্রভৃতি)। এখানে ভক্তের বংশমর্যাদা বা পাণ্ডিত্য বড় কথা নয়, বড় কথা তাঁহার ভক্তিসাধনা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। মরাঠী ভক্তি-সাহিত্যের জ্ঞানেশ্বর ব্রাহ্মণ, তুকারাম শূদ্র। জ্ঞানেশ্বর পণ্ডিত, নানাশাস্ত্র পারঙ্গম; তুকারামের জীবন কাটিয়াছে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রচর্চার পরিবেশ হইতে বহুদূরে। জ্ঞানেশ্বর যে-বয়সে বিদ্যার্থী, তুকারাম সেই বয়সে পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত। জ্ঞানেশ্বর ব্রহ্মচারী, তুকারাম গৃহস্থ। জ্ঞানেশ্বর দীক্ষালাভ করেন অল্প বয়সে, তুকারামের দীক্ষা হয় অধিক বয়সে, তাহাও আবার স্বপ্ন দীক্ষা। এই দুই ব্যক্তির এত বৈষম্য সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রের বারকরী ভক্তসম্প্রদায়ে ইঁহাদের সমান মর্যাদা। অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ ব্যাপার দুর্লভ নয়।

২৬৩. ভক্তিধর্মে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রবেশ ঘটিলেও ইহা মূলত ছিল অব্রাহ্মণ্য সংগঠন। ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাহ্মণ ইহাতে যোগদান করিয়া সংগঠনের নেতৃত্বলাভে সমর্থ হন সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মণসমাজ ইহার প্রতি তেমন প্রসন্ন ছিল না। তাই দক্ষিণভারতে ভক্তিধর্ম যতটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল, উত্তর-ভারতে ঠিক তদনুরূপ সাফল্য দেখা যায় নাই। আবার উত্তরেই হউক বা দক্ষিণেই হউক, ভক্তি-ধর্মের অভ্যন্তরেও যে জাতি-বৈষম্য মাথা চাড়া দিয়া উঠিত তাহারও নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে কর্ণাটকের ভক্তকবি কনকদাসের কাহিনী স্মরণীয় (দ্র° ১১২)। অন্ত্যজ বলিয়া ইনি উডুপির কৃষ্ণমন্দিরের পূজারীগণ কর্তৃক মন্দিরের দ্বারদেশে প্রত্যাখ্যাত হন। মোট কথা, ব্রাহ্মণদের জাত্যভিমান কখনো বাহির হইতে, কখনো ভিতর হইতে ভক্তিধর্মের শুভ সম্ভাবনাকে অনেকাংশে ব্যাহত করিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো সন্তান ভক্তমণ্ডলীতে যোগদান করিলে সমাজে তাহাকে 'পতিত' করা হইত এবং স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের কন্যা

পাওয়াও তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। উদাহরণ গুজরাতী ভক্ত ব্রাহ্মণ নরসিংহ মহেতা (দ্র° ২৩৪)।

ভক্তিধর্মের অগ্রগতির পথে ব্রাহ্মণ-সমাজ যে কত ভাবে বাধাসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" নামক অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধে তাহার চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে-দুইজন মহাপুরুষকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ নন, তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, অপরজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এমন একটা প্রবল চিত্তগত ভেদ দেখা দিল যাহার পরিণাম স্বরূপ ভারতবর্ষে এককালে একটা সমাজ-বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। রামায়ণ মহাভারতের মূল বিষয় ছিল সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষ-জনিত প্রাচীন সমাজ-বিপ্লব। এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়পক্ষের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন যথাক্রমে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিবাদ সুপরিচিত। কিন্তু ইহা দুই ব্যক্তির বিবাদ নয়, দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ (দ্র° ৭৯)।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সংঘর্ষের প্রাচীনতর যুগেই নয়, প্রতিটি যুগে উচ্চতর ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায় প্রতিটি সামাজিক সংস্কার ও মিলন-প্রচেষ্টায় বাধা দিয়া আসিতেছিল। কোনো ক্ষেত্রেই তাহারা শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু তথাপি বিরোধের বিরাম ছিল না। "বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণ-সংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্ম-রক্ষণীশক্তি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য শক্তি) বারম্বার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে। মনুতে

বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে…তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস কোনো দিন নিরস্ত হয় নাই" (ইতিহাস পৃ ৩৪)। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ভক্তিধর্মের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া উচ্চবর্ণের তুলনায় যে বিপুল-সংখ্যক নিম্নবর্ণের মানুষ, তাহারা এই ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করে।

২৬৪. বিশাল ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণদের পক্ষেও এই মিলনমূলক ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মনোভাব বজায় রাখা বেশিদিন সম্ভব হইল না। ব্রাহ্মণেরা ইহাকে ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। ভারতীয় ধর্মসাধনায় ব্রাহ্মণদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। কেহ কেহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে য়ুরোপীয় উপনিবেশকারীদের সহিত ভারতের আর্য উপনিবেশকারীদের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, য়ুরোপীয়রা সর্বত্র স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ও সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া (এবং সম্ভব হইলে তাহাদের বিনাশ করিয়া) নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় আর্যদের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা সামরিক শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়াও বিভিন্ন আর্যেতর জাতি ও উপজাতির ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে নষ্ট না করিয়া নিজেদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে যথাসম্ভব খাপ খাওয়াইয়া লয়।[১] এইভাবে বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত নতুন

১ The brahmin pioneers integrated into their own socio-cultural organization the tribesmen and their culture. ……They were too respectful of any religions to destroy right away the old traditional beliefs of their new companions. The cult of Vithoba pp. 199-200.

দেব-দেবীর স্বীকৃতির প্রয়োজন ঘটিল তাহাদের জন্ম-বৃত্তান্ত ও কীর্তিকলাপ অবলম্বন করিয়া নতুন নতুন কাহিনী গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং স্থানীয় কিংবদন্তীগুলিকে সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়া স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক সমাজপতি ও মণ্ডল-পতিদের বংশধারাকে কল্পিত সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের সহিত মিলাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণগণ তাহাদের আভিজাত্য ও মর্যাদা স্বীকার করিয়া তাহাদের সদিচ্ছা অর্জন করে (ইংরেজ সরকার যেমন নানাবিধ খেতাব বর্ষণ করিয়া একশ্রেণীর ভারতবাসীর আনুগত্য অর্জন করিয়াছিল)। এই সমস্ত নতুন দেবতা ও দৈবানুগৃহীত ব্যক্তিদের বংশকাহিনী পল্লবিত হইয়া পুরাণ-উপপুরাণের আকার গ্রহণ করে। পৌরাণিক কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক তথ্যরূপে অগ্রাহ্য হইলেও উহার মধ্যে ভারতীয় জন-সংমিশ্রণ ও ধর্ম-মিলনের ইতিহাস লুকাইয়া আছে সন্দেহ নাই। ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস)

২৬৫. ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক বলিয়া যতই গর্ব করি না কেন উহার ত্রুটি ও অসুবিধার কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে তেত্রিশ কোটি গ্রাম্যদেবতা লইয়া যে বিরাট হিন্দুধর্ম ও হিন্দুমন্দির গঠিত হইল স্বভাবতই তাহার মধ্যে সুনির্দিষ্ট ঐক্যসূত্রের অভাব থাকিয়া গেল। ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুধর্মের এই অভাবাত্মক দিকের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন: সমস্ত অনার্য অনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনাকাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আর্যভাবের ঐক্যসূত্রে আদ্যোপান্ত

মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না—তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার মধ্যে শতসহস্র অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। এই সমস্ত অসঙ্গতির কোনোপ্রকার সমন্বয় হয় না—কেবল কালক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে অসঙ্গতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে, যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাক। ইহা একপ্রকার হাল-ছাড়িয়া-দেওয়া নীতি। যখন বিরুদ্ধগুলিকে পাশে রাখিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই মিলাইতে পারা যাইবে না, তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই পারে না। (ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)

২৬৬. বৃহত্তর হিন্দুধর্মে যে অসঙ্গতি তাহা যে ভক্তিধর্মেও দেখা দিবে তাহাতে আর বিচিত্র কী? ভক্তিধর্ম মূলত মিলনের ধর্ম, ঐক্যের ধর্ম; কর্মানুষ্ঠানের ধর্ম নয়। 'বহুপল্লবিত যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যখন ভক্তিধর্মের যুগ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল' তখন একটা বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি লইয়াই তাহা আসিয়াছিল। আমরা এখন দেখিবার চেষ্টা করিব, উত্তরকালে সেই প্রতিশ্রুতি কী ভাবে কতটা পূর্ণ হইয়াছে।

প্রথমে ভক্তিধর্মের বিরোধিতা করিয়াও ব্রাহ্মণ্য সমাজ যখন ইহা অনুমোদন করে, তখন আবার তাহারাই এক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয়। মঠ-মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব তাহাদের হাতে আসিয়া যায় এবং ধীরে ধীরে ভাক্তধর্মের মধ্যে বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হইতে থাকে। কেবল তাহাই নয়, ভক্তিধর্মের 'সাম্যের রাজ্যে'ও সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে এক-প্রকার শ্রেণীবিভাগ থাকিয়া যায়। ইহার একটি বড় উদাহরণ পাওয়া যাইবে মরাঠী বারকরী সম্প্রদায়ে। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বারকরী সম্প্রদায় আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী

উপলক্ষ্যে পঁঢরপুরের অভিমুখে যে তীর্থযাত্রা করে (দ্র° ২১১), তাহাতে অতীত যুগের জ্ঞানেশ্বর নামদেব তুকারাম প্রভৃতি সাধকদের পাদুকা পাল্‌কীতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয় বলিয়া এই যাত্রীদলকে বুঝাইতে 'পাল্‌কী' কথাটিও ব্যবহৃত হয়। এক একটি 'পাল্‌কী'তে (অর্থাৎ দলে) যত যাত্রী থাকে, একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার সহিত তাহারা অগ্রসর হয়। প্রত্যেক 'পাল্‌কী'র কতকগুলি উপবিভাগ থাকে যাহা 'দিণ্ডী' নামে পরিচিত। এক একটি দিণ্ডীতে ত্রিশ হইতে একশত পর্যন্ত যাত্রী থাকে। এইরূপ কয়েকটি দিণ্ডী লইয়া এক একটি 'পাল্‌কী' গঠিত। সমগ্রভাবে একটি 'পাল্‌কী'তে উচ্চতম ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম মহার পর্যন্ত সর্বস্তরের লোক থাকে। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একটি দিণ্ডীর মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া থাকে না। একটি দিণ্ডীর যাত্রীদল একই সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের দিণ্ডীতে কোনো শূদ্র থাকিবে না, বা শূদ্রের দিণ্ডীতে কোনো ব্রাহ্মণ যাইবে না।

ভক্তিধর্ম স্বীকার করিয়া লইয়াও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ যে নিম্নবর্ণের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিতে সংকোচ বোধ করে তাহার কারণ সামাজিক মর্যাদা বিসর্জন দিয়া নিম্নতর শ্রেণীর সহিত একাত্মবোধ অনুভব করা মনুষ্যজীবনের একটি কঠিন বাধা। মানুষে মানুষে প্রচুর পার্থক্য—আচারে-ব্যবহারে, রঙে-চেহারায়, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে। ধর্ম এক হইলেই এই পার্থক্য ঘুচাইয়া দেওয়া চলে না। আদর্শের দৃষ্টিতে আমরা মানুষে মানুষে ঐক্যের কথা যতই বলি না কেন, বাস্তব দৃষ্টিতে ভেদাভেদ আছেই; এবং সেই সামাজিক বিভেদ দূর করা বড় সহজ কথা নয়। বারকরী সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই, তাহারা বাস্তব বিভেদ বজায় রাখিয়া উহারই মধ্যে, একটা ধর্মীয় বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ ঐক্যও আছে অনৈক্যও আছে। ইহা সেই রবীন্দ্র-কথিত ভারতীয় জীবনের "শত সহস্র অসংগতি"র একটি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন ভক্ত সাধকের কণ্ঠে মানব-ঐক্যের যে মহৎ বাণী প্রচারিত হইয়াছে তাহা এখনও অনেকাংশে কল্পলোকের বস্তু। যে প্রারম্ভিক শুভ সংকল্প লইয়া ভক্তিধর্মের সূচনা, আজও তাহা যথাযথরূপে কার্যকরী হইতে পারিল না। তুকারামের স্বপ্ন ছিল যে, আর কোথাও না হউক অন্তত পবিত্র তীর্থভূমি পঁঢরপুরের অভ্যন্তরে কোনো জাতিভেদ থাকিবে না, দেবতার মন্দিরে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন সফল হয় নাই। চতুর্দশ শতকে মহারাষ্ট্রের মহার (হরিজন) ভক্ত চোখা (মৃত্যু ১৩৩৮ খ্রী°) একদিন বড় বেদনায় গাহিয়াছিল: 'মন্দিরের পূজারীরা আমাকে প্রহার করে, কিন্তু আমার কোনো দোষ নাই প্রভু। তাহারা আমাকে প্রশ্ন করে—বিঠোবার গলার মালা আমি কিরূপে পাইলাম। তাহারা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলে কিনা আমি দেবতাকে স্পর্শ দ্বারা কলুষিত করিয়াছি। প্রভু, আমি তোমার দুয়ারের কুকুর, আমাকে তাড়াইও না।' চোখার এই করুণ আবেদনের পরে পুরা ছয়টি শতাব্দী অতিবাহিত হইল, তবু মন্দিরের অভ্যন্তরে ভক্ত হরিজনদের প্রবেশাধিকার জুটিল না।[১] অর্থাৎ ভক্তিধর্ম তাহার আবেগময়ী বৈপ্লবিক শক্তি হারাইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তাহার সার্বজনীন মানবতা আজও সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কে লিপ্ত।

২৬৭. ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে ভক্তিধর্মের এই দ্বিবিধ রূপ

১ অবশেষে স্বাধীন ভারতে সরকারী আইনের সাহায্যে তাহাদের সেই অধিকার দেওয়া হইল। অর্থাৎ মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে বার বার আবেদন জানাইয়া যাহা নিষ্ফল হইয়া ছিল, বলপ্রয়োগে (আইনের আশ্রয়ে) তাহাকে ফলপ্রসূ করা মোটেই কঠিন হইল না। তবে কি ভক্তিধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাস ব্যর্থ হইয়াছে? না। কারণ আজ ভারতবর্ষের উচ্চ সম্প্রদায়ের যে শুভবুদ্ধির ফলে ইহা সম্ভব হইল তাহার পশ্চাতে ভক্তিসাধনার দানকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রতিফলিত। একদিকে তাহার উদার, উদাত্ত আহ্বান; আরেক দিকে সম-ধর্মী অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব। একদিকে তাহার পরম আস্বাদনীয় অনুভব-বেদ্য বাণী, অন্যদিকে স্ব-সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা। একদিকে ভক্তচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রকাশ, অন্যদিকে গোষ্ঠীগত বিধিনিষেধের গুণকীর্তন। পুরন্দর-তুকারাম প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যেও এই প্রাকৃতজনোচিত প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁহারা যখন সম্প্রদায়ের মুখ চাহিয়া কথা বলিয়াছেন, তখন তাহা ভক্তিরস ও সাহিত্যরস উভয় রসে বঞ্চিত। আর যখন ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা প্রকাশ করিয়াছেন তখন কাব্যরসের অভাব হয় নাই। তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, সমস্ত সাময়িক ও সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনের উর্ধ্বে তাঁহাদের প্রতিভার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটিয়াছে এবং সেইখানেই তাঁহারা যথার্থ কবি ও সাধক। জাতীয় জীবনের বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজনে দেশাত্মবোধক সাহিত্য রচিত হইলেও তাহার কোনো কোনো অংশে যেমন ভিন্ন কালের আদরণীয় বস্তুও পাওয়া যায়, অতীত দিনের ভক্তিসাহিত্যেও এমন অংশের অভাব নাই যাহা কালের সীমা অতিক্রম করিয়া আমাদের এই অগ্রসর যুগের চিত্তবৃত্তিকেও সৌন্দর্যে মাধুর্যে চরিতার্থ করিতে পারে।

২৬৮. ভক্তিসাহিত্যের মধ্যে আমরা এমন কতকগুলি সাধারণ সত্যের সন্ধান পাই যাহা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষায় বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এই পুনরাবৃত্তি ভক্ত কবিদের পুচ্ছগ্রাহিতার ফল নয়। ইঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশ—শাস্ত্রবাক্য অর্থাৎ পূর্ব-সূরীদের বাণী তাঁহাদের উপলব্ধিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

ভক্তিধর্মের সাধনায় যে চারিটি বস্তুর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় সে সম্পর্কে হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের একটি শ্লোকে এইরূপ বলা হইয়াছে—

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত্ গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন কিয়ে নাশে বিঘন অনেক ॥

নামে চারিটি পৃথক বস্তু হইলেও ভক্তি, ভক্ত, গুরু ও ভগবান কার্যত একই—একই সূত্রে আবদ্ধ। শেষ লক্ষ্য ভগবান, পথ তাহার ভক্তি, সেই পথের জন্য চাই নিত্য ভক্তসঙ্গ আর চাই গুরুর কৃপা। বিভিন্ন ভক্তকবি অসংখ্য শ্লোকে, স্তবকে ও পদে এই চারিটি বস্তুর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাদের বন্দনা কীর্তন লইয়াই ভক্তিসাহিত্য।

২৬৯. ধর্ম সাধনার প্রথম অঙ্গ ভক্তি। ভক্তকবিরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য নিষ্কাম ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রয়োজন নাই। নানা ভাবে ভক্তির লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ঃ ঈশ্বরে অতিশয় অনুরক্তি (সা পরানুরক্তিরীশ্বরে), ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম (সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা অমৃতস্বরূপা চ), ঈশ্বরে প্রীতি (মহনীয় বিষয়ে প্রীতিঃ ভক্তিঃ), স্নেহপূর্বক নিরন্তর ধ্যান (স্নেহপূর্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে), মাহাত্ম্যজ্ঞান পূর্বক সর্বাধিক সুদৃঢ় স্নেহ (মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্বস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্বতোঽধিকঃ। স্নেহোভক্তিরিতিপ্রোক্তস্তয়ামুক্তির্নচান্যথা ॥)। এই ভক্তিসাধনায় কোনো কর্মকাণ্ড নাই, ইহার জন্য প্রয়োজন কেবল চিত্তশুদ্ধি। অথচ আশ্চর্য এই যে, ভক্তির গুরুত্ব বুঝাইতে গিয়া ভক্তকবিরা মন্ত্রতন্ত্র পূজাপাঠ তীর্থভ্রমণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ভক্তিধর্মের চর্চা ও বিকাশের মূলে বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে একটা বিরোধিতার মনোভাব সর্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল। ধর্ম-সাধনার জন্য যাঁহারা সদাচার ও চিত্তশুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, তাঁহাদের এই পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা স্বভাবতই বেদনাদায়ক।

২৭০. ভক্তিধর্মের অভ্যুদয়ের যে বিবরণ আমরা দেখিয়াছি তাহাতে এই অসহিষ্ণুতা খুব অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইবে না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন বৈদিক ধর্মের মহিমাকে

অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ভক্তিধর্মই নয়, জনসাধারণের মধ্য হইতে আরও অসংখ্য মত ও পথ গড়িয়া উঠিয়াছে।[১] প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সূচক মনোভাব। অনার্যগোষ্ঠীসম্ভূত সকল ধর্মেই 'বেদ' নিন্দিত ও ধিকৃত। আসলে ইহা আঘাতের প্রত্যাঘাত। বহিরাগত আর্য-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের জল-হাওয়া-মাটির মধ্যে বর্ধিত হইয়াও দেশীয় জনসাধারণ হইতে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিত। যতটুকু সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নিতান্ত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে. ইহার মূলে কোনো উদার মনোবৃত্তি ছিল বলা যায় না। বরং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নিদারুণ বিদ্বেষমূলক মনোভাব লক্ষিত হয়। এই বিদ্বেষ কেবল দ্রাবিড় প্রমুখ আর্যেতর জাতি ও ধর্ম সম্পর্কেই নয়, আর্যসমাজেও যাহারা যুগে যুগে চিন্তায় ও কর্মে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, এই বিদ্বেষ-বহ্নি হইতে তাঁহারাও নিস্তার পান নাই (দ্র° ৭৯, ২৬৩)। অনার্যের সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের যুগে আর্যজাতির মুখপাত্র ব্রাহ্মণদের মনোভাব আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। "তখন বিদ্বেষ একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধারণ করিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র।...তখন নীচে যে থাকে সে যতই অবনত হয়, উপরে যে থাকে সে-ও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে।...মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।...আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, য়ুরোপীয় ও এসিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো যেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে, সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্বনাশকে ঘনাইয়া আনে" (ইতিহাস পৃ ৫০)। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় ব্রাহ্মণের কাপুরুষতা অব্রাহ্মণকেও কাপুরুষ করিয়াছে। ভক্তিধর্ম তাই চিত্তশুদ্ধির ধর্ম হইলেও তাহাতে পরধর্মবিদ্বেষরূপ

১ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতীয় সাধনার ঐক্য পৃ ১

মালিন্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্তকবিরা যে মন্ত্রতন্ত্র বেদাধ্যয়নের নিন্দা করিয়াছেন তাহার মূলে একটা প্রবল সামাজিক কারণও ছিল।

২৭১. বিভিন্ন ভাষার ভক্তকবিদের মধ্যে এ বিষয়ে একটি ভাবগত ঐক্য দেখিতে পাই। তাঁহারা প্রায় এক বাক্যে ভক্তি মহিমা ও সদাচারের উপর গুরুত্ব দান করিয়া তীর্থ, পূজা, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানের নিরর্থকতার কথা বলিয়াছেন। তামিল শৈব কবি অপ্পর্ বলেন—'প্রভু যে সর্বকালে ও সর্বদেশে থাকিয়া আমাদের অন্তরেও বিরাজ করিতেছেন একথা যাহারা বুঝিতে না পারে তাহাদের গঙ্গাস্নানেই বা কী প্রয়োজন? তাহাদের বেদাধ্যয়ন নিষ্ফল, শাস্ত্রশ্রবণও অর্থহীন। কেনই বা তাহারা উপবাস ও ব্রতানুষ্ঠান করে? পর্বতে উঠিয়া তপশ্চর্যাতেই বা তাহাদের কী প্রয়োজন?' তামিল বৈষ্ণব কবিদের রচনায় অর্চাবতার ও দিব্যদেশের প্রতি বিশেষ প্রবণতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এমন কথাও পাওয়া যায় যে, অর্চা-বিগ্রহের আদৃত বাসস্থলে বসতির প্রয়োজন নাই, সেখানে গমনেরও প্রয়োজন নাই। এই দিব্যদেশ বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত মানসিক চিন্তাই যথেষ্ট।[1] কন্নড শৈব কবি সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন—ভক্তিহীন হইয়া জপতপ তীর্থযাত্রা প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠান একান্তই নিরর্থক। যিনি ভক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরকে বাহিরে খোঁজার কোনো আবশ্যকতা নাই। উদ্ধারকর্তা ভগবান যখন অন্তরেই রহিয়াছেন তখন ঘাটে ঘাটে ঘুরিবার কী প্রয়োজন? কন্নড শৈব সাহিত্যের অন্যতম সাধক অল্লম প্রভু বলেন: যে সত্য বলে না, যে সদাচারী নয়, যাহার মধ্যে সদ্‌ভক্তি নাই, যে সৎক্রিয়া করে না, যাহার সম্যক্ জ্ঞান নাই তাহার বেশভূষা দেখিয়া গুহেশ্বর লিঙ্গ হাসিতেছে। ধিক্ ধিক্ এই শ্রেণীর লোকগুলিকে। কবি বসবন্ বলিয়াছেন—পাথরের দেবতা দেবতা নয়, মাটির দেবতা

১ শ্রী যতীন্দ্র রামানুজ দাস—আড়বার পৃ ১৮৯

দেবতা নয়, কাঠের দেবতা দেবতা নয়, পঞ্চধাতুনির্মিত দেবতাও দেবতা নয়। আমাদের আরাধ্য দেবতা নাদপ্রিয় নন, বেদপ্রিয় নন, তিনি কেবল ভক্তিপ্রিয়। তেলুগু শৈব কবি বেমনা চিত্তশুদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন—'চিত্তশুদ্ধি বিনা শিবপূজা করিলে কোনো লাভ নাই। মন্দিরের কঠিন শিলার সম্মুখে মাথা কুটিলে কি সেই শিলার কঠিন্য দূর হয়? এই শরীরই মন্দির এবং আত্মাই ভগবান। সুতরাং ব্যর্থ শিলাপূজা ছাড়িয়া দাও। মানুষ 'কাশী কাশী' করিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করে। কিন্তু তাহা কি এখানে নাই? যদি হৃদয় পবিত্র হয় তবে ভগবানকে সর্বত্রই পাওয়া যায়।' তেলুগু বৈষ্ণব কবি ত্যাগরাজের মুখেও সেই একই কথা: সদ্‌ভক্তি যাহার নাই সে কি কখনও মোক্ষলাভ করিতে পারে? মনকে জয় করিতে না পারিলে কেবল ঘণ্টা বাজাইয়া ও ফুল ছড়াইয়া কী হইবে? দুর্মদ ব্যক্তির পক্ষে কাবেরী বা মন্দাকিনী স্নানে লাভ কী? যে ব্যক্তি মনকে জয় করিতে পারে নাই, সে বাহ্য অনুষ্ঠানের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। আবার যিনি সংযতমনা তাঁহার পক্ষেও মন্ত্রতন্ত্র নিরর্থক। কেরলের কবি কুলশেখর বলিয়াছেন: বেদাধ্যয়নই বলো আর ব্রতাদি পুণ্যকর্মই বলো, তাঁহার চরণযুগল স্মরণ না করিলে সমস্তই নিষ্ফল। বেদপাঠ সে তো অরণ্যে রোদন মাত্র; বেদ-বিহিত নিত্যব্রতকর্ম সে তো দেহক্ষয়কারী; কূপদীর্ঘিকাখননাদি পূর্ত কার্য সমস্তই ভস্মে আহুতির তুল্য; পুণ্যতীর্থে স্নান গজস্নানের তুল্য। এড়ুত্তচ্ছনের কণ্ঠেও সেই সুর—যে মনুষ্য ভক্তিহীন, শতসহস্র বর্ষেও তাঁহার জ্ঞান বা মোক্ষলাভ হয় না। মরাঠী কবি নামদেব বলেন: জপতপ-তীর্থ-উপবাসের কোনোই সার্থকতা নাই হৃদয় যদি পবিত্র না হয়। জটা-মালা-তিলক-ভস্ম দিয়া কী হইবে? গুজরাতী কবি নরসিংহ মহেতা গাহিয়াছেন: স্নানে ও পূজা-অর্চনায় ফল কী? ঘরে বসিয়া দান-ধ্যান করিলে কী হইবে? জটাধারণ ও ভস্মলেপনে কোনো

লাভ নাই। তপস্তা-তীর্থ-তিলক-তুলসী-মালা-গঙ্গাজল ইত্যাদির প্রয়োজন নাই। বেদ ব্যাকরণ ষড়দর্শন অধ্যয়নেই বা কী ফল যদি তোমার বর্ণভেদ থাকে? প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত হইল পেট ভরাইবার কৌশলমাত্র। গুরু নানকের কণ্ঠেও শুনিতে পাই: যজ্ঞ হোম পুণ্য তপস্যা ইত্যাদি করিয়া মানুষ নিত্য দেহকে কষ্ট দেয়। বই-পড়া, ব্যাকরণ-আলোচনা, ত্রিকালে সন্ধ্যা-বন্দনা করা বৃথা। দণ্ড-কমণ্ডলু-শিখা-সূত্র-ধুতি-তীর্থেও কিছু হয় না।

২৭২. ভক্তিধর্ম ও ভক্তিসাহিত্যে ভক্তের স্থান বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। তামিল শৈব কাব্য পেরিয়পুরাণম্ তো পুরাপুরি ভক্তজীবনকথা। তেবারম্-এ আছে: যাহাদের সমস্ত অঙ্গ কুষ্ঠরোগে গলিত; অথবা যাহারা পুলেয়া প্রভৃতি নীচজাতির লোক কিংবা যাহারা গোমাংসভোজী তাহারাও যদি শিবের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হয় তবে নমস্য দেবতা বলিয়া আমি তাহাদের বন্দনা করিব। তামিল বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে একজনের নামকরণেও এই মনোভাবটি পরিস্ফুট। তিনি হইতেছেন তোণ্ডর্-অডিপ্-পোডি অর্থাৎ ভক্ত-চরণ-রেণু (দ্র° ৬১)। কন্নড শৈব কবি বসবন্ বলিয়াছেন: আমি ব্রহ্মপদবী চাই না, বিষ্ণুপদবী চাইনা, রুদ্রপদবী চাই না। অন্য কোন প্রকার উচ্চ পদও আমার কাম্য নয়। হে দেব, তুমি আমার প্রতি এই করুণাই কর যাহাতে আমি তোমার সদ্ভক্তের চরণে আশ্রয় পাই। বৈষ্ণব কবি পুরন্দর দাসের পদে আছে: আমি হরিভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়াছি। আর আমার কী চাহিবার আছে? তেলুগু বৈষ্ণব কবি বম্মের পোতানা মনে করেন ভক্তিরসের আস্বাদন যাঁহার ভাগ্যে একবার ঘটিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোনো বিষয়ে তাঁহার আসক্তি হইতে পারে না। কেরলীয় ভক্তকবি পূন্তানম্-এর গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় রচিত দেখিয়া সংস্কৃত কবি ভট্টাতিরি উহা অবজ্ঞাভরে ছুঁড়িয়া ফেলিলে সেই দিন রাতে স্বয়ং নারায়ণ স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া গেলেন যে, তিনি পণ্ডিত ভট্টতিরি অপেক্ষা ভক্ত

পুন্তানম্-এর সাধনায় অধিকতর তৃপ্ত। মরাঠী কবি তুকারামের একটি পদে[১] আছে—মন, যদি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে চাও তো ভক্তের সঙ্গে দেখা কর; ঈশ্বর তাঁহাদের অনুপম সম্পদ্। মন, যদি কাহারও সঙ্গে বাস করিতে চাও তো ভক্তের সঙ্গে বাস কর; অন্য কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন নাই। ভক্ত হইতেছেন আনন্দের সাগর, তিনিই তোমার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করিবেন। শিখগুরু অর্জুন বলিয়াছেন: যে ভক্ত-সংসর্গে আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং সর্বজ্ঞ পুরুষকে পাইয়াছি তাঁহাদেরই চরণে আমি প্রাণ-মন সমর্পণ করিলাম।

২৭৩. গুরুমহিমা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয় তামিল বৈষ্ণব কবি মধুর আলোয়ারের কথা। মধুর আলোয়ার অন্য কোনো ভগবানের উপাসক ছিলেন না। তাঁহার চোখে গুরুই ভগবান। গুরুর গান গাহিয়া বেড়ানোই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র কাজ। কন্নড শৈব কবি সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন, গুরু ঈশ্বর অপেক্ষাও বড়। বৈষ্ণব কবি বিজয়দাস বলিয়াছেন—তাঁহার দুয়ার খুলিয়াছে যে-তিনটি বস্তুর সংযোগে তাহার একটি গুরুকৃপা (অপর দুইটি হরি-করুণা এবং ভক্তজনের সহবাস)। মরাঠী ভক্ত বারকরী সম্প্রদায়ে গুরুর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একনাথ ও তুকারাম বহু পদে গুরু-ঋণের কথা বলিয়া গিয়াছেন—ভক্তি তো তাঁহারই করুণার দান; গুরুই তো ভগবানের দূত। গুরুই ভগবান। মহারাষ্ট্রে গুরু ভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একনাথের রচনায়। কবি তাঁহার প্রত্যেকটি অভঙ্গ-এর (পদের) ভণিতায় নিজ নামের সহিত গুরু জনার্দন স্বামীর নামোল্লেখ করিয়া অশেষ গুরুকৃত্য সাধন করিয়াছেন। 'বাবা যেরূপ ছেলের হাত ধরিয়া নিজেই বর্ণমালা লিখিয়া দেন গুরুও তেমনি আমাকে দিয়া লিখাইয়া লইলেন' —এইভাবে একনাথ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। পঞ্জাবী সূফী কবি বুল্লেশা বলেন, আমার সদ্গুরু আমাকে পথ দেখাইয়াছেন।

---

১ যেসী তরী ঘেঈ…ইন্দুপ্রকাশ সংস্করণ, পদ সং ১২৪০

গুরু নানক বলেন, গুরু-উপদেশ বিনা মুক্তি কোথায়? নানকের অপর একটি পদে আছে—হে ভব-খণ্ডন, হে জন্মমরণের মুক্তিদাতা, তোমার প্রকাশেই সকল প্রকাশিত। গুরু-উপদেশে সেই জ্যোতি প্রকট হয়।

২৭৪. ভগবৎমহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিও যখন বলেন—তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, তুমি সুখ, তুমি শান্তি....অথবা, তুমি অকূলের কূল, অগতির গতি, অনাথের নাথ, পতিতের পতি... (গীত বিতান পৃ ৩৪), তখন আর প্রাচীন যুগীয় ভক্তকবিদের ঐ জাতীয় উক্তিকে শূন্য হৃদয়োচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হয় না। তামিল শৈব কবি সম্বন্ধর্ বলিয়াছেন: তুমিই গুণ, তুমিই দোষ। তুমি বন্ধু, তুমি সম্পদ, তুমি আনন্দ। তুমি আমার সব। তামিল বৈষ্ণব কবি তিরুমলিসৈ আলোয়ারের কণ্ঠে শোনা যায়—তুমিই আমার প্রেম, তুমিই আমার সুদুর্লভ অমৃত, তুমিই আমার আনন্দ, তুমি আমার সর্বস্ব। কন্নড শৈবকবি বসবন্ বলিতেছেন: পিতা তুমি, মাতা তুমি, বন্ধু তুমি, আত্মীয় তুমি, তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। তেলুগু শৈব কবি সোমনাথের রচনায় পাই: তুমি আমার ভব্যনিধি, তুমি অমৃত সাগর, তুমি কল্পতরু, তুমি আমার পেটিকা, উজ্জ্বল মণি তুমি। তেলুগু বৈষ্ণব কবি ত্যাগরাজের কণ্ঠে শুনি—তুমি আমার জীবনাশ্রয়, তুমি তপস্যার ফল; তুমি আমার মঙ্গলময়; তুমি দেহের বল; তুমি কুল-সম্পদ, তুমি চিদানন্দ; তুমি মনোহর, তুমি সন্তোষ; তুমি আমার জীবন-যৌবন-ভালোবাসা; তুমি ভাগ্য, তুমি বৈরাগ্য। মরাঠী কবি নামদেবের "মাতা পিতা বন্ধু" পদটিতে বলা হইয়াছে—হে বিঠল, তুমি আমার পিতা ও মাতা, বোন ও বন্ধু। তুমি আমার জীবন, একমাত্র আশ্রয়। তুমিই আমার কৃচ্ছ্র সাধন, আমার ধর্মানুষ্ঠান, তীর্থস্থান, নৈবেদ্য ও পুণ্য। তুমি আমার নীতি, বিচার, সত্য, সাহস, ভাগ্য, ধর্ম ও মহিমা। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। পঞ্জাবী সূফী কবি বুল্লে শা একটি 'কাফী'তে বলিয়াছেন—

কোথাও সে শত্রু, কোথাও বা বন্ধু; কোথাও মজনুঁ, কোথাও লায়লা; কোথাও গুরু, কোথাও শিষ্য; কোথাও মসজিদ, কোথাও মন্দির; কোথাও জপমালাধারী বৈরাগী, কোথাও শেখ-বেশী মুসলমান!

২৭৫. এমন ঈশ্বরের স্তুতি না করিয়া কবির কি উচিত সামান্য মানুষের স্তুতি করা। ভক্ত কবিকেও কখনো কখনো দেখা যায় ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের বন্দনায় মুখর। তামিল শৈব কবি সুন্দরর্ বলিয়াছেন: মিথ্যার আশ্রয়ে যাহারা জীবন ধারণ করিতেছে তাহাদের প্রশংসা হইতে বিরত হও। আমার প্রভুর গুণকীর্তন করো, তিনিই তোমার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তোমার সমস্ত দুঃখ দূর হইবে। পরিশেষে তোমার শিবলোক প্রাপ্তি ঘটিবে।[১] তামিল বৈষ্ণব করি নম্‌মাড়বার একই সুরে বলিয়াছেন: হে কবিবৃন্দ, তোমাদের স্তুতির বিনিময়ে নশ্বর রাজশক্তির দরবারে যে গুটিকয়েক সুবর্ণমুদ্রা পাইবে তাহা ঐ রাজশক্তির মতোই নশ্বর। তোমাদের মধ্যে যে মধুর কবিত্ব-সম্পদ রহিয়াছে তাহার দ্বারা ইষ্টদেবের উপাসনা কর। যখন তিরুবেঙ্কট পর্বতে আমার প্রভু রহিয়াছেন, তখন আমার কণ্ঠের গান আমি মানুষের সেবায় উৎসর্গ করিব না। তেলুগু শৈব কবি ধূর্জটি ছিলেন এই মনোভাবের জীবন্ত উদাহরণ। রাজসভায় স্থান পাইয়াও তিনি রাজশক্তির কাছে শিব-ভক্তি বিসর্জন দিতে পারেন নাই। তাই রাজসভার অন্যান্য কবি যখন কৃষ্ণদেব রায়ের স্তুতি-বন্দনায় মুখর এবং স্বরচিত গ্রন্থাদি রাজার নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ, তখন ধূর্জটি রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া কালহস্তীশ্বরের চরণে তাঁহার গ্রন্থ সমর্পণ করিয়া অনন্য শিবভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তেলুগু বৈষ্ণব কবি পোতানা রাজার নামে তাঁহার ভাষা-ভাগবত উৎসর্গ করিতে আদিষ্ট হইলে কবি তাঁহার গ্রন্থের সূচনায় এই মর্মে একটি শ্লোক যুক্ত করিয়া দিলেন—এই সমস্ত অধম মনুজেশ্বরকে গ্রন্থ

১ Tamil Literature (Calcutta) 1958, p. 27

সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের কাছ হইতে কিছু ধন রত্ন, জমি জায়গা এবং হাতী ঘোড়া লাভের পরিবর্তে পোতানা জগৎ-হিতের জন্য রচিত তাঁহার ভাগবত শ্রীহরি চরণে সমর্পণ করিল। ত্যাগ বলিয়াছেন: প্রভুই যখন আমার ধন-ধান্য-দেবতা, তখন দুর্মার্গগামী অধম মানুষের স্তুতি-বন্দনার কোনো প্রয়োজন নাই।

২৭৬. ভক্ত কবিরা বিভিন্ন স্থানীয় মূর্তির উপাসনা করিলেও তাহা যে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বদেবতার আরতি এবং সেই আরতির উপকরণ যে সামান্য ধূপদীপ নৈবেদ্য নয় একথা তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তামিল বৈষ্ণব কবি পোয়্‌কৈ আলোয়ার পৃথিবীকে দীপাধার রূপে, মহাসমুদ্রকে তৈল রূপে, এবং প্রখর সূর্যকে দীপশিখা রূপে ব্যবহার করিয়া প্রভুর পদবন্দনার কথা বলিয়াছেন। ভূদত্ত আলোয়ারের গানে দীপাধার হইল প্রেম, তৈল হইতেছে পরম ভক্তি, এবং প্রদীপের সলিতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে আনন্দ-বিগলিত চিত্তকে। কন্নড় শৈব কবি মহাদেবি অক্ক বলিয়াছেন (অয়্যা পাতাল বিত্তিত্ত শ্রীপাদ): প্রভু, আমরা পাতালের কথা বলি, তোমার চরণ সেই পাতালেরও তলে। আমরা স্বর্গের কথা বলি, তোমার মস্তক সেই স্বর্গেরও উপরে।...যে-তুমি এই সমগ্র বিশ্ব ভরিয়া বিরাজ কর সেই তুমিই আবার সূক্ষ্মমূর্তি ধরিয়া আমার করতলে আসিয়া বসিলে।[১] কন্নড় বৈষ্ণব কবি ব্যাসরায়ের পদে আছে: প্রত্যহ আমি পূজা করিতেছি আমার অন্তরস্থ প্রভুর মূর্তিকে। আমার শরীর তাঁহার মন্দির, আমার হৃদয় তাঁহার মণ্ডপ। আমার চক্ষু দুইটি প্রদীপ, আমার হস্তদ্বয় চামর। আমার তীর্থযাত্রা তাঁহার প্রদক্ষিণ, আমার নিদ্রা হইল প্রণিপাত, স্তুতি তাঁহার মন্ত্র, আমার বাণী তাঁহার পুষ্প। প্রসিদ্ধ তেলুগু বৈষ্ণব কবি ত্যাগরাজ অনেকটা একই ভঙ্গিতে বলিলেন: আমার দেহই তোমার পূজার মন্দির। আমার স্থির

১ **Pathway to God in Kannada literature pp. 162-163**

চিত্ত তোমার স্বর্ণপীঠ। তোমার চরণ ধ্যানই আমার গঙ্গাজল; তোমার প্রতি ভালোবাসাই আমার শুভ বস্ত্র। তোমার গুণকীর্তন চন্দনের গন্ধ, তোমার নাম-স্মরণই প্রস্ফুটিত পদ্ম। আমার অতীত জীবনের দুষ্কৃতি তোমার সম্মুখে ধূপ হইয়া পুড়িবে; আমার ভক্তি তোমার পূজার প্রদীপ হইয়া জ্বলিবে। আমার এই পূজার ফল তোমার নৈবেদ্য, এই পূজা-প্রসূত স্থায়ী আনন্দ তোমার তাম্বূল এবং তোমার দর্শনই তোমার দীপারাধনা (আরতি)। মরাঠী কবি তুকারাম বলিয়াছেন: পাথর দিয়া আমরা বিষ্ণুমূর্তি গড়িয়াছি, কিন্তু পাথর বিষ্ণু নয়। বিষ্ণুর অর্ঘ্য বিষ্ণুকেই দেওয়া হয়, পাথর পাথরই থাকিয়া যায়।[১] অন্য একটি পদে বলিয়াছেন: আমরা তোমাকে ধাতুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছি পূজা-অর্চনার জন্য, যদিও তোমার মধ্যে রহিয়াছে চতুর্দশ ভুবন। আমরা ভালোবাসিয়া তোমাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াই, যদিও তোমার না আছে অবয়ব, না আছে আকার। আমরা তোমার গান করি, অথচ তুমি অনির্বচনীয়। তোমার গলায় মালা পরাই, অথচ তুমি আমাদের স্পর্শাতীত।[২] গুজরাতী কবি নরসিংহ বলিয়াছেন: অনন্ত উৎসবের মাঝে পথ-ভোলা আমি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই মহৎ শ্যাম সৌন্দর্যকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যেখানে কোটি সূর্যের জ্যোতি জ্বলিতেছে, সেখানে আনন্দক্রীড়ায় রত সচ্চিদানন্দ। সলিতা নাই, তেল নাই, তবু জ্বলিতেছে অনির্বাণ দীপ। সেই অরূপের রূপ আমরা দেখিব, কিন্তু এই চোখে নয়। সেই রসময়ের রস পান করিব, কিন্তু এই রসনায় নয়। গুরু নানকের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে: হে জন্মমরণের মুক্তিদাতা, এ কি তোমার অদ্ভুত আরতি! এই গগনমণ্ডল থালা, সূর্য চন্দ্র দুইটি বাতি, মালা ঐ অনন্ত নক্ষত্র

১ ইন্দুপ্রকাশ সংস্করণ, পদ সং ২৬২
২ ঐ পদ সং ২৮৭০

মণ্ডল। মলয়ানিল তোমার ধূপ, পবন তোমার চামর, সমগ্র বনরাজি তোমার ফুল।

২৭৭. সমগ্র বিশ্বব্যাপী যাঁহার অধিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে যিনি বিশ্বাতীত, ভক্তের সহিত তাঁহার সম্পর্কটি কিরূপ? ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি (দ্র° ২৭৪) ভগবানের জন্য ভক্তের আকুলতা, দেখিয়াছি ভগবানকে নানা নামে ডাকিয়া ডাকিয়া ভক্ত সারা হইয়া যায়। কিন্তু সম্পর্কটি কি এক পক্ষের? প্রভু যে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন তাহা কি কেবল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য? না। তিনি আসেন আমার সহিত মিলিত হইতে, আসেন রৌদ্রালোকিত বনপথ ধরিয়া, আসেন শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে চড়িয়া। ইহা কেবল আধুনিক কবির কথা নয়, প্রাচীন ভক্ত কবিরাও তাঁহাদের নিজস্ব ভঙ্গীঅনুযায়ী এই কথা বলিয়াছেন। তামিল শৈব কবি মাণিক্কবাচকরের কণ্ঠে শুনিতে পাই, "সেই যে প্রভু যিনি স্বর্গ ছাড়িয়া এই মর্ত্যে পদার্পণ করিয়াছেন, মানুষকে তাঁহার নিজের করিয়া লইয়াছেন, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে অনুভবময় করিয়া তুলিয়াছেন..." ইত্যাদি। তামিল বৈষ্ণব কবি নম্‌মাড়বার বলিয়াছেন—বৈকুণ্ঠপতি আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে তাঁহার করিয়া লইয়া আমার মধ্য দিয়া তাঁহার অমর সংগীত গাহিবার ব্যবস্থা করিলেন। অন্যত্র বলিয়াছেন—হে প্রভু, তুমি স্বর্গবাসী দেবগণের পূজা-অর্চনা উপেক্ষা করিয়া অনুপম মায়াবলে নামিয়া আস এই মর্ত্যভূমিতে। প্রেমাবতার প্রভু সম্পর্কে তিরুমলিসৈ আড়বার বলেন, "হে নারায়ণ, আমি নিশ্চিত জানি, তোমাকে ছাড়া যেমন আমার কোনো অস্তিত্ব নাই, তেমনি তুমিও আমাকে ছাড়া থাকিতে পার না।" মহারাষ্ট্রের বারকরী সম্প্রদায়ের পূর্ণ বিশ্বাস যে মানুষকে কোথাও ঈশ্বরের খোঁজে যাইতে হয় না, ভক্ত মানুষের টানে তিনিই মাটিতে নামিয়া আসেন। ঈশ্বর যে পাঁঢরপুরে আসিয়া কটি দেশে হাত রাখিয়া বিঠোবা রূপে দাঁড়াইলেন তাহা তো সাধক পুণ্ডলীকের জন্য (দ্র° ২০৯)। মীরার

চোখে মাধব কেবল হৃদয়-দেবতা নন, ব্রজনারীর ঘোলের মটুকের মধ্যেও তিনি দিব্য বসিয়া আছেন। আর গোপী চলিয়াছে বৃন্দাবনের পথে পথে সেই ঘোলের মটুক মাথায় লইয়া।

২৭৮. এমন যে প্রভু, যিনি তাঁহার স্বর্গীয় সিংহাসনের আসন ছাড়িয়া পর্ণকুটিরে আসিয়া আমাদের সুখদুঃখের সঙ্গী হইলেন, তাঁহার সেবা করিতে না পারিলে মনুষ্য-ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা কোথায়? তামিল বৈষ্ণব কবি তিরুপ্পান্ আলোয়ার বলিয়াছেন, "আমার নয়ন দেখিয়াছে সেই ঘনশ্যামকে···তাহাকে দেখিবার পর নয়ন আমার আর কিছুই দেখিতে চাহে না।" কন্নড বৈষ্ণব কবি পুরন্দর দাসের পদে আছে: বেদাধ্যয়নহীন বিপ্রের মতো, যুদ্ধবিদ্যাহীন সৈনিকের মতো, জ্ঞানদানে বিরত গুরুর মতো আমার এই নয়ন দুটিও ব্যর্থ, পদ্ম-নাভের দর্শন ছাড়া।[১] তেলুগু বৈষ্ণব কবি পোতানা বলিয়াছেন: হাত যদি ভগবানের পূজা না করে, মুখ যদি তাঁহার গুণকীর্তন না করে তবে আর এই জন্মগ্রহণের সার্থকতা কী? তেলুগু কবি ত্যাগরাজের রচনায় পাই—যে নয়ন প্রভুর সৌন্দর্য দেখিল না সেই নয়নের কী প্রয়োজন? যে দেহ সেই নীলসমুদ্রকান্তি শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিল না তাহা তো পিঞ্জরের তুল্য। যে হাত তাঁহার পূজা করিল না সেই হাত থাকা না থাকা সমান। যে রসনা রাম-মূর্তির স্তুতিগান করিল না সেই রসনার কোনো সার্থকতা নাই। পঞ্জাবী সূফী কবি ফরীদ বলিয়াছেন: যে নয়ন ঈশ্বরের দিকে তাকায় না তাহার অন্ধ হওয়াই ভালো: যে রসনা তাঁহার নামকীর্তন করে না তাহার মূক হওয়াই শ্রেয়; যে কান তাঁহার স্তুতি শ্রবণ করে না তাহার বধির হওয়াই উচিত; যে দেহ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয় না তাহার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় শতকের তামিল কাব্য 'শিলপ্পধিকারম্'-এ গোপীরা গাহিয়াছে: কৃষ্ণের কীর্তিকথা যে কান শোনে নাই সেই কান কি কান? যে চোখ তাঁহাকে দেখে নাই সেই

১ শ্রীপুরন্দরদাসকে ভজন, পদ সং ৮৫

চোখ কি চোখ? যে রসনা তাঁহার নামোচ্চারণ করে নাই সেই জিহ্বা কি জিহ্বা? এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে জাগে স্বরূপ দামোদরের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥

এবং তৎসহ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ব্যাখ্যা।

২৭৯. যাঁহার প্রতি হৃদয়ের পরম অনুরাগ তাঁহাকে বাদ দিয়া জীবনে আর কী কাম্য থাকিতে পারে? মুক্তি ও স্বর্গ তাঁহার কাছে তুচ্ছ—এই মর্মে ভক্ত কবির দল মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। তামিল শৈব কবি কারৈক্কাল্ অম্মৈয়ার্ বলেন—হে চন্দ্রচূড়, তোমাকে দেখিয়া, তোমার চরণতলে প্রণত থাকিয়া যদি তোমার সেবা না করিতে পারি তবে স্বর্গ পাইলেও আমি তাহা চাই না। মাণিক্কবাচকর্ বলেন—আমি খ্যাতি চাই না, অর্থ চাই না, স্বর্গ-মর্ত্য কিছুই কামনা করি না। আমি যে প্রভুর চরণলাভে ধন্য হইয়াছি, কোথাও যাওয়ার আর প্রয়োজন নাই। তামিল বৈষ্ণব কবি কুলশেখর একাধিক পদে বলিয়াছেন যে, তিনি রাজ্য চাহেন না (প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করেন), অর্থ চাহেন না, উর্বশীর ভালোবাসাও তাঁহার কাম্য নয়। তিনি শুধু চান প্রভুর চরণে আশ্রয়। তাহাতে যদি কবিকে মনুষ্য জন্ম ছাড়িয়া মৎস্যজন্মও গ্রহণ করিতে হয় আপত্তি নাই। তেলুগু বৈষ্ণব কবি তাল্লপাক পেদ তিরুমলাচার্য বলেন: আমার পদক্ষেপ, নৃত্য, ক্রিয়াকলাপ ও সংলাপ—এই সমস্তই তোমার কাজ। আমরা তো তোমারই সভার নর্তক। তোমার আনন্দবিধানের জন্য আমরা মোক্ষ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তুমি দয়া করিয়া যাহা দিবে আমাদের তাহাই হোক। মরাঠী কবি নামদেব বলেন: আমি

বৈকুণ্ঠ চাই না, কৈলাস চাই না, আরাধ্য দেবতার চরণে আমার সকল আশা। মহারাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থ পঁঢরপুর সম্পর্কে তুকারাম বলেন: সাধু সন্তেরা সেখানে দোকান খুলিয়াছেন, যাহার যাহা চাই তাহা সেখানে আছে। বিনামূল্যে সেখানে মুক্তিও পাওয়া যায় কারণ কেহই তাহা চায় না।

২৮০. যে দেবতার বিনিময়ে ভক্তের কাছে মুক্তিও কাঙ্ক্ষিত নয়, তিনি কি সত্যই তীর্থভূমিতে অবস্থান করেন? ভক্ত কবিরা এক নিশ্বাসে তাহাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্য নিশ্বাসে শোনা যায় উহার বিপরীত কথা। ভক্তিসাহিত্যে তীর্থ-মহিমা কীর্তিত হইয়াছে বলিয়া কাঞ্চীপুর-চিদম্বর-শ্রীরঙ্গ-তিরুবেঙ্কটাচল-শ্রীশৈল-গুরুবায়ুর-পঁঢরপুর-বৃন্দাবনের অভিমুখে আজিও লক্ষ লক্ষ যাত্রী ছুটিয়া যায়। কিন্তু ভক্তিসাহিত্যে একথাও বলা হইয়াছে যে, তীর্থদেবতা হৃদয়-দেবতাও বটে। সেই হৃদয়বিহারীকে বাসনা-বিদ্ধ চিত্তে দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু তিনি বিরাজ করেন হৃদয়ের গোপন প্রদেশে। তামিল শৈব কবি কারৈক্কাল্ অম্মৈয়ার্ গাহিয়াছেন—কেহ বলে তিনি আছেন স্বর্গে। বলুক না তারা। কেহ বলে তিনি বাস করেন দেবরাজ ইন্দ্রপুরীতে। বলুক না তারা। কিন্তু আমি বলিব সেই যে দেবতা তিনি আছেন আমার হৃদয়ের মধ্যে। কন্নড শৈব কবি সর্বজ্ঞের মতে যিনি ভক্তিমান্ তাঁহাব পক্ষে ঈশ্বরকে বাহিরে খোঁজার কোনো আবশ্যকতা নাই। উদ্ধারকর্তা ভগবান যখন অন্তরেই রহিয়াছেন তখন ঘাটে ঘাটে ঘুরিবার কী প্রয়োজন? কন্নড বৈষ্ণব কবি কনকদাস বলিয়াছেন: এতদিন ভাবিতাম বৈকুণ্ঠ বুঝি অনেক দূরে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি-বলে আজ দেখিতেছি বৈকুণ্ঠ আছে এখানে—আমার হৃদয়ে।

২৮১. হৃদয়স্থিত দেবতাকে খুঁজিয়া পাইতে এত বিলম্ব হয় কেন? তাহার উত্তরে বলা যায়, যে-মন খুঁজিবে সে তো ষড়রিপুর তাড়নায় পাগলের মতো নিরন্তর ধাবমান। একদিকে ঈশ্বরের প্রতি

অনুরাগ, অন্যদিকে বিষয়বাসনার তীব্র আকর্ষণ—এই দুই বিপরীতের টানাটানিতে ভক্ত-হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত। বহুগানে ভক্তকবির এই পাপ বোধ, এই দৈন্যবোধের অন্তরঙ্গ পরিচয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তামিল শৈব কবি অপ্পর বলিতেছেন: ন্যায়ত আমি বাঁচিতে পারি না। দিনের পর দিন আমি নিজেকে কলঙ্কিত করিয়াছি। শাস্ত্র অধ্যয়ন করি বটে, কিন্তু উহার তাৎপর্য কিছুই বুঝি না। তুমি আমার প্রভু, তোমাকেও হৃদয়ে স্থান দিই না। আমি বাসনার পাশ হইতে মুক্তিলাভ করি নাই। এতদিন চর্মচক্ষু দিয়া দেখিয়াছি, জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াও খুলে নাই। অজ্ঞানজনিত যে পাপকর্ম সঞ্চিত হইয়াছে, এখনও তাহার ভোগ শেষ হয় নাই। হে প্রভু, আমি বড় ক্লান্ত। কন্নড শৈবকবি বসবন্ বলিয়াছেন—পরের সম্পদের প্রতি লোভ আমাকে জ্বরের মতো পাইয়া বসিয়াছে, আমি বিকল। স্বর্ণ, ভূমি ও রমণী চাহিয়া চাহিয়া আমি বৈকল্য-প্রাপ্তের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছি। হে প্রভু, তুমি আমার এই দুঃস্বপ্ন বন্ধ করিয়া তোমার করুণামৃত বর্ষণ কর এবং সকল প্রলোভনের উত্তাপ হইতে আমাকে বাঁচাও। কন্নড বৈষ্ণব কবি ব্যাসরায়ের একটি পদে আছে: পতঙ্গ যেরূপ জানিয়া শুনিয়া আগুনে ঝাঁপ দেয়, আমিও সেইরূপ সজ্ঞানে ঘৃণ্য বিষয়-সমূহে লিপ্ত হইতেছি। পতি কাছে থাকা সত্ত্বেও কুলটা যেরূপ অন্য পুরুষ কামনা করে আমিও সেইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় খুঁজি। একটি শশকের উপর ছয়টি ব্যাঘ্রের ঝাঁপাইয়া পড়ার মতো ষড়-রিপু আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। তেলুগু কবি ত্যাগরাজের কণ্ঠে শুনিতে পাই: চপলচিত্ত আমি তোমার মনের কথা না বুঝিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে তুমি কৃপা কর। তুমি তো সকল জীবের পরিত্রাতা, সকলের দোষগুণও তোমার ভালোরূপ জানা আছে। তৎসত্ত্বেও যে আমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রার্থী তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। মরাঠী ভক্ত তুকারামের একটি পদে আছে—আমি তোমার মুখ দেখিতে চাই,

কিন্তু আমার ভিতরে পবিত্র আচরণের কোনো স্থান নাই।...যদিও বাহিরে আমি সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছি, ভিতরে আমি অপবিত্র। হে দেব, যদি তুমি সাহায্য না কর তবে আমার উপায় নাই। চতুর্থ গুরু রামদাসের একটি গানে আছে: হৃদয় চায় কাঞ্চন ও নারী। মায়া-মোহ তাহার কাছে বড়ই মধুর লাগে। গৃহ, প্রাসাদ, ঘোড়া—এই সমস্ত বিষয়ে তাহার বড় আনন্দ। তোমাকে তো আমি স্মরণ করি নাই। আমি কিরূপে রক্ষা পাইব? হে রাম, ইহাই আমার নীচ কর্ম।

২৮২. নীচ কর্ম হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎ নাম কীর্তন। ভক্তকবিরা সমস্বরে এই নাম মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে তুলসীদাসের কথা, রামনামের মহিমাকীর্তনে যাঁহার ক্লান্তিহীন আনন্দ—"নাম ও নামধারী দুই-ই সমান বটে, তথাপি উহাদের মধ্যে সেব্য-সেবক সম্পর্ক অর্থাৎ নামই প্রভু, নামধারী তাহার সেবক মাত্র।...স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারে বলিতেছি, রাম অপেক্ষা তাঁহার নাম বড়"—

সমুঝত সরিস নাম অরু নামী।
প্রীতি পরসপর প্রভু অনুগামী॥...
কহউঁ নামু বড় রাম তেঁ নিজ বিচার অনুসার॥

(রামচরিতমানস, বালকাণ্ড)

তামিল শৈবকবি সুন্দরর্ বলেন: সংসারের কোলাহলে আমি তোমাকে ভুলিয়া গেলেও, হে প্রভু, আমার জিহ্বা যেন অবিরত বলিতে পারে—নমঃ শিবায়। মাণিক্কবাচকর্ বলেন: তোমার নাম ডাকিতে ডাকিতে জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যাইবে এমন ডাকা ডাকিতেছি কৈ? তামিল বৈষ্ণব কবিরাও ঠিক একই ভঙ্গিতে বলিয়াছেন—প্রভুকে এমন ভাবে ডাকিতে হইবে যাহাতে জিহ্বায় কড়া পড়িয়া যায়।[১] কন্নড বৈষ্ণব কবি বাদিরাজতীর্থের একটি

১ শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস—আড়্বার পৃ ৫৬

পদে বলা হইয়াছে—সহস্র সহস্র শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজন কী? হে মন, চতুর্দশ ভুবনের অধিপতি হরির নাম একবার উচ্চারণ কর। তেলুগু বৈষ্ণব কবি ভদ্রাচল রামদাস বলিয়াছেন: অন্তিম দিনে তোমার নাম স্মরণে যদি অসমর্থ হইয়া পড়ি, হে করুণাসাগর দাশরথি, আমি তাই আজই তোমার ভজনা করিতেছি। কেরলীয় কবি পূন্তানম্ কলিযুগে ভগবৎনাম সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। মরাঠী ভক্ত নামদেবের পদে আছে: হে প্রভু, আমি তোমার নাম কীর্তনেই মগ্ন থাকিব। হাতে বীণা, মুখে হরিনাম, আর কী চাই? মীরা গাহিয়াছেন: রাধা কৃষ্ণের নাম ছাড়িয়া অন্য কিছু বলিও না—

বোল মা বোল মা বোল মা রে,
রাধা কৃষ্ণ বিনা বীজু বোল মা রে।

গুরু নানকের পদে আছে ঈশ্বরের নাম ব্যতীত মুক্তি পাইবে না, মুক্তি আসিবে গুরু-উপদিষ্ট পথে প্রভুর নাম স্মরণে।

২৮৩. প্রভুর কৃপাধন্য ভক্তকবির দল যে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সাধন পথের শেষ কথা। তামিল বৈষ্ণব কবি নম্মাড়বার দেহস্থ অন্তরাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—তুমি ধন্য, আর তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য। কন্নড শৈব কবি বসবেশ্বর বলেন: তোমাকে দেখিয়া আমি অনন্ত পরম সুখ পাইলাম। তোমার দর্শন, তোমার সংস্পর্শ অন্তহীন আনন্দের উৎস। ঈশ্বর লাভের মত্ততায় কন্নড বৈষ্ণব কবি পুরন্দর দাস বলিয়াছেন—'আমি পাগল হইয়াছি, পাগল হইয়াছি।' এই পাগল হওয়া যে কী তাহা ভক্ত ব্যতীত আর কে জানিতে পারে? তেলুগু কবি ত্যাগরাজের কণ্ঠে শোনা যায়—যখন তোমার দর্শন পাই নয়ন বাহিয়া আনন্দাশ্রু নামিয়া আসে। তোমার চরণ আলিঙ্গনকালে আমি আমার দেহসত্তা ভুলিয়া যাই। গুজরাতী ভক্ত নরসিংহ মহেতার একটি পদে আছে: সখি, আজিকার রজনী

আমার ধন্য হইল কারণ 'শামলিয়া' কৃষ্ণ কী মধুর খেলাই না খেলিতেছে! হে, সখি তোমরা সকলে মিলিয়া আনন্দে মঙ্গলগীত গাও। গুরু নানকের পদে পাই: যখন বর কৃপা করিয়া আমার গৃহে আসিল, সখীরা মিলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। এবং সেই খেলায় আমার মন আনন্দিত।

২৮৪. সর্বশেষে বলিতে চাই, ভক্তকবিদের উদ্দীপ্ত অভয় বাক্যই আমাদের যন্ত্রণাকাতর জীবনের পরম আশার বাণী। আধুনিক কবি যে-ভঙ্গীতে আমাদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই', এই সমস্ত প্রাচীন কবিদের কণ্ঠেও আমরা অনুরূপ আশ্বাস বাণী শুনিতে পাই। ইঁহারা হয়ত আধুনিক জীবন-বোধে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের বাণী আধুনিক যুগের বঞ্চিত মানুষের মনে যথার্থ বল সঞ্চার করে, "দিনযাপনের আর প্রাণধারণের গ্লানি" হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া তাহাদের দিবারাত্রির মূল্য বাড়াইয়া দেয়। তামিল শৈব কবি সুন্দরর্ ভক্তজনের স্বাভাবিক দৈন্য বোধের পরিবর্তে অনেকটা যেন সদম্ভেই ঘোষণা করেন: আমরা কাহারও অনুগত নই, যমরাজকেও আমরা ভয় করি না। আমরা রহিব সদা প্রসন্ন, রোগ থাকিবে অনেক দূরে। কাহারও নিকট আমরা নতিস্বীকার করিব না। দুঃখ আমাদের কিছু নাই, আমরা যে সদানন্দ। তামিল বৈষ্ণব কবি নম্‌মাড়বার এই সুরে অনেক গান গাহিয়াছেন—জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক। মানব-জীবনের নিষ্ঠুর অভিশাপ চলিয়া গেল। নরকের দুঃখকষ্টও বিনষ্ট হইল। এই পৃথিবীতে যমরাজের আর কিছু করিবার নাই। কন্নড বৈষ্ণব কবি ব্যাসরায়ের একটি পদে শুনিতে পাই: এখন আমি জগদীশ্বরে পৌঁছিয়াছি, পৌঁছিয়াছি। নরকের ভয় আর কিছুমাত্র নাই। আমার চোখ দেখিতেছে কৃষ্ণের মূর্তি, কান শুনিতেছে তাঁহার কথা। ত্যাগরাজ বলিয়াছেন: জগৎ জুড়িয়া একটি নাট্যাভিনয় চলিতেছে, আর সেই নাটকের সূত্রধার

তুমি। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত। কারারুদ্ধ গুরু অর্জুন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—আমার ভ্রমের ডিম ভাঙিয়া গেল, মন আলোকিত হইল, গুরু আমার পায়ের বেড়ি কাটিয়া দিয়া বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

২৮৫. বিপুল দেশ ও কালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত যে ভক্তিসাহিত্যের কথা বলা হইল তাহার ভাব ও রূপ যে সর্বতোভাবে এক ও অভিন্ন তাহা নয়। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বে যদি বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও কালের মধ্যেও যে স্বাতন্ত্র্য থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। ভক্তিধর্মের ইতিহাসেও আমরা সেই স্থানগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। এক প্রদেশের ভক্তিসাধনা অন্য প্রদেশকে উদ্বুদ্ধ করিলেও তুই-এর সাধনা ঠিক এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে আমরা তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। তামিল ও বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাবগত ঐক্য যেমন আছে, পার্থক্যও সেইরূপ কম নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে নায়িকা-ভাবের সাধনায় নায়ক কেবল বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ; তামিল বৈষ্ণবসাহিত্য শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত পাওয়া যায় নারায়ণ, রাম, শ্রীরঙ্গনাথ, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রভৃতি নাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে মুখ্য নায়িকা রাধা; তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা নাই, আছেন শ্রীদেবী, ভূদেবী ও নীলা দেবী (নপ্পিনৈ)। আধুনিক কালের শ্রীবৈষ্ণব আচার্যগণ অবশ্য রাধাকে নীলাদেবীর অবতার বলিয়া বিবেচনা করেন। তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন নায়িকার মাতার আক্ষেপ, বিলাপ প্রভৃতি পাওয়া যায় (দ্র° ৬৫) অন্যত্র তাহা দুর্লভ। এই সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যাপার নায়িকা কর্তৃক 'মডল্' গ্রহণ। ইহা নায়কের প্রতি নায়িকার প্রণয়রোষজনিত অভিমান। প্রাচীন তামিলনাড়ে প্রচলিত একটি সামাজিক প্রথা হইতে ইহা শৈব-বৈষ্ণব উভয় সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোল্‌কাপ্পিয়ম্-এ 'মডল্'-এর উল্লেখ আছে কি না জানি না। 'তিরুক্কুরল্' গ্রন্থের ১১৩১ সং শ্লোকে বলা হইয়াছে

—'প্রিয় ব্যক্তি হইতে দূরে থাকিয়া যাহারা বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করে, 'মডল্‌' গ্রহণ ছাড়া তাহাদের আর অন্য উপায় নাই।' স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষে ইহা গ্রহণীয়। ভক্তিসাহিত্যে কেবল নায়িকার 'মডল্‌'-গ্রহণ আছে বলিয়া আমরা সেইটুকুর উল্লেখ করিতেছি। উপেক্ষিতা নায়িকা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একখানি 'মডল্‌' অর্থাৎ তালপত্র হাতে লইয়া রুক্ষ দেহে আলুথালু কেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। বিরহিণীর এই বিচিত্র কার্যকলাপে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিত না যে, সে নায়ক কর্তৃক পরিত্যক্তা এবং পুনর্মিলনের জন্য নায়কের প্রতি রোষ বশত তাহার এইরূপ আচরণ। তখন নায়কের বন্ধুগণ অথবা নায়িকার সখীগণ মিলন ঘটাইয়া দিত, অথবা অপবাদের ভয়ে নায়ক নিজে আসিয়া নায়িকার সহিত মিলিত হইত। নায়িকাভাবাপন্ন বৈষ্ণবকবিগণ যখন ভগবানের কাছে সকল প্রকার প্রার্থনা ও অনুরোধ জানাইয়াও তাঁহার সঙ্গলাভে ব্যর্থ হন, তখন ধৈর্যহীনা নায়িকার (নায়িকাভাবাপন্ন কবির) শেষ অস্ত্র হইল মডল্‌-গ্রহণ। কবি তখন ভয় দেখাইয়া বলেন, "তুমি যদি না দেখা দাও তবে আমি মডল্‌ গ্রহণ করিব। তাহাতে কি তোমার গৌরব বাড়িবে?" বলা বাহুল্য ভগবান এই প্রেমাতিশয্যে সন্তুষ্ট হইয়া নায়িকার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হন।[১]

কন্নড বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে মধুর ভাব থাকিলেও রাধা নাই, বাৎসল্য ভাব থাকিলেও যশোদা নাই, সখ্যভাব থাকিলেও গোপবালক অনুপস্থিত। 'অনুভাবী' অর্থাৎ ভক্তই স্বয়ং রাধা, যশোদা অথবা গোপবালক। কন্নড সাহিত্যের এই রীতি রাধা-কৃষ্ণ-গোপ-গোপীলীলায় অভ্যস্ত বাঙালী, হিন্দী ও গুজরাতী মানসে বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে। পক্ষান্তরে কন্নডিগ আচার্যবৃন্দ মনে করেন যে, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে তৃতীয় কাহারও উপস্থিতি ভক্তিভাবের শৈথিল্য সূচিত করে। কন্নড

১ শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস—আড়বার পৃ ১৪৬-১৪৭

অনুভাবী সাহিত্যে গোপীদের উল্লেখ করা হইয়াছে ভক্তচিত্তের ঈর্ষ্যা বুঝাইবার জন্য। ভাবখানা এই যে, গোপীরা যে সৌভাগ্যের অধিকারী হইল আমার তাহা জুটিল না।

পক্ষান্তরে গোপীভাব ও রাধাভাব বাঙ্‌লার ধর্ম ও সাহিত্যের উপর যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও ঠিক সেইরূপ দেখা যায় না। রাধা-ভাবের পরকীয়া তত্ত্ব বাঙ্‌লা দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য। তামিল বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে মহিলা কবি আণ্ডালের সমস্ত ভাবনা নায়িকা-ভাব-বিশিষ্ট সন্দেহ নাই এবং কুলশেখর, তিরুমঙ্গৈ ও নম্মাড়বার এই তিনজন পুরুষ কবির ভাবনাও বহুস্থলে নায়িকাভাবাপন্ন। তাঁহাদের এই নায়িকাভাবের আধিক্যের জন্য শ্রীবৈষ্ণব সমাজে তাঁহারা 'নায়িকা' নামেও পরিচিত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো আড়বার কবিদের নায়িকা-চিন্তা পরকীয়াবাদে আচ্ছন্ন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নায়িকা স্বকীয়া, অল্পক্ষেত্রেই পরকীয়া ভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও হয়ত প্রথম দিকে পরকীয়াবাদকে গ্রহণ করিতে চায় নাই। রূপগোস্বামী এবং বিশেষভাবে জীব গোস্বামী পরকীয়াবাদকে অস্বীকার করিয়া পরম স্বকীয়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরম স্বকীয়াতেই রাধাপ্রেমের চরমোৎকর্ষ।[১] কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঙ্‌লা দেশে সহজিয়া মতের প্রাবল্যের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের মধ্যে পরকীয়াবাদ প্রাধান্য লাভ করে।[২]

২৮৬. এইভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেরূপ স্থানিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় সেইরূপ সমগ্র ভারতবর্ষ মিলাইয়া একটি দেশগত বৈশিষ্ট্যও আছে। সেই বৈশিষ্ট্য যেমন বিশেষ কোনো কালে স্পষ্টরূপে দেখা দেয়, আবার বিচার করিয়া দেখিলে

---

১ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত—শ্রী রাধার ক্রমবিকাশ পৃ ২৩০-২৩১

২ ঐ পৃ ২৬৩-২৬৪

কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল কালের মধ্য দিয়াই সেই দেশগত বিশেষত্বের প্রকাশ ঘটিতেছে। রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন—"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম।... বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসংগতির সাধনাই হল ভারতের বিশেষ সাধনা।[১] ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয় রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[২] ভক্তিধর্ম ও ভক্তিসাহিত্যের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আমরা ভারতীয় সভ্যতার এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই কতক-পরিমাণে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিভিন্ন কালে ভারতবর্ষে যে নানা শ্রেণীর মানুষ বাহির হইতে আসিয়া এখানে বসতি বিস্তার করিল তাহাদের সাক্ষাৎ, সংঘর্ষ, সদ্‌ভাব ও সামঞ্জস্যের কাহিনী ভক্তিধর্মেও প্রতিফলিত। ভেদ-জর্জর ভারতবর্ষে সামঞ্জস্য কতটা হইয়াছে সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। যুগে যুগে ভক্ত সাধকবৃন্দ সাম্য ও অভেদের বাণী উচ্চারণ করিয়া কি সাম্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছেন?

২৮৭. খোলা মন লইয়া আমরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইব। আমাদের যাবতীয় আলোচনায় এই কথাটি অস্পষ্ট থাকে নাই যে ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা বিরুদ্ধ জাতির পুনঃ পুনঃ সংঘাতে অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে; জটিলতা সমধিক বলিয়া সুদীর্ঘ ইতিহাসেও তাহার সুস্থ সমাধান হয় নাই। শ্রেণী হিসাবে উচ্চতর শ্রেণীগুলিই যে বার বার এই সমাধানের

১ ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত "বাঙলার সাধনা" গ্রন্থের নিবেদন দ্রষ্টব্য।

২ রবীন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষের ইতিহাস

পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, সমস্ত বিরোধ-সংঘাতের অবসানে সম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মণই বার বার প্রাধান্যলাভে সমর্থ হয়। ইহা তাহাদের বিশেষ ধী-শক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আর চাতুর্য ব্যতীত যে ধী-শক্তির প্রকৃত স্ফূর্তি ঘটিতে পারে না ব্রাহ্মণ্য ইতিহাসে তাহারও নিদর্শন রহিয়াছে। ধরা যাক রামচন্দ্রের কথা। (এখানে আমরা রবীন্দ্র-বিশ্লেষণের শরণাপন্ন হইলাম)। ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ সমাজ রামায়ণের উত্তর কাণ্ড লিখিতে বসিয়া প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা রামচন্দ্রের এই আশ্চর্য উদারতাপূর্ণ চরিত্রমাহাত্ম্যকে বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে। শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজ-রক্ষকের দল রামচন্দ্রের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। উত্তরকাণ্ডের সীতা-নির্বাসনও এইরূপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল কাহিনী। যে সীতাকে রাম সুখেদুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, অনার্য-স্পৃষ্টা সেই রমণীকে বর্জন না করিলে সমাজের প্রতি যে কর্তব্য পালিত হয় না। এইভাবে যে-রামচরিত্রের মধ্যে একটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল, পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে সামাজিক আচার রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে (আর্যজাতিকে) বিদ্বেষের সঙ্কোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মতো বরণীয় হইয়াছিলেন সে-কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। একদিন সমাজে

যিনি গতির পক্ষে বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর এই কৌশল সত্ত্বেও সাধারণ ভারতবর্ষ একথা ভুলিতে পারে নাই যে, তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা ও বিভীষণের বন্ধু ছিলেন।

২৮৮. অনার্যদের সহিত বিরোধের দিনে যাঁহারা আর্য সমাজে বীর ছিলেন তাঁহাদের অপেক্ষা অনার্যদের সহিত আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই স্মরণীয়। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে যাঁহারা অবতার-রূপে অধিষ্ঠিত তাঁহারা বিদ্বেষ-মন্ত্র জপ করেন নাই, ভালোবাসার বাণী প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় হইয়াও তাঁহারা শান্তির দূত। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও বুদ্ধের সেই গৌরবময় ধারা প্রাচীন যুগেই শেষ হইয়া যায় নাই। পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতব্যাপী যে বিরাট ভক্তি-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারও মূলমন্ত্র—প্রেম; লক্ষ্য—সর্বশ্রেণীর মিলন। আর এই ভক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্বের আসরে কেবল ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্যন্ত সকল শ্রেণীর সাধকই দেখা দিয়াছেন। ইঁহারা কেবল সাধক নন, যোদ্ধাও বটে। জড়ত্বের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তাঁহাদের চিত্ত বরাবর যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম, তাহার ভক্তিধর্ম—সমস্তই এই মহাযুদ্ধের জয়লব্ধ সামগ্রী। তাহার শ্রীকৃষ্ণ, তাহার শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধ ও মধ্যযুগীয় সাধকবৃন্দ এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক। সেই যুদ্ধের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। আধুনিক ভারতবর্ষকে 'সবার পরশে পবিত্র-করা' তীর্থক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার যে আয়োজন চলিতেছে, ভারতীয় ভক্তিধর্ম ও ভক্তিসাহিত্য তাহারই পৃষ্ঠভূমি।

পরিশিষ্ট—১

মহাশাস্তা

উত্তর ভারতে শাস্তা বা মহাশাস্তা অপরিচিত দেবতা হইলেও দক্ষিণের তাঞ্জোর ও তিরুনেল্‌বেলি জেলায় এবং বিশেষভাবে কেরল অঞ্চলে ইঁহার যথেষ্ট সমাদর। স্থানীয়ভাবে ইনি অয়্যনার্, অয়প্পন্ প্রভৃতি নামেও পরিচিত। কিন্তু ইঁহার সবচেয়ে বড় পরিচয়—ইনি শিব ও বিষ্ণুর পুত্র। তাই ইঁহার নামান্তর 'হরিহরপুত্রন্'। দাক্ষিণাত্যে ইঁহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তাহার বিবরণ রহিয়াছে।

বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি ধারণের কথা শ্রবণ করিয়া শিব বলিলেন, আমি তোমার সেই মোহন রূপ দেখিতে চাই—

যদ্রূপং ভবতোপাত্তং তন্মহ্যং সংপ্রদর্শয় ॥
দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপং শৃঙ্গারস্যাধিদৈবতম্।
অবশ্যং দর্শনীয়ং মে ত্বং হি প্রার্থিতকামধুক ॥
ইতি সংপ্রার্থিতঃ শশ্বন্ মহাদেবেন তেন সঃ।
যদ্ধ্যানবৈভবাল্লব্ধং রূপং তদ্দর্শয়ন্ ॥...
তামিমাং কন্দুকক্রীড়ালোলামলোলভূষণাম্।
দৃষ্ট্বা ক্ষিপ্রং উমাং ত্যক্ত্বা সোঽন্বধাবদথেশ্বরঃ ॥
উমাপি তং সমাবেক্ষ্য ধাবন্তং চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
স্বাত্মানং স্বাত্মসৌন্দর্যং নিন্দতী চাতিবিস্মিতা ॥
তস্থাববাঙ্‌মুখী তূষ্ণীং লজ্জাসূয়াসমন্বিতা ॥
গৃহীত্বা কথমপ্যেনামালিলিঙ্গ মুহুর্মুহুঃ।
উদ্ধূয়োদ্ধূয় সাপ্যেবং ধাবতি স্ম সুদূরতঃ ॥
পুনর্গৃহীত্বা তামীশঃ কামং কামবশীকৃতঃ।
আশ্লিষ্টং চাতিবেগেন তদ্বীর্যং প্রচ্যুতং তদা ॥
ততঃ সমুত্থিতো দেবো মহাশাস্তা মহাবলঃ।
অনেককোটিদৈত্যেন্দ্রগর্বনির্বাপণক্ষমঃ ॥

(৪।১০।৪৬–৪৮, ৭১-৭৫)

এইভাবে শাস্তা বা মহাশাস্তার উৎপত্তি হইল। পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে কেরলে প্রচলিত কিংবদন্তী এইরূপ : মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত পন্দলম্ নামক অঞ্চলের নিঃসন্তান রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়া পিতামাতার পরিত্যক্ত এই শিশুকে দেখিতে পান এবং তাহাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিয়া পুত্ররূপে পালন করিতে থাকেন। বালকের নানাবিধ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া রাজা খুবই বিস্মিত হইলেন এবং রাজ্য, রানী, পাত্রমিত্র সব ভুলিয়া গিয়া দিনে দিনে সেই বালকের উপর তাঁহার সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া দিলেন।

শাস্তার আদর ও প্রভাব দেখিয়া রাণীর আর সহ্য হইল না। মন্ত্রীও ভ্রূকুঞ্চন করিলেন। রাজ্যের চিকিৎসক প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকের ভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল। কিছুদিন ধরিয়া রাজার অগোচরে ষড়যন্ত্র চলিবার পর অকস্মাৎ একদিন শোনা গেল, কঠিন পীড়ায় রানী শয্যাগত। রাজা খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসক রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিল, মহারানীকে বাঁচাইতে হইলে যে জিনিসটি অত্যাবশ্যক তাহা হইল 'পুলিপাল্' অর্থাৎ বাঘের দুধ।

কিন্তু কাহার এমন শক্তি আছে যে, ব্যাঘ্রদুগ্ধ দোহন করিয়া আনিবে। আলোচনা-প্রসঙ্গে শাস্তার নাম উঠিল। কিন্তু রাজা কোন্ প্রাণে তাঁহার প্রাণাধিক পালিত পুত্রকে বাঘের মুখে পাঠাইবেন? ব্যাপার শুনিয়া শাস্তা নিজেই বাঘের দুধ আনিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শ্বাপদ-সংকুল বনের অভিমুখে রওনা হইল। পুরবাসীরা যখন তাহার মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় নিঃসংশয়, তখন অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদ হইতে দেখা গেল বহুদূরে অরণ্যের যাবতীয় হিংস্র পশুর এক বিরাট বাহিনী নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, আর তাহাদের সম্মুখভাগে বাঘের পিঠে বসিয়া আছে শাস্তা। মন্ত্রীর টনক নড়িল, চিকিৎসক প্রমাদ গণিলেন এবং রানী কঠিন পীড়া ভালো হইতে এক মুহূর্তও লাগিল না। নগরময় ছুটাছুটি, চিৎকার ও আর্তনাদ। অবশেষে মহারাজের অনুরোধে শাস্তা তাহার পশু-বাহিনীকে বনে পাঠাইয়া দেয়।

এইভাবে রাজ্যে তাহার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু সে আর নগরে থাকিতে চাহিল না। পিতাকে বলিল নির্জন অরণ্যে তাহার জন্য একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে। দক্ষিণ কেরলের কোল্লম্ (Qulion) জিলার 'শবরীমলৈ' অর্থাৎ শবরী পর্বতে তাহার বাসস্থানের ব্যবস্থা হইল। স্মরণাতীত কাল হইতে কেরলের এই শবরীগিরিতে প্রতিবৎসর 'বৃশ্চিক'

(অগ্রহায়ণ) মাসে মহাসমারোহে শাস্তা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে কেরলের বেতার-কেন্দ্র সমূহ হইতেও এই অনুষ্ঠান-প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

শাস্তা সম্পর্কে যে-সকল গান প্রচলিত তাহাতে তাহাকে বিশ্বমোহিনীপুত্র, ধূর্জটিসুত, মায়ামোহিনীসুত, মাধব-শঙ্করসুত, হরিহরতনয় ইত্যাদি বলা হইয়াছে। কেহ কেহ 'অয়প্পন্' নামের ব্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গে বলেন—অয়ন্ (বিষ্ণু)+অপ্পন্ (শিব)=অয়প্পন্। এই দেবতার বর্ণনায় বলা হইয়াছে—তাহার কেশ দীর্ঘ ও কুঞ্চিত, মাথায় কিরীট, কানে স্বর্ণকুণ্ডল, দুই হাতে তীরধনু, বটবৃক্ষের নীচে সিংহাসনে উপবিষ্ট।[১] শাস্তার প্রাচীনতা সম্পর্কে বলা যায়, মহাবলিপুরম্-এ সপ্তম শতাব্দীর যে ভাস্কর্যের নিদর্শন রহিয়াছে তন্মধ্যে একটি হইল হরিহরমূর্তি—যাহার ডান দিক শুভ্র, বাম অংশ নীলবর্ণ।[২] শাস্তা বা অয়প্পন্ মূলে হয়তো একটি গ্রাম্য দেবতা। উত্তরকালে শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য হরিহরপুত্র রূপে তাহার কল্পনা হইয়া থাকিবে। ইহা এক প্রকার আর্যদ্রাবিড়ের মিলন-সাধনের প্রতীক বলিয়াও গণ্য হইতে পারে।

পরিশিষ্ট—২

মুরুগন্

দাক্ষিণাত্যের, বিশেষভাবে তামিলনাড়ের, একটি প্রিয় দেবতা হইল মুরুগন্। 'মুরুকু' (সৌন্দর্য, যৌবন) আছে যাহার—এই অর্থে মুরুকু+অন্=মুরুকন্> মুরুগন্। কন্দন্ (স্কন্দ), বেলন্ বা বেলায়ুধন্ (বল্লমধারী), গুহন্ (গুহাবাসী), কুমার, কুমারস্বামী, সুব্রহ্মণ্য, কার্ত্তিক, কার্ত্তিকেয়, আরুমুখন্ বা ষণ্মুখন্, মুরুগেশন্ ইত্যাদি নানা নামান্তরেও ইনি পরিচিত। তামিলভাষীরা সাধারণত শিশু মুরুগনের অনুরাগী। চিত্রাদিতে ও সন্তানের নামকরণে তাই (বালকৃষ্ণ বা বালগোপালের ন্যায়) 'বাল সুব্রহ্মণ্যম্' কথাটির খুব প্রচলন। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে যেমন প্রেম ও বীরত্বের প্রতীক, মুরুগন্ও তাই। প্রাচীন ও আধুনিক তামিল সংগীতে মুরুগন্ শব্দটির বহুল ব্যবহার পাওয়া যায়। ত্যাগরাজ ও ভারতীর কণ্ঠেও মুরুগ-বন্দনা ধ্বনিত হইয়াছে।

(১) H. Krishna Sastri—South Indian images of gods and goddesses p.230

(২) Iconography of Southern India p. 26

তামিলনাডের 'ঐন্ তিনৈ' বা পঞ্চভূমির কল্পনায় মুরুগন্ হইলেন কুরিঞ্জি অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলের অধিষ্ঠাতা (দ্র° ২৬)। পর্বতের বর্ণনায় তোল্কাপ্পিয়ম্-এ বলা হইয়াছে—'চেয়োন্মেয় মৈবরৈয়ুলগম্' অর্থাৎ উজ্জ্বল দেব-অধিষ্ঠিত কৃষ্ণ (মেঘাচ্ছন্ন) পর্বত প্রদেশ। মুরুগন্ যুদ্ধদেবতা বলিয়া এবং পর্বতস্থিত দুর্গ হইতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া পরে হয়তো 'পঞ্চভূমি কল্পনা'র যুগে মুরুগন্ গিরি-দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। সাধারণভাবে পর্বতমাত্রেই মুরুগনের 'স্থল' বলিয়া গণ্য হইলেও তামিল গ্রন্থাদিতে ছয়টি বিশিষ্ট পর্বতে তাহার অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। (দেবতা 'ষণ্মুখ' বলিয়া কি তাহার ছয়টি বাসস্থানের কল্পনা?) এই ছয়টি পর্বতে 'পডৈবীডু' অর্থাৎ যুদ্ধ শিবির স্থাপন করিয়া প্রাচীন দ্রাবিড়গণ শত্রুপক্ষকে (আর্যপক্ষ?) বাধা দান করিত বলিয়া অনুমান হয়। পর্বত ছয়টি হইতেছে—১. তিরুপ্ পরম্ কুণ্ড্রম্ (মাদুরা শহর হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত)। ২. তিরুচ্ চীর্ অলৈবায়্ (বর্তমানে ইহা তিরুনেল্বেলি জিলার সমুদ্রতীরবর্তী 'তিরুচ্ চেন্দূর্' নামে পরিচিত)। ৩. তিরু আবিনন্ কুডি (বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ পলনি পর্বত)। ৪. তিরু এরগম্ (তাঞ্জোর শহর হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত বর্তমান 'স্বামিমলৈ')। ৫. কুণ্ড্রু তোরু আডল্। ৬. পড় (ফল) মুদির্ চোলৈ (নামান্তর—চোলৈমলৈ বা অলগর মলৈ, মাদুরার নিকটে অবস্থিত)।

তামিল সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ 'সংঘম্ সাহিত্যের যুগ' বলিয়া পরিচিত। এই যুগের অন্যতম সংগ্রহ-গ্রন্থ "পত্তুপ্ পাট্টু"র দশটি গাথা-কাব্যের অনেক স্থানে যুদ্ধদেবতা মুরুগনের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এই সংগ্রহ-গ্রন্থের অন্যতম রচনা "তিরু মুরুগাট্রুপ্পডৈ"[১] কেবল মুরুগন্‌কে লইয়া রচিত। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে কবি নক্কীরর্ যখন ৩১৭ পঙ্‌ক্তির এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করেন তখন দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় ও আর্য জাতির দেব-কল্পনায় সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নক্কীরর্-বর্ণিত মুরুগন্ আর তাই বিশুদ্ধ দ্রাবিড় দেবতা নন, কার্তিকের সঙ্গে অনেকটা একাত্ম হইয়া গিয়াছেন।

নক্কীররের গ্রন্থখানি ছয়টি পাহাড়ের নামানুসারে ছয়টি ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থের বিবরণ হইতে ম ন হয়, এই দ্রাবিড় যুদ্ধদেবতা সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র নয়;

(১) তিরু+মুরুগু+আট্রু+পডৈ=তিরু মুরুগাট্রুপ্পডৈ। কথাটির অর্থ, 'শ্রীমুরুগন্ দেবতার কাছে যাওয়ার পথ'।

'কুরব' অর্থাৎ ব্যাধ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষই হয়তো কালক্রমে তাহাদের রক্ষকদেবতার মর্যাদালাভ করেন। গ্রন্থে দেখা যায়, বল্লি নামক এক ব্যাধ-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ইন্দ্রকন্যা 'দেবযানৈ'। গ্রন্থের পঞ্চম (অর্থাৎ কুণ্ড্রু তোরাডল=গিরিনৃত্য) ভাগে মুরুগনের সম্মানে অনুষ্ঠিত দ্রাবিড়ভূমির 'কুরব' নৃত্যের বর্ণনা রহিয়াছে। কোথাও বলা হইয়াছে মুরুগনের মাতা 'কোট্রবৈ'—যিনি দ্রাবিড় ভূমির রণচণ্ডীরূপে বিরাজমান থাকিয়া পরে দুর্গার সহিত একাত্ম হইয়া যান। কোথাও আবার ('তিরুচ্ চীর্ অলৈবায়্' অধ্যায়) মুরুগনের বর্ণনায় ছয় মুখ ও বারো হাতের উল্লেখ রহিয়াছে। কতকাংশে আর্য-কল্পিত কার্ত্তিকের অনুরূপ। ছয়মুখের এক মুখ দিয়া তিনি আবার বৈদিক ব্রাহ্মণদের যজ্ঞরক্ষায় নিযুক্ত! তৃতীয় (তিরু আবিনন্ কুডি) অধ্যায়ে দেখা যায়, আর্যদেবতা ব্রহ্মার পক্ষ সমর্থনে মুরুগনের কাছে বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শিবের উপস্থিতি। চতুর্থ (তিরু এরগম) অধ্যায়ে আর্যব্রাহ্মণ ও তাহাদের ধর্মীয় জীবযাত্রার বিবরণ রহিয়াছে।

কাব্যরচনার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, কবি একবার এক দৈত্যের হাতে বন্দী হন। ইতিপূর্বে সেখানে ৯৯৯ জন হতভাগ্য ব্যক্তি বন্দী হইয়া বলির অপেক্ষা করিতেছিল। কবি আসিয়া হাজারের ঘর পূর্ণ করিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর দৈত্যের ভয়াবহ বাসনা চরিতার্থ হইবার পূর্বেই মুরুগন্ কবি নকীরের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং দৈত্যকে বধ করিয়া সহস্র বন্দীকে মুক্ত করেন।

সর্বকালের ন্যায় সেই প্রাচীন কালেও তামিল যুবক-যুবতীরা সাধারণ:দেবতার পূজা-অর্চনা অপেক্ষা প্রেমের দেবতার অধিক উপাসনা করিত। 'সংঘম্ সাহিত্যে' বর্ণিত প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে মুরুগনের যে-ভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা কিঞ্চিৎ কৌতুকপ্রদ। প্রাচীন তামিলীরা 'কলবু' (গোপন প্রেম) ও 'করপু' (প্রকাশ্য বা বিবাহিত প্রেম বা সতীধর্ম) এই দুই প্রকার প্রণয়ের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে 'কলবু' অনেকটা গান্ধর্ব বিবাহের তুল্য। এই গান্ধর্ব বিবাহ সর্বস্থলে ঘটিত না। উচ্চকুল সম্ভূত গুণান্বিত 'তলৈবন্' (অর্থাৎ নায়ক) এবং পার্বত্য অঞ্চলের কুমারী নায়িকা কোনো একটি নির্জন স্থলে সাক্ষাৎ করিয়া গোপন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই বিবাহের সাক্ষী থাকে নায়িকার 'উয়িরৃত্ তোলি' অর্থাৎ হৃদয়ের সখী। মিলনের কিছুকাল পরে নায়ককে দূরদেশে কার্যান্তরে চলিয়া যাইতে হয়। বিরহিণী নায়িকার অন্তরে দুশ্চিন্তার অন্ত নাই।

'আবার সে আসিবে তো? আমাকে ভালোবাসিবে তো? না কি অন্য কোনো রমণীর প্রেমাসক্ত হইয়া আমাকে ভুলিয়া যাইবে? পিতা মাতা তো আমাদের বিবাহের কথা জানেন না! তাঁহারা কি অন্যত্র আমার বিবাহের আয়োজন করিবেন? তবে তো আমার নারীমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে।'—এই সমস্ত দুশ্চিন্তায় নায়িকার চোখে ' নাই, মুখে অন্ন নাই, । নাই বিমূঢ়া। কন্যার দুরবস্থার কারণ বুঝিতে না পারিয়া পিতামাতা মুরুগনের পূজারীকে ডাকিয়া পাঠায়। পূজারীর স্কন্ধে তখন স্বয়ং দেবতা (মুরুগন্) আসিয়া ভর করেন। তখন পূজারীই দেবতা। নায়িকার ব্যাপার দেখিয়া সে বলে—'তোমাদের কন্যাকে ভূতে ধরিয়াছে।' ভূত ছাড়াইবার উদ্যোগ হইলে সখী আসিয়া বাধা দেয়। নায়িকার মাতা বাধা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সখী সমস্ত কথা খুলিয়া বলে—আমি ও আমার সখী একদিন পুষ্পচয়নের জন্য বনে গিয়াছি, এমন সময়ে বৃষ্টি নামিল। জলের প্লাবনে আমরা ভাসিয়া যাই, তখন কোথা হইতে এক বীর্যবান্ সুপুরুষ আসিয়া আমাদের রক্ষা করে। সেই হইতে সখী তাহার চিন্তায় মগ্ন।[১] অতঃপর সখী মুরুগন্-আবিষ্ট পূজারীকে সম্বোধন করিয়া বলে—

কডবুল্ আয়িনুমাক মডবৈ মণ্ড্র, বালিয় মুরুগে।

'তুমি দেবতা হইলেও হইতে পার কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই মূর্খ। তথাপি হে মুরুগ, তুমি দীর্ঘজীবী হও'। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য এই যে, সখী কষ্ট পাইতেছে ভালোবাসিয়া, দেবতা তাহার কিছুই না জানিয়া মূর্খের মতো একটি মত প্রকাশ করিয়া বসিল। কিন্তু দেবতার অভিশাপে পাছে নায়িকার কোনরূপ অনিষ্ট হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সখী তাহাকে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া তুষ্ট করিবারও চেষ্টা করিল।[২]

মুরুগন্ প্রসঙ্গে প্রাচীন কবি নক্কীরের পরে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি ষোড়শ শতকের অরুণগিরিনাথর্ (সংক্ষেপে অরুণগিরি)। ১৩৬৭ স্তবক সমন্বিত 'তিরুপ্‌পুকড়্' কাব্যে কবি তাঁহার উপাস্য দেবতার স্তুতিবন্দনা ও

---

(১) নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ অন্যরূপও আছে। যেমন, হাতী আসিয়া তাড়া করিলে নায়ক নায়িকাকে রক্ষা করে, অথবা নায়িকা উঁচু ডালের ফুল তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে থাকিলে নায়ক আসিয়া তাহাকে উঁচে তুলিয়া ধরে ইত্যাদি।

(২) এই প্রসঙ্গটি প্রসিদ্ধ তামিল পণ্ডিত উ. বে. স্বামিনাথয়্যর্ প্রণীত 'সঙ্গত্ তমিলুম্ পিন্‌কালত্ তমিলুম্' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

তাঁহার নিকট নিবেদন-প্রার্থনার কথা বলিয়াছেন। বর্তমানে অনেক স্থলে সুব্রহ্মণ্য (মুরুগন্) মূর্তির ডানদিকে নক্কীরর্ এবং বাঁ দিকে অরুণগিরির মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে হয়তো সমস্ত পর্বতেই মন্দির ছিল। আজকাল মন্দির না থাকিলেও সেই বিলীন বা বিলীয়মান মন্দিরের সংলগ্ন দেবতার পুকুর রহিয়াছে। তামিলে ইহার নাম 'কোনেরি'<কুকনেরি<কুকন্+এরি=গুহন্+এরি =কার্তিক পুকুর।

পরিশিষ্ট—৩

দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্মে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব আছে বলিয়া কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, পৃথিবীতে দয়া, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর প্রথম প্রচার করেন যীশু খ্রীষ্ট, দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টপন্থীদের ধর্ম প্রচারের ফলে অতি প্রাচীনকালেই ভারতের হিন্দু সাধকবৃন্দ এই সমস্ত সদ্গুণ অনুশীলনের সুযোগ পায় এবং পরবর্তীকালের ভক্তিধর্মে তাহারই প্রকাশ।

ভারতে খ্রীষ্টধর্মের প্রথম প্রচার সম্পর্কে এই একটি মত প্রচলিত যে, আজ হইতে ১৯০৬ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫৭ অব্দে সেণ্ট টমাস (পোর্তুগীজ নাম San Thome) নামক জনৈক য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান সমুদ্রপথে আসিয়া মালাবার উপকূলে অবতীর্ণ হন। কথিত আছে, তিনি ত্রিবাঙ্কুরের অনেক নম্বূতিরি ব্রাহ্মণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া সেখানে সাতটি গির্জা স্থাপন করেন। পরে পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া বর্তমান মদ্রাস শহরের ময়িলাপুর অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। টমাস তৎকালীন মদ্রাস-অধিপতি নরসিংহের রাজ্যে অনেকদিন ধরিয়া প্রচারকার্য চালাইলেও প্রথমদিকে ব্রাহ্মণদের বিরোধিতায় তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। উপাসনা মন্দিরের জন্য টমাস রাজার কাছে একখণ্ড জমি প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণদের বিরোধিতায় সে প্রার্থনাও নামঞ্জুর করা হয়। অবশেষে টমাস এক অলৌকিক শক্তিবলে রাজাকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করিয়া উপাসনা মন্দিরের জমি সংগ্রহ করেন। তখন যাহারা রাজসভায় উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই শ্রদ্ধানত হৃদয়ে টমাসের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। জনসাধারণের চোখে এইভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ টমাসের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে এবং অবশেষে তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ময়িলাপুরে টমাস নিহত হন।

অনেক প্রাচ্য এবং কতিপয় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টমাসের এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া মনে করেন। বস্তুত এই ঘটনা লইয়া পক্ষে-বিপক্ষে এত আলোচনা-প্রত্যালোচনা হইয়াছে যে এ সম্পর্কে আমাদের পক্ষে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কঠিন। বর্তমান কেরল অঞ্চলে ২৩ লক্ষেরও অধিক খ্রীষ্টান অধিবাসীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট দলকে পুরুষ-পরম্পরায় 'টমাসের খ্রীষ্টান'রূপে অভিহিত করা, ময়িলাপুরে টমাসের স্মৃতি-জড়িত গির্জার প্রতিষ্ঠা, দূর দূরান্তর হইতে টমাসের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য মলিয়াপুর অভিমুখে খ্রীষ্টানদের তীর্থযাত্রা, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমারোহে টমাসের ভারতে শুভ পদার্পণের ১৯০০ তম বার্ষিক উৎসব পালন করা প্রভৃতি ঘটনাগুলি একসঙ্গে বিবেচনা করিলে টমাসের ঐতিহাসিকতাকে এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

আমাদের বক্তব্য এই যে, টমাসের ভারত অভিযান সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেই কি ভারতীয় ভক্তিধর্মের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ভারতীয় ভক্তিসাধনা টমাসের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, বিশুদ্ধ অনুমান ছাড়া তাহার আর কোনো প্রমাণ নাই। এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে ভক্তিধর্মের উন্মেষ, ক্রমবিকাশ, অবক্ষয় ও উজ্জীবন সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছে।তাহাতে আমরা ভারতীয় ভক্তিধর্মের একটা নিজস্ব ধারা লক্ষ্য করিয়াছি। বিচিত্র ধর্মসংঘর্ষে যুগে যুগে তাহার গতি-পরিবর্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই গতিপথে খ্রীষ্টধর্মের ধারাকে স্বীকার করিবার মতো কোনো ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে নাই। এই ধারা ভারতীয় মূল ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অথচ মিশনারী লেখকবৃন্দ যখনই সুযোগ পাইয়াছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে কৌশল উদ্ভাবনের ত্রুটি করেন নাই। ভারতীয় ভক্তিসাধনায় খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব-অনুমানও সেইরূপ একটি কৌশল। জাতি ও ধর্মের গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ বিচারের সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, রেভারেণ্ড জি. ইউ. পোপের ন্যায় তামিল পণ্ডিতও সংস্কারমুক্ত হইয়া বিষয়টি বিবেচনা করেন নাই। মলিয়াপুরে যাহারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় তাহাদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিয়া দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দুসন্তানগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছেন এইরূপ কল্পনা তাঁহার পক্ষেও অসঙ্গত বোধ হয় নাই।[১]

(১) V. V. S. Aiyar—The Kural, Preface.

পরিশিষ্ট—৪

একটি শব্দ

ভক্তি সাহিত্যে শব্দতত্ত্ব আলোচনার অবকাশ নাই। পরিশিষ্টে একটি কথা বলিতে হইল। জনৈক শব্দ-পাগল বন্ধু 'প্যাণ্ডেল' (pandal) কথাটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে ভারতীয় ইংরেজী রূপে ইহার বহুল প্রচলন থাকিলেও ইংরেজী অভিধানে শব্দটি অনুপস্থিত।

'প্যাণ্ডেল' শব্দটির মূল কী জানি না। তবে প্রাচীন তামিলে 'পন্দল্'-রূপে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। তামিল মহিলা কবি আণ্ডালের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্লোকটির অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে (দ্র° পৃ ১৩২)। মূল অংশটি এইরূপ—

মত্তলম্ কোট্ট বরিশঙ্খম্ নিণ্ড্রূদ
মুত্তুডৈত্ তাম নিরৈ তাল্দ **পন্দল্** কীল্
মৈত্তুনন্ নম্বি মধুসূদন বন্দু এন্নৈক্
কৈত্তলম্ পট্রক্ কনাক্কণ্ডেন্ তোলি নান্।

শুদ্ধ সংস্কৃতবাদীর মন লইয়া বাংলা অনুবাদে 'পন্দল্' না লিখিয়া 'চন্দ্রাতপ' লিখিয়াছি। এই তামিল শব্দটি কিভাবে সর্বভারতে ব্যাপ্ত হইল জানি না। অনুমান করি দক্ষিণ ভারতীয় ইংরেজদের দ্বারা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই 'পন্দল্'-এর দন্ত্যবর্ণ 'দ' বাংলা প্রভৃতি ভাষায় মূর্ধন্য 'ড' হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী

Genealogy of the South Indian gods, Bartholomaeus Ziegenbalg, 1869
The Folk songs of Southern India, C. E. Gover, 1871
Thiruvacagam, G. U. Pope, 1900
Christianity in Travancore, G. T. Mackenzie, 1901
The holy lives of the Azhvars, A. Govindacharya, 1902
The Divine wisdom of the Dravidian Saints, Do. 1902
India and the Apostle Thomas, A. E. Medly Colt, 1905
Vedic Concordance, Maurice Bloomfield, 1906
The religion of the Veda, Maurice Bloomfield, 1908
The Sikh Religion, M. A. Macauliffe, 1909
A Classical Dictionary of Hindu Mythology etc, 1913
Vaishnavism, Saivism and minor religious systems, R. G. Bhandarkar, 1913
A History of Kanarese Literature, Edward P. Rice, 1915
Footfalls of Indian History, Sister Nivedita, 1915
South Indian images of gods, H. Krishna Sastri, 1916
The History of Kathiawad, H. Wilberforce Bell, 1916
The History of Aryan Rule in India, E. B. Havell, 1918
Psalms of the Marathi Saints, Nicol Macnincol, 1919
An outline of the religious Literature of India, J. N. Farquhar, 1920
Studies in honor of Maurice Bloomfield, 1920
Early history of Vaishnavism in South India, S. K. Aiyangar, 1920
Materials for the study of the early history of the Vaishnava Seet, H. C. Ray chaudhury, 1920
Theism in Mediaeval India, J. Estlin Carpenter, 1921
Hymns of Tamil Saivite Saints, F. Kingsbury, 1921
Some contributions of South India to Indian Culture, S. Krishnaswami Aiyangar, 1923
The Dravidian element in Indian culture, G. Slater, 1924

The Religion and Philosopy of the Veda and Upanishads,
A. B. Keith, 1925
A History of Indian Literature M. Winternitz, 1927
The Maratha Rajas of Tanjore, K. R. Subramanian, 1928
The origin of Saivism and its history in the Tamil land,
K. R. Subramanian, 1929
Hymns of the Alvars, J. S. M. Hooper, 1929
History of Kerala (Vol. II). K. P. P. Menon, 1929
A History of Telugu Literature. P Chenchiah, 1930
The chronology of the early Tamils, K. N. Pillai, 1932
Mysticism in Maharashtra,R. D. Ranade. 1933
Studies in Tamil literature, V. R. R. Diskshitar, 1936
Inconography of Southern India, Jouvean-Dubreuil, 1937
Popular Culture in Karnataka, M. V. Iyengar, 1937
Panjabi Sufi poets, Lajwanti Rama Krishna, 1938
Mystic Teachings of the Haridasas of Karnataka, A. P.
Karmarkar and N. B. Kalamdani, 1939
Ezuttaccan and his age, C. A. Menon, 1940
History of Kannada Literature, Narasinhacharya, 1940
Sources of Karnataka History, S. Srikantha Sastri, 1940
Songs of Bullah, Atam Singh, 1940
A History of Tirupati (vol. II), S. K. Ayangar, 1941
A Handbook of Virasaivism, S. C. Nandimath, 1942
The Nayakas of Tanjore, V. Vriddhagirisam, 1942
Early history of the Vaishnava faith and movement in
Bengal, S. K. De, 1942
Telugu Literature, P. T. Raju, 1944
Obscure religions cults, S. B. Das Gupta, 1946
Pattupattu (Ten Tamil Idylls), J. V. Chelliah, 1946
The Heritage of Karnataka, R. S. Mugali, 1946
Five Tamil Idylls, J. M. Somasundaram Pillai, 1947
Cultural history of Karnataka A. P. Karmarkar, 1947
Early Indus civilizations (2nd ed.), Ernest Mackay, 1948
Saiva Siddhanta, G. Subramania Pillai, 1948
The Bhagavadgita (2nd ed.) S. Radhakrishnan, 1949
Kamba Ramayanam—a Study, V. V. S. Aiyar, 1950

The Religions of India (vol. I) A. P. Karmarkar, 1950
Great Composers (Book I), P. Sambamoorthy, 1950
The Kural (3rd. edition), V. V. S. Aiyar, 1952
Mediaeval Kerala, P. K. S. Raja, 1953
Tirukkural, A. Chakravarti, 1953
A Primer of Tamil literature, K. S. R Sastri, 1953
Gujarat and its Literature (2nd ed) K. M. Munshi, 1954
Great Composers (Book II), P Sambamoorthy, 1954
Thyagaraja Mahotsava Souvenir, Calcutta, 1954
Outlines of Islamic culture (2nd ed) Shushtery, 1954
Lines of devotion (Tyagaraja), A. V. S. Sarma, 1954
The Glory that was Gurjara Desa K. M. Munshi, 1955
A History of South India, K. A. Nilakanta Sastri, 1955
Karnataka Darshana, 1955
Sekkilar's Periyapuranam (2nd ed), J. M. Pillai, 1955
Ramacaritam K. M. George, 1956.
History of Tamil language, S. Vaiyapuri Pillai, 1956
Aspects of Indian religious thought, S.B. DasGupta, 1957
Excerpts from Potana's Bhagavatam, Sarma, 1957
Buddha and Basava, Kumaraswami, 1957
Gems of Ahdhra literature, Peri Suryanarayana, 1957
The Spiritual heritage of Tyagaraja, V. Raghavan, 1957
The Saundaryalahari, W. Norman Brown, 1958
Vedic Index, A. Macdonell and A. B. Keith, 1958
The Cultural Heritage of India (vol. I), 1958
Kerala Darshana, Krishna Chaitanya, 1958
Tamil literature, T. Writers Association (Calcutta), 1958
Kevaladvaita in Gujarati poetry, Y. J. Tripathi, 1958
The classical poets of Gujarat, G. M. Tripathi, 1958
Carnatic Music, R. Rangaramanuja Iyengar, 1958
Two Thousand years of Tamil literature, J. Pillai, 1959
Indian Literature, Nagendra, 1959
The Cult of Vithoba, G. A. Deleury, 1960
India through the ages (5th. ed), Jadunath Sarkar, 1960
Pathway to God in Kannada literature, Ranade, 1960
History of Indian Music, P. Sambamoorthy, 1960

A History of Kerala, K. M. Panikkar, 1960
Tamil Literature, T. Writers Association (Calcutta), 1960
Anciant Kerala, K. Achyutha Menon, 1961
First Souvenir, Andhra Sahitya Parishad (Calcutta), 1961
Madhva's Teachings in his own words, B. Sharma, 1961
Sri Aurobindo's Vedic Glossary, A. B. Purani, 1962

Periodicals

The Journal of the Music Academy, Madras
Indian culture
Indian Historical Quarterly
Tamil culture
The Modern Review

কন্নড

কর্ণাটক কবি চরিতে (তিন খণ্ড), নরসিংহাচার্য, ১৯২৪
মহাদেবিয়ক্কন রগলে, শ্রীচন্ন মল্লিকার্জুন, ১৯৩৩
হরিহরদেব, কে. জি. কুন্দনগার, ১৯৩৭
বচনধর্মসার, এম্. আর্. শ্রীনিবাস মূর্তি, ১৯৪৬
শ্রীকর্ণাটক হরিদাস কীর্তনতরঙ্গিণী (১ম ও ২য় ভাগ) ২য় মুদ্রণ ১৯৪৭
হরিভক্তিসুধে (২য় সংস্করণ), রঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকর, ১৯৪৯
সর্বজ্ঞবচনগলু, চন্নপ্প উত্তঙ্গি, ১৯৫০
হরিশ্চন্দ্রকাব্যসংগ্রহ, মৈসূরু বিশ্ববিদ্যানিলয়, ১৯৫০
বসবেশ্বরবচনসংগ্রহ, এল্. বসবরাজু, ১৯৫২
কর্ণাটকদ হরিদাস সাহিত্য, কন্নড সাহিত্য পরিষত্তু, ১৯৫২
গিরিজাকল্যাণ মহাপ্রবন্ধম্ (২য় মুদ্রণ) দেবিরপ্প ও জবরেগৌড়, ১৯৫৩
কন্নড সাহিত্য চরিত্রে, রং. শ্রী. মুগলি, ১৯৫৩
হরিহরন গিরিজাশংকরক, জি. ব্রমপ্প, ১৯৫৪
শ্রীবসবণ্ণনবর ষটস্থলদ বচনগলু, বিরূপাক্ষ, ১৯৫৪
শ্রীজগন্নাথদাসরু, কে. এম. কৃষ্ণরাও, ১৯৫৬
কনকদাসর কীর্তনেগলু, উপাধ্যায় প্রকটনালয়, ১৯৫৬

গুজরাতী

নরসিংহ মহেতাকৃত কাব্যসংগ্রহ, ইচ্ছারাম সূর্যরাম দেশাই, ১৯১৩
বৃহৎকাব্যদোহন (৭ম সং) ইচ্ছারাম সূর্যরাম দেশাই, ১৯২৫

গুজরাতী সাহিত্য নী রূপরেখা (২য় সং), বিজয়রায় কল্যাণরায় বৈদ্য, ১৯৪৯
গোবর্ধনরাম মাধবরাম ত্রিপাঠী, মধুসূদন মোহন, বিনয়চন্দ গুলাবচন্দ শাহ, ১৯৫৩
গুজরাতী সাহিত্য (মধ্যকালীন), অনন্তরায় রাওল, ১৯৫৪
সাহিত্য রত্ন (২য় ভাগ), ১৯৫৫
সাহিত্য প্রারম্ভিকা (৩য় সং), হিম্মতলাল গণেশজী অঞ্জারিয়া, ১৯৫৭
গুজরাতী সাহিত্য নো পরিচয়, সুস্মিতা মেঢ, ১৯৫৭
প্রেমানন্দকৃত দশমস্কন্ধ, মনসুখলাল ঝবেরী, ১৯৫৮
গুজরাতী সাহিত্য না স্তম্ভো, কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝবেরী, ১৯৫৮

তামিল

আড়্বার্কল্চরিত্রম্—সুন্দররাজাচারিয়ার্, ১৯১৯
তেবারপ্ পদিকঙ্গল্, সদাশিবম্ চেট্টিয়ার্, ১৯২৭
তিরুমুরু গাট্রুপ্পড়ৈ, বৈয়াপুরি পিল্লৈ, ১৯৪৩
তিরুপ্পাবৈ, গোপালকৃষ্ণমাচারি, ১৯৪৬
শিবন্, ন. চি. কন্দৈয়া পিল্লৈ, ১৯৪৭
আড়্বার্কল্ বরলারু, গোবিন্দরাজ মুদলিয়ার্, ১৯৪৮
সংঘত্ তমিলুম্ পির্কালত্ তমিলুম্, উ. বে. স্বামিনাথৈয়র্, ১৯৪৯
শিলপ্পধিকারম্ (৫ম সং), উ. বে. স্বামিনথৈয়র্, ১৯৫০
নালায়িরদিব্যপ্রবন্ধম্, কে গোপালাচার্য, ১৯৫২
কম্বন্ কাব্যম্, বৈয়াপুরি পিল্লৈ, ১৯৫৫
আড়্বার্ অমুদু, রায় চো, ১৯৫৬
মহাকবি ভারতিয়ার্ কবিতৈকল্, শক্তিকার্যালয়ম্, ১৯৫৭
কম্বরামায়ণম্, এস্. রাজম্, ১৯৫৮
আড়্বার্কল্ অরুল্মোড়ি, স্বামী চিদম্বরনার্, ১৯৬০

তেলুগু

ভক্তিরসশতকসম্পুটমু (৪ খণ্ড), শেষাদ্রি, ১৯২৬
পারিজাতাপহরণমু, নাগপুডি কুপ্পুস্বাময়্য, ১৯২৯
হরবিলাসমু, প্রভাকর শাস্ত্রী, ১৯৩৯
আন্ধ্রকবিতরঙ্গিণী, চাগণ্টি শেষয়্য, ১৯৪৬
শ্রীবেঙ্কটেশ্বর শতকমু (অন্নমাচার্য), রামস্বামি শাস্ত্রুলু এণ্ড্ সন্স্, ১৯৪৭

কুমারসম্ভবমু, মদ্রাস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮

ক্ষেত্রয়্যপদমুলু, আন্ধ্রকলাগানপরিষত্তু, ১৯৫০

পাণ্ডুরঙ্গমাহাত্ম্যমু, রামস্বামি শস্ত্রুলু এণ্ড সন্স, ১৯৫২

বসবপুরাণমু, আন্ধ্রগ্রন্থমালা, ১৯৫২

শ্রীমদান্ধ্রভাগবতমু, রায়লু এণ্ড্ কোং, ১৯৫৪

আমুক্তমাল্যদ (৬ষ্ঠ সং), রামস্বামি শস্ত্রুলু এণ্ড্ সন্স, ১৯৫৪

দক্ষিণদেশীয়ান্ধ্রবাঙ্‌ময়মু, নিড়ুদবোলু বেঙ্কটরাও, ১৯৫৪

শতক বাঙ্‌ময় সর্বস্বমু (প্রথম সম্পুটমু), বেদমু বেঙ্কটকৃষ্ণ শর্মা, ১৯৫৪

শৃংগার সংকীর্তনলু (অন্নমাচার্য), তিরুপতি দেবস্থানম্‌, ১৯৫৬

প্রাচীনকাব্যমঞ্জরি, গণ্টিজোগি সোময়াজি, ১৯৫৭

আমুক্তমাল্যদ পর্যালোকনমু, বেলদণ্ড প্রভাকরামাত্য ১৯৫৮

নন্নেচোড়ুনি কবিত্বমু, অমরেশম্‌ রাজেশ্বর শর্মা, ১৯৫৮

নন্নেচোড়ুনি কবিত্বমু, বেদমু বেঙ্কটরায় শাস্ত্রি, ১৯৫৯

বেমন পত্থমুলু, নেদুনূরি গঙ্গাধরম্‌ ১৯৬০

পঞ্জাবী

সটীক শলোক ফরীদ, সাহিব সিংঘ, ১৯৪৬

শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিব, শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমেটী, ১৯৫১

চণ্ডী দী বার, পরমিন্দর ও কিরপাল সিংঘ, ১৯৫১

বাবা ফরীদ দরশন, দীবান সিংঘ, ১৯৫১

শাহ হুসৈন, মোহন সিংঘ, ১৯৫২

কাফীআঁ বুল্হে শাহ, মেহর সিংঘ এণ্ড্ সন্স, ১৯৫৬

বাংলা

কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯২

কুরল্‌, নলিনীমোহন সান্যাল, ১৯৩৭

ভারতীয় সাধনার ঐক্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৯৪৫

বাংলার সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, ১৯৪৫

ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, ১৯৫০

ভারতের সংস্কৃতি (পুনর্মুদ্রিত ২য় সং), ক্ষিতিমোহন সেন, ১৯৫৪

বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং ইহার প্রাচীনতা, শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস, ১৯৫৪

ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৫৫
তন্ত্রকথা, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ১৯৫৫
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ (২য় সং), শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৯৫৭
আড়্বার্, শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস, ১৯৫৮
শ্রীব্রত, শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস. ১৯৬২

মরাঠী

শ্রীঅমৃতানুভব (জ্ঞানেশ্বর), বাবা গর্দে, ১৯২৯
জ্ঞানেশ্বর বচনামৃত (২য় সং), রা. দ. রানডে, ১৯৫২
মহারাষ্ট্র পরিচয়, কার্বে-জোগলেকর-জোশী, ১৯৫৪
একনাথ বচনামৃত, রা. দ. রানডে, ১৯৫৫
শ্রীতুকারাম বাবাঁচ্যা অভঙ্গাচী গাথা, মুম্বঈ সরকার, ১৯৫৫
ওলীচে অভঙ্গাচী শ্রীসকলসন্তগাথা, গোপালশংকর বাহিরকর, ১৯৫৫
তুকারামবচনামৃত (২য় সং), রা. দ. রানডে, ১৯৫৫
রবীন্দ্রনাথ আণি মহারাষ্ট্র, শ্রীপাদ জোশী, ১৯৬১
রামদাস বচনামৃত, রা. দ. রানডে, ?

মলয়ালম্

এড়ুত্তচ্ছণ্ডে রত্নঙ্গল্, কোচ্চি মলয়াল ভাষা পরিষ্করণ কমিটি, ১৯৩৩
অধ্যাত্মরামায়ণম্ (এড়ুত্তচ্ছন্), শ্রীরামবিলাসম্ প্রেস, ১৯৩৩
কৃষ্ণগাথা (চেরুশ্শেরি), ন্যাশনাল বুক স্টল, ১৯৫৩
কেরল সাহিত্য চরিত্রম্ (১ম খণ্ড), উল্লূর্. এস্. পরমেশ্বর অয়্যর্, ১৯৫৩
নম্মুডে নাডন্ পাট্টুকল্, তিরুবনন্তপুরম্ কাব্যোৎসব সমিতি, ১৯৫৪
এড়ুত্তচ্ছন্ সাহিত্যম্, কে. বি. শর্মা, ১৯৫৫
কৃষ্ণগাথা (চেরুশ্শেরি), মঙ্গলোদয়ম্, ১৯৫৬
পূন্তানম্ কৃতিকল্, কে. বাসুদেবন্, ১৯৫৮
সাহিত্য চরিত্রম্, কে. এম্. জর্জ, ১৯৫৮
মলয়ালম্ সাহিত্য চরিত্রম্, পি. কে. পরমেশ্বরন্ নায়র্, ১৯৫৮
অয়প্পন্ পাট্টু, কে. জি. মেনোন্, ১৯৫৯
শ্রীকৃষ্ণচরিত্রম্ (মণিপ্রবালম্), এইচ্. এণ্ড্ সি স্টোর্স্, ১৯৬০ .

সংস্কৃত

শ্রীমুকুন্দমালা, অন্নামলৈ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্, সুশীলকুমার দে, ১৯৩৮

শ্রীকৃষ্ণলীলা তরঙ্গিণী (নারায়ণতীর্থ), কে. বি. এণ্ড্ সন্স্, ১৯৪৮

[illegible], স্বামী শিবানন্দ, ১৯৪৯

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৯৫০

মুকুন্দমালা, বি. বি. কে. রঙ্গচারী, ১৯৫৪

নারায়নীয়ম্ (নারায়ণ ভট্টতিরি), সোমসুন্দর দীক্ষিতর্, ১৯৫৪

অধ্যাত্মরামায়ণম্, ভালচন্দ্র শঙ্কর দেবস্থলী, ১৯৫৫

শ্রীমদ্‌বাল্মীকি রামায়ণম্, রামরত্নম্, ১৯৫৮

হিন্দী

হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, ১৯৪০

মরাঠী সাহিত্যকা ইতিহাস, কৃষ্ণলাল শরণোদে 'হংস', ১৯৪৮

অষ্টছাপ পরিচয় (২য় সং), প্রভুদয়াল মীতল, ১৯৫০

রামকথা (উৎপত্তি ঔর বিকাস), কামিল বুল্কে, ১৯৫০

আন্ধ্রদেশ কে কবীর শ্রীবেমনা, বারণাসি রামমূর্তি 'রেণু', ১৯৫০

রামচরিতমানস, গোরখপুর গীতা প্রেস, ১৯৫৩

সন্ত্ সুধাসার, বিয়োগী হরি, ১৯৫৩

আদানপ্রদান, বারণাসি রামমূর্তি 'রেণু', ১৯৫৪

পঞ্চামৃত, বালশৌরি রেড্ডী (আন্ধ্রহিন্দী পরিষদ্), ১৯৫৪

তেলুগু ঔর উসকা সাহিত্য, শ্রীহনুমচ্ছাস্ত্রী 'অযাচিত', ১৯৫৪

মরাঠী ঔর উসকা সাহিত্য, প্রভাকর মাচবে, ১৯৫৬

কৈরলী সাহিত্য দর্শন, রত্নময়ী দেবী দীক্ষিত, ১৯৫৬

ভারতকে সন্ত্ মহাত্মা, রামলাল, ১৯৫৭

হিন্দী কো মরাঠী সন্তোঁ কী দেন, বিনয়মোহন শর্মা, ১৯৫৭

হিন্দী ঔর কন্নড মেঁ ভক্তি আন্দোলন কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন, হিরণ্ময়, ১৯৫৯

মলয়ালম্ সাহিত্য কা ইতিহাস, কে. ভাস্করন্ নায়র্, ১৯৬০

হিন্দী ঔর মলয়ালম্ মেঁ কৃষ্ণভক্তিকাব্য, কে. ভাস্করন্ নায়র্, ১৯৬০

পুরন্দরদাস কে ভজন, বাবুরাও কুমঠেকর, ১৯৬০

নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	ভুল	শুদ্ধ
১৬	২০	will	well
৩০	১১	চিন্তাধারায়	চিন্তাধারার
৩৭	২০	অন্নামলৈ	অণ্ণামলৈ
৩৯	৪	পূজৈ<পূজা	পূজৈ>পূজা
৫১	৬	স্কন্দ	স্কন্ধ
৫৭	২০	স্কন্দের	স্কন্ধের
৬৩	৬	তিনটি পরিচ্ছেদে	পরিচ্ছেদগুলিতে
৬৪	১৪	১৯৩০ খ্রী°	১০৩০ খ্রী°
৭৪	১২	ধর্মসঘর্ষের	ধর্মসংঘর্ষের
১১০	৩	পাববমুম	পাবমুম্
১১৩	৩	নম্মালোয়ারের	নম্‌মালোয়ারের
১২৪	৬	স্কন্দের	স্কন্ধের
১২৯	২	২৮	১৮
১২৯	২৩	নপ্পিনৈ	নপ্পিন্নৈ
১৩৯	২৪	পাঠাএ	পঠাএ
২১৩	২৫	রামদাস	রামভদ্র দাস বা ভদ্রাচল রামদাস
২১৩	২৬	কালুস পুরুষোত্তম	কাসুল পুরুষোত্তম
২১৬	২০	দ্র° ১১৪	দ্র° ১৪৪
২১৭	২৪	তল্লাপাক	তাল্লপাক
৩৩৯	১৬	ভগবতেরও	ভাগবতেরও
৩৬৮	১৯	পাঁঢরপুর	পাঁঢরপুরে
৪২৮	৭	শেষ	শেখ
৪৭৬	১৮	নপ্পিনৈ	নপ্পিন্নৈ
৪৮৪	২৩	রানী	রানীর
৪৮৮	২৩	নক্কীরের	নক্কীররের